উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন

ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার

মহোদয়ের করকমলে

ইতিহাসের লক্ষ্মী ওঠেন
এই জীবনের সিন্ধু-তীরে,—
বিস্মরণের সরণীতেই
তাঁর নিলয়ে চলেন ফিরে।
মিলিয়ে গেল রথখানা তাঁর
মহাকালের ঘোড়ায় টানা ;
চাকার আঁকা দাগ দেখে আজ
মিলবে কি তাঁর ঠিক্ ঠিকানা ?

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজা গণেশের বংশ (৬০-৭৮)

বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর ঃ স্বাধীন সুলতানদের আমল

(১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা
ভূমিকা সংবলিত

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় এম.এ.
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী

পরিবেশক :—
ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

Sukhamay Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ—জুলাই, ১৯৬০

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে

প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২০

দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৫৮

মূল্য ১৩.৫০ টাকা

প্রকাশক

শ্রীনন্দদুলাল দে

শান্তিনিকেতন

মুদ্রাকর

শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ

অন্নপূর্ণা প্রেস

৩৩ডি, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৬

তৃতীয় অধ্যায়

মাহ্মূদ শাহী বংশ (৭৯-১৪৮)

চতুর্থ অধ্যায়

হাবশী রাজত্ব (১৪৯-১৭৩)

পঞ্চম অধ্যায়

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৭৪-৩১১)

ষষ্ঠ অধ্যায়

হোসেন শাহী বংশের শেষ পর্ব (৩১২-৩৪৯)

ভূমিকা

এ বইখানি বাংলায় স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে মুঘল যুগের অব্যবহিত পূর্বে শের শাহের অধিকার পর্যন্ত বাংলা দেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস। অবশ্য এতে গণেশ ও হোসেন শাহ এবং আর কয়েকজন সুলতানের প্রসঙ্গ যেমন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, অন্য রাজাদের বর্ণনা তার তুলনায় কিছু সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হলেও অন্যান্য রাজগণের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যই আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাঁদের রাজত্বের ঘটনাগুলির বিচার করা হয়েছে। মোটের উপর ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হবার পর বাংলা ভাষায় বাংলা দেশের মুসলমান যুগের প্রথম ভাগের এরূপ ধারাবাহিক ইতিহাস আর কেহ লেখেন নাই। ইংরেজীতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ব্যতীত এই যুগের আর কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই।

গ্রন্থকার বাংলা দেশের মধ্যযুগের সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুতঃ এই যুগের সম্বন্ধে জ্ঞান ও গবেষণায় তিনি যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যে সকল নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং জটিল ঐতিহাসিক সমস্যাগুলি যেরূপ নিপুণভাবে ও যুক্তির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে অভিনন্দিত কর্তে কারও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রাজা গণেশের সম্বন্ধে এমন সম্পূর্ণ ও যুক্তিমূলক বিবরণ আর কোন গ্রন্থে নাই। অবশ্য গণেশের সম্বন্ধে সকল সমস্যারই চূড়ান্ত মীমাংসা করবার মত প্রমাণ আমাদের হাতে নাই—সুতরাং কতকগুলি ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকবেই। কিন্তু এ যাবৎ যেখানে যা কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে—তার একটিও গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়ায় নি বলেই মনে হয়। আর তার থেকে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করেছেন তাও খুব যুক্তিসঙ্গত। গণেশ ও ইব্রাহিম শর্কীর বিরোধ সম্বন্ধে তিনি সম্প্রতি-আবিষ্কৃত কতকগুলি নূতন তথ্যের সাহায্যে যে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন তা খুবই প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যায়। এ সম্বন্ধে

এতদিন যে কতগুলি অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরুদ্ধ ধারণা ছিল তা দূর করে তিনি একটি মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ দিয়ে বাংলার ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগের উপর নূতন আলোক পাত করেছেন। নূর কুৎব আলম ও আশ্‌রফ সিম্‌নানী ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলার কাফের রাজার বিরুদ্ধে যে ভাষায় উত্তেজিত করেছিলেন (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০-২১) তাতে বোঝা যাবে সে যুগে হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত সম্বন্ধ কি ছিল। যাঁরা মনগড়া হিন্দু-মুসলমানের কাল্পনিক ভ্রাতৃভাবে বিশ্বাস না করে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানতে চান—তাঁরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৯ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠা পড়লে অনেক খাঁটি তথ্য পাবেন। আর গণেশ এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে অন্ততঃ কিছুকাল গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাতে প্রমাণিত হয় যে রাজা গণেশ একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালী ও বাংলার ইতিহাস তাঁর স্মৃতির যথোচিত সমাদর করেনি। বাঙ্গালীর এই অপবাদ কতকটা দূর করে গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

হোসেন শাহ সম্বন্ধে যে রকম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই গ্রন্থে আছে পূর্বে তা কখনও পড়িনি। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যমের কথা উল্লেখ করা উচিত। অনেক প্রচলিত ও বদ্ধমূল ধারণার মূলে যে কোন সত্য নেই তিনি তার কতকগুলি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। হোসেন শাহ সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা এদেশে প্রচলিত আছে। তিনি নাকি বাংলা সাহিত্যের বড় একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর ধর্মমত নাকি ছিল খুবই উদার (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই সব কারণে 'হোসেন শাহী আমল' নামে বাংলার ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়েরই সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বাংলার মুসলমান যুগের এই আদর্শ রাজার সম্বন্ধে ৺দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখকেরা যে কাল্পনিক কাহিনী ইতিহাস বলে চালিয়ে এসেছেন আলোচ্য গ্রন্থে তা একেবারে ভূমিসাৎ হয়েছে। এটি গ্রন্থকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অবদান বলে আমি মনে করি। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে (দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৭ পৃঃ) এবং মৃগাবতীর শ্লোকে (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ) যে হোসেন শাহের উল্লেখ আছে—তিনি যে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এটা সকলেই বিনা বিচারে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু গ্রন্থকার যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন তাতে বিজয় গুপ্তের বর্ণিত হোসেন শাহ যে জলালুদ্দীন ফতে শাহ—তা'ই অধিকতর সঙ্গত মনে

হয়। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির মত উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে মৃগাবতীর হোসেন শাহও খুব সম্ভবত ভিন্ন ব্যক্তি। হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিনা এবং তাঁর ধর্মসম্বন্ধীয় নীতি কতটা উদার ছিল—এই দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার যে প্রচলিত মতের ভ্রান্তি দেখিয়েছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯২-৩১০ পৃঃ) তা এই গ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্যবান অংশ। হোসেন শাহের সম্বন্ধে আর একটি প্রচলিত ধারণা এই যে তিনিই প্রথম সত্যপীরের সিন্নি প্রবর্তন করেন। এ সম্বন্ধে যে কোন প্রমাণ নাই এবং সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন।

হোসেন শাহের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। 'রাজমালা' নামক ত্রিপুরার ইতিহাস বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। দুর্গামণি উজীরের সম্পাদিত (ও সংশোধিত) পুঁথিই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। এবং এর থেকে মূল পুঁথি রচনার তারিখ ও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে যাঁরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে থিসিস্ লেখেন তাঁরাও জানেন না যে এর পুরাতন পুঁথি এখনও পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত একখানি পুঁথির গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। দুর্গামণি উজীর কর্তৃক রাজমালা সংশোধনের আগেই এই পুঁথি লিপিকৃত হয়েছিল। এই পুঁথি থেকে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের বঙ্গদেশ আক্রমণ ও হোসেন শাহের ত্রিপুরা-অভিযান সম্বন্ধে যে অংশ গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন তার সঙ্গে মুদ্রিত রাজমালার পাঠের অনেক অনৈক্য দেখা যায়। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে এই পুরানো রাজমালার পুঁথি অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। গ্রন্থকার এটি উদ্ধৃত করে বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যের সমৃদ্ধি খুব বাড়িয়েছেন।

এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তা থেকেই আলোচ্য গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থখানির স্থান যে খুব উঁচুতে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এই উদীয়মান প্রতিভাশালী লেখককে সম্বর্ধনা করে ও অভিনন্দন জানিয়ে এই ভূমিকার উপসংহার করছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থকারের নিবেদন

বর্তমান বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আজ যেমন আমার আনন্দ হচ্ছে, তেমনি আবার আশঙ্কাও হচ্ছে। কারণ মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার মত জটিল এবং শ্রমসাধ্য কাজ খুব কমই আছে। আলোচ্য যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন সমসাময়িক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কিছু কিছু সূত্র বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে, সেগুলি অবলম্বন করে অনেক কষ্টে ঐ ইতিহাসকে পুনর্গঠন করে নিতে হয়। কিন্তু এই জাতীয় সূত্রের পরিমাণও এত অপ্রচুর যে পুনর্গঠন সন্তোষজনক হয় না। তাছাড়া এই দুরূহ কাজে হাত দেওয়া তাঁরই সাজে—যিনি সুপণ্ডিত, বহুভাষাবিৎ এবং মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। সেদিক দিয়ে আমার অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি যতটা সচেতন, এমন বোধ হয় আর কেউই নন। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি পর্ব সম্বন্ধে বই লিখলাম—একে দুঃসাহস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাই আজ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও হচ্ছে যে আমার দুঃসাহস হয়তো তিরস্কৃত হবে।

এই দুঃসাহস কেন আমার হল, সে সম্বন্ধে আমি এখানে কৈফিয়ৎ দিতে চাই। তা দিতে হলে এই ইতিহাস-গ্রন্থ রচনার ইতিহাসটি সংক্ষেপে বলা দরকার। কয়েক বছর আগে অন্য কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আমার 'রাজা গণেশ' সম্বন্ধে কিছু জানার প্রয়োজন হয়। সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখা সমস্ত আলোচনা পড়েও ঠিক তৃপ্তি পেলাম না, মনে হল ঐ বিষয় সম্বন্ধে বলবার কথা আরও অনেক বাকী থেকে গিয়েছে এবং যেটুকু এঁরা বলেছেন, তারও কিছু সংশোধন দরকার। তখন আমি নিজেই ঐ বিষয় সংক্রান্ত মূল সূত্রগুলি পড়তে এবং এ নিয়ে ভাবতে সুরু করলাম। আমার অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল হল 'রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ' নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলাম। সেই প্রবন্ধগুলি একত্র করে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি একখানি বই প্রকাশ করলাম—তার নাম 'রাজা গণেশের আমল'। বইটি প্রকাশের সময় ধরে নিয়েছিলাম যে এ বই বিশেষজ্ঞদের কাছে শুধু ধিক্কার ও

উপহাসই লাভ করবে এবং সেই সঙ্গেই আমার ইতিহাস-রচনা-প্রচেষ্টাতে পড়বে পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু তার বদলে বইটি তাঁদের অনুমোদন ও আশীর্বাদ লাভ করল। বিভিন্ন পত্রিকায় ঐ বইয়ের যে সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হল, তাতে লেখকের উৎসাহ বিশেষভাবে বর্ধিত হল।

এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে দু'টির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার মনে করছি। মধ্যযুগের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের (৫৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) পৌষ মাসের 'প্রবাসী'র 'পুস্তক-পরিচয়'-এ (পৃঃ ৩৮২) লেখেন,

"ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিরোধী কল্পনাবিলাস যেভাবে খরতর গতিতে বাংলা সাহিত্যকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক গবেষণা বাংলাদেশে লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছে। উদীয়মান গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় এই গবেষণাগ্রন্থ লিখিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। যাহারা 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' জাতীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া রাজা গণেশকে রূপকথার নায়ক সাজাইয়া তৃপ্তিবোধ করেন—বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী অদ্যাপি করিতেছেন—তাঁহারা আলোচ্য গ্রন্থটি একবার পড়িয়া দেখুন। বর্ত্তমানে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে রাজা গণেশের রাজত্বের উপর প্রচুর আলোকপাত হইয়াছে এবং গ্রন্থকার যাবতীয় উপকরণ বিচারপূর্ব্বক খণ্ডন-মণ্ডন করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কোন কোন ঘটনার বৈচিত্র্য এতই চিত্তাকর্ষক যে, রূপকথাকেও পরাস্ত করিতে পারে।"

তাঁর এই সমালোচনা আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-রচয়িতা ডঃ সুকুমার সেন ১৩৬৩-৬৪ বঙ্গাব্দের মাঘ-চৈত্র মাসের (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 'যাত্রী' পত্রিকায় (পৃঃ ৬৬-৬৮) 'রাজা গণেশের আমল'-এর যে সমালোচনা করেন, তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ডঃ সেন তাঁর সমালোচনার উপক্রমে লেখেন,

"নানাদিক থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ আহরণে লেখক যে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তা এখনকার দিনের গবেষণা গ্রন্থে (অবশ্য বাংলায় লেখা) মিলবে না।"

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর সমালোচনা শেষ করেন এই বলে,

"সুখময় বাবু আমাদের ভূতপূর্ব ছাত্র। এঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা রাখি। অনেকদিন কোন বাংলা বই পড়ে এমন তৃপ্তি পাইনি।"

এঁদের এই উক্তিগুলি আমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগায়। তার ফলে এবারে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছি—বাংলার দ্বিশতবর্ষব্যাপী স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) সম্বন্ধে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ আকারে আলোচনা করে এই বইটি লিখেছি। এ বই লেখার যোগ্যতা যে আমার নেই, তা আগেই বলেছি। কিন্তু কয়েক বৎসরের অধ্যয়ন ও চিন্তার ফলে যে তথ্যগুলি পেয়েছি, সেগুলিকে প্রকাশ করাই আমি নানা কারণে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করেছি। আমার অপটু হাতের এই সামান্য প্রচেষ্টার মূল্য নিঃসন্দেহে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তার মধ্যে যদি অল্প কিছু প্রয়োজনীয় বস্তুও থাকে, তবে তা পরবর্তী গবেষকদের কাজে লাগবে। সুতরাং তাকে অপ্রকাশিত রেখে কোন লাভ নেই। এই পর্বের ইতিহাস রচনার যোগ্য ব্যক্তি যিনি আসবেন—সেই পরম দক্ষ ও পরম পণ্ডিত ঐতিহাসিকের পথের কয়েকটি কাঁটা হয়ত এই বইটির মধ্য দিয়ে অপসারিত করতে পেরেছি এবং তা যদি পেরে থাকি, তাকেই যথেষ্ট বলে আমি মনে করব।

এই বই লেখার সময় আমি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত সব সূত্র থেকেই তথ্য আহরণ করার প্রয়াস পেয়েছি। অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে আলোচ্য যুগের বাংলার ইতিহাসের উপকরণ যে সমস্ত সূত্রে পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশই ফার্সী ভাষায় লেখা। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। এই যুগের ইতিহাসের ফার্সী সূত্র খুব বেশী নেই ; যে ক'খানি আছে, তাদের প্রায় সবগুলিই ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে এবং তাদের নিয়ে এপর্যন্ত আলোচনাও হয়েছে বিস্তর। সুতরাং ফার্সী সূত্রগুলিতে প্রদত্ত তথ্য যে কেউই আহরণ করতে পারেন এবং তাদের মধ্য থেকে নতুন কিছু পাবার আশা নেই। পক্ষান্তরে এই যুগের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থে ইতিহাসের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে, সেগুলি খুবই মূল্যবান ; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে জলালুদ্দীন ফতে শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালের নানা ব্যাপার সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলার কোন প্রামাণিক ধারাবাহিক ইতিহাস যখন পাওয়া যায় না, তখন সেই ইতিহাসকে পুনর্গঠন করে তুলতে হবে এবং সেই পুনর্গঠনে অনেকখানি উপাদান যোগাবে এই সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থগুলি। অথচ আজ পর্যন্ত এগুলি বিশেষ কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। বর্তমান বইটির মধ্যে সুপরিচিত ও ইতিপূর্বে-আলোচিত সূত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, সেইসঙ্গে এযাবৎ-অবহেলিত এই সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থগুলির

সাক্ষ্যও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার ফলে হয়তো আমার পক্ষে কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এই বইতে বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থের নাম যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। এইসব গ্রন্থের যতটুকু পরিচয় উল্লেখ করলে যথেষ্ট হবে, তার বেশী করিনি। যে সমস্ত বইয়ের নাম এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র উল্লিখিত হয়েছে, সংস্করণের উল্লেখ নেই, সে সব বইয়ের প্রথম সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে বুঝতে হবে। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের অধ্যায়সংখ্যা উল্লেখের সময় বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত সংস্করণকে এবং 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র পরিচ্ছেদসংখ্যা উল্লেখের সময় বঙ্গবাসী প্রেস প্রকাশিত সংস্করণকে অনুসরণ করেছি, কিন্তু ঐ দুই সংস্করণের পাঠকে সর্বত্র অনুসরণ করিনি, তার বদলে বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও কয়েকটি পুঁথি মিলিয়ে দেখার পরে যে পাঠ আমার কাছে সঙ্গত বলে মনে হয়েছে, তারই উপর নির্ভর করেছি ও তা'ই উদ্ধৃত করেছি। এই বইয়ে আলোচ্য পর্বের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; এই ব্যাপারে আমি প্রধানত তিনটি বই থেকে সাহায্য পেয়েছি, (১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ', (২) ডঃ আহমদ হাসান দানীর **Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal,** (৩) মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদের **Inscriptions of Bengal (Vol. IV)**। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ'-এ তাঁর সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাক্-মোগল যুগের বাংলার মুসলিম সুলতানদের শিলালিপিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে যাঁরা বাংলার সুলতানদের শিলালিপিগুলির তালিকা বা বিবরণ প্রস্তুত করেছেন, তাঁরা রাখালদাসের তালিকা থেকে বিশেষভাবে সাহায্য পেয়েছেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁরা যথোপযুক্তভাবে রাখালদাসের কাছে ঋণ স্বীকার করেন নি।

এই বইতে বাংলার ইতিহাসের যে পর্বটি আলোচিত হয়েছে, তাকে আগে অনেকে "পাঠান সুলতানদের আমল" নামে অভিহিত করতেন। কিন্তু ঐ নাম সম্পূর্ণ অসার্থক, কারণ শের শাহের আগে কোন পাঠান সুলতানই বাংলাদেশ শাসন করেন নি। আলোচ্য পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই পর্বে বাংলাদেশ একটানা দুশো বছর ধরে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। এই

সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের সম্পদ বাংলার ভিতরেই ছিল—বাইরে যায় নি। তা ছাড়া এই পর্বের অধিকাংশ সময় বাঙালীরাই বাংলাদেশ শাসন করেছেন বলা যায়। রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরেরা বাঙালী ছিলেন। নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ ও তাঁর বংশধরদেরও তা'ই বলা যেতে পারে (বর্তমান গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭-১৪৮ দ্রষ্টব্য)। আলাউদ্দীন হোসেন শাহও বাঙালী ছিলেন বলে এই বইতে দেখাবার চেষ্টা করেছি (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৮০-১৮২ দ্রষ্টব্য)। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমল আর একদিক দিয়ে স্মরণীয়। এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষ্যণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করে তোলেন ; তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজকর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। কাজেই, বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য পর্বটি সবদিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যে সব সুলতান বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। এই বইটিতে কোন কোন রাজার সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, কারণ তাঁদের সম্বন্ধে অন্য রাজাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তার দ্বারা এই কথা বোঝায় না যে অন্য রাজাদের তুলনায় তাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সব দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলতে হয় (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য)। এই বইতে তাঁর সম্বন্ধে যে ত্রিশ-পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা আছে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯০-১২০), তা অন্য কোন কোন রাজা সম্বন্ধীয় দীর্ঘতর আলোচনার তুলনায় স্বল্পায়তন হওয়ার দরুণ হয়তো তেমনভাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। সেইজন্যে এখানেই এ সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করে রাখলাম।

প্রথমে আমার এই পরিকল্পনা ছিল যে একখানি বইয়ের মধ্যেই বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করব। কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রচনায় অনেকখানি অগ্রসর হয়েও শেষ পর্যন্ত আমি পরিকল্পনাটি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছি। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করলে বইটির আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ হয়ে পড়ত। সেইজন্য এই বইটির মধ্যে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস প্রদত্ত হল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। এই

বইয়ের ছাপা সুরু হবার সময় আমি বইয়ের অতিরিক্ত কলেবর বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক না হয়ে স্থির করি যে কেবলমাত্র রাজা গণেশের অভ্যুদয় থেকে হোসেন শাহী বংশের পতন পর্যন্ত ইতিহাস আপাতত প্রকাশ করব। কিন্তু কতকগুলি ফর্মা ছাপা হয়ে যাবার পর বন্ধুদের পরামর্শে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের সমগ্র পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসটি একখানি বইয়ের মধ্যে দেওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। তার ফলে বাংলার স্বাধীনতার প্রথম পর্যায় থেকে সুরু করে রাজা গণেশের ক্ষমতা-অধিকার পর্যন্ত ইতিহাস পরে ছাপিয়ে এই বইয়ের মধ্যে 'প্রথম খণ্ড' রূপে অন্তর্ভুক্ত করা হল। পূর্ব-মুদ্রিত রাজা গণেশের আমল থেকে হোসেন শাহী বংশের আমল পর্যন্ত পর্বটির ইতিহাস 'দ্বিতীয় খণ্ড' হিসাবে থাকল। বইটি এইভাবে ছাপা হওয়ার ফলে কতকগুলি বিষয় উভয় খণ্ডের মধ্যেই আলোচিত হয়েছে, প্রথম খণ্ড আগে ছাপা হলে যা হত না। পাঠকেরা যেন এইসব পুনরুক্তি-দোষ মার্জনা করেন। উভয় খণ্ডের উক্তির মধ্যে কোন অনৈক্য দেখা গেলে প্রথম খণ্ডের উক্তিকেই যথার্থ ধরতে হবে, কারণ এই খণ্ডটি পরে ছাপা হয়েছে এবং ছাপতে দেবার অব্যবহিত পূর্বে এই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। পাঠকেরা যাতে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে গোলমাল করে না ফেলেন, তার জন্য প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যার পাশে /১ লিখে দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা থেকে পৃথক করা হয়েছে।

এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় যে রাজনৈতিক ইতিহাস, তা উপরে বলেছি। আধুনিক যুগের কোন কোন লেখক রাজনৈতিক ইতিহাসকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না ; তাঁদের মতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসই দেশের আসল ইতিহাস। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ প্রথমত, সর্বদেশের ও সর্বকালের ইতিহাসে দেখা যায়, জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকের তুলনায় রাজনৈতিক দিকই সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। আজকের দিনের সংবাপত্রগুলিতেও প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামায় রাজনৈতিক সংবাদ-গুলিই পরিবেশিত হয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সন্দেশ তাতে গৌণতর স্থান লাভ করে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন দেশের অন্যান্য দিকের ইতিহাসও লেখা যায় না। দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে হলেও প্রথমে রাজনৈতিক ইতিহাস ভালভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। কারণ রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রভাবেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বেশীর ভাগ

বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনই সংঘটিত হয় রাজনৈতিক ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের ফলে। এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশের অতীতকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্ব কোনক্রমেই ছোট করে দেখা চলে না, বরং তার সম্বন্ধে এখন আগেকার চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া দরকার।

যাহোক, বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলের শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনাও আমার পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। এই পর্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে আলোচিত হবে এবং ঐ খণ্ড স্বতন্ত্র বইয়ের আকারে প্রকাশিত হবে; সমসাময়িক সাহিত্য, শিলালিপি, বৈদেশিক বিবরণ ও অন্যান্য প্রামাণিক সূত্রে আলোচ্য যুগের দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজ্যশাসনব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি ঐ খণ্ডের মধ্যে প্রদত্ত হবে। এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে চীনা গ্রন্থ 'য়িং-য়ই-শেং-লান' ও 'সিং-চা-শেং-লান'-এ প্রদত্ত বাংলাদেশের বিবরণ "এই বইয়ের অন্যত্র" সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত হয়েছে; তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডের ২৪০ পৃষ্ঠায় বারবোসার বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিবরণ এই বইয়ের অন্যত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত হওয়ার কথা লেখা হয়েছে। এখানে "অন্যত্র" বলতে এই বইয়ের প্রকাশিতব্য তৃতীয় খণ্ড বুঝতে হবে। বলা বাহুল্য, যে খণ্ডে আলোচ্য পর্বের বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচিত হবে, তারই মধ্যে এই বিবরণগুলি স্থান পাওয়া উচিত। তবে চীনা বিবরণগুলির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ 'রাজা গণেশের আমল' বইয়ে (পৃঃ ৬৩-৭০) ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম, কৌতূহলী পাঠক সেখানেই এগুলি দেখতে পারেন।

বর্তমান বইয়ে মুসলমানী নামগুলি এবং অন্যান্য আরবী-ফারসী শব্দগুলি বাংলা অক্ষরে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার। এই নাম ও শব্দগুলি যেভাবে উচ্চারিত হয়, যতদূর সম্ভব সেইভাবেই লেখবার চেষ্টা করেছি। এগুলি রোমান অক্ষরে যেভাবে লেখা হয়, তার সঙ্গে উচ্চারণের অনেক সময় একটা পার্থক্য দেখা যায়। এই নাম ও শব্দগুলি বাংলা অক্ষরে কীভাবে লিখব, সে বিষয়ে আমি আরবী ও ফার্সী ভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি এগুলি যেভাবে লেখা উচিত, সে সম্বন্ধে আমায় যে পরামর্শ দিয়েছেন, তা'ই গ্রহণ করেছি। এখানে একটি কথা বলবার আছে। 'মাহ্‌মূদ' নামটিকে আমি

প্রচলিত বাঙালী উচ্চারণ-রীতি অনুসরণ করে এই বইয়ের ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'মামুদ'-রূপে লিখেছিলাম, পরে শ্রীযুক্ত মৈত্র আমাকে নামটি 'মাহ্মূদ'-রূপে লিখতে বলেন এবং ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে নামটি সেই ভাবেই লেখা হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে নিদর্শনী ও পাদটীকা দেবার সময় একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। যে সমস্ত নিদর্শনী দেওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং যে সমস্ত বিষয় পাদটীকায় উল্লেখ করা অপরিহার্য, সেইগুলি মূল গ্রন্থের মধ্যে দিয়েছি। অন্যান্য নিদর্শনী এবং পাদটীকায় আলোচিতব্য অন্যান্য বিষয় পরিশিষ্ট 'ঙ'-তে উল্লেখ করেছি। তাছাড়া কোন অংশ ছাপা হবার পরে ঐ অংশের কোন ভুল ধরা পড়ে থাকলে তার সংশোধনও পরিশিষ্ট 'ঙ'-র মধ্যে করেছি। যে সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট অংশ ছাপা হবার পরে পেয়েছি অথবা যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা মূল গ্রন্থের মধ্যে করা সম্ভব নয়, সেগুলি সম্বন্ধেও পরিশিষ্টেই আলোচনা করেছি; এগুলির মধ্যে বৃহৎ বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পরিশিষ্ট 'ক' থেকে পরিশিষ্ট 'ঘ' তে এবং অন্যগুলি পরিশিষ্ট 'ঙ'-তে আলোচিত হয়েছে। পাঠকদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁরা মূল গ্রন্থের মধ্যে কোন বিষয়ের আলোচনা পড়ার পরে যেন দেখেন পরিশিষ্টে ঐ বিষয় সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হয়েছে কিনা।

এই বইটির রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে অনেকেই আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহোদয় এই বইটির ভূমিকা লিখে দিয়ে একে অসামান্য গৌরব দান করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। ডক্টর মজুমদার এখন প্রবীণ বয়সে উপনীত এবং নানা কাজে ব্যস্ত। তা সত্ত্বেও তিনি এই দীন গ্রন্থকারের অনুরোধ রক্ষা করে এই মূল্যবান ভূমিকাটি লিখেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত করছি। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রের কাছে যখনই কোন সাহায্য চেয়েছি, তিনি তখনই তাঁর নিজের কাজ ফেলে রেখে আমায় সাহায্য করেছেন। এই বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পাটনা কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির কাছেও আমি কয়েকটি বিষয়ে সাহায্য পেয়েছি। এই জ্ঞান-তপস্বী নিরভিমানী ঐতিহাসিকের নাম সাধারণের কাছে অপরিচিত বললেও হয়, কিন্তু মুসলিম যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ বোধ হয় আজ আর কেউই নেই। তিনিও আমার শ্রদ্ধাভাজন।

বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ২১৫-২১৬ পৃষ্ঠায় কুৎবনের 'মৃগাবতী' থেকে উদ্ধৃত রাজ-প্রশস্তিটির পাঠ নির্ণয় ও তার বাংলা অনুবাদ করে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই পাঠ ও অনুবাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই। বিশ্বভারতী চীনভবনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সেন ও সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত রান-য়ুন-হুয়া এবং বিশ্বভারতীর ওড়িয়া বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসন্ন পট্টনায়ক ও ডঃ নরেন্দ্রনাথ মিশ্রও আমাকে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য করেছেন। আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী নবনীতা মজুমদার এই বইয়ের নির্ঘণ্ট প্রস্তুতে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছেও আমি ঋণী রইলাম। আরও একজনের কাছে আমি ঋণী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আহমদ শরীফ। তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই, তা সত্ত্বেও তিনি আমায় অনেক সাহায্য করেছেন। তিনি মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বহুদিন ধরে অক্লান্তভাবে মূল্যবান গবেষণা করে চলেছেন। যখনই তাঁর কোন বই বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আমায় তা পাঠিয়েছেন। সেগুলি থেকে আমি এই বইয়ের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছি। এছাড়া পত্রযোগে যখন তাঁর কাছে কোন সাহায্য চেয়েছি, তিনি তা আমায় অবিলম্বে পাঠিয়ে দিয়েছেন—নানা অসুবিধা ও কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া উপকরণগুলি আমার পরবর্তী বইগুলিতে আরও বেশী কাজে লাগবে। এই বই লেখার সময় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আমি বিশ্বভারতী, এসিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছে সব সময়ে সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। বোলপুর পুস্তকালয়ের কর্ণধার শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র নায়েকও এ ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণ স্বীকার করছি।

এই বইটি ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে প্রেসে যায়। নানা অসুবিধার জন্য ছাপা শেষ হতে প্রায় দু' বছর লাগল। যাহোক, এতদিন পরেও যে বইটি প্রকাশিত হল, তাই আমার পক্ষে সান্ত্বনার বিষয়।

এই বই যদি বাঙালী পাঠকদের মনে, বিশেষভাবে তরুণদের মনে মধ্য-যুগের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনুরাগ জাগাতে সক্ষম হয়, তাহলে আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল বলে মনে করব। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমনই যে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস, বিশেষত মধ্যযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে

ছাত্রজীবনে প্রায় কিছুই জানবার সুযোগ পাই না। কোন ইংরেজ, সে উচ্চ-শিক্ষিতই হোক্ আর স্বল্পশিক্ষিতই হোক্ আর তার পেশা যা'ই হোক্ না কেন—ইংলণ্ডের ইতিহাসটি মোটামুটিভাবে জানতে বাধ্য। ইংলণ্ডের অ্যালফ্রেড দি গ্রেট অথবা উইলিয়ম দি কংকারারের মত প্রসিদ্ধ রাজাদের সম্বন্ধে কিছু খবর রাখে না এমন ইংরেজ তো কেউ নেইই, অখ্যাততর রাজাদেরও অন্তত নামটুকু সে জাতের প্রত্যেকেই জানে। কিন্তু বাংলাদেশের খুব শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অধিকাংশই এদেশের শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বা রুকনুদ্দীন বারবক শাহ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের নাম জানেন না এবং জানেন না বলে ঘোষণা করতে তাঁরা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না! এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। রাজা গণেশ বা হোসেন শাহের নাম অনেকে শুনেছেন, কিন্তু ঐ শোনামাত্রই সার, তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছুই তাঁদের জানা নেই। অনেকে আবার বহুলপ্রচারিত কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক কোন কোন বই পড়ে বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য পর্ব সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা গঠন করে বসে আছেন ; এই জাতীয় বইগুলির মধ্যে অন্যতম দুর্গা-চরণ সান্ন্যালের লেখা 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস', বইখানা নামে 'ইতিহাস' হলেও আসলে বটতলার বস্তাপচা উপন্যাসের সমগোত্রীয়, আগাগোড়াই নিকৃষ্ট ধরণের কাল্পনিক উপাখ্যানে ভর্তি। শিক্ষিত বাঙালী জনসাধারণের কাছে আমি এই আশাই করব যে তাঁরা নিজের দেশের অতীতকে জানতে আগ্রহবোধ করবেন, মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী হবেন এবং নকল ছেড়ে আসলের স্বাদ গ্রহণ করবেন।

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়

অবতরণিকা

বাংলাদেশে মুস্‌লিম অধিকার প্রতিষ্ঠার সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে একবার দিল্লীর অধীন হয়েছে, আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে সুরু করে ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের উচ্ছেদ পর্যন্ত পুরোপুরি দুশো বছর বাংলাদেশ যে রকম অবিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করেছিল, তত দীর্ঘদিন ধরে আর কোন সময় তার স্বাধীনতা স্থায়ী হয়নি। এই দুশো বছর বাংলা দেশের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়ে বাংলার সুলতানরা নিজেদের যোগ্যতা, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের অন্যতম হয়ে উঠেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার পরিচালনায় এবং রাজার নানা রকম কর্তব্য পালনেও অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন। তার ফলে তাঁরা বাংলার জনসাধারণের, এমন কি বিধর্মী হিন্দুদেরও আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসের এই স্মরণীয় পর্বটির সম্বন্ধেই আমরা অতঃপর আলোচনা করব।

ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ

১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের মৃত্যু হবার পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে। এঁদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ্। কিন্তু তাঁর দু'জন ভ্রাতা দিল্লীর তৎকালীন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিয়াসুদ্দীন তুঘলক সসৈন্যে বাংলায় এসে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিজের

অধীনে আনেন (১৩২৪ খ্রীঃ)। ৭৩৯ হিজরা বা ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ তুঘলক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঐ সময়ে বাংলাদেশ তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল—লখ্‌নৌতি (লক্ষ্মণাবতী), সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও। ১৩৩৮ খ্রীঃর অব্যবহিত পূর্বে এই তিনটি অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন যথাক্রমে কদর খান, বহ্‌রাম খান ও মালিক ইজ্জুদ্দীন য়াহয়া। কয়েক-বছর সাফল্যের সঙ্গে সোনারগাঁও অঞ্চল শাসন করবার পর বহ্‌রাম খান পরলোকগমন করেন। এই বহ্‌রাম খানের তরবারি-বাহক ছিলেন ফখরুদ্দীন। তিনি ৭৩৯ হিজরায় দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সোনারগাঁও অঞ্চলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন এবং ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ নাম নিয়ে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। এই সময়ে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের খামখেয়ালীপনা ও অত্যাচারের ফলে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছিল, কাজেই ফখরুদ্দীন তাঁর উচ্চাশা নিবৃত্তির সুযোগ পেয়ে গেলেন।

কীভাবে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হলেন, তার সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য বিবরণ সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনির লেখা 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দীন বারনি দোয়াব ও বারনে মুহম্মদ তুঘলকের অত্যাচার বর্ণনা করার পরে লিখেছেন,

"প্রায় এই সময়ে বাংলাদেশে বহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পরে ফখ্‌রা বিদ্রোহ করে। ফখ্‌রা এবং তার বাঙালী সৈন্যেরা কদর খানকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী, পরিবার ও অধীনস্থ লোকদের খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে। সে তারপর লখ্‌নৌতির ধন-সম্পদ লুঠ করে ঐ স্থান এবং সাত-গাঁও ও সোনারগাঁও দখল করে। এইভাবে সম্রাট (মুহম্মদ তুঘলক) এইসব স্থান হারালেন, এগুলি ফখ্‌রা ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের হাতে গিয়ে পড়ল এবং আর এদের পুনরুদ্ধার করা হল না।" (**Tarikh-i-Firoz Shahi, Translated by Elliot, edited by Dowson, 1953, p. 167** দ্রষ্টব্য।)

ফখ্‌রুদ্দীনের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা অর্জন সম্বন্ধে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায়। এতে লেখা আছে,

"বহ্‌রাম খান সোনারগাঁওয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং তাঁর

তরবারি-বাহক মালিক ফখরুদ্দীন ৯৩৯ হিজরায় (১৩৩৮–৩৯ খ্রীঃ) বিদ্রোহী হয়ে সুলতান ফখরুদ্দীন নাম নিয়ে রাজচিহ্ন ধারণ করল। লখ্নৌতির শাসনকর্তা মালিক পিণ্ডার খিলজি কদর খান, মুস্তৌফি-ই-মমালিক মালিক হিসামুদ্দীন আবু রেজা, সাতগাঁওয়ের জায়গীরদার আজম-ই-মুল্ক্ অজুদ্দীন য়াহিয়া এবং করহ্-এর আমীর নসরৎ খানের পুত্র ফিরোজ খান বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে সোনারগাঁওয়ে গেলেন। সেও (ফখ্রুদ্দীন) তাঁর লোকদের নিয়ে তাঁদের সম্মুখীন হল। তারপর যে যুদ্ধ হল, তাতে ফখ্রুদ্দীন পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করল। পলাতকের হাতী এবং ঘোড়াগুলি বিজয়ী পক্ষের দখলে এল। কদর খান ঐ জায়গায় রইলেন, অন্যান্য আমীররা তাঁদের নিজের নিজের জায়গীরে ফিরে গেলেন।

"বর্ষাকাল উপস্থিত হলে কদর খানের বাহিনীর বেশীর ভাগ ঘোড়া মারা গেল। তিনি দু'তিন মাস ধরে বিপুল পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করে তাঁর নিজের গৃহে স্তূপাকারে ভাণ্ডারজাত করেছিলেন। তিনি বলতেন যে সম্রাটের সামনেও তিনি এইভাবে রৌপ্যমুদ্রা সঞ্চয় করতেন, কারণ তিনি যত বেশী সঞ্চয় করবেন, সুলতানের তাতে তত বেশী কাজ হবে। মালিক হিসামুদ্দীন তাঁকে এই মর্মে উপদেশ দিলেন, 'দূর দেশে প্রভূত ধন সংগ্রহ করা ক্ষতিকর, কারণ তার উপর লোকদের লোভ হবে এবং তারা সন্দেহ করবে কেন এই অর্থ সম্রাটকে পাঠানো হচ্ছে না। যা কিছু অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করা হয়েছে, সমস্ত রাজকোষে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। এর চেয়ে ভাল আর কিছুই হতে পারে না।" কদর খান তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না; তিনি সৈন্যদের তাদের প্রাপ্য (লুঠের অংশ) দিলেন না, রাজকোষেও ঐ সম্পদ পাঠালেন না। তাঁর সৈন্যেরা ঐ ধনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে ফখ্রুদ্দীন এসে পৌঁছোলো এবং পৌঁছোবামাত্র কদর খানের সৈন্যেরা তার সঙ্গে যোগ দিয়ে কদর খানকে হত্যা করল।

"ফখ্রুদ্দীন সোনারগাঁওকে তার রাজধানী করল এবং তার গোলাম মুখলিশকে লখ্নৌতিতে রেখে দিল। কদর খানের অধীনস্থ আরিজ-ই-লস্কর (সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা) আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করে লখ্নৌতি অধিকার করলেন। কিন্তু তিনি সার্বভৌম রাজা হবার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে সম্রাটের (মুহম্মদ তুঘলক) কাছে এই মর্মে এক আবেদন পাঠালেন যে তিনি লখ্নৌতি অধিকার করেছেন; যদি সম্রাট তাঁর কোন ভৃত্যকে

সেখানে পাঠান এবং (লখ্‌নৌতির) সিংহাসনে বসান (অর্থাৎ শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন), সে (ফখ্‌রুদ্দীন) সম্রাটকে শ্রদ্ধা দেখাবে। সুলতান আদেশ জারী করলেন যে নগরীর (অর্থাৎ দিল্লীর) শাসনকর্তা য়ূসুফকে 'খান' পদবী দিয়ে (লখ্‌নৌতিতে) পাঠান হল। ইতিমধ্যে (অর্থাৎ লখ্‌নৌতিতে পৌঁছোবার আগেই) মালিক য়ূসুফের মৃত্যু হল, কিন্তু সুলতান এদিকে মন দিলেন না এবং কাউকেই তিনি লখ্‌নৌতিতে পাঠালেন না। আলী মুবারক তখন ফখ্‌রুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর শত্রুতার জন্য বাধ্য হয়ে রাজচিহ্ন ধারণ করলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন নামে নিজেকে অভিহিত করলেন।" (**K. K. Basu's translation, pp. 106-107** দ্রষ্টব্য)।

সমসাময়িক গ্রন্থ 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে ফখ্‌রুদ্দীনের বিদ্রোহ ও সাফল্যলাভ সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিঞ্চিৎ পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী'তে তার সম্পূর্ণ সমর্থন মিলছে, উপরন্তু তাতে এই ঘটনার বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবরণ খুব পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। পরবর্তী কালে লেখা ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি ভাবে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ফখ্‌রুদ্দীন কদর খানের শিলাদার বা বর্মরক্ষক ছিলেন, কিন্তু 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, ফখ্‌রুদ্দীন বহ্‌রাম খানের তরবারি-বাহক ছিলেন, বদাওনীর 'মন্তখব্-উৎ-তওয়ারিখে' এই উক্তির সমর্থন আছে; জিয়াউদ্দীন বারনিও লিখেছেন যে সোনারগাঁওয়ে বহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পর সেই জায়গাতেই ফখ্‌রুদ্দীন বিদ্রোহ করেন। অতএব 'রিয়াজ'-এর উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কদর খান আসলে ফখ্‌রুদ্দীনের প্রভু ছিলেন না, শত্রু ছিলেন; ফখ্‌রুদ্দীনকে পরাজিত করেও কদর খান নিজের অতিরিক্ত অর্থলোভের জন্য শেষরক্ষা করতে পারেননি। ফখ্‌রুদ্দীন তার জন্য কদর খানকে বধ করে সংগ্রামে জয়ী হতে পেরেছিলেন।

ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহ ৭৫০ হিজরা (১৩৪৯-৫০ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, কারণ ৭৪০ থেকে হিঃ ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত সোনারগাঁও টাকশালে উৎকীর্ণ তাঁর মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ৭৫০ হিজরাতেই তাঁর রাজত্ব শেষ হয়, কারণ ৭৫০ হিঃর পরে আর তাঁর মুদ্রা মিলছে না, তার জায়গায় ৭৫০ হিঃ থেকে ৭৫৩ হিঃ পর্যন্ত সোনারগাঁও টাকশালে তৈরী ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

অনেকের ধারণা আছে, ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহ কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গের অধিপতি ছিলেন এবং পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আলাউদ্দীন আলী শাহের (পূর্ব নাম আলী মুবারক—'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণ দ্রষ্টব্য) অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের মুদ্রা কেবলমাত্র সোনার গাঁওয়ের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছে বলেই সম্ভবত এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। জিয়াউদ্দীন বারনির 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী' থেকে আগে যে অংশ উদ্ধৃত করেছি, তাতে পরিষ্কার লেখা আছে যে ফখ্‌রুদ্দীন সোনারগাঁও ছাড়া লখ্‌নৌতি এবং সাতগাঁও-ও জয় করেছিলেন। ফখ্‌রুদ্দীন যে লখনৌতি জয় করেছিলেন, সে কথা 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তেও লেখা হয়েছে; তাতে এই লেখা আছে, "ফখ্‌রুদ্দীন সোনারগাঁওকে তার রাজধানী করল এবং তার গোলাম মুখলিশকে লখ্‌নৌতিতে রেখে দিল।" এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ফখ্‌রুদ্দীন লখ্‌নৌতি জয় করেছিলেন এবং মুখলিশকে তার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেছিলেন; কিন্তু নিজের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সোনারগাঁওয়ে, সম্ভবত লখ্‌নৌতি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ জায়গা নয় বলে। এরপর আলী মুবারক মুখলিশকে বধ করে লখ্‌নৌতি পুনরধিকার করে নেন। আলী মুবারক ফখ্‌রুদ্দীনকে কোনদিন লখ্‌নৌতি জয় করতে দেন নি বলে যে ধারণা আছে, তা 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র বিবরণ থেকে ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। সাতগাঁও অঞ্চল কিন্তু বরাবর, অন্তত ১৩৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের রাজ্যভুক্ত ছিল। কারণ ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্ বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। ইব্‌ন্ বতুতা তাঁর ভ্রমণ-বিবরণীতে লিখেছেন যে তিনি সুলতান ফখ্‌রুদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 'সোদকাওয়াঙ' নামে বিশাল শহরে পদার্পণ করেছিলেন, ঐ 'সোদকাওয়াঙ' এবং সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম অভিন্ন (এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট 'ঙ' দ্রষ্টব্য)। আলাউদ্দীন আলী শাহের অধীনে লখ্‌নৌতি অঞ্চল ছাড়া আর কোন অঞ্চল কোনদিন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সোনারগাঁও, সাতগাঁও এবং সাময়িকভাবে লখ্‌নৌতি অঞ্চল অধিকার করেই ফখ্‌রুদ্দীন ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি চট্টগ্রাম জয় করে সেখানে প্রথম মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই বিষয়ের প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঔরংজেবের অন্যতম কর্মচারী শিহাবুদ্দীন তালিশের লেখায়। শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন, "সুদূর অতীতে ফখরুদ্দীন নামে বাংলার

একজন সুলতান চট্টগ্রাম সম্পূর্ণভাবে জয় করেন এবং শ্রীপুরের ঘাঁটির সামনে নদীর বিপরীত পারে অবস্থিত চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি বাঁধ তৈরী করেন। চট্টগ্রামে যে সমস্ত মসজিদ ও সমাধি রয়েছে, সেগুলি ফখ্রুদ্দীনের আমলে নির্মিত হয়েছিল। ধ্বংসাবশেষ থেকে তা প্রমাণ হয় (**The ruins prove it**)।" (**Studies in Mughal India, by Jadunath Sarkar, p. 122** দ্রষ্টব্য)।

শিহাবুদ্দীন তালিশের উক্তি থেকে অবশ্য ফখ্রুদ্দীনের চট্টগ্রাম বিজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, কারণ শিহাবুদ্দীন তালিশ ফখ্রুদ্দীনের মৃত্যুর প্রায় সওয়া তিনশো বছর বাদে তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তবে শিহাবুদ্দীন তালিশের বিবরণের শেষ দুটি বাক্য থেকে মনে হয় যে তিনি চট্টগ্রামের অনেক মসজিদ ও সমাধির ধ্বংসাবশেষের শিলালিপিতে ফখ্রুদ্দীনের নাম দেখেছিলেন। শিহাবুদ্দীন তালিশ কিছুদিন চট্টগ্রামে বাস করেছিলেন এবং চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, কাজেই ফখ্রুদ্দীনের চট্টগ্রাম বিজয় সম্বন্ধে তাঁর উক্তি সত্য হওয়া খুবই সম্ভব।

যিনি ফখ্রুদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে এসেছিলেন, সেই ইব্‌ন্ বত্তুতার ভ্রমণ-বিবরণী থেকে আমরা ফখ্রুদ্দীন সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি। ফকীরদের উপর ফখ্রুদ্দীনের অসামান্য প্রীতি, আলাউদ্দীন আলী শাহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ এবং ফখ্রুদ্দীনের রাজত্বকালে বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে ইবন্ বত্তুতা অনেক সংবাদ দিয়েছেন। আমরা এখানে ইবন্ বত্তুতার লেখা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি,

"বাংলার সুলতান—ইনি সুলতান ফখ্রুদ্দীন, ডাকনাম ফখ্রা। ইনি গুণী রাজা এবং বিদেশীদের, বিশেষত ফকীর ও সুফীদের ভালবাসেন। ...আলী শাহ লখ্নৌতিতে ছিলেন। ...ফখ্রুদ্দীন...'সোদকাওয়াঙে' এবং বাংলার অবশিষ্ট অংশে বিদ্রোহ করেন। সেখানে তিনি নিজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলী শাহের যুদ্ধ বাধে। শীতকালে এবং বর্ষাকালে জলকাদার মধ্যে ফখ্রুদ্দীন জলপথে লখ্নৌতি আক্রমণ করতেন, কারণ জলে তিনি শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু শুষ্ক ঋতু (গ্রীষ্মকাল) এলে আলী শাহ স্থলপথে বাংলা আক্রমণ করতেন, কারণ স্থলে তাঁর শক্তি বেশী ছিল।

"সুলতান ফখরুদ্দীনের ফকীরদের প্রতি শ্রদ্ধা এত প্রগাঢ় ছিল যে তিনি তাদের (ফকীরদের) মধ্য থেকে শায়দা নামে একজনকে 'সোদকাওয়াঙে'

তাঁর নায়েব (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর ফখরুদ্দীন তাঁর একজন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করেন। কিন্তু শায়দা নিজে স্বাধীন হবার অভিপ্রায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে সুলতান ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে। এইটি ছাড়া সুলতানের আর কোন পুত্র ছিল না। এই খবর শুনে সুলতান রাজধানীতে ফিরে আসেন। শায়দা এবং তার দলের লোকেরা পালিয়ে 'সুনারকাওয়াঙ' (সোনারগাঁও) শহরে আশ্রয় নিল। ঐ স্থান খুব দুর্ভেদ্য। সুলতান ঐ জায়গা দখল করার জন্য এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের প্রাণের ভয়ে শায়দাকে বন্দী করে সুলতানের বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিল। এই খবর সুলতানের কাছে গেলে তিনি বিদ্রোহীর মাথা (তাঁর কাছে) পাঠাতে আদেশ দিলেন। ফলে তার (শায়দার) মাথা কেটে ফেলা হল ও (সুলতানের কাছে) পাঠানো হল এবং তার জন্য এক বিরাট সংখ্যক ফকীর নিহত হল। আমি যখন 'সোদকাওয়াঙে' প্রবেশ করি, আমি তার সুলতানকে দেখিনি বা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি, কারণ তিনি ভারতবর্ষের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং আমি যদি সাক্ষাৎ করি, তার ফলাফল কী হবে, সে সম্বন্ধে আমার ভয় হয়েছিল।"

ইব্‌ন্ বত্তুতা এখানে একটি নতুন সংবাদ দিয়েছেন। সেটি এই যে তাঁর বাংলাদেশে ভ্রমণের সময়ে 'সোদকাওয়াঙ' বা 'সাতগাঁও'য়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজধানী ছিল। ফখরুদ্দীন পর্যায়ক্রমে সোনারগাঁও ও সাতগাঁওতে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করতেন বলে মনে হয়।

ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে ঐ সময় বাংলাদেশ ধনে-ধান্যে ভরা ছিল এবং তার জিনিসপত্র এত সস্তা ছিল, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণের মধ্যে সেযুগের বিভিন্ন জিনিষের দাম উল্লিখিত আছে।

ফখ্‌রুদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্গত হবঙ্ক (বর্তমান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত) শহরে ইব্‌ন্ বত্তুতা হিন্দুদের যে অবস্থা দেখেছিলেন, তার তিনি এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, "হবঙ্কের অধিবাসীরা বিধর্মী, তারা 'জিম্মা'র (রক্ষণব্যবস্থা) অধীন। যে শস্য তারা উৎপাদন করে, তার অর্ধেক নিয়ে নেওয়া হয়। তাছাড়াও তাদের কোন কোন কর দিতে হয়।" এর থেকে বোঝা যায়, ফখ্‌রুদ্দীনের কাছ থেকে হিন্দুরা উদার ব্যবহার পায় নি।

ইব্‌ন্ বত্তুতা নীল নদী অর্থাৎ মেঘনা দিয়ে হবঙ্ক থেকে সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "সুলতান ফখরুদ্দীন আদেশ দিয়েছেন যে এই নদীতে ফকীরদের কাছ থেকে কোন ভাড়া আদায় করা হবে না এবং যার কিছু নেই, তাকে খাদ্য দেওয়া হবে। যে ফকীর এই শহরে (সোনারগাঁওয়ে) আসে, তাকে আধ দীনার (প্রায় আট আনার মত) দেওয়া হয়।"

ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে, 'সোদকাওয়াঙ' বা সাতগাঁওয়ের কাছে "গঙ্গা নদীর উপরে অসংখ্য জাহাজ আছে, এগুলি দিয়ে এরা লখ্‌নৌতির লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।" এর থেকে বোঝা যায়, লখনৌতির তৎকালীন সুলতান ইলিয়াস শাহের সঙ্গেও ফখরুদ্দীনের যুদ্ধ হত।

কিন্তু ইব্‌ন্ বত্তুতা তাঁর বিবরণে ফখরুদ্দীনের সম্বন্ধে একটি ভুল খবর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে বাংলাদেশ থেকে সুলতান নাসিরুদ্দীনের (বলবনের পুত্র বুঘরা খান) বংশের আধিপত্য লুপ্ত হলে ফখরুদ্দীন মুহম্মদ তুঘলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং নিজে স্বাধীন রাজা হন, কারণ তিনি নাসিরুদ্দীনের বংশের মিত্র ছিলেন। কিন্তু বাংলায় নাসিরুদ্দীনের বংশের আধিপত্য ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছুকাল আগে নাসিরুদ্দীনের পুত্র রুকনুদ্দীন কায়কাউসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহ তার বহু পরে সংঘটিত হয়েছিল। ইব্‌ন্ বত্তুতা শাম্‌সুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ) ও তাঁর পুত্রদের নাসিরুদ্দীনের বংশের লোক বলে মনে করেছেন, কিন্তু তাঁরা নাসিরুদ্দীনের বংশধর নন (এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 77, pp. 93-94 এবং I. H. Q., Vol. XVIII, No. 1, 1942, p. 65 ff. দ্রষ্টব্য)। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের বংশের উচ্ছেদ ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের ১০।১১ বছর আগে ঘটেছিল (History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 89 দ্রষ্টব্য), সুতরাং তাও ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহের কারণ হতে পারে বলে মনে হয় না। ফখরুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের পালিত পুত্র এবং দিল্লী থেকে প্রেরিত বহ্‌রাম খানের তরবারি-বাহক ছিলেন, শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের বংশের সঙ্গে ফখরুদ্দীনের কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে অন্য কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। তবে এরকম ঘনিষ্ঠতা থাকা অসম্ভব নয়। ফখ্‌রুদ্দীন শাম্‌সুদ্দীন ফিরোজ শাহের বংশের উচ্ছেদকে তাঁর বিদ্রোহের অজুহাত হিসাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, এরকম হতে পারে।

কীভাবে ফখ্রুদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যু হল, তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণে বিভিন্ন ধরণের কথা লেখা আছে এবং আশ্চর্যের বিষয়, কারও কথা সত্য নয়। নীচে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে যে ফিরোজ শাহ তুঘলক ও শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের যুদ্ধের পর ফিরোজ শাহ দিল্লীতে ফিরে গেলে (৭৫৫ হিঃ = ১৩৫৪ খ্রীঃ) ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও আক্রমণ করে ফখরুদ্দীনকে নিহত করেন এবং তাঁর রাজ্য অধিকার করে নেন। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, ৭৫০ হিজরায় ফখ্রুদ্দীন মুবারক শাহের মৃত্যু হয় এবং ঐ বছরেই ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ও ৭৫৩ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অতএব ৭৫৫ হিজরায় ফখরুদ্দীনের নিহত হওয়া এবং ফখরুদ্দীনের কাছ থেকে ইলিয়াস শাহের রাজ্য কেড়ে নেওয়া—দুইই অসম্ভব।

য়াহিআ বিন্ সির্হিন্দি তাঁর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ ৭৪১ হিজরায় সোনারগাঁও আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ফখরুদ্দীনকে প্রথমে গলায় শৃঙ্খল বেঁধে বন্দী করেন ও পরে বধ করেন। কিন্তু ফখরুদ্দীন ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং ৭৫৩ হিঃ অবধি তাঁর পুত্র রাজত্ব করেন। অতএব ৭৪১ হিজরায় তাঁর পরাজয় ও রাজ্যচ্যুতি অসম্ভব।

বদাওনী তাঁর 'মন্ত্খব্-উৎ-তওয়ারিখে' লিখেছেন যে ফখ্রুদ্দীন বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সুলতান মুহম্মদ তুঘলক তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং ৭৪১ হিজরায় সোনারগাঁওয়ে এসে সোনারগাঁও অধিকার করেন ও ফখ্রুদ্দীনকে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু মুহম্মদ তুঘলকের সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা তাঁর এই তথাকথিত ৭৪১ হিজিরার বঙ্গাভিযান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেননি, তাঁদের লেখা বিবরণ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে মুহম্মদ তুঘলক ৭৪১ হিজরায় বাংলাদেশ থেকে দূরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গিয়েছিলেন। আলোচ্য যুগের প্রধান সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনি স্পষ্টই লিখেছেন যে ফখ্রুদ্দীন বিদ্রোহ করে মুহম্মদ তুঘলকের সাম্রাজ্যের যে সমস্ত অংশ অধিকার করেছিলেন, মুহম্মদ সেগুলি কোন দিন পুনরধিকার করতে পারেন নি। যাহোক ৭৪১ হিজরায় যখন মুহম্মদ

তুঘলক বাংলাদেশে আসেননি এবং ফখ্‌রুদ্দীন যখন ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, তখন বদাওনীর উক্তি ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

গোলাম হোসেন তাঁর 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লিখেছেন যে লখ্‌নৌতির সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতান ফখ্‌রুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন; যুদ্ধের পরে আলী শাহ ফখ্‌রুদ্দীনকে বন্দী করেন এবং তাঁকে বধ করে তিনি কদর খানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। 'রিয়াজ'-এর মতে ৭৪১ হিজরায় এই ঘটনা ঘটেছিল। আবার ৭৪১ হিজরা! 'আইন-ই-আকবরী'তেও লেখা আছে যে আলী শাহ ফখ্‌রুদ্দীনকে আক্রমণ করে বন্দী ও বধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন সালের উল্লেখ করা হয়নি। মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, ৭৪৩ হিজরায় আলাউদ্দীন আলী শাহের মৃত্যু ঘটে ও শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন; ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ যখন ৭৫০ হিঃ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, তখন আলাউদ্দীন আলী শাহের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে না।

অতএব এ সম্বন্ধে প্রত্যেকটি বিবরণের উক্তিই ভ্রান্ত। আসলে যতদূর মনে হয়, ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল।

ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে তাঁর সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। তাঁর মুদ্রাগুলির গঠন ও আকৃতি চমৎকার এবং এ পর্যন্ত বাংলার সুলতানদের যত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তাদের মধ্যে এগুলি সবচেয়ে সুন্দর। এ সম্বন্ধে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন, "The coins of Fakhruddin are veritable gems of the art of coin-striking and speak volumes in favour of the skill of the Sonargaon artists. Their shape is regular, the lettering on them delightfully neat and well-shaped, and they carry about them a refreshing air of refinement. It is a joy to behold them and a delight to read them. It may be safely asserted that coin-making never again attained such excellence in Bengal." রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "সুলতান ফখর্‌-উদ্দীন্‌ মবারক্‌ শাহের মুদ্রা অবিমিশ্ররজতে নির্ম্মিত এবং ইহার গঠন অতি সুন্দর।"

বিখ্যাত দরবেশ শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজি ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের

সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করতেন। ইবন্ বতুতা ৭৪৭ হিজরা বা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। পরের বছর ১৫০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ

ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের নাম কোন ইতিহাসগ্রন্থে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে তাঁর অস্তিত্ব জানা গিয়েছে।

ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের সমস্ত মুদ্রা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহেরই মত সোনারগাঁওয়ের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ। তাঁর মুদ্রায় 'অল-সুলতান বিন অল-সুলতান' লেখা আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে ইখতিয়ারুদ্দীনের পিতা সুলতান ছিলেন। কিন্তু কোন মুদ্রাতেই তাঁর পিতার নাম লেখা নেই। না থাকলেও, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহই যে ইখতিয়ারুদ্দীনের পিতা, তা তিনটি প্রমাণ থেকে বলা চলে। প্রথমত, ফখরুদ্দীনের মুদ্রা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইখতিয়ারুদ্দীনের মুদ্রা সুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ফখরুদ্দীন ও ইখতিয়ারুদ্দীনের মুদ্রার গঠন অবিকল এক এবং উভয়ের মুদ্রারই উল্টো-পিঠে "খলীফৎ-এর ডান হাত" কথাটি লেখা আছে একইভাবে। তৃতীয়ত ঐ সময়ে বা তার অব্যবহিত আগে সোনারগাঁওয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ ছাড়া এমন কোন সুলতানের সন্ধান পাওয়া যায় না, ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ যাঁর পুত্র হতে পারেন। এই তিনটি প্রমাণ থেকেই টমাস ইখতিয়ারুদ্দীন ফখরুদ্দীনের পুত্র ছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং পরবর্তী সমস্ত ঐতিহাসিক তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন।

ইখতিয়ারুদ্দীন যে ফখরুদ্দীনের পুত্র, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নেই। তবে ইব্ন্ বতুতার একটি উক্তি এ সম্বন্ধে খানিকটা সংশয়ের সৃষ্টি করে। ইব্ন্ বতুতা লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন শায়দা নামক একজন ফকীরকে সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করে কোন একজন শত্রুর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, তখন দুষ্ট শায়দা ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করে। এইটি ছাড়া সুলতানের আর কোন পুত্র ছিল না। ফখরুদ্দীনের একমাত্র পুত্র যখন

শায়দার হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তখন ইখতিয়ারুদ্দীন ফখরুদ্দীনের পুত্র হন কেমন করে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, ইবন্ বত্তুতার বাংলাদেশে ভ্রমণের পরে ফখরুদ্দীনের আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনিই ইখতিয়ারুদ্দীন। এই মত যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে ৭৫০ হিজরায় সিংহাসনে আরোহণের সময় ইখ্তি-রুদ্দীন নিতান্ত শিশু ছিলেন, কারণ ৭৪৭ হিজরা বা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইবন্ বত্তুতা বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন। ৭৫৩ হিজরায় যখন ইখতিয়ারুদ্দীনের রাজত্বের অবসান হয়, তখনও তিনি শিশুই ছিলেন। আমাদের মত সত্য হলে কেন ইখতিয়ারুদ্দীন কোন ইতিহাসগ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি, তা বোঝা যাবে।

৭৫৩ হিজরা থেকে ৭৫৮ হিজরা অবধি সোনারগাঁও টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা অব্যাহতভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে ৭৫৩ হিজরায় ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক রাজচ্যুত ও সম্ভবত নিহত হন।

শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ কর্তৃক ফখরুদ্দীন নিহত ও তাঁর রাজ্য অধিকৃত হবার পরে ফখরুদ্দীনের জামাতা জাফর খাঁ দিল্লীতে ফিরোজ শাহের কাছে গিয়ে নালিশ করেন। আফিফের এই উক্তির মধ্যে যে ভুল আছে, সেকথা আগেই বলেছি। আমরা সিকন্দর শাহের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব এবং এই ভুলের কারণ কী, তাও নিরূপণের চেষ্টা করব। আসলে জাফর খাঁ ইলিয়াস শাহ কর্তৃক ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের রাজ্য অধিকারের পরেই ফিরোজ শাহের কাছে গিয়ে নালিশ করেছিলেন সন্দেহ নেই। যতদূর মনে হয়, শিশু ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের অভিভাবক রূপে তাঁর ভগ্নীপতি জাফর খাঁ রাজ্য শাসন করতেন। এই শিশুর কথা সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেননি বা করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফের মতে ইলিয়াস শাহের সোনারগাঁও অধিকারের সময় জাফর খাঁ শুল্ক আদায় এবং শুল্ক সংগ্রাহকদের হিসাবপত্র পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই কথা সত্য বলে মনে হয়। জাফর খাঁর অভিযোগের ফলেই ফিরোজ শাহ দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন।

আলাউদ্দীন আলী শাহ

আলাউদ্দীন আলী শাহের পূর্ব নাম আলী মুবারক। তিনি লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা কদর খানের অধীনে সৈন্যবাহিনীর বেতনদাতা ছিলেন। কদর খান সোনারগাঁওয়ে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের বিদ্রোহ দমন করতে যান এবং প্রথমে ফখ্‌রুদ্দীনকে পরাজিত করেও তারপর নিজের অর্থলোভের দরুণ সৈন্যবাহিনীর বিরাগভাজন হন, ফলে তারা ফখ্‌রুদ্দীনের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁকে নিহত করে। ফখ্‌রুদ্দীন তারপর লখ্‌নৌতি অধিকার করে সেখানে নিজের ভৃত্য মুখলিশকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আলী মুবারক কিন্তু বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মুখলিশকে বধ করে লখ্‌নৌতি অধিকার করেন। তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় না দেখিয়ে দিল্লীশ্বর মুহম্মদ তুঘলকের কাছে লখ্‌নৌতির একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করার আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠান। মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা য়ুসুফ দিল্লীতে এসে পৌঁছোবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং উন্মাদ মুহম্মদ তুঘলক তাঁর জায়গায় আর কাউকে নিযুক্ত করেন নি। তখন আলী মুবারক বাধ্য হয়ে সিংহাসনে বসলেন এবং আলাউদ্দীন আলী শাহ নাম নিলেন। কারণ তাঁর শত্রু ফখ্‌রুদ্দীন অনবরত লখ্‌নৌতি জয়ের চেষ্টা করছেন, লখ্‌নৌতিতে কোন শাসনকর্তা নেই, অতএব আলী মুবারককেই সে আক্রমণ ঠেকাতে হবে। কিন্তু লোকে রাজা ভিন্ন কারও নির্দেশ সহজে মানবে না, তাই বাধ্য হয়ে তিনি রাজা হলেন। আলী মুবারক যে সত্যিকারের বীর, নিঃস্বার্থপরায়ণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন, তা 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে বর্ণিত তাঁর এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায়।

ইবন্‌ বত্তুতার বিবরণ থেকে জানা যায়, আলী শাহ কীরকমভাবে ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। বর্ষাকাল এবং শীতকালে ফখ্‌রুদ্দীন লখ্‌নৌতি আক্রমণ করতেন, কারণ ফখ্‌রুদ্দীন জলে শক্তিশালী ছিলেন; কিন্তু আলী শাহ স্থলে বেশী শক্তিশালী ছিলেন বলে গ্রীষ্মকালে তিনিই ফখ্‌রুদ্দীনের রাজ্য আক্রমণ করতেন।

আলাউদ্দীন আলী শাহের সমস্ত মুদ্রাই ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশাল থেকে তৈরী। এর থেকে বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গের অঞ্চলবিশেষ তাঁর অধিকারে ছিল। সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে, লখ্‌নৌতি অঞ্চল

(অর্থাৎ পূর্বতন মুসলমান সুলতানদের রাজ্যের মধ্যে উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত অঞ্চল ছিল) তাঁর অধিকারে ছিল। বাংলার আর কোন অঞ্চল যে তিনি কোন দিন অধিকার করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ নেই। সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ যে তাঁর শত্রু ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহের অধীনে ছিল, তার প্রমাণ আছে। এসম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

আলাউদ্দীন আলী শাহ কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, সে প্রশ্ন আগে বেশ জটিল ছিল। কারণ টমাস এবং তাঁর অনুবর্তী গবেষকেরা বলেছিলেন, আলী শাহের ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫ ও ৭৪৬ হিজরায় মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। আলী শাহের পরবর্তী সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহেরও ৭৪০, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫ ও ৭৪৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে বলে এঁরা বলেছিলেন। দুই সুলতানের মুদ্রাই ফিরোজাবাদের টাকশালে তৈরী। টমাস এবং তাঁর অনুবর্তী গবেষকদের মত সত্য হলে বলতে হত, আলী শাহ ও ইলিয়াস শাহ ৭৪০ বা ৭৪২ হিজরা থেকে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছেন, এবং কখনও একজন, কখনও অপরজন ফিরোজাবাদ দখল করে তার টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এইভাবে যে সে টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রকাশ করলেই লোকে সে মুদ্রাকে গ্রহণ করে না। আসলে টমাস প্রভৃতি গবেষকেরা আলী শাহ ও ইলিয়াস শাহের অনেক মুদ্রার তারিখ ভুল পড়াতেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দীন আলী শাহের এ পর্যন্ত যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, সমস্তই ৭৪২ ও ৭৪৩ হিজরায় তৈরী; ইলিয়াস শাহের ৭৪০ হিজরার কোন মুদ্রা নেই, ঐ তারিখ ভুল পড়া হয়েছিল (Bhattashali, Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, pp. 14-17, 19-24)। ইলিয়াস শাহের রাজত্বের প্রাচীনতম তারিখ ৭৪৩ হিজরার ২রা শাবান। ঐ তারিখে উৎকীর্ণ তাঁর একটি শিলালিপি পাওয়া যায়। ৭৪৩ থেকে ৭৫৮ হিজরা পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ৭৪৩ হিজরার শাবান মাসের আগেই আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্ব শেষ হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর রাজত্ব কবে আরম্ভ হয়েছিল, তাও অনুমান করা কঠিন নয়। ৭৪২ হিজরায় সর্বপ্রথম আলাউদ্দীন আলী শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ঐ বছরেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কারণ ৭৩৯ হিজরায় ফখ্‌রুদ্দীন মুবারক শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারপর কদর খান কর্তৃক বিদ্রোহ দমন, কদর খানের হত্যা, ফখরুদ্দীন কর্তৃক লখ্‌নৌতি অধিকার, সেখানে মুখলিশকে শাসনকর্তা

নিযুক্ত করা, আলী শাহ কর্তৃক মুখলিশকে বধ ও লখ্নৌতি পুনরধিকার, মুহম্মদ তুঘলকের কাছে শাসনকর্তা নিয়োগ করতে চিঠি লেখা, মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক শাসনকর্তা নিয়োগ, সেই শাসনকর্তার মৃত্যু, অতঃপর মুহম্মদ তুঘলকের কিছুকাল নতুন শাসনকর্তা নিয়োগে অবহেলা এবং তার ফলে আলী শাহের সিংহাসনে আরোহণ—এই ঘটনাগুলি যথাক্রমে ঘটে। এত ঘটনা ঘটতে ৩।৪ বছরের কম সময় লাগবার কথা নয়। অতএব আলী শাহ ৭৪২ হিজরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে ধরা যায়। পরবর্তী ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে আলী শাহ এক বছর কয়েক মাস ('রিয়াজ'-এর মতে এক বছর পাঁচ মাস) রাজত্ব করেন। এই কথাই সত্য বলে মনে হয়। সুতরাং আলাউদ্দীন আলী শাহ ৭৪২ হিজরার গোড়ার দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে অনুমান করা যায়।

শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের কাছ থেকে পাণ্ডুয়া জয় করার পরে (১৩৫৪ খ্রীঃ) ফিরোজ শাহ তুঘলক ঐ শহরের নাম ফিরোজাবাদ রাখেন। কিন্তু আলাউদ্দীন আলী শাহের মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদের টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে মুদ্রাগুলিতে লেখা আছে। অতএব শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফের উক্তি ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের সঙ্গে আলাউদ্দীন আলী শাহের কী সম্পর্ক ছিল, তা সঠিকভাবে জানা জায় না। 'আইন-ই-আকবরী'র মতে ইলিয়াস বাংলার অন্যতম অভিজাত **(one of the nobles of Bengal)** ছিলেন, 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ইলিয়াস ছিলেন আলী শাহের ধাত্রীমাতার পুত্র এবং বুকাননের বিবরণীর মতে তিনি ছিলেন আলী শাহের ভৃত্য। প্রায় সমস্ত বিবরণীরই মতে ইলিয়াস ষড়যন্ত্র করে আলী শাহকে বধ করে নিজে রাজা হন। এই সব বিবরণের মধ্যে 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'ই সব চেয়ে প্রাচীন। এতে লেখা আছে, "মালিক ইলিয়াস হাজীর বহু সমর্থক ছিল। তিনি লখ্নৌতির আমীর ও মালিকদের এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দিয়ে আলাউদ্দীনকে বধ করেন এবং সুলতান শামসুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন।" এই কথা সত্য বলেই গ্রহণ করা যায়।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' আলাউদ্দীন আলী শাহের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা আমরা অনুবাদ করে দিলাম,—

"কথিত আছে মালিক আলী মুবারক প্রথমে মালিক ফিরোজ রজবের একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলেন। মালিক ফিরোজ সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সুলতান মুহম্মদ শাহের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। সুলতান মুহম্মদ শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন রাজত্বের প্রথম বছরেই তিনি মালিক ফিরোজকে তাঁর সচিব (সেক্রেটারী) নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে আলী মুবারকের ধর্ম-ভাই হাজী ইলিয়াস কোন অপকর্ম করেন এবং তার জন্য তিনি দিল্লী থেকে পলায়ন করেন। মালিক ফিরোজ আলী মুবারককে তাঁর কথা বললে তিনি তাঁর (ইলিয়াসের) খোঁজ করলেন। যখন তাঁর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না, তখন আলী মুবারক মালিক ফিরোজকে তাঁর পলায়নের কথা জানালেন। মালিক ফিরোজ তখন তাঁর উপর চটে গিয়ে তাঁকেও তাড়িয়ে দিলেন। আলী মুবারক বাংলাদেশের দিকে রওনা হলেন। পথে তিনি স্বপ্নে হজরৎ শাহ মখদুম জলালুদ্দীন তব্রিজির (ভগবান তাঁর সমাধি পবিত্র করুন) দেখা পেলেন এবং তাঁকে বিনয় ও আনুগত্য দেখিয়ে পরিতুষ্ট করলেন; সেই দরবেশ তাঁকে বললেন, 'আমরা তোমাকে বাংলার সুবা দান করছি, কিন্তু তুমি আমাদের জন্যে একটি দরগা তৈরী করে দেবে।' আলী মুবারক তাতে সম্মত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় দরগা তৈরী করতে হবে। দরবেশ বললেন, "পাণ্ডুয়া শহরে এক জায়গায় তুমি তিনটি ইঁট দেখতে পাবে। একটির উপরে আর একটি ইঁট রয়েছে এবং এই ইঁটগুলির নীচে আছে একটি তাজা একশো পাপড়ীওয়ালা গোলাপ ফুল। ঐ জায়গায় দরগা নির্মাণ করতে হবে।" যখন তিনি (আলী মুবারক) বাংলায় পৌঁছোলেন, তিনি কদর খানের কাছে চাকরী নিয়ে সেখানেই থেকে গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কদর খানের বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হলেন।...আলী মুবারক আলাউদ্দীন নাম নিয়ে সুলতান হয়ে...অসীম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লখনৌতিতে একদল সৈন্য রেখে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল জয়ে মন দিলেন। বাংলাদেশে নিজের নামে খুৎবা এবং মুদ্রা প্রবর্তন করার পর তিনি বিলাস এবং সাফল্যের নেশায় এমনই মত্ত হয়ে গেলেন যে দরবেশের আদেশের কথা ভুলে গেলেন। তার ফলে এক রাত্রে আবার ঐ দরবেশ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'আলাউদ্দীন! তুমি বাংলার রাজ্য পেয়েছ, কিন্তু আমার আদেশ ভুলে গেছ।' আলাউদ্দীন পর দিনই ইঁটগুলির খোঁজ করে দেখলেন দরবেশ যে নিশানা দিয়েছিলেন, সেই ভাবেই সেগুলি আছে। তিনি সেখানে একটি দরগা তৈরী করলেন, এখনও

তার চিহ্ন বর্তমান আছে। এই সময়ে হাজী ইলিয়াসও পাণ্ডুয়ায় এলেন। সুলতান আলাউদ্দীন কিছু সময় তাঁকে বন্দী করে রেখে দিলেন, কিন্তু তাঁর ধাত্রী—ইলিয়াসের জননীর অনুরোধে তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে—তাঁর সামনে আসতে আজ্ঞা দিলেন। হাজী ইলিয়াস অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যবাহিনীকে নিজের দলে টানলেন। একদিন তিনি খোজাদের সাহায্যে আলাউদ্দীনকে হত্যা করলেন এবং নিজে সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরা নাম নিয়ে লখ্‌নৌতি এবং বাংলার রাজ্য অধিকার করলেন। আলাউদ্দীনের রাজ্য এক বছর পাঁচ মাস স্থায়ী হয়েছিল।”

বুকাননের বিবরণীতে আলী শাহ সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে 'রিয়াজ'-এর বিবরণের মিল আছে, কিন্তু অমিলও যথেষ্ট। বুকাননের বিবরণীতে যা লেখা আছে, তা আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম এবং এই বিবরণীর বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য [ ] বন্ধনীর মধ্যে দিলাম।

“Firuz Shah, king of Delhi [ফিরোজ শাহ তখনও দিল্লীর সুলতান হননি], **was a desolute prince, fond of hunting in company with his women, one of whom was corrupted by Shamsudin, then a servant of Alawudin, a principal officer under the king.** ['রিয়াজ'-এর মতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস আলাউদ্দীন আলী শাহের ধর্ম ভ্রাতা আর এই বিবরণীর মতে ভৃত্য ; 'রিয়াজ'-এ শুধু লেখা আছে ইলিয়াস দিল্লীতে কোন এক অপকর্ম করেছিলেন, আর এখানে বলা হয়েছে ইলিয়াস ফিরোজ শাহের জনৈক স্ত্রীলোক (উপপত্নী) কে নষ্ট করেছিলেন।] **The culprit having secreted himself, the king was enraged with his master, and sent him to Azmut Khan, governor of Bengal,** [নতুন নাম ; স্টেপলটন এঁকে মুহম্মদ তুঘলকের অধীনস্থ সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা আজম-উল-মুল্‌ক্‌-এর সঙ্গে অভিন্ন ধরতে চান (**Memoirs of Gaur and Pandua, p. 21, f. n.**)।] **I suppose with a view of having him killed. On the road he met with a holy man, Shyekh Jalaludin, of Tabriz,** ['রিয়াজ' এর মতে আলী শাহ স্বপ্নে জলালুদ্দীন তব্রিজির দেখা পেয়েছিলেন, আর এই বিবরণীর মতে তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলেন ; এ ব্যাপার সম্ভাব্য, কারণ জলালুদ্দীন তব্রিজি ঐ সময় জীবিত ছিলেন, ইব্‌ন্‌ বতুতা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে দেখেছিলেন।] **who prophesied to him that he would**

be king, and requested that he would then bestow an endowment on him. I suppose the holy man also discovered to the noble the design of his being sent to Bengal; as the manuscript [যার থেকে এই বিবরণী সঙ্কলিত হয়েছে] states that he immediately killed Azmut Khan, and seized on the government. [অন্য কোন বিবরণীতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না।] He, only, however, assumed the title of Muktagh, or governor; but retained his authority for 20 years. [ভুল উক্তি।] He probably neglected the saint, who, according to the manuscript, seems to have assisted the fugitive servant, Shamsudin, to seize on the government. After having murdered Alawudin, under the disguise of a religious mendicant, by the advice of the saint Jalal, of Tabriz, [ধর্মনিষ্ঠ সর্বজনপূজ্য দরবেশ জলালুদ্দীন তব্রিজি বৃদ্ধ বয়সে ইলিয়াসের সঙ্গে আলীশাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা যায় না], usually called Mukhdum Shah, Shamsudin fixed the seat of his government at Peruya, [পেঁড়ো অর্থাৎ পাণ্ডুয়া] and assumed the title of king." [পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ সম্ভবত আলাউদ্দীন আলী শাহেরও রাজধানী ছিল, কারণ সেখানকার টাকশাল থেকে তাঁর মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল।]

পাণ্ডুয়াতে জলালুদ্দীন তব্রিজির নামাঙ্কিত একটি দরগা এখনও বর্তমান; এই দরগাটি 'শাহ জলালের দরগা' বা 'বড়ী দরগা' নামে পরিচিত। এই দরগার মধ্যে অনেকগুলি কোঠা আছে, এগুলি আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্বকালের অনেক পরে নির্মিত। আলাউদ্দীন আলী শাহ যে দরগা নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার কিছুই বোধ হয় এখন আর বর্তমান নেই; ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম হোসেন 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' বইয়ে লিখেছিলেন যে ঐ সময়ে আলাউদ্দীন আলী শাহ কর্তৃক নির্মিত দরগার "চিহ্ন" মাত্র অবশিষ্ট ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলিয়াস শাহী বংশ

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ

আলাউদ্দীন আলী শাহকে হত্যা করে হাজী ইলিয়াস শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম নিয়ে রাজা হলেন। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণী—উভয় সূত্রেই লেখা আছে যে ইলিয়াস দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন এবং ষড়যন্ত্র করে তাঁর প্রভু আলী শাহকে বধ করেছিলেন। এই সব কথা কতদূর সত্য, তা বলা যায় না। তবে রাজা হবার আগে ইলিয়াস যা'ই করে থাকুন না কেন, রাজা হবার পরে তিনি অসীম যোগ্যতার পরিচয় দেন। আলী শাহকে বধ করে তিনি শুধু উত্তর বঙ্গের রাজা হলেন না, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরও বৃহত্তর গৌরবের অধিকারী হলেন। নানা রাজ্য তিনি জয় করলেন, সমগ্র বাংলাদেশকে এবং বাংলার বহির্ভূত অনেক অঞ্চলকেও নিজের অধিকারে আনলেন, দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখলেন এবং এমন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, যা দীর্ঘকাল ধরে গৌরব ও কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল।

অথচ এই কীর্তিমান নৃপতির পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন', বুকাননের বিবরণী প্রভৃতি অর্বাচীন সূত্রে এ সম্বন্ধে যা বলা আছে, সেটুকু আলাউদ্দীন আলী শাহের প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছি। ইলিয়াস যে বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ সম্বন্ধে সব বিবরণীই একমত। কিন্তু তাঁর আদি নিবাস কোথায় ছিল, তার উল্লেখ প্রায় কোন সূত্রেই মেলে না। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক অল-সখাওয়ী তাঁর **Al-Daw al-Lami li-ahl al-qarn al-tasi** বইয়ে **(Cairo, A. H. 1303, pt. II, p. 313)** ইলিয়াস শাহকে অল-সিজিস্তানী বলেছেন। এর থেকে মনে হয়, হাজী ইলিয়াসের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরাণের সিজিস্তানে। ইলিয়াস শাহ মক্কায় তীর্থ করে এসেছিলেন, তা তাঁর 'হাজী' উপাধি থেকে বোঝা যায়।

যাহোক্, প্রথমে জীবনে যিনি একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনিই পরবর্তীকালে এক বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং জয়ের পর জয়ের মুকুট পরে, প্রবল শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে নিজের গৌরবের পতাকা উড়িয়েছিলেন। এইরকম অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষণজন্মা ব্যক্তির আবির্ভাব শুধু এদেশে নয়, ভিন্ন দেশেও খুব কমই হতে দেখা গিয়েছে। এঁর ইতিহাস যেটুকু জানা যায়, তা আমরা এখন বর্ণনা করব।

৭৪৪ হিজরা থেকে ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশালে তৈরী শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। কারও কারও মতে তাঁর কতকগুলি পাণ্ডুয়ায় তৈরী মুদ্রার তারিখ ৭৪৩ হিজরা, কিন্তু এ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। যাহোক, ৭৪৩ হিজরায় যে ইলিয়াস পাণ্ডুয়া তথা উত্তর বঙ্গ অধিকার করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কলকাতার বেনিয়াপুকুর এলাকার একটি আধুনিক মসজিদে একটি শিলালিপি সংলগ্ন আছে, সেটি শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের রাজত্বকালে ৭৪৩ হিজরার ১রা শাবান তারিখে অর্থাৎ ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উৎকীর্ণ হয়েছিল বলে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে (**Bibliography of the Muslim Sultans of Bengal, Dr. A. H. Dani, p. 10**)। শিলালিপিটি কলকাতায় আবিষ্কৃত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন যে ইলিয়াস শাহ প্রথমে দক্ষিণ বঙ্গ বা সাতগাঁও অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। কিন্তু যে মসজিদে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে, সেটি আধুনিক। এই মসজিদটি তৈরী হবার আগে শিলালিপিটি যে দক্ষিণ বঙ্গে ছিল, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। শিলালিপিটিতে প্রসিদ্ধ দরবেশ আলা অল-হকের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণের কথা লেখা আছে। আলা অল-হক যে পাণ্ডুয়ায় বাস করতেন, সে সম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। (পরে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে তিনি পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগাঁওয়ে যেতে বাধ্য হন।) সুতরাং ইলিয়াস শাহের এই শিলালিপিটি যে মূলে পাণ্ডুয়ায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

সাতগাঁও অঞ্চল যে ইলিয়াস শাহ কবে জয় করেছিলেন, তা জানা যায় না। অন্তত ৭৪৭ হিঃ বা ১৩৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত যে সাতগাঁও ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা ইব্ন্ বত্তুতার ভ্রমণ-বিবরণী থেকে জানা যায়।

সিংহাসনে আরোহণ করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ রাজ্য জয়ের দিকে মন

দিলেন। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নেপাল আক্রমণ করেন এবং সেখানকার বহু নগর ভস্মীভূত করেন, বহু নগর ভেঙে ফেলেন ও বিখ্যাত পশুপতিনাথের মূর্তিকে তিন খণ্ড করেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে সংকলিত একটি নেপাল রাজবংশাবলীতে লেখা আছে,

"সম্বৎ ৪৬৯ পৌর্ণমাস্যাং শ্রীশ্রীরাজাজয়রাজদেবেন শ্রীপশুপতিভট্টারকস্য কোষ প্রঢোকিতম্। তেন তত্র পূর্বস্থরত্রাণ সমসদীনেনাগত্য শ্রীপশুপতিস্ত্রি-খণ্ডীকৃতঃ, নেপাল সমস্ত ভস্মীভবানা হাহাকরোন্তি লোকাশ্চ।" (ইতিহাস, ৮ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ১৫৩)

এখানে বলা হয়েছে যে ৪৬৯ নেওয়ারী সংবৎ বা ১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দে নেপালের রাজা জয়রাজ (মল্ল) পশুপতিনাথের কোষ থেকে অর্থ গ্রহণ করেন এবং তার পরে পূর্বদেশের (অর্থাৎ বাংলার) সুরত্রাণ (সুলতান) সমসদীন (শামসুদ্দীন = শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ) নেপালে এসে পশুপতিনাথকে তিন খণ্ড করেন এবং সমস্ত পুড়িয়ে দেন। ১৩৪৯ খ্রীঃর কত পরে বাংলার সুলতান নেপাল আক্রমণ করেছিলেন, তা এখানে লেখা হয় নি। কিন্তু কাঠমণ্ডুর নিকটস্থ স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের এক শিলালিপিতে এই আক্রমণের সঠিক বৎসরটি পাওয়া যায়। এই শিলালিপির প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে উদ্ধৃত হল।

সপ্তত্যভ্যধিকে শ্রীমন্নেপালাব্দ চতুঃশতে।
মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে দশম্যাং গুরুবাসরে॥
সুরত্রাণ সমসদীনো বঙ্গাল বহুলৈ র্বলৈঃ।
সহাগত্য চ নেপালে ভগ্নো দগ্ধশ্চ সর্বশঃ॥

(ইতিহাস, ঐ সংখ্যা, পৃঃ ১৫২)

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে ৪৭০ নেওয়ারী সংবৎ বা ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে শামসুদ্দীন নেপাল আক্রমণ করে ছারখার করেছিলেন।

প্রাচীন ললিতপুরী বা পাটনের লিপিতে ইলিয়াস শাহের নেপাল আক্রমণের কথা এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

শ্রুতান সমসদীন যবনাধিরাজঃ
নেপাল সর্বনগরং ভস্মীকরোতি।

(ইতিহাস, ঐ সংখ্যা, পৃঃ ১৫১)

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ

করেছিলেন। তিনি চিল্কা হ্রদের সীমা পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন এবং ৪৪টি হাতী সমেত বহু সম্পত্তি লুঠ করেছিলেন।

উত্তরে ও দক্ষিণে নেপাল ও উড়িষ্যা অভিযানে ইলিয়াস শাহ লুঠপাট করে বহু সম্পত্তি হস্তগত করেন বটে, কিন্তু এর দ্বারা তাঁর রাজ্যের আয়তন কতখানি প্রসারিত হয়েছিল তা জানা যায় না। অথচ পশ্চিম ও পূর্বে তাঁর রাজ্যের সীমা যে অনেক দূর প্রসারিত হয়েছিল, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ ত্রিহুত আক্রমণ করে তা অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং ঐ দেশ লুঠ করে, তার বহু নগর ছারখার করে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপরেই তিনি সমানভাবে অত্যাচার চালিয়েছিলেন। যোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক মুল্লা তকিয়া তাঁর বয়াজে লিখেছেন যে হাজী ইলিয়াস উত্তর বিহারের হাজীপুর পর্যন্ত জয় করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য)। হাজী ইলিয়াসের নাম অনুযায়ী হাজীপুর নামক স্থানের নামকরণ হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে।

'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' নামে আর একটি সমসাময়িক ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করে এক বিরাট ভূখণ্ড তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বহ্‌রাইচের সিপাহ্‌সালার শেখ মস্‌উদ গাজীর সমাধিতে দু'বার গিয়ে নিজের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। এই বইয়ের মতে ইলিয়াস বহ্‌রাইচ থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে বলেছিলেন, "এত প্রচুর শক্তি ও সম্পদ, স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে আমি যদি দিল্লী গিয়ে শেখ-উল-ইসলাম নিজামুদ্দীনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতাম, তাহলে কেমন সুন্দর হত? আমাকে এবং আমার বাহিনীকে বাধা দিতে কে সাহস করত?"

পূর্বদিকেও ইলিয়াস শাহ নতুন নতুন রাজ্য জয় করেছিলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, ৭৫৩ হিজরা বা ১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের পুত্র ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের কাছ থেকে সোনারগাঁও সমেত সমগ্র পূর্ববঙ্গ জয় করে নেন। এর ফলে ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাদেশেরই অধীশ্বর হলেন।

এছাড়া ইলিয়াস শাহ কামরূপেরও অন্তত কতকাংশ জয় করেছিলেন। কারণ তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকে—৭৫৯ হিজরায় উৎকীর্ণ একটি মুদ্রায় টাকশালের নাম লেখা আছে, "চৌলীস্তান

'ওরফে কামরূপ।" ("চৌলীস্তান" মানে চাউলের দেশ। ডঃ আবদুল করিমের মতে স্থানটির প্রকৃত নাম 'আওয়ালিস্তান'—**Corpus of the Muslim Coins of Bengal, p. 50** দ্রষ্টব্য।) এর দ্বারা বোঝা যায় যে সিকন্দর শাহের রাজত্বের সুরু থেকেই কামরূপ বা তার কতকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং "কামরূপ" অঞ্চল জয় তাঁরই রাজত্বকালের ঘটনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ইলিয়াস শাহের এই সমস্ত বিজয়ের গৌরবও ম্লান হয়ে যায়, যখন দিল্লীর পরাক্রান্ত সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের কথা স্মরণ করি। যদিও ফিরোজ শাহের অনুগত লোকদের লেখা ইতিহাস-গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে ইলিয়াস এই যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের উক্তি বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না যে প্রকৃত সত্য অন্যরূপ। এ সম্বন্ধে বিচার করার আগে এই সংঘর্ষের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব।

তিনখানি সমসাময়িক গ্রন্থে এই সংঘর্ষের কথা পাওয়া যায়। তিনটি সমসাময়িক গ্রন্থের মধ্যে একটি জিয়াউদ্দীন বারনি রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'। দ্বিতীয়টি শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'। তৃতীয়টি অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বয়ং ফিরোজ শাহের নির্দেশে রচিত 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'। তিনটিই ফিরোজ শাহের অনুগত লোকের লেখা। সুতরাং যেক্ষেত্রে জয়পরাজয়ের প্রশ্ন জড়িত, সেক্ষেত্রে তাঁদের উক্তি একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। অন্য সব বিষয়ে তাঁদের বিবরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

এই তিনটি বইয়ের মধ্যে জিয়াউদ্দীন বারনির বইই সব চেয়ে আগে—ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের মাত্র পাঁচ বছর পরে—১৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তাই বারনির বইয়ে এ সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তা খুব মূল্যবান। নীচে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

সুলতান ফিরোজ শাহের রাজত্বের প্রথম বছরেই (১৩৫১-৫২ খ্রীঃ) তাঁর কানে এই খবর পৌঁছোলো যে লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা ঐ দেশ জোর করে অধিকার করে অসংখ্য পাইক ও ধনুককে (ধনুকধারী সৈন্যদের) একত্র সমবেত করেছে এবং ত্রিহুত আক্রমণ করে, সেখানকার মুসলমান ও জিম্মিদের (হিন্দুদের) উপর অত্যাচার করে সেই দেশ লুঠ করছে ও শহরগুলি ছারখার

করছে। সেই সঙ্গে ত্রিহুত ও ফিরোজ শাহের রাজ্যের সীমান্তে সে উৎপীড়ন চালাচ্ছে। এই কথা শুনে ফিরোজ শাহ ৭৫৪ হিজরার ১০ই শওয়াল (৮ই নভেম্বর, ১৩৫৩ খ্রীঃ) তারিখে লখ্‌নৌতি ও পাণ্ডুয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং অবিরাম যাত্রা করে অযোধ্যা প্রদেশে পৌঁছোলেন। বহু রাজার সাহায্যপুষ্ট বিশাল বাহিনী নিয়ে ফিরোজ শাহ সরযূ নদী পার হলেন। ভাঙখোর ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহের আগমনের কথা শুনে সীমান্ত ছেড়ে ত্রিহুতে পালিয়ে গেলেন। তারপর ফিরোজ শাহের বাহিনী খরোসা ও গোরক্ষপুরে পৌঁছোলে ইলিয়াস ত্রিহুত থেকে পাণ্ডুয়ায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। গোরক্ষপুর ও খরোসার রাজারা ফিরোজ শাহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁকে কর ও উপঢৌকন দিলেন এবং তাঁর বাহিনীতে নিজেদের বাহিনী নিয়ে যোগ দিলেন। ফিরোজ শাহও তাঁদের সর্বতোভাবে অভয় দান করলেন। এদিকে ফিরোজ শাহের বাহিনী আসছে শুনে ইলিয়াস পাণ্ডুয়া থেকে চলে গিয়ে একডালা নামক একটি নিকটবর্তী জায়গার দুর্গে আশ্রয় নিলেন এবং আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। ফিরোজ শাহের বাহিনী গোরক্ষপুর থেকে জাকাৎ এবং জাকাৎ থেকে ত্রিহুতে গিয়ে পৌঁছোলো। ত্রিহুতের রাজা ও জমিদাররা ফিরোজ শাহের সভায় এসে বশ্যতা স্বীকার করে উপঢৌকন দিলেন। ফিরোজ শাহ ত্রিহুতে সুশাসনের বন্দোবস্ত করলেন এবং তাঁর বাহিনী ত্রিহুতে কোনরকম অত্যাচার করল না। ইলিয়াস পাণ্ডুয়ার সমস্ত লোকজন নিয়ে একডালায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, ঐ স্থানের এক দিকে জল, অপর দিকে জঙ্গল। ইলিয়াস তাঁর পরামর্শদাতা ও সমর্থকদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বললেন যে বর্ষাকাল খুব সন্নিকট, আশপাশের জমিগুলি খুব নীচু, বর্ষায় তারা জলে ভরে যাবে এবং বড় বড় মশা জন্মাবে, ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনীর পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হবে না, তাদের ঘোড়াগুলি মশার কামড় সহ্য করতে পারবে না। এই সমস্ত কারণের জন্য বর্ষা নামলে ফিরোজ শাহের বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হবে। এদিকে ফিরোজ শাহের বাহিনী পাণ্ডুয়ায় পৌঁছোলে ফিরোজ শাহ এই মর্মে এক ফরমান জারী করলেন যে তাঁর দলের কেউ যেন পাণ্ডুয়ার লোকদের কোন ক্ষতি না করে এবং ইলিয়াস শাহের প্রাসাদ ও উদ্যান নষ্ট বা ভস্মীভূত না করে। তাঁর যে সমস্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পাণ্ডুয়ায় পৌঁছেছিল, তারা পাণ্ডুয়ার সাধারণ লোকদের কিছু

করল না, কিন্তু ইলিয়াস শাহের প্রাসাদে যে সমস্ত বিদ্রোহী ছিল, তাদের অনেককে বধ করল। তাঁর প্রাসাদের ঘোড়াগুলিও তারা দখল করল। তারপর ফিরোজ শাহের বাহিনী একডালার দিকে রওনা হল। একডালার সামনে যে জলের বেষ্টনী ছিল, তারই ধারে ফিরোজ শাহের বাহিনী একটি কংখর বা পাথুরে ডাঙায় তাঁবু গাড়ল। ফিরোজ শাহ এক ফরমান জারী করে আদেশ দিলেন যে তাঁর বাহিনীর লোকেরা যেন নদী পার হবার ব্যবস্থা করতে ও বাঁধ, সেতু প্রভৃতি তৈরী করতে সুরু করে এবং নদী পার হবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে সবাই যেন একসঙ্গে নদী পার হয়ে একডালা দুর্গ দখল ও ধূলিসাৎ করে। ফিরোজ শাহের লোকেরা যত শীঘ্র সম্ভব নদী পার হয়ে একডালা দুর্গ ধ্বংস করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠল। কিন্তু সুলতানের মনে হল দুর্গ ধ্বংস করলে দোষী লোকদের সঙ্গে নির্দোষ লোকদেরও প্রাণ যাবে, সুন্নী মুসলমানদের জেনানা অমুসলমান পাইক ও ধনুক সৈন্য এবং অন্যান্য উচ্ছৃঙ্খল লোকদের হাতে পড়বে ; বহু উচ্চ, সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী লোক এবং সুফীরা, ছাত্রেরা, দরবেশরা, সন্ন্যাসীরা, বিদেশীরা ও পথিকেরা প্রাণ হারাবে। অথচ দুষ্ট ইলিয়াস শাহের জল ও জঙ্গলে ঘেরা দুর্গ ধ্বংস করতে গেলে হাতী ব্যবহার করতে হবে এবং তা করলেই এ সমস্ত ঘটবে। সেই কারণে সুলতান প্রার্থনা করতে লাগলেন যে ইলিয়াস যেন সসৈন্যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করে, তাহলেই তিনি তাকে শাস্তি দিতে পারবেন। তাঁর প্রার্থনা একদিন পূর্ণ হল। একদিন সকালে ফিরোজ শাহ এই মর্মে এক ফরমান জারী করলেন যে অত্যধিক লোকের অবস্থানের জন্য বর্তমান ঘাঁটি তাঁর সৈন্যদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে, সুতরাং ঘাঁটি পরিবর্ত্তন করতে হবে। তাই শুনে তাঁর বাহিনীর লোকেরা আনন্দিত হয়ে সোরগোল করে ঐ কংখর ছেড়ে নতুন ঘাঁটির জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে ইলিয়াস শাহ এবং তাঁর দলের লোকেরা ভাবলেন যে ফিরোজ শাহের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করছে। ইলিয়াস এ সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর না নিয়ে ভাঙের নেশায় এবং অত্যধিক আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে একডালা থেকে তাঁর হাতীসওয়ার, ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরোজ শাহের পরিত্যক্ত ঘাঁটির সামনে তাঁর হাতীগুলিকে সাজালেন। তার ফলে তাঁর বাহিনী ফিরোজ শাহের বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াল।

যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। ইলিয়াসের সৈন্যেরা প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করল। ফিরোজ শাহ তাঁর বাহিনীর কয়েকটি দলের প্রতি ফরমান জারী করে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করতে বললেন। তাঁর সৈন্যেরা আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি করে কোষ থেকে অসি নিষ্কাশিত করল এবং প্রথম আক্রমণেই ইলিয়াস শাহের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। শত্রু-বাহিনী দিশাহারা হয়ে পড়ল। রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা ইলিয়াস শাহের রাজছত্র, রাজদণ্ড, তূর্য ও পতাকা এবং ৪৪টি হাতী দখল করল। ইলিয়াস চক্ষের নিমেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্তর্হিত হলেন। ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা তাদের তরবারি দিয়ে তাঁর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের মাথা কেটে ফেলতে লাগল। ফলে অনতিবিলম্বে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠল। বাংলার বিখ্যাত পাইক সৈন্যেরা বহুবছর ধরে নিজেদের বাংলাদেশের পিতা বলে অভিহিত করত, লোকে তাদেব বীর বলত, ভাঙখোর ইলিয়াসের কাছে তারা তাদের সাহসের জন্য বখশিস পেয়ে আসছিল এবং বাংলার জলের দ্বারা স্ফীতকায় (হিন্দু) "রাজা"-দের সঙ্গে তারা সেই জংলী উন্মাদটার (ইলিয়াসের) পাশে দাঁড়িয়ে বেপরোয়াভাবে হাত পা ছুঁড়ছিল। যুদ্ধ সুরু হলে তারাই বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে মুখে দুটি আঙুল পুরে দিল, ঠিকমত দাঁড়াতে ভুলে গেল, হাত থেকে তরবারি ও তীরধনুক ফেলে দিল, মাটিতে কপাল ঘসতে লাগল এবং প্রতিপক্ষের তরবারিতে কাটা পড়তে লাগল।

বিকালের মধ্যে শত্রুর মৃতদেহের স্তূপে সমস্ত জায়গাটা ভরে গেল। ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা বিজয়ী হল এবং প্রচুর লুঠের সম্পত্তি তাদের হস্তগত হল। তাদের কারও মাথার একটি চুলও এই যুদ্ধে নষ্ট হল না।

সান্ধ্য উপাসনার পরে বিজয়ী ফিরোজ শাহ তাঁর সভায় বসে এই ফরমান জারী করলেন যে ইলিয়াস শাহের পক্ষে যেসব লোক বন্দী হয়েছে এবং তাঁর রাজছত্র প্রভৃতি যেসব জিনিস তাঁর বাহিনী হস্তগত করেছে—তাদের যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। ৪৪টি অতিকায় পর্বতের মত হাতী—যেগুলি ইলিয়াস শাহের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি জয় করেছিলেন—সেগুলি তাঁর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। ফিরোজ শাহের মাহুত ও হস্তীরক্ষকরা বলল এত বড় হাতী এর আগে কখনও দিল্লীতে যায়নি।

এই হাতীগুলিকে দেখে ফিরোজ শাহ আমীর ও রাজাদের বললেন, "এইসব

হাতীর জোরেই ইলিয়াস দিল্লীর বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার কথা কল্পনা করেছিল। এখন হাতীগুলি হারাবার ফলে তার গর্ব আর মাথা তুলবে না এবং সে আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে ও দিল্লীতে প্রতি বছর উপঢৌকন সমেত তার ভৃত্যদের পাঠাবে। ন্যায়সঙ্গত রাজা ভিন্ন আর কারও হাতীশালে বড় হাতী থাকা উচিত নয়। অবিবেচক লোকদের বড় হাতী থাকলে তাদের মাথায় অহঙ্কার জন্মায়। নির্ভীক প্রকৃতির দুর্বৃত্তের হাতে বড় হাতী পড়লে মহা বিপদের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে পরিণামে তারই পতন ও ধ্বংস হয়।"

এইসব ঘটনার পরে ফিরোজ শাহ এক ফরমান জারী করে সমস্ত লুঠের মাল তাঁর সেনাপতির কাছে জমা দিতে বললেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর সুলতান ভগবানের কাছে তাঁর বিজয়ের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তার পরদিন তাঁর বাহিনীর সমস্ত লোকেরা—উচ্চ, নীচ, অশ্বারোহী, পদাতিক, মুসলমান, হিন্দু, বাজারের লোক এবং ভৃত্য, সকলে রাজসভার সামনে সমবেত হয়ে বলল তারা একডালা দুর্গ লুঠ করবে এবং হাতী দিয়ে তা ধূলিসাৎ করে ইলিয়াস শাহের অনুগত লোকদের তাড়িয়ে দেবে। কিন্তু সুলতান তা করার অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, "যারা বিদ্রোহ করেছিল তারা নিহত হয়েছে। যে সমস্ত হাতী ইলিয়াসের দম্ভ ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণ ছিল, সেগুলি অধিকৃত হয়েছে। ভগবান আমাদের সাহায্য করে বিজয়ী করেছেন। এখন বর্ষাকাল আসন্ন হয়ে উঠেছে। আমাদের লক্ষ্য হবে মুসলমানদের মধ্যে এবং বর্তমান ইসলামের বাহিনীর লোকদের মধ্যে যারা এখন নিরাপদে আছে, তারা যাতে নিরাপদে গৃহে ফিরতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করা। এইরকম বিজয় লাভের পরে আর অতিরিক্ত কিছু চাওয়া উচিত নয়।"

সুলতানের নির্দেশে তাঁর বাহিনীর লোকেরা দিল্লীর দিকে ফিরতে সুরু করল। ৭৫৫ হিজরার ১২ই শাবান (১লা সেপ্টেম্বর, ১৩৫৪ খ্রীঃ) তারিখে তারা দিল্লী পৌঁছোলো। ইলিয়াস শাহের যে সমস্ত সম্পত্তি ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা লুঠ করেছিল এবং তাঁর দলের যে সমস্ত লোককে তারা বন্দী করেছিল, তাদের দিল্লীর পথে পথে দেখিয়ে বেড়ানো হল। দিল্লীর লোকেরা ফিরোজ শাহের বিজয় উপলক্ষে মহা আনন্দে উৎসব, পানভোজন ও নৃত্যগীত করতে লাগল। সুলতান দরিদ্রদের এই বিজয় উপলক্ষে বহু অর্থ দান করলেন। তিনি দিল্লীর উলেমাদের অনেক উপহার দিলেন, শেখদের আশ্রমে দান করলেন এবং সন্ন্যাসীদের আস্তানায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন। দরবেশদের সমাধিতে

গিয়েও তিনি দানধ্যান করলেন। এই বিজয়ের ফলে লখ্‌নৌতির শাসনকর্তা ইলিয়াস নম্র হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন। তিনি ফিরোজ শাহের দরবারে দুবার উপঢৌকন পাঠালেন এবং একজন আমীর যেভাবে বশ্যতা স্বীকার করে আবেদন জানায়, তেমন ভাবেই আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন।

শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ এবং 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র বিবরণ বারনির বিবরণের সঙ্গে মূলত অভিন্ন। তবে কোন কোন বিষয়ে তাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নীচে আমরা এই বিষয়গুলির উল্লেখ করলাম।

শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন যে ফিরোজ শাহ কুশী নদীর তীরে পৌঁছে দেখেছিলেন অপর তীরে গঙ্গা ও কুশীর সঙ্গমস্থলের খুব কাছে ইলিয়াস শাহের সৈন্যেরা রয়েছে। তার ফলে ফিরোজ শাহের বাহিনী কুশীর উজানে ১০০ ক্রোশ উঠে গিয়ে চম্পারণের নীচে অনেক কষ্ট করে খরস্রোতা কুশী নদী পার হয়। ফিরোজ শাহ চম্পারণ ও রচাপ হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছোন। অতঃপর ইলিয়াস শাহ একডালা (ইকডালা) দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ ঐ দুর্গ অবরোধ করেন এবং তার চারদিকে পরিখা খনন করান। প্রত্যেক দিন ইলিয়াস শাহের সৈন্যেরা একডালা থেকে বেরিয়ে এসে পাঁয়তাড়া ভাঁজত, কিন্তু প্রতিপক্ষের শরবর্ষণে জর্জরিত হয়ে একডালা দ্বীপে ফিরে গিয়ে সেখানে আশ্রয় নিত। ফিরোজ শাহের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছিল। বাংলার অনেক রাও, রাণা এবং জমিদার ফিরোজ শাহের দলে যোগ দিলেন। বাংলার জনসাধারণের মধ্যেও অনেকে তাঁর দলে যোগ দিল।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর সূর্য কর্কটরাশিতে প্রবেশ করার উপক্রম করল এবং আর্দ্র আবহাওয়া দেখা দিল। তখন ফিরোজ শাহ তাঁর অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে দিল্লীর দিকে কয়েক ক্রোশ এগিয়ে গেলেন এবং একডালা দুর্গে কয়েকজন কালান্দার বা ফকীরকে পাঠালেন। এইসব কালান্দার একডালা দুর্গে গিয়ে বন্দী হল এবং তাদের ইলিয়াস শাহের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তারা ইলিয়াস শাহকে জানাল যে ফিরোজ শাহ সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও মালপত্র নিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা হয়েছেন। এই খবর শুনে ইলিয়াস ১০,০০০ ঘোড়া, ৫০টি হাতী এবং ২,০০,০০০ পদাতিক সমেত এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ফিরোজ শাহকে আক্রমণ করলেন। তখন ফিরোজ শাহ একডালা থেকে সাত ক্রোশ দূরে নদীতীরে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ইলিয়াস শাহের আসার খবর পেয়ে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে তিনভাগ করে

সাজালেন। ডান দিকের বাহিনীতে ৩০,০০০ সৈন্য রইল মীর-শিকার মালিক দিলান-এর অধীনে, বাঁ দিকের বাহিনীতে মালিক হিসাম নওয়ার অধীনে ৩০,০০০ যোদ্ধা রইল এবং মাঝের বাহিনীতে তাতার খানের অধীনে ৩০,০০০ সৈন্য থাকল। হাতীগুলিকেও তিন ভাগ করে সাজানো হল। ফিরোজ শাহ সমস্ত বাহিনীতে ঘুরে তাঁর লোকদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। ইলিয়াস ফিরোজ শাহের সৈন্যসজ্জা দেখে বুঝতে পারলেন যে কালান্দাররা তাঁকে ঠকিয়েছে। তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। প্রথমে তীর ধনুকের যুদ্ধ, তারপর বর্শা ও তরবারির যুদ্ধ হল এবং তারপর দুদলের সৈন্যেরা পরস্পরের এত কাছাকাছি এল যে হাতাহাতি যুদ্ধ চলতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে ইলিয়াস শাহ পরাজিত হয়ে পালাতে লাগলেন। তাতার খান তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ইলিয়াস শাহের সমস্ত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তাঁর ৪৮টি হাতী ফিরোজ শাহের লোকেরা দখল করল এবং ৩টি হাতী প্রাণ হারাল। ইলিয়াস মাত্র ৭ জন অশ্বারোহী নিয়ে পালিয়ে একডালা দুর্গে প্রবেশ করে অনেক কষ্টে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিলেন। ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা শহর (একডালা শহর) অধিকার করল। ফিরোজ শাহ সেখানে এসে পৌঁছোলে (ইলিয়াস শাহের অন্তঃপুরের) সম্ভ্রান্ত মহিলারা দুর্গের ছাদে চড়লেন এবং ফিরোজ শাহকে দেখে মাথার কাপড় খুলে গভীর শোক প্রকাশ করতে লাগলেন। ফিরোজ শাহ তাই দেখে দুঃখিত হয়ে ভাবলেন যে অনেক মুসলমানকে হত্যা করে তিনি এই শহর ও এই দেশ অধিকার করেছেন এবং দুর্গ দখল করতে হলে আরও বহু মুসলমানকে হত্যা করতে ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অমর্যাদার মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে। তা করলে তিনি চরম বিচারের দিনে কী কৈফিয়ৎ দেবেন এবং মোগলদের সঙ্গে তাঁর কী পার্থক্য থাকবে? তাতার খান বারবার সুলতানকে অনুরোধ করতে লাগলেন বিজিত অঞ্চলগুলি স্থায়িভাবে অধিকারে রাখার জন্য। কিন্তু ফিরোজ শাহ বললেন যে এর আগে দিল্লীর বহু রাজা বাংলাদেশকে নিজেদের অধীনে এনেছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই সেখানে বেশীদিন থাকা উচিত মনে করেন নি, কারণ বাংলাদেশ জলাভূমিতে পূর্ণ এবং এখানকার সম্ভ্রান্ত লোকরা দ্বীপে বাস করেন; অতএব পূর্ববর্তী রাজারা যা করেছেন, তার তুলনায় স্বতন্ত্র কিছু করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। এই বলে ফিরোজ শাহ তাঁর বাহিনীকে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। যাবার আগে সুলতান নিহত বাঙালীদের মাথাগুলি এক

জায়গায় জড়ো করতে আদেশ দিলেন এবং এক একটি মাথা সংগ্রহের জন্য একটি করে রূপোর টঙ্কা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ১,৮০,০০০-এরও বেশী মাথা পাওয়া গেল, কারণ পুরো একদিন ধরে সাতক্রোশ ব্যাপী জায়গা জুড়ে যুদ্ধ হয়েছিল। সুলতানের বাহিনী দিল্লীর দিকে রওনা হল। মাঝপথে পাণ্ডুয়ায় ফিরোজ শাহের নামে খুৎবা পড়া হল। ফিরোজ শাহ একডালা ও পাণ্ডুয়ার নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে আজাদপুর ও ফিরোজাবাদ রাখলেন। তারপর তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। লখ্নৌতি থেকে পাওয়া হাতীগুলিকে সামনে রেখে তাঁর বাহিনী দিল্লীতে প্রবেশ করল।

'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে মোটামুটিভাবে শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফেরই অনুরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তবে এই বইয়ের মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত কম। এই বইয়ের মতে ইলিয়াস শাহ একডালা (ইকডালা) দুর্গে ঢোকবার আগে একবার তাঁর বাহিনীর সঙ্গে ফিরোজ শাহের বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে ইলিয়াসের বাহিনী পরাস্ত হয়েছিল। তারপর তিনি বহু হাতী এবং আট লাখ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে নতুন এক বাহিনী গঠন করেন এবং দ্বিতীয়বার ফিরোজ শাহের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এবারও তিনি পরাজিত হন। তাঁর পক্ষের প্রায় ৬০,০০০ লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং অনেকে বন্দী হয়। বিজয়ী পক্ষ ইলিয়াস শাহের অনেকগুলি হাতী দখল করে। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে যুদ্ধ জয়ের পর ফিরোজ শাহের বাহিনী একডালা দুর্গ জয়ের উদ্যোগ করছিল। কিন্তু এই সময় বিপন্ন মুসলমানরা চীৎকার করে তাদের দুঃখের কথা জানাতে থাকে। মুসলিম স্ত্রীলোকেরা ফিরোজ শাহের কাছে করুণভাবে নিরস্ত হবার জন্য আবেদন জানায়; তারা বলে যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ তাদের আটক করে রাখায় তারা বিপন্ন হয়ে পড়েছে; একে তারা ঐ দুর্বৃত্তের অত্যাচারে পীড়িত, তার উপর ফিরোজ শাহ কর্তৃক দুর্গ অবরোধের ফলে তারা ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছে; কারণ ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা দুর্গ জয় করলে তারা দুর্গ লুঠ করবে এবং মেয়েদের ক্রীতদাসী বানাবে; তারা (মেয়েরা) শামসুদ্দীনের সমর্থক নয়, বরং সম্রাট ফিরোজ শাহেরই আজ্ঞাবহ; সম্রাট যদি তাদের রক্ষা না করেন, তাহলে অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তারা বিষ খেয়ে মরবে। এদের অনুনয় ও আবেদনের ফলে ফিরোজ শাহ দুর্গ জয়ের চেষ্টা থেকে নিরস্ত হন। বাংলার (বন্দী) সৈন্যেরা কান্নাকাটি করার পর ফিরোজ শাহ তাদের মুক্তি দেন এবং একডালার নাম আজাদপুর

রাখেন। জয় এবং প্রভূত ধনসম্পদ লাভ করে ফিরোজ শাহ দিল্লী ফিরে যান। ইলিয়াসও শিক্ষা পাওয়ার পরে অত্যাচার বন্ধ করেন এবং সম্রাটের কাছে অতীত আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে প্রতি বছর দিল্লীতে উপঢৌকন প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

জিয়াউদ্দীন বারনি, শাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিফ এবং 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখক, এই তিনজন ঐতিহাসিকই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ফিরোজ শাহের সঙ্গে যুদ্ধে ইলিয়াস শাহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। এঁরা এমনভাবে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছেন, যার থেকে মনে হয় ফিরোজ শাহের প্রচণ্ড শক্তির কাছে ইলিয়াস শাহ মেষশাবকের মত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। বারনি আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে লিখেছেন যে প্রথম আক্রমণেই ফিরোজ শাহের বাহিনী ইলিয়াস শাহের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়, তারপর যথেচ্ছভাবে তাদের মাথা কাটতে থাকে এবং এই যুদ্ধে ফিরোজ শাহের পক্ষের কারও মাথার একটি চুলও নষ্ট হয় নি। কিন্তু আফিফ এতখানি নির্লজ্জ অত্যুক্তি করতে পারেন নি, তিনি লিখেছেন যে, প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইলিয়াস শাহ পরাজয় বরণ করেন। এঁদের কিঞ্চিৎ পরবর্তী ঐতিহাসিক য়াহিআ বিন্ সিরহিন্দি তাঁর 'তারিখ-ই-মোবারক শাহী'তে এই যুদ্ধের বিবরণ দেবার সময় একে "মহাযুদ্ধ" (great battle) বলেছেন।

একডালার যুদ্ধে ইলিয়াস শাহ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। ফিরোজ শাহের অনুগত তিনজন ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ফিরোজ শাহই এই যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। এ সম্বন্ধে টমাস ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন, তা অখণ্ডনীয়। টমাস লিখেছেন, **"The invasion only resulted in the confession of weakness, conveniently attributed to the periodical flooding of the country."** রাখালদাস লিখেছেন, "সুলতান্ ফিরোজ শাহের সমসাময়িক ঐতিহাসিক শমস্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়ীয় অবরোধবাসিনীগণের রোদনধ্বনিতে বিচলিত হইয়া বাদ্‌শাহ্ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আফিফের এই উক্তি ফিরোজ শাহের গৌড়াভিযানের বিফলতা গোপন করিবার জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বাদ্‌শাহ যখন গৌড়াভিযানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন কি জানিতেন না যে,

গৌড়-যুদ্ধে বহু মুসলমান নিহত হইবে এবং তাহাদিগের পুত্র কলত্রের আর্ত্তনাদ সতত তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে? সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইলেও ইলিয়াস্ শাহের সেনা তখনও যুদ্ধ পরিত্যাগ করে নাই, গৌড়-দেশ অধিকৃত হইলেও রাজধানীর প্রধান দুর্গ তখনও অনধিকৃত ছিল, এই অবস্থায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা যদি বিজয় হয়, তাহা হইলে মুসলমান ঐতিহাসিকগণের উক্তি সত্য। বর্ষাকালে গৌড়দেশে অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া এবং সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ অধিকার অসম্ভব জানিয়া, গৌড়াভিযানে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া দিল্লীর বাদ্‌শাহ্ ফিরোজ শাহ্ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জিয়া-উদ্দীন বার্ণী বঙ্গদেশীয় রাজা ও পদাতিক সেনার কাপুরুষতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ......শম্‌স্-ই-সিরাজ্ আফিফ্ সুলতান্ শমস্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ (ইলিয়াস) শাহের কাপুরুষতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,......কিন্তু এই কাপুরুষ সুলতান্, তাঁহার অধীন কাপুরুষ বাঙ্গালী রাজগণ এবং তাঁহাদিগের অধীন কাপুরুষ পদাতিক সেনার জন্য ভারতেশ্বর ফিরোজ্ শাহকে একডালার অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। জিয়া-উদ্দীন বার্ণী স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, গৌড়াভিযানে ফিরোজ শাহের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং সৌভাগ্যক্রমে বর্ষাকাল আসিয়া পড়ায়, পরাজয়ের পরিবর্ত্তে উহাই প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।"

জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন যে সুলতান ফিরোজ শাহ্ ইলিয়াস শাহের ৪৪টি হাতী দখল করে বলেছিলেন যে এর ফলেই ইলিয়াস শাহ বশীভূত হবে; কারণ এইসব বড় বড় হাতীর জোরেই ইলিয়াস শাহের গর্ব এত বেড়েছিল। অদ্ভুত কথা! যেন ইলিয়াস শাহের এই ৪৪টি ভিন্ন আর কোন হাতী ছিল না এবং নতুন হাতী সংগ্রহ করা এতই দুরূহ ব্যাপার! ফিরোজ শাহ নিজের দুর্বলতা গোপন করবার জন্যই এই কথা বলেছিলেন সন্দেহ নেই।

তারপর, বারনি, আফিফ ও 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'-রচয়িতা তিন-জনেই লিখেছেন যে পাছে নিরীহ লোকেরা নিহত বা উৎপীড়িত হয় এবং সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সেই কারণে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ জয় করেননি। কিন্তু তা'ই যদি হয়, তাহলে ফিরোজ শাহ্ ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে আবার বাংলাদেশ আক্রমণ ও একডালা দুর্গ অবরোধ করেছিলেন কেন? তখনও তো নিরীহ ব্যক্তিদের প্রাণনাশ ও

সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মর্যাদা হানির একইরকম সম্ভাবনা ছিল। এইসব বাজে কথা লিখে ফিরোজ শাহের চাটুকার ঐতিহাসিকেরা ফিরোজ শাহের ব্যর্থতাই উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

আসল কথা, ফিরোজ শাহের সঙ্গে সংঘর্ষে ইলিয়াস শাহ পরাজিতও হন নি, পলায়নও করেন নি ; তিনি উচ্চাঙ্গের রণকৌশল অনুসারেই কাজ করেছিলেন। ফিরোজ শাহকে সৈন্যবাহিনী সমেত নিজের রাজ্যে অনেক দূর প্রবেশ করতে দিয়ে তিনি একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে কালক্ষেপণ করছিলেন। তিনি জানতেন যে বর্ষার আগে ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ জয় করতে পারবেন না। তারপর বর্ষা উপস্থিত হলে ফিরোজ শাহের বাহিনী অসহায় হয়ে পড়বে, তখন তিনি অতি সহজেই তাদের পরাজিত করতে পারবেন। সম্ভবত ফিরোজ শাহের সৈন্যসংখ্যা ইলিয়াস শাহের তুলনায় বেশী ছিল, তাই ইলিয়াস এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তারপর ফিরোজ শাহের সৈন্যেরা চলে যাচ্ছে ভেবে তিনি তাদের আক্রমণ করেছিলেন, যার বর্ণনা আফিফ দিয়েছেন। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকেরা এই যুদ্ধে ইলিয়াস পরাজিত হয়েছিলেন বলে দেখাবার চেষ্টা করলেও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে কোন পক্ষই এই যুদ্ধে চূড়ান্ত-ভাবে জয়ী হতে পারেন নি। ফিরোজ শাহ কয়েকজন বন্দী, কিছু লুঠের মাল ও কয়েকটি হাতী ভিন্ন আর কিছুই এই যুদ্ধ থেকে লাভ করিতে পারেন নি। তাঁর পক্ষেও নিশ্চয় কিছু ক্ষতি হয়েছিল, যার কথা পূর্বোক্ত লেখকরা চেপে গিয়েছেন। ইলিয়াস এই যুদ্ধের পরে আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর অবস্থা আগে যা ছিল, এখনও তা'ই থেকে গেল। কিন্তু ফিরোজ শাহ এই যুদ্ধেই ইলিয়াস শাহের বলবীর্যের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ইলিয়াসকে পর্যুদস্ত করা বা একডালা দুর্গ জয় করা দুইই তাঁর পক্ষে অসম্ভব, উপরন্তু বর্ষাকাল এলে তাঁর বাহিনীর শোচনীয় বিপর্যয় ঘটবে। তাই তিনি হাতী জয়ের দ্বারাই যুদ্ধ জয় হয়েছে এই জাতীয় কথা বলে কোন রকমে নিজের মান বাঁচিয়ে বাংলাদেশ থেকে সসৈন্যে প্রস্থান করলেন। পরে প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের গ্লানি গোপন করেছিলেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ফিরোজ শাহ প্রায় সমস্ত অভিযানেই এই ভাবে অসাফল্য বরণ করেছিলেন।)

এই হচ্ছে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের পরিণামের প্রকৃত চিত্র। এই যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে ও তার পূর্বদিকে ইলিয়াস শাহের অধিকার

কিছু মাত্র খর্ব হয় নি, কিন্তু বাংলার পশ্চিমে যে সব রাজ্য ইলিয়াস জয় করেছিলেন, সেগুলি ফিরোজ শাহের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। যাহোক্, এই সংঘর্ষের কিছুদিন পরে ফিরোজ শাহকে ইলিয়াস শাহ্ উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, এর থেকে বোঝা যায় ইতিমধ্যে ফিরোজ শাহের সঙ্গে তাঁর সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য বারনি, আফিফ এবং 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখকের মতে ইলিয়াসের এই উপঢৌকন প্রেরণ বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন, কিন্তু ফিরোজ শাহের প্রভাব থেকে মুক্ত য়াহিআ বিন্ সিরূহিন্দি তাঁর 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে স্পষ্টই লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ সমকক্ষ রাজা হিসাবে ফিরোজ শাহকে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন ; এই বইয়ের মতে একবার ইলিয়াস শাহের উপঢৌকন পেয়ে ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের দূতকে বলেছিলেন, "তুমি যা এনেছ, আমার দীন ভৃত্যেরা তার চেয়ে ভাল জিনিষ তৈরী করে। এখন থেকে তোমাদের বাছা বাছা হাতী আনা উচিত। একজন রাজার আর একজন সমকক্ষ রাজাকে (**Brother king**) এই ধরণের উপহারই দেওয়া উচিত।" পরবর্তীকালে রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী' গ্রন্থের মতে ৭৫৫ হিঃর ২৭শে রবী অল-আখির তারিখে ইলিয়াস শাহের সঙ্গে ফিরোজ শাহের সন্ধি হয় এবং এরপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশ থেকে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা সুরু করেন। এই কথা সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। সম্ভবত ফিরোজ শাহের গৌরবহানি হতে পারে, এই আশঙ্কায় সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা এই সন্ধি সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে বাংলা দেশ থেকে ফিরোজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পরে একটী ঘটনা ঘটে। সেটি এই, **"When Shamsu-d din entered Ikdala, he seized the Governor, who had shut the gates, and had him executed."** (শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফের লেখার ইলিয়ট কৃত ইংরেজী অনুবাদ)। এই বাক্যটির অর্থ অনেকে ধরতে পারেন নি। আমাদের মনে হয়, এখানে **"Ikdala"** বলতে একডালা দুর্গকে নয়, একডালা শহরকে বোঝাচ্ছে। ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ অধিকার করতে না পারলেও একডালা শহর যে অধিকার করেছিলেন, তা আফিফ লিখেছেন। এই শহরেরই নাম ফিরোজ শাহ পরিবর্তিত করে আজাদপুর রাখেন, এ কথা আফিফ ও 'সিরাৎ' থেকে জানা যায়। আমাদের মনে হয়, উপরে উদ্ধৃত বাক্যে আফিফ এই বলতে চেয়েছেন যে ফিরোজ

শাহ চলে যাবার পরে ইলিয়াস একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে একডালা শহরে প্রবেশ করে সেখানে ফিরোজ শাহ যে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন এবং যিনি একডালা দুর্গের দ্বার অবরোধ করেছিলেন, তাঁকে বন্দী ও বধ করেন। সম্ভবত এর পরে ইলিয়াস বাংলাদেশে ফিরোজ শাহের অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলগুলি জয় করে নেন।

য়াহিআ বিন্ সিরহিন্দি 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে একডালার যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন সংবাদ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে ৭৫০ হিজরার ২৮শে (পাঠান্তর ২৭শে) রবী অল-আউয়ল (২১শে এপ্রিল, ১৩৫৪ খ্রীঃ) তারিখে এই যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে বাঙালীদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সহদেও (সহদেব), তিনি যুদ্ধে নিহত হন। বলা বাহুল্য য়াহিআ বিন্ সিরহিন্দির এই উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, কারণ তিনি যে সময় 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' লেখেন, তখনও নিশ্চয়ই একডালার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বা এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিলেন।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইলিয়াস শাহের সেনাপতি ছিলেন হিন্দু সহদেব। এছাড়া জিয়াউদ্দীন বারনি স্পষ্টই লিখেছেন যে হিন্দু রাজারা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তারপর, ইলিয়াস শাহের শক্তির প্রধান উৎস ছিল পাইকেরা। সে যুগের পাইকেরা সাধারণত হিন্দু হত, ফিরোজ শাহের পক্ষীয় পাইকদের অনেকে যে হিন্দু ছিল, সে কথা বারনি বলে গেছেন। সুতরাং যে ইলিয়াস শাহ নেপালে গিয়ে হিন্দুর দেবমন্দির ও প্রতিমা ধ্বংস করেছিলেন, তিনি এখন হিন্দুদেরই সাহায্যে তাঁর স্বাধীনতা রক্ষা করলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের হিন্দুর সহায়তা গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন এইখানেই পাওয়া গেল। পরবর্তী কালের সুলতানদের হিন্দুরা যে আরও বেশী সাহায্য করেছিল, তা আমরা পরে দেখতে পাব। হিন্দুরা মুসলমান সুলতানদের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। একডালার যুদ্ধে যেমন সহদেব প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন, ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধে তেমনি বসন্ত রাও নামে আর একজন হিন্দু বীর নসরৎ শাহের হয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার অনেক সুলতান হিন্দুদের মন্দির ভাঙতে ও ধর্ম নষ্ট করতে ইতস্তত করেন নি।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই বইয়ে লেখা আছে যে, ইলিয়াস

শাহ তাঁর পুত্রকে পাণ্ডুয়ার দুর্গে এক সৈন্যবাহিনী সমেত রেখে একডালায় গিয়েছিলেন ; ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়ায় এসে ইলিয়াসের পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বন্দী করে একডালা অভিমুখে যাত্রা করেন ; ফিরোজ শাহ বাইশ দিন ধরে একডালা দুর্গ অবরোধ করার পরে ইলিয়াস দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন ; দুই পক্ষে বহু লোক নিহত হবার পরে ইলিয়াস পরাজিত হন এবং আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে 'রিয়াজ-রচয়িতা লিখেছেন, "কথিত আছে দরবেশ শেখ রাজা বিয়াবানি এই সময় মারা যান। এঁর উপরে সুলতান শামসুদ্দীনের গভীর বিশ্বাস ছিল। সুলতান শামসুদ্দীন ফকীরের ছদ্মবেশে দুর্গ থেকে বেরিয়ে শেখের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে তিনি একা ঘোড়ায় চড়ে ফিরোজ শাহের সঙ্গে দেখা করে দুর্গে ফিরে যান ; কিন্তু ফিরোজ শাহ তাঁকে চিনতে পারেন নি। সুলতান (ফিরোজ শাহ) যখন এই ব্যাপার জানতে পারলেন, তখন তিনি (ইলিয়াসকে ধরতে না পারার জন্য) দুঃখ প্রকাশ করে-ছিলেন।" 'রিয়াজ'-এর মতে বর্ষা এসে গেলে ফিরোজ শাহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন এবং ইলিয়াস শাহও একটানা অবরোধের ফলে ক্লান্ত হয়ে আংশিক বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধি করেছিলেন। তখন ফিরোজ শাহ ইলিয়াসের পুত্র ও অন্যান্য বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দিল্লী ফিরে যান। এই সব উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বখ্‌শী নিজামুদ্দীনের 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সংঘর্ষের বিভিন্ন ঘটনার সময় নির্দেশ করা হয়েছে। এই বইয়ের মতে (১) ৭৫৪ হিঃর ১০ই শওয়াল তারিখে ফিরোজ শাহ দিল্লী থেকে রওনা হন, (২) ৭৫৫ হিঃর ৭ই রবী অল-আউয়ল তারিখে ফিরোজ শাহ এক-ডালায় পৌঁছোন, (৩) ৭৫৫ হিঃর ২৯শে রবী অল-আউয়ল তারিখে তিনি একডালা থেকে দিল্লী ফিরে যাবার ভাণ করেন, (৪) ৭৫৫ হিঃর ৫ই রবী অল-আখির তারিখে ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহকে আক্রমণ করেন, (৫) ৭৫৫ হিঃর ৭ই রবী অল-আখির তারিখে ফিরোজ শাহ গৌড়ের বন্দীদের মুক্তি দান করেন, (৬) ৭৫৫ হিঃর ২৭শে রবী অল-আখির তারিখে ইলিয়াস শাহ ও ফিরোজ শাহের সন্ধি হয় এবং ফিরোজ দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন সুরু করেন, (৭) ৭৫৫ হিঃর ১২ই শাবান তারিখে ফিরোজ শাহ দিল্লী পৌঁছোন। এর মধ্যে (১) ও (৭) নং ঘটনার তারিখ সঠিক, কারণ বারনির

'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে এই দুই তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। (৩) ও (৪) নং ঘটনার তারিখ ভুল, কারণ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা আছে যে ৭৫৫ হিঃর ২৭শে বা ২৮শে রবী অল-আউয়ল তারিখে (৪) নং ঘটনা ঘটেছিল। অন্যান্য তারিখগুলি নিজামুদ্দীন কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তা জানা যায় না, কাজেই তাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। (৬) নং "ঘটনা" আদৌ ঘটেছিল কিনা বলা যায় না, কারণ সমসাময়িক বইগুলিতে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; তবে ফিরোজ শাহের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের সন্ধি যে সম্পূর্ণ সম্ভাব্য ব্যাপার, তা আগেই আলোচনা করে দেখিয়েছি। বুকাননের বিবরণীতে ইলিয়াস শাহ ও ফিরোজ শাহের সংঘর্ষের কারণ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে যে ইলিয়াস "made war on Ibrahim, governor of Behar, on the part of Firuz....The royal party, however, repulsed the usurper. The emperor then invaded Bengal." এই কথার সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সমসাময়িক ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে একডালা-র অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়নি। তাই এই বিষয় নিয়ে আধুনিক কালের পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে। জিয়াউদ্দীন বারনি, শাম্স্-ই-সিরাজ আফিফ, ফিরিশতা, গোলাম হোসেন প্রভৃতির উক্তি বিশ্লেষণ করে এঁরা একডালার প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কারও কারও মতে একডালা বর্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত। অন্যদের মধ্যে কেউ ঢাকা জেলায়, কেউ দিনাজপুর জেলায় একডালার অবস্থিতি নির্ণয় করেন। কিন্তু শেষোক্ত পণ্ডিতরা দেখেননি যে ফিরোজ শাহ ও ইলিয়াস শাহের সমসাময়িক এবং সম্ভবত একডালা যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি * কর্তৃক যুদ্ধের অল্প পরে রচিত 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে, "...Ikdala which was

* এরকম ধারণার কারণ, 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার সময় ফিরোজ শাহ মাঝে এক জায়গায় নেকড়ে, চিতা, বাঘ, ভালুক, সিংহ প্রভৃতি বন্য জন্তু শিকারের নেশায় মেতে ওঠেন, সিংহ শিকারের সময় গ্রন্থকারের কলম চলছিল। [At the time when the pen (of the author) was being set in motion, furious lions fell before the fierce arrows of the (imperial) army.—কে. কে. বসুর অনুবাদ] এর থেকে মনে হয়, 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখক এই অভিযানে ফিরোজ শাহের সহযাত্রী ছিলেন।

situated on the banks of the Ganges and was surrounded by one of the branches of said river." (কে. কে. বসুর অনুবাদ, J. B. O. R. S, Vol. XXVII, pt. I, p. 87 দ্রষ্টব্য)। দিনাজপুর বা ঢাকা জেলায় গঙ্গা নদী নেই। আমরা এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ে 'হোসেন শাহের রাজধানী' (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪০-২৪৩) শীর্ষক আলোচনার মধ্যে এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি এবং দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এই একডালা বর্তমান মালদহ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড় নগরীর পাশেই অবস্থিত ছিল।

একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে যখন ফিরোজ শাহ দ্বিতীয় বার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন, তখনও সিকন্দর এই একডালা দুর্গে আশ্রয় নিয়েই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখেন ও সন্ধি করতে বাধ্য করেন। অথচ এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একডালা দুর্গের বিস্তৃত প্রামাণিক বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন যে একডালা দুর্গের এক পাশে নদী এবং আর একপাশে জঙ্গল ছিল। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে একডালা দুর্গ গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গার একটি শাখানদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। তার ফলেই দুর্গটি এত দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। বারনির বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, একডালা দুর্গের আয়তন অসাধারণ রকমের বৃহৎ ছিল, যার ফলে ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া শহরের সমস্ত লোকজন নিয়ে তার মধ্যে ঢুকে বসেছিলেন। শাম্স-ই-সিরাজ আফিফ লিখেছেন যে একডালা দুর্গ একটি দ্বীপের ("জজৈর") উপর অবস্থিত ছিল। দ্বীপ বলতে আফিফ নদী দ্বারা বেষ্টিত ভূখণ্ড বুঝিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আফিফ লিখেছেন যে, একডালা দুর্গটি কাদামাটি দিয়ে তৈরী ছিল; তিনি "বিশ্বস্ত লোকদের" কাছে এই কথা শুনেছিলেন বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়টি আমাদের মনে বিস্ময় ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। যদিও তখন পর্যন্ত এ দেশের যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হয়নি, তাহলেও কাদামাটি দিয়ে তৈরী দুর্গ এতদিন ধরে কী করে পরাক্রান্ত শত্রুবাহিনীর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পারল, তা আমরা বুঝতে পারি না।

ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করবার পূর্বাহ্ণে ফিরোজ শাহ

তুঘলক একটি "নিশান" বা ঘোষণাপত্র জারী করেছিলেন। সেটি পাওয়া গিয়েছে। ফিরোজ শাহের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মচারী মালিক অয়নু'ল-মুল্‌ক্‌ মাহরূর চিঠিপত্রের সংকলন গ্রন্থ 'ইন্‌শা-ই-মাহ্‌রূ'র মধ্যে এই "নিশান"টি সংরক্ষিত হয়ে আছে (J. A. S B., 1923, pp. 279-280 দ্রষ্টব্য)। আমরা নীচে "নিশান"টির পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ দিলাম।

"যেহেতু আমাদের কানে (এই সংবাদ) এসেছে যে—ইলিয়াস হাজী লখ্‌নৌতি এবং ত্রিহুত অঞ্চলের লোকদের উপর যথেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়ন চালাচ্ছে, অহেতুক রক্তপাত করছে, এমন কি স্ত্রীলোকদেরও রক্তপাত করছে, যদিও প্রত্যেক ধর্ম ও মতবাদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি এই যে কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করা চলবে না, যদি সে স্ত্রীলোক কাফের হয়, তবুও না; এবং (ইলিয়াস হাজী) ইসলামের আইনে অনুমোদিত নয়, এমন সব কর আদায় করে লোকদের কষ্ট দিচ্ছে; জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা নেই, সম্মান ও সতীত্বেরও নিরাপত্তা নেই; এবং যেহেতু এই অঞ্চল আমাদের প্রভুরা (পূর্ববর্তী রাজারা) জয় করেছিলেন, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ও ইমামের দান হিসাবে আজ তা আমাদের হাতে এসেছে, আমাদের রাজকীয় ও সাহসী সত্তার উপরে ঐ রাজ্যের অধিবাসীদের নিরাপত্তা বিধান (করার দায়িত্ব) বর্তেছে; এবং যেহেতু ইলিয়াস হাজী পরলোকগত সম্রাটের (মুহম্মদ-বিন-তুঘলক) জীবিতাবস্থায় সম্রাটের প্রতি বশ্য ও অনুগত ছিল, এবং আমাদের পবিত্র অভিষেকের সময়ে সে অধীন ব্যক্তির মত বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রদর্শন করেছিল, আমাদের কাছে সে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল এবং আমাদের সেবা করার জন্য (তার) ভৃত্যদের পাঠিয়েছিল; তাই, ভগবানের সৃষ্ট প্রাণীদের উপরে সে যে অত্যাচার ও যথেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছে, তার অতি ক্ষুদ্র অংশ যদি ইতিপূর্বে আমাদের গোচরে আসত, তাহলে আমরা তাকে সাবধান করে দিতাম, যার ফলে সে তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারত; এবং যেহেতু সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ও প্রকাশ্যে আমাদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা এক অপরাজেয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই দেশ উন্মুক্ত করবার জন্য এবং এখানকার অধিবাসীদের সুখের (সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করার) জন্য এর সন্নিহিত হয়েছি এই আশা নিয়ে যে এর দ্বারা সবাইকে তার উৎপীড়ন থেকে মুক্ত করব, বিচার ও দয়ার প্রলেপ দিয়ে তার অত্যাচারের ক্ষত আরোগ্য করব; এবং তার অত্যাচার ও নৃশংসতার উত্তপ্ত দূষিত ঝটিকায় বিশুষ্ক তাদের অস্তিত্বের বৃক্ষ আমাদের

উদারতার নির্মল জলনিষেকে বর্ধিত ও ফলবন্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং আমাদের দয়ার আধিক্যহেতু আমরা আদেশ দিয়েছি যে লখ্‌নৌতি অঞ্চলের সমস্ত লোকেরা—সাদাৎ, উলেমা, মশায়খ, ও এই জাতীয় অন্যান্য লোকেরা এবং খান, মালিক, উমারা, সদ্‌র্‌, আকাবের ও মারিফ এবং তাদের অনুচরবর্গ, যারা তাদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে পারে অথবা যাদের ইসলামের প্রতি অনুরাগ এইদিকে চালিত করে, তারা অপেক্ষা বা বিলম্ব না করে আমাদের বিশ্ব-রক্ষাকারী উপস্থিতির কাছে আসবে। তারা তাদের জায়গীর, গ্রাম, জমি, বৃত্তি, পারিশ্রমিক ও বেতন থেকে যা পেত, তার চাইতে তাদের আমরা বেশী দেব; এবং কস্‌ই (কোশী) নদী থেকে লখ্‌নৌতির বেলায়ৎ নদীর সুদূর সীমা পর্যন্ত অঞ্চলে যে শ্রেণীর লোকেরা জমীন্‌দার (জমিদার) ও মুকদ্দম নামে অভিহিত, তারাও আমাদের বিশ্ব-রক্ষাকারী উপস্থিতির সমীপে আসতে পারে। আমরা বর্তমান বছরের ফসল (যা করস্বরূপ দিতে হয়) এবং শুল্ক পরিপূর্ণভাবে মাপ করে দেব; এবং আগামী বছর থেকে পরলোকগত সুলতান শামসুদ্দীনের (শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ) রাজত্বকালে বলবৎ আইন অনুসারে রাজস্ব ও শুল্ক আদায়ের জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি; কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তার চেয়ে বেশী দাবী করা হবে না এবং অতিরিক্ত ও অবৈধ যে সমস্ত কর ও শুল্ক দেশের ঐ অঞ্চলের লোকেদের উপর অতিরিক্ত ভারী বোঝা হয়ে উঠতে পারে, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মকুব ও উচ্ছেদ করা হবে; এবং যে সমস্ত সন্ন্যাসী, সাঁই ও গব্‌র্‌ (?) ইত্যাদি দলবদ্ধভাবে আমাদের বিশ্ব-রক্ষাকারী উপস্থিতির কাছে আসবে, তারা তাদের জায়গীর, গ্রাম, জমি, পারিশ্রমিক ও বেতন থেকে যা পেত, আমরা তাদের সম্পূর্ণভাবে তা'ই মঞ্জুর করব; এবং যারা দুদলে ভাগ হয়ে আসবে, আমরা তাদের একটি বেকনা (?) মঞ্জুর করব; এবং যে কেউ একা আসবে, সে যা পেত, তা'ই আমরা মঞ্জুর করব। তাছাড়া, আমরা তাদের আদি বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করব না অথবা তাদের ক্লেশের কারণ ঘটাব না; আমরা এই আদেশ দিয়েছি যে এই অঞ্চলের প্রত্যেকেই তাদের গৃহে অন্তরের আশা অনুযায়ী বাস করতে পারে এবং চিরকাল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ও পরিতৃপ্তি উপভোগ করতে পারে—যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন।"

জিয়াউদ্দীন বারনি তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে ইলিয়াস শাহের যে সব অত্যাচারের কথা লিখেছেন, "নিশান"টিতেও সেই ধরণের কথাই লেখা আছে। "নিশান"টি পড়লেই বোঝা যায় যে ফিরোজ শাহ ইলিয়াস শাহের

প্রজাদের নানারকম লোভ দেখিয়ে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন ; এমন কি হিন্দুদেরও তিনি প্ররোচিত করেছেন, এই নিশানে হিন্দু-সন্ন্যাসী "সাঁই"দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আসল কথা, ফিরোজ শাহ বুঝতে পেরে-ছিলেন যে ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে জয়লাভ দুঃসাধ্য ; তাই ইলিয়াস শাহের দল ভাঙাবার জন্যে তিনি সম্ভাব্য সব রকম উপায় অবলম্বন করেছেন এবং বিধর্মীদের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তিনি বিধর্মী সন্ন্যাসীদের সুযোগ-সুবিধা দেবার আশ্বাস দেওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন।

"নিশান"টিতে দাবী করা হয়েছে যে ফিরোজ শাহের অভিষেকের সময়ে ইলিয়াস তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। আসলে সম্ভবত ইলিয়াস ঐ সময়ে সৌজন্যসূচক উপহার ও চিঠি পাঠিয়েছিলেন ; তাকেই "নিশান"-এ এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই "নিশান"-এ এবং বারনির বইয়ে ইলিয়াস শাহের অত্যাচারের কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে। নিরপেক্ষ কোন সূত্র থেকে এই সব কথার সমর্থন না পাওয়া পর্যন্ত এদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। তবে একটি ব্যাপার এ সম্বন্ধে খানিকটা সন্দেহের সৃষ্টি করে। বিহারের বিখ্যাত দরবেশ শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি এই সময়ে জীবিত ছিলেন। শেখ হুসামুদ্দীন মাণিক-পুরীর 'রফীক অল-আরেফীন' (রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ)-এর এক জায়গায় লেখা আছে, "সুলতান ফিরোজ শেখ শরফুদ্দীন মনেরির সঙ্গে দেখা করার জন্য বিহার (শরীফ) -এ আসেন। ...সুলতান নিজের মনে ভাবলেন শেখের সঙ্গেই তিনি প্রার্থনা করবেন। শেখ ইমামের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তিনি প্রথমবার হাঁটু গেড়ে "এজাজা নসরুল্লাহ্" শ্লোক আবৃত্তি করলেন এবং দ্বিতীয়বার তিনি "তব্বৎ ইয়াদা" শ্লোক পড়লেন। প্রার্থনা শেষ হলে সুলতান বললেন যে এর থেকে তিনি শুভ সঙ্কেত পাচ্ছেন। শেখ উত্তর দিলেন তিনি তাঁর (ফিরোজ শাহের) জয়ের জন্য 'এজাজা' এবং তাঁর শত্রুর পরাজয়ের জন্য 'তব্বৎ ইয়াদা' আবৃত্তি করেছেন।" ফিরোজ শাহ তুঘলক একবার ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করবার সময় এবং দ্বিতীয়বার ইলিয়াসের পুত্র সিকন্দর শাহের বিরুদ্ধে অভিযান করার সময় বিহারে এসেছিলেন। শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি ফিরোজ শাহের যে শত্রুর পরাজয় কামনা করেছিলেন, তিনি সিকন্দর শাহ হতে পারেন না, কারণ সিকন্দর শাহের সঙ্গে শরফুদ্দীনের গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল (সিকন্দর শাহ ও গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সংক্রান্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

অতএব ইলিয়াস শাহের সঙ্গে সংঘর্ষের পূর্বাহ্ণেই ফিরোজ শাহ শরফুদ্দীনের কাছে এসেছিলেন এবং শরফুদ্দীন ইলিয়াস শাহেরই পরাজয় কামনা করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে মনে হয়, শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি ইলিয়াস শাহের উপরে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং ইলিয়াস শাহ তাঁর প্রজাদের উপরে কিছু অত্যাচার করেছিলেন এবং তারই ফলে এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় দরবেশের তিনি অসন্তোষ উদ্রেক করেছিলেন বলে কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন। আমাদের মনে হয়, ফিরোজ শাহের "নিশান" এবং বারনির বইয়ে ইলিয়াসের যে সমস্ত অত্যাচারের কথা লেখা আছে, তার অধিকাংশই সত্য নয়, কিন্তু "নিশান"-এ ইলিয়াসের প্রজাদের উপরে নতুন নতুন কর বসানো সম্বন্ধে যা লেখা আছে তা সত্য, কারণ "নিশান"-এ ফিরোজ শাহ সমস্ত কর এক বছরের জন্য মকুব করার এবং পরে স্থায়িভাবে হ্রাস করার আশ্বাস দিয়েছেন। ইলিয়াস শাহ সম্ভবত অর্থলোভ বা প্রয়োজননির্বাহের জন্যে এই রকম বহু নতুন কর বসিয়েছিলেন এবং এরই জন্যে তিনি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি প্রমুখ অনেক লোকের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে তিনি উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশ শাসনের ব্যাপারে তাঁর দক্ষতা কী রকম ছিল, তা জানবার বর্তমানে কোন উপায় নেই।

ইলিয়াস শাহ যে লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তা ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে দৃঢ়তাপূর্ণ প্রতিরোধ ও পরিণামে জয়যুক্ত হওয়া থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না। ইলিয়াস শাহ মুসলিম সন্ত ও দরবেশদের খুব সম্মান করতেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম সন্ত বর্তমান ছিলেন—অখী সিরাজুদ্দীন, তাঁর শিষ্য আলা অল-হক এবং রাজা বিয়াবানি। শেষোক্ত দুজনের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর রাজত্বকালে ও সম্ভবত তাঁরই আদেশে আলা অল-হকের জন্য ৭৪৩ হিঃর ২রা শাবান বা ১৩৪২ খ্রীঃর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল (**Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 10** দ্রষ্টব্য)। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ফিরোজ শাহ যখন একডালা দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, সেই সময়ে শেখ রাজা বিয়াবানির মৃত্যু হয় এবং ইলিয়াস শাহ অসীম বিপদের ঝুঁকি

নিয়ে ফকীরের ছদ্মবেশে একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

'রিয়াজ'-এ লেখা আছে, "জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করা ও সৈন্যবাহিনীর হৃদয় জয় করার দিকে তিনি (ইলিয়াস) তাঁর মহৎ প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করেছিলেন।" 'রিয়াজ'-এর মতে ইলিয়াস দিল্লীর শাম্‌সী স্নানাগারের অনুরূপ একটি স্নানাগার নির্মাণ করেছিলেন।

জিয়াউদ্দীন বারনি এবং অন্যান্য সমসাময়িক ও পরবর্তী ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন যে ইলিয়াস শাহ ভাঙ বা সিদ্ধির নেশা করতেন। একথা সত্য বলেই মনে হয়। পরবর্তীকালে লেখা বহু গ্রন্থে ইলিয়াস শাহের নামের সঙ্গে 'ভাঙ্গরা' নামে একটি উপাধি বা উপনাম যুক্ত দেখা যায়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ইলিয়াস শাহ অত্যধিক পরিমাণে ভাঙ খেতেন বলে 'সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরা' নামে পরিচিত ছিলেন। ডঃ আহমদ হাসান দানী একথা বিশ্বাস করেন না, কারণ 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা আছে যে ইলিয়াস শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে নিজেই 'সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্করা' উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিরিশ্‌তার কথা যে সত্য, তার কোন প্রমাণ নেই। ডঃ দানী মনে করেন 'সুলতান শামসুদ্দীন বাঙ্গালা' বিকৃত হয়ে 'সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরা (বা ভাঙ্করা)'য় পরিণত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য, শাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিফ ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' উপাধিতে অভিহিত করেছেন। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াস শুধু ভাঙখোর ছিলেন না, কুষ্ঠরোগীও ছিলেন এবং কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হবার জন্য তিনি বহ্‌রাইচের সিপাহ্‌সালার শেখ মস্‌উদ গাজীর সমাধির ধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করেন। কিন্তু 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' ইলিয়াস শাহের শত্রুপক্ষের লোকের লেখা, কাজেই তার উক্তি কতখানি সত্য আর কতখানি বিদ্বেষপ্রণোদিত, তা বলা কঠিন। ফিরোজ শাহের অনুগত লোকদের লেখা বইগুলিতে ইলিয়াস শাহের চরিত্রে নানাভাবে কালিমা লেপন করা হয়েছে, বলা বাহুল্য তার অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের ৭৫৮ হিজরা অবধি তারিখের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। ঐ বছর থেকেই আবার তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে মনে হয় ৭৫৮ হিজরাতেই ইলিয়াস শাহের রাজত্ব শেষ এবং সিকন্দর শাহের রাজত্ব সুরু হয়েছিল। কিন্তু সমসাময়িক গ্রন্থ 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে লেখা

আছে যে ইলিয়াস শাহ ৭৫৯ হিজরায় পরলোকগমন করেন। সম্ভবত ইলিয়াস শাহ বৃদ্ধ বা রুগ্ন হয়ে পড়ার দরুণ ৭৫৮ হিজরায় সিংহাসন ত্যাগ করে পুত্রের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করেছিলেন এবং পরের বছর পরলোকগমন করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত করলে মুদ্রা ও গ্রন্থের সাক্ষ্যের সামঞ্জস্য করা যায়।

'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে ইলিয়াস শাহ তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে মালিক তাজুদ্দীন এবং আরও কয়েকজন অমাত্যের হাত দিয়ে দিল্লীতে ফিরোজ শাহের কাছে বহু উপহার পাঠিয়েছিলেন। ফিরোজ শাহ এই দূতদের আগের দূতদের চেয়েও বেশী যত্ন করে কিছুদিন পরে মালিক সৈফুদ্দীন শাহ্‌নাফীল নামে একজন দূত মারফৎ ইলিয়াস শাহকে আরবী ও তুর্কী ঘোড়া এবং আরও নানারকমের উপহার পাঠিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হয়। মালিক তাজুদ্দীন ও মালিক সৈফুদ্দীন বিহারে পৌঁছে এই খবর পান। সৈফুদ্দীন দিল্লীতে ইলিয়াসের মৃত্যু-সংবাদ পাঠালেন এবং ফিরোজ শাহের আদেশ অনুসারে ঘোড়া ও উপহারগুলি বিহারে অবস্থিত ফিরোজ শাহের সৈন্যদের বেতনের বদলে বণ্টন করে দিলেন। মালিক তাজুদ্দীন বাংলাদেশে ফিরে গেলেন।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সাতগাঁও, সোনারগাঁও এবং শহর-ই-নৌ নামে একটি অজ্ঞাত স্থানের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। "শহর-ই-নৌ" সম্ভবত নিকলো দা কন্তির ভ্রমণ-বিবরণে উল্লিখিত "শেরনোব" শহরের সঙ্গে অভিন্ন। ইলিয়াস শাহের এপর্যন্ত একটি মাত্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি কলকাতার বেনিয়াপুকুরের একটি আধুনিক মসজিদে বসানো আছে, মূলে এটি অন্যত্র ছিল।

সিকন্দর শাহ

সিকন্দর শাহ ইলিয়াস শাহের সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তাঁর রাজত্বকালেও দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ বাংলাদেশ জয় করতে আসেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সন্ধি করে ফিরে যান। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন। পিতার মত তিনিও অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অনন্যসাধারণ নৃপতির সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্যই জানা যায় না।

শামস্-ই-সিরাজ আফিফের লেখা 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং অজ্ঞাত-

নামা ব্যক্তির লেখা 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' তে ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং সিকন্দর শাহের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফের বিবরণে খুঁটিনাটি তথ্য বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু ভুল আছে। আফিফ লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা জাফর খাঁর অনুরোধে ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার অভিযান করেন; ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে তাঁর প্রথম অভিযানের পর দিল্লীতে ফিরে গেলে ইলিয়াস শাহ ফখরুদ্দীনের উপর প্রতিশোধ নেবার মৎলব করে নৌকোয় চড়ে কয়েকদিনের মধ্যে সোনারগাঁওয়ে পৌঁছোন এবং বিপদের ভয় থেকে নিশ্চিন্ত ফখরুদ্দীনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে অবিলম্বে বধ করেন ও তাঁর রাজ্য অধিকার করেন, ফখরুদ্দীনের সমস্ত বন্ধু ও অনুচররা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে. জাফর খাঁ এই সময় শুল্ক আদায় এবং শুল্ক সংগ্রাহকদের হিসাবপত্র পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি সমস্ত খবর শুনে সোনারগাঁও থেকে পলায়ন করেন এবং নানা পথ ঘুরে অনেক কষ্টে জলপথে থাট্টায় ও সেখান থেকে দিল্লীতে পৌঁছে ফিরোজ শাহকে সমস্ত কথা নিবেদন করেন; ফিরোজ শাহ তাঁকে প্রচুর অর্থ, সম্মান ও উচ্চ রাজপদ দান করেন এবং পরিশেষে যাতে জাফর খাঁ শ্বশুরের রাজ্যের অধীশ্বর হতে পারেন, তার জন্য স্বয়ং ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। কিন্তু ফিরোজ শাহের প্রথম বাংলা-অভিযান ৭৫৫ হিজরাতে শেষ হয়; আর ফখরুদ্দীন ৭৫০ হিজরায় পরলোক গমন করেছিলেন, কারণ তাঁর ৭৫০ হিঃ পর্যন্তই মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে; ৭৫০ হিঃ থেকে ৭৫৩ হিঃ পর্যন্ত তাঁর পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ৭৫৩ হিঃ থেকে ৭৫৮ হিঃ পর্যন্ত একটানা সোনারগাঁও টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ ইলিয়াস শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে! অতএব ইলিয়াস শাহ ৭৫৫ হিজরায় ফখরুদ্দীনকে বন্দী ও নিহত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করতে পারেন না। তিনি আসলে উচ্ছেদ (ও সম্ভবত নিহত) করেছিলেন ফখরুদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহকে এবং এই ঘটনা ঘটেছিল ৭৫৩ হিজরায়—ফিরোজ শাহের প্রথম গৌড়-অভিযানের আগেই। সুতরাং শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ এক্ষেত্রে ভুল করেছেন, তাঁর পক্ষে এই জাতীয় ভুল করা খুবই স্বাভাবিক, কারণ ফিরোজ শাহের বঙ্গাভিযান সম্বন্ধে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না; ঐ সময়ে তিনি হয় জন্মান নি না হয় নিতান্ত বালক ছিলেন। [শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ-আফিফ 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লিখেছেন যে ফিরোজ শাহ ৭০৯ হিঃ বা ১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ

করেন এবং তাঁর নিজের পিতামহ শাম্‌স্‌-ই-শহাব-আফিফ ও ফিরোজ শাহ একই দিনে জন্মান (**Tarikh-i-Firoz Shahi, Eng. Translation, 1953, pp. 3, 5** দ্রষ্টব্য)। অতএব ৭৫৯ হিজরা বা ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় বঙ্গাভিযানের সময় ফিরোজ শাহ ও শাম্‌স্‌-ই-শহাব আফিফ দুজনেরই বয়স ৪৯ বছর ছিল। সুতরাং শাম্‌স্‌-ই-শহাব আফিফের পৌত্র শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ ঐ সময়ে জন্মান নি বা জন্মালেও নিতান্ত বালক ছিলেন।] শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফের পিতা ফিরোজ শাহের বঙ্গাভিযানের সময় ফিরোজ শাহের "খওয়াস" (attendant) ছিলেন, তাঁর কাছে শুনে আফিফ এই ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্য জাফর খাঁ যে ফিরোজ শাহের কাছে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং ফিরোজ শাহ যে জাফর খাঁর দাবী পূরণ করার অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার অভিযান করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহকে উচ্ছেদ করে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁও অধিকার করার বেশ কিছুদিন পরে জাফর খাঁ দিল্লীতে যান।

শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় বঙ্গাভিযানের যে বিবরণ দিয়েছেন, নীচে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

যখন বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন শুনলেন যে ফিরোজ শাহ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি করছেন, তখন তিনি ভয় পেলেন এবং একডালায় থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না বুঝে সোনারগাঁওয়ে চলে যাওয়া উচিত মনে করলেন, কারণ ঐ জায়গা বাংলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং সেখানে তিনি শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ হতে পারবেন। তিনি সেখানেই গেলেন, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ফিরোজ শাহকে আবেদন জানিয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। ফিরোজ শাহও তখন সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হলেন।

ফিরোজ শাহের প্রথম অভিযানের মত দ্বিতীয় অভিযানেও বিরাট ও শক্তিশালা সৈন্যবাহিনী গেল। তাঁর বাহিনীতে ৭০,০০০ ঘোড়সওয়ার, ৪৭০টি রণহস্তী এবং বহু নৌকো ছিল ; যে সব তাঁবু গেল, তার মধ্যে দুটি বাইরের তাঁবু, দুটি অভ্যর্থনা করবার তাঁবু, দুটি ঘুমোবার তাঁবু এবং দুটি রান্না-বান্না প্রভৃতি সাংসারিক কাজ করবার তাঁবু ছিল। তাঁর বাহিনীতে ১৮০টি নানা ধরণের পতাকা, ৮৪টি গাধার পিঠে বোঝাই তূর্য ও দামামা এবং বহু উট, গাধা ও ঘোড়া ছিল।

কনৌজ, অযোধ্যা ও জৌনপুর হয়ে ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে এসে পৌঁছোলেন। ইতিমধ্যে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ মারা গিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ রাজা হয়েছিলেন। তিনি দুর্ভেদ্য ও জলবেষ্টিত একডালা (ইকডালা) দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফিরোজ শাহের বাহিনী ঐ দুর্গ বেষ্টন করে রইল এবং কাঠের বাড়ী তৈরী করে বাস করতে লাগল। দুপক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল এবং চারদিকে আরাদা (শূল ক্ষেপণের যন্ত্র) ও মঞ্জানিক (শর ক্ষেপণের যন্ত্র) স্থাপন করল। উভয় দলে তীর ও বল্লম ছোঁড়াছুড়ি চলতে লাগল। সিকন্দর শাহের পক্ষের লোকেরা ভয়ে দুর্গের ভিতর থেকে বেরোতে পারত না। কিন্তু হঠাৎ একদিন সিকন্দরিয়া দুর্গের (সিকন্দরের দুর্গ অর্থাৎ একডালা) একটি প্রধান প্রাকার অত্যধিক লোকের ভার সইতে না পেরে ধ্বসে পড়ল। তার ফলে উভয় পক্ষেরই মধ্যে তুমুল চীৎকার উঠল এবং তারা যুদ্ধের জন্য তৈরী হল। হিসামুলমুল্‌ক্ সুলতান ফিরোজ শাহকে এই সুযোগে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে নিতে বললেন। কিন্তু ফিরোজ শাহ বললেন যে এখন অতর্কিত আক্রমণ করে দুর্গ অধিকার করলে নিষ্ঠুর ও অভদ্র লোকদের হাতে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের অমর্যাদা ঘটবে। তাই ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে অপেক্ষা করাই ভাল। তাঁর লোকেরা দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে তারা সুলতানের আদেশ মেনে নিল।

এদিকে "কালোদের রাজা" সিকন্দর শাহের উৎসাহী বাঙালী মিস্ত্রীরা সারারাত্রি খেটে বিধ্বস্ত প্রাকার মেরামত করে ফেলল। একডালা দুর্গ কাদামাটি দিয়ে তৈরী ছিল বলে এত কম সময়ের মধ্যেই প্রাকারটি মেরামত করে ফেলা সম্ভব হল। তারপর দুপক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অবশেষে দুর্গে খাদ্য ফুরিয়ে গেল। বাঙালীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কিন্তু দুপক্ষই যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই দুই সুলতান সন্ধি কামনা করলেন। সিকন্দর শাহ তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা ফিরোজ শাহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে এক দূত পাঠাতে চাইলেন। সিকন্দর শাহ নিরুত্তর রইলেন, কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা মৌনতাকেই সম্মতির লক্ষণ জ্ঞান করে ফিরোজ শাহের কাছে একজন চতুর ও বিশ্বস্ত দূত পাঠিয়ে বললেন যে যুধ্যমান দুই পক্ষই যখন মুসলমান, তখন তাঁদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়াই উচিত। ফিরোজ শাহ বললেন যে সন্ধি করতে তাঁর আপত্তি নেই, তবে জাফর খাঁকে সোনারগাঁওয়ের রাজা করতে হবে এই তাঁর একমাত্র সর্ত। ফিরোজ শাহের

সিদ্ধান্ত শুনে তাঁর মন্ত্রীরা সিকন্দর শাহের কাছে হৈবৎ খান নামে একজন দূত পাঠালেন। হৈবৎ খানের বাড়ী ছিল বাংলায় এবং তাঁর দুই পুত্র সিকন্দর শাহের অধীনে চাকরী করতেন। হৈবৎ খানের কাছে প্রস্তাব শুনে সিকন্দর শাহ প্রথমে এসম্বন্ধে কিছু না জানার ভাণ করলেন। কিন্তু সুকৌশলী ও মিষ্টভাষী হৈবৎ খান তাঁকে ভাল করে সমস্ত বুঝিয়ে বলে ফিরোজ শাহের প্রদত্ত সর্ত অনুযায়ী সন্ধি করতে রাজী করালেন। সিকন্দর তখন বললেন জাফর খাঁকে সোনারগাঁওয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ফিরোজ শাহের নিজের আসার কী দরকার ছিল, তিনি দিল্লী থেকে সিকন্দরকে আদেশ পাঠালেই তো সিকন্দর জাফর খাঁকে সোনারগাঁও ছেড়ে দিতেন !

হৈবৎ খান ফিরোজ শাহের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে সমস্ত কথা জানালেন। সব কথা শুনে ফিরোজ শাহ খুশী হয়ে বললেন যে তিনি সিকন্দর শাহের সঙ্গে সন্ধি করবেন এবং তাঁকে তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের মত জ্ঞান করবেন। তারপর হৈবৎ খানের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সিকন্দর শাহকে উপহার পাঠালেন। ফিরোজ শাহ মালিক কাবুল বা তোরাবান্দ খানের হাত দিয়ে ৮০,০০০ টঙ্কা দামের একটি মুকুট এবং ৫০০ আরবী ও তুর্কী ঘোড়া একডালা দুর্গে পাঠালেন। সেই সঙ্গে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে তাঁর এবং সিকন্দরের মধ্যে আর যুদ্ধ হবে না। ইস্কান্দরের (অর্থাৎ সিকন্দরের) দুর্গের পরিখা ২০ গজ চওড়া ছিল, তা সত্ত্বেও মালিক কাবুল ঘোড়া চড়ে তা লাফ দিয়ে পার হয়ে গেলেন এবং দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সিকন্দর শাহের সভায় গিয়ে মালিক কাবুল সাতবার সিকন্দরের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলেন এবং তাঁর মাথায় মুকুট ও বুকে সম্মান-উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন। সুলতান সিকন্দর সন্তুষ্ট হয়ে চল্লিশটি হাতী এবং আরও নানা মূল্যবান উপহার পাঠালেন এবং এই কামনা প্রকাশ করলেন যে এখন থেকে প্রতি বছর দুই সুলতানের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ উপহার-বিনিময় চলতে থাকবে। যতদিন ফিরোজ শাহ ও সিকন্দর শাহ বেঁচে ছিলেন, ততদিন দুজনের মধ্যে উপহার-বিনিময় চলেছিল।

সিকন্দর শাহের প্রেরিত উপহার পেয়ে ফিরোজ শাহ খুব খুশী হলেন। অতঃপর তিনি জাফর খাঁকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে তাঁকে সোনারগাঁওয়ে গিয়ে সেখানকার রাজপদ গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন। এও বললেন যে জাফর খাঁর নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে যেখানে আছেন, সেখানেই কিছু সময় অবস্থান করবেন, ইতিমধ্যে জাফর খাঁ সোনারগাঁওয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত

হয়ে যাবেন। জাফর খাঁ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁরা সকলেই বললেন যে জাফর খাঁর পক্ষে সোনারগাঁওয়ে থাকতে পারা একেবারেই অসম্ভব, কারণ তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবেরা কেউই বেঁচে নেই, সকলেই বিনষ্ট হয়েছে। জাফর খাঁ তখন ফিরোজ শাহের কাছে ফিরে গিয়ে জানালেন যে দিল্লীতেই তিনি ও তাঁর পরিবার নিরাপদে থাকতে পারবেন, তাই সোনারগাঁওয়ের রাজা হবার বাসনা আর তাঁর নেই, তার বদলে তিনি তাঁর বর্তমান অবস্থাতেই পরিতুষ্ট থেকে শান্তিতে জীবন কাটাতে চান। একথা শুনে ফিরোজ শাহ সন্তুষ্ট হলেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে জৌনপুর ও পরে জাজনগর বা উড়িষ্যার দিকে গেলেন।

আফিফ লিখেছেন যে ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান শেষ হতে দু'বছর সাত মাস সময় লেগেছিল। আফিফের বিবরণ মোটামুটিভাবে বিশ্বাসযোগ্য, তবে এই বিবরণের একডালা দুর্গের গম্বুজ ধ্বসে পড়া ও মহিলাদের সম্ভ্রম হানির ভয়ে ফিরোজ শাহের তা আক্রমণ করতে অস্বীকৃত হওয়া এবং সিকন্দর শাহের জাফর খানকে সোনারগাঁও ছেড়ে দিতে রাজী হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি অমূলক বলে মনে হয়।

'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র বিবরণ আফিফের বিবরণের তুলনায় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর মূল্য অন্য দিক দিয়ে বেশী, কারণ এই বইয়ের লেখক সম্ভবত ফিরোজ শাহ ও সিকন্দর শাহের যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আর স্বয়ং ফিরোজ শাহের নির্দেশে এই বই লেখা হয়। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'তে লেখা আছে যে শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর সুলতান সিকন্দর পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। যৌবনের ঔদ্ধত্যে তিনি তাঁর শুভার্থীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে এবং আগেকার ইতিহাস ভুলে গিয়ে সম্রাট ফিরোজ শাহের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এই সময় পিণ্ডার খিলজী নামে ফিরোজ শাহের একজন কর্মচারী দিল্লীতে বিশ্বস্তভাবে সুলতানের কাজ করে কাদির খান উপাধি এবং অধিকন্তু "বঙ্গ ও বাঙ্গালা"দেশের কর্তৃত্ব (!) লাভ করেন। ইলিয়াস শাহের এক পুত্র আলী শাহ এই পিণ্ডারের কর্মচারী ছিলেন এবং পিণ্ডার তাঁকে ভাইপো বলে ডাকতেন। (এর দ্বারা 'সিরাৎ'-রচয়িতা বোঝাতে চাইছেন যে ফিরোজ শাহের কাছে সিকন্দর শাহ নিতান্ত তুচ্ছ ব্যক্তি।) এসব কথা ভুলে গিয়ে সিকন্দর যখন ফিরোজ শাহের কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেন, তখন ফিরোজ শাহ তাঁকে শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করলেন। ফিরোজ শাহ তাঁর সভাসদদের জানালেন যে সিকন্দর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত

থাকার অধিকার হারিয়েছেন এবং ৭৫৯ হিজরায় (১৩৫৭-৫৮ খ্রীঃ) তিনি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ফিরোজ শাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে বাংলায় পৌঁছোলেন এবং একডালা দুর্গ অবরোধ করলেন। তার ফলে সিকন্দর পরিশেষে বিবর্ণ হয়ে বৈরীভাব ত্যাগ করে দয়া ভিক্ষা করলেন। ফিরোজ শাহও তাঁকে ক্ষমা করে বললেন, "বুদ্ধিমান লোক কোন অবিজ্ঞোচিত কাজ করলে তার শাস্তি দেবার সময় উদার ব্যবহার করা প্রয়োজন।" সিকন্দরের যে সমস্ত লোক বন্দী হয়েছিল, তাদের ফিরোজ শাহ মুক্তি দিলেন। সিকন্দরও ফিরোজ শাহকে বড় বড় হাতী ও অনেক সুন্দর উপহার পাঠালেন। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন যে যারা মিছামিছি তাঁর উপর দোষ দিয়ে তাঁর নামে কোন কিছু প্রচার করেছে, তাদের উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তিনি শাস্তি দিতে চান এবং দেশকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্ত করার ভার তিনিই নিচ্ছেন।

সুতরাং ফিরোজ শাহের প্রথম অভিযানের মত দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সিকন্দর তাঁর পিতারই মত যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ফিরোজ শাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করলেন, উপরন্তু স্বাধীন ও সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে ফিরোজ শাহের কাছে স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন। যদিও শাম্‌স্‌-ই-সিরাজ আফিফ ও 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র লেখক বলেছেন যে সিকন্দরই প্রথমে ফিরোজ শাহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। অন্তত 'সিরাৎ'-এ সিকন্দর শাহের যে দীনভাবে ক্ষমা ভিক্ষার বর্ণনা আছে, তা যে সত্য নয় তা বলাই বাহুল্য। সিকন্দর শাহ যদি সত্যিই এভাবে নত হতেন, তাহলে ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে তাঁর সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করতেন না, তাঁকে নিজের সামন্ত করে রাখতেন।

ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান যে ৭৫৯ হিজরায় সুরু হয়েছিল এবং দু'বছর সাত মাস চলেছিল, তা যথাক্রমে 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী' এবং শাম্‌স্‌-ই সিরাজ আফিফের বই থেকে জানা যায়। সুতরাং ৭৬১ হিজরার শেষ দিক অথবা ৭৬২ হিজরার প্রথম দিকে এই অভিযান শেষ হয়েছিল। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' প্রভৃতি পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে যে ৭৬২ হিজরার রজব মাসে ফিরোজ শাহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। একথা সত্য বলেই মনে হয়।

পরবর্তীকালে লেখা ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে ফিরোজ শাহের এই দ্বিতীয় বঙ্গাভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন কথা পাওয়া যায়। 'তারিখ-ই-মুবারক

শাহী'তে লেখা আছে যে ৭৫৯ হিজরার শেষ দিকে বাংলাদেশ থেকে দূতেরা ফিরোজ শাহের দরবারে উপঢৌকন নিয়ে এসেছিল এবং তারপর ফিরোজ শাহ বাংলাদেশে অভিযান করেন। একথা সত্য হলে বলতে হবে, ফিরোজ শাহের অভিযানের প্রস্তুতি তার আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু ফিরোজ শাহ বাংলার রাজদূতদের কিছুই বুঝতে দেননি এবং তারা চলে যাবার পরে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'র এই সময় নির্দেশে ভুল আছে বলে মনে হয়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেই ফিরোজ শাহকে বিভিন্ন ধরণের ৫০টি দুষ্প্রাপ্য হাতী উপহার পাঠিয়েছিলেন। ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ'এর মতে ফিরোজ শাহ যখন সিকন্দর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন বন্যার জন্য গোমতী নদীর তীরে জাফরাবাদে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল. সেই সময় ফিরোজ শাহ তাঁর কাছে দূত পাঠান; সিকন্দর শাহ বুঝতে পারেননি ফিরোজ শাহের আসার উদ্দেশ্য কী? এসম্বন্ধে তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ছিল, তাই তিনি পাঁচটি হাতী ও অন্যান্য উপহার সমেত ফিরোজ শাহের কাছে দূত পাঠান, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'মন্তখব-উৎ-তওয়ারিখ'এর মতে জাফরাবাদ থেকে ফিরোজ শাহ সিকন্দর শাহের কাছে সৈয়দ রসূলদার নামে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন।

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা জানা যায় না। তাঁর একটি অক্ষয় কীর্তি বিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করা। স্থাপত্য-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই মসজিদটি অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নির্মিত সমস্ত মসজিদের মধ্যে এইটি আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়। এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ও বহু হিন্দু মন্দিরের উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণে, সুলতানের আদেশে বিভিন্ন হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে বলতে হবে ধর্মের ব্যাপারে সিকন্দর শাহের মনোভাব খুব উদার ছিল না। কিন্তু ঐ অনুমান থেকে নিম্নোক্ত দুটি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় না।

(১) মুসলমান আমলে হিন্দু মন্দিরের উপকরণে যে সমস্ত মসজিদ তৈরী হত, তাতে সাধারণত দেব-দেবীদের মূর্তিগুলিকে নিশ্চিহ্ন বা বিকৃত করা হত অথবা উলটে রাখা হত; কিন্তু আদিনা মসজিদের মধ্যে যেসব দেবদেবীর মূর্তি দেখতে

পাওয়া যায়, তাদের অধিকাংশই অবিকৃত এবং সেগুলি সোজা ভাবেই বসানো আছে, তাদের অনেকগুলি মসজিদের বাইরের দেওয়ালে ও ভিতরে বেশ ভাল জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। দ্বিতীয়ত, এই মসজিদের কয়েকটি দরজার উপরের প্যানেলে খুব সুন্দরভাবে হিন্দু দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছে ; ঐ প্যানেল-গুলি বাইরের থেকে আনা হয়েছে বলে মনে করা শক্ত, কারণ এগুলি দরজার মাপের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়, বাইরের থেকে আনা মূর্তি-সংবলিত প্যানেলকে দরজার মাপের সঙ্গে কৃত্রিমভাবে মেলানো হলে তার মধ্যে এমন সুষমতা ও পরিপূর্ণতা রক্ষা করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

(২) আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিনা মসজিদের যে অংশটি এখনও বজায় আছে, তার মধ্যে এক জায়গায় মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে একটি কালো পাথরের কারুকার্যখচিত মঞ্চ আছে, তার নাম 'বাদশাহ্-কা-তখ্ৎ' ; বাদশাহ্ এবং তাঁর পরিবারবর্গের নমাজ পড়ার জন্য এই মঞ্চটি নির্মিত হয়েছিল বলে সাধারণত মনে করা হয় ; কিন্তু ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে মসজিদে সবাই একসঙ্গে নমাজ পড়তে বাধ্য, সেখানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা একেবারে নিষিদ্ধ ব্যাপার।

সুতরাং সিকন্দর শাহ হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করিয়ে তার থেকে আদিনা মসজিদের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না। উপরে যে দুটি সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে, তার সমাধান সম্বন্ধে পাণ্ডুয়া অঞ্চলে প্রচলিত একটি পুরোনো প্রবাদ থেকে খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; প্রবাদটি এই যে, রাজা গণেশ ক্ষমতা লাভের পরে আদিনা মসজিদকে তাঁর কাছারী-বাড়ীতে পরিণত করেছিলেন। এ সম্বন্ধে এইচ. এস. স্টেপলটন লিখেছিলেন, **"It may also be added with reference to the supposed connection of Rājā Kāns with the Eklākhī building that local tradition states that when the Rājā obtained supreme power over Bengal after the death of the short-lived successors of Ghiyāsuddīn, out of contempt for Muhammadanism he used the adjacent Adīna mosque as his Kācherī (Magistrate's Court or Zamindārī Office)." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 126, f. n.)**

এই প্রবাদ সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। এই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে এমন হতে পারে যে, আদিনা মসজিদ যখন প্রথম নির্মিত হয়, তখন তাতে হিন্দু দেব-

দেবীর মূর্তি বা 'বাদশাহ্-কা-তখ্‌ৎ'—কিছুই ছিল না ; রাজা গণেশ যখন ক্ষমতা লাভ করে আদিনা মসজিদকে কাছারীতে পরিণত করেছিলেন, সেই সময়ে তাঁরই আদেশে এই মসজিদের মধ্যে দেবদেবীর মূর্তিগুলি খোদাই করা হয়েছিল এবং গণেশই এই নতুন কাছারীতে 'বাদশাহ্-কা-তখ্‌ৎ' নির্মাণ করিয়েছিলেন নিজে বসবার জন্য ; কিন্তু গণেশের মৃত্যুর পর আদিনা মসজিদ আবার মসজিদে পরিণত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অল-সখাওয়ী আরবী ভাষায় 'অল্‌-জও অল্‌-লামে লে-অহ্‌ল্ অল্‌-করন্ অল্‌-তাসে' নামে যে বই লেখেন, তাতে তিনি লিখেছেন যে রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ রাজা হবার পরে তাঁর পিতা মসজিদ ও অন্যান্য জিনিস যা কিছু ধ্বংস করেছিলেন, সেগুলির সংস্কারসাধন করেন। সম্ভবত এইভাবে আদিনা মসজিদকেও আবার মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়, কিন্তু দেবদেবীর মূর্তিগুলি ও 'বাদশাহ্-কা-তখ্‌ৎ'কে আর অপসারণ করা হয়নি, এগুলি অপসারণ করলে আদিনা মসজিদের সৌন্দর্যহানি ঘটবে ভেবেই হয়তো জলালুদ্দীন ও তাঁর পরবর্তী মুসলমান সুলতানেরা এগুলিকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। এই যদি প্রকৃত ব্যাপার হয় তাহলে পূর্বোক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হয়।

আদিনা মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিক বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবল পশ্চিম দিকের অনেকখানি অংশ এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এত বিরাট ও এত সুন্দর মসজিদটি চারশো বছরও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারে নি, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'রিয়াজ'-রচয়িতা গোলাম হোসেন এর "কিছু চিহ্ন" মাত্র দেখেছিলেন।

আদিনা মসজিদের পশ্চিমদিকের বাইরের দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে, আতে সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার কথা লেখা আছে। শিলালিপিটির তারিখ ৭৭০ হিজরার ৬ই রজব অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। কথিত আছে শিলালিপিটির ভাষা স্বয়ং সিকন্দর শাহের লেখনীনিঃসৃত। 'রিয়াজ'-রচয়িতা সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে লিখেছেন যে সিকন্দর শাহ আদিনা মসজিদ সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। কিন্তু উপরে উল্লিখিত শিলা-লিপির সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, সিকন্দর শাহের জীবদ্দশাতেই এই মসজিদ সম্পূর্ণ হয়েছিল, কারণ ঐ শিলালিপির তারিখের পরেও সিকন্দরশাহ আরও একুশ বছর জীবিত ছিলেন। আদিনা

মসজিদের পশ্চিমদিকে আগে একটি সমাধি ছিল। লোকে বলে এইটিই সিকন্দর শাহের সমাধি।

সিকন্দর শাহের ৭৫৮ হিঃ থেকে ৭৯২ হিঃ পর্যন্ত বছরগুলিতে উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। ৭৯৩ হিঃ থেকে তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। অতএব ৭৯২ বা ৭৯৩ হিজরায় যে সিকন্দর শাহের মৃত্যু ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

সিকন্দর শাহের মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া), সোনারগাঁও, সাতগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ, শহর-ই-নৌ এবং চৌলীস্তান বা কামরূপের টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল। আজ অবধি এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

দেবীকোট (দিনাজপুর), পাণ্ডুয়া (মালদহ) এবং মোল্লা সিমলা (হুগলী)।

এর থেকে তাঁর রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। মোল্লা সিমলার শিলালিপিতে সুলতানের নাম নেই, তবে মুখলিশ খান নামে একজন রাজ-কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

সিকন্দর শাহের প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আজ অবধি কোন মুদ্রা, শিলালিপি বা আর কোন সূত্রে তাঁর পূর্ণ রাজকীয় নাম পাওয়া যায় নি।

সিকন্দর শাহ্ তাঁর পিতা ইলিয়াস শাহেরই মত মুসলিম সাধুসন্তদের ভক্ত ছিলেন। দেবীকোটের বিখ্যাত সন্ত মখদুম মৌলানা আতা ওয়াহিদুদ্দীন বা মুল্লা আতার সমাধিতে তিনি ৭৬৫ হিজরায় একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত দরবেশ আলা অল-হকের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত মুসলিম সন্তদের জীবনীগ্রন্থ 'অখবার অল-অখিয়ার'এর সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে বলতে হয়, শেষের দিকে আলা অল-হকের সঙ্গে সিকন্দর শাহের বিরোধ ঘটে। এই বইতে লেখা আছে যে আলা অল-হক বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ছাত্র, ভিক্ষুক ও পথিকদের খাওয়াবার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। সুলতানের পক্ষেও এত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয় বলে সুলতানের মনে আলা অল-হকের প্রতি ঈর্ষ্যা জাগ্রত হল এবং তিনি তাঁকে রাজধানী পাণ্ডুয়া ছেড়ে সোনার-গাঁওয়ে চলে যেতে বললেন। সোনারগাঁওয়ে গিয়ে আলা অল-হক আগের তুলনায় দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন। কিন্তু কেউ-ই জানত না কোথা থেকে তিনি এই অর্থ পেতেন। বুকাননের বিবরণীতে 'অখবার অল-অখিয়ার'এর

এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। এতে লেখা আছে, "The most celebrated person in the reign of Sekundur, was a holy man named Mukhdum Alalhuk, whose son, Azem Khan, was commander of the troops. The saint having taken disgust at some part of the king's conduct, retired to Sonargang, near Dhaka...... The good man was, however, soon after induced to return."

এই বিবরণীতে আর একটি নতুন কথা পাওয়া গেল যে আলা অল-হকের পুত্র আজম খান সিকন্দরের সেনাপতি ছিলেন। 'অখবার অল-আখিয়ার'এর মতে আজম খান সুলতানের উজীর ছিলেন।

এছাড়া বিহারের বিখ্যাত দরবেশ শেখ-উল ইসলাম শরফুল হক ওয়াদ্দীন ওরফে শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরির সঙ্গে সিকন্দর শাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁদের মধ্যে পত্রবিনিময় চলত। বিহারের দরবেশ মুজঃফর শাম্‌স্ বলখি সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন, তার একটিতে লেখা আছে, "যদিও ফিরোজ শাহ (তুঘলক) এবং তাঁর পক্ষের লোকেরা বারবার শেখকে (শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি) কিছু লিখতে অনুরোধ করেন যা তাঁরা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখতে পারেন, তিনি তাঁদের পৃথকভাবে কিছু লেখেন নি বা পাঠান নি। পক্ষান্তরে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে অন্তরের ইচ্ছায় শহীদ সুলতানকে (সিকন্দর শাহ) প্রায়ই চিঠি লিখতেন।" (Proceedings of the 19th session of Indian History Congress, 1956, p. 214)

নূর কুৎব্ আলমের শিষ্য শেখ হুসামুদ্দীন মাণিকপুরীর বাণী ও উপদেশ সংগ্রহ করে তাঁর শিষ্য ফরীদ বিন সালার 'রফীক অল-আরেফীন' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ের মধ্যে দেখা যায়, শেখ হুসামুদ্দীন মাণিকপুরী রাজা হিসাবে ও মানুষ হিসাবে সিকন্দর শাহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সিকন্দর শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' একটি অতি করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেটি এই ঃ—

সিকন্দর শাহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম গিয়াসুদ্দীন, তিনি আদবকায়দা জানতেন ও অন্যান্য গুণে ভূষিত ছিলেন এবং তাঁর ভাইদের তুলনায় তিনি সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায়ও তিনি দক্ষ

ছিলেন। তার ফলে তাঁর বিমাতা ঈর্ষ্যাপরায়ণা হয়ে উঠলেন এবং তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একদিন তিনি সুলতান সিকন্দর শাহের কাছে গিয়ে বললেন যে গিয়াসুদ্দীন পিতা ও ভ্রাতাদের বধ করে সিংহাসন অধিকারের মৎলব করছেন। অতএব তাকে বন্দী করা অথবা তার চোখ অন্ধ করে দেওয়া উচিত। সিকন্দর একথা শুনে বিরক্ত হলেন। তখন রাণী বললেন যে সুলতানের মঙ্গলের কথা ভেবেই তিনি একথা তাঁকে জানানো প্রয়োজন বোধ করেছেন। তাই শুনে সিকন্দর নিজের মনে বললেন, "গিয়াসুদ্দীন কর্তব্য-পরায়ণ পুত্র এবং শাসনদক্ষতার অধিকারী। সে যদি আমার জীবন নিতে চায়, নিক্। পুত্র কর্তব্যপরায়ণ হলেই সুখের বিষয়। সে যদি কর্তব্যপরায়ণ না হয়, তাহলে ধ্বংস হোক্।" এর পরে তিনি গিয়াসুদ্দীনকে সম্পূর্ণভাবে রাজ্য-পরিচালনার ভার দিলেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন বিমাতার চাতুরী ও কৌশল সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সন্দিগ্ধ ছিলেন। একদিন শিকারের অছিলা করে তিনি সোনারগাঁওয়ে পালিয়ে গেলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী গঠন করে পিতার কাছে সিংহাসন দাবী করলেন এবং তারপরে রাজ্য অধিকারের জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি সোনারগাঁও থেকে রওনা হলেন এবং সোনারগড়িতে ঘাঁটি গাড়লেন। সিকন্দর শাহও এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে এখন আর বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা ছিল না। গোয়ালপাড়ার প্রান্তরে দুইপক্ষের যুদ্ধ হল। গিয়াসুদ্দীন তাঁর দলের লোকদের আদেশ দিয়েছিলেন সিকন্দরকে বধ না করে জীবিত অবস্থায় বন্দী করবার জন্য। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন সিকন্দরকে না চিনে বধ করে ফেলল। যখন অন্য একজন লোক তাকে জানাল যে সে সিকন্দরকেই বধ করেছে, তখন সে ঐ লোকটির সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাউকে বধ না করলে যদি নিজে নিহত হতে হয়, তাহলে কি আমরা তাকে বধ করতে পারি?" গিয়াসুদ্দীন বললেন, "নিশ্চয়ই পার।" তারপর তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "যতদূর মনে হয় তোমরা সুলতানকেই বধ করেছ।" ঐ লোকটি বলল, "হ্যাঁ! না জেনে আমি সুলতানের বুকে বর্শা বিদ্ধ করেছি। এখনও তাঁর জীবনের কিছু অবশিষ্ট আছে।" গিয়াসুদ্দীন তখন তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ে যেখানে তাঁর পিতা পড়েছিলেন, সেখানে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পিতার মাথা কোলে তুলে নিলেন। তাঁর গাল দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, "পিতা! চোখ খুলুন। আপনার অন্তিম অভিলাষ ব্যক্ত করুন। আমি

তা পূর্ণ করব।" সিকন্দর চোখ খুলে বললেন, "আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। এ রাজ্য এখন তোমার। রাজা হিসাবে তুমি সমৃদ্ধি লাভ কর।" এই বলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। গিয়াসুদ্দীন কয়েকজন অমাত্যকে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্বাহের জন্য রেখে নিজে ঘোড়ায় চড়ে পাণ্ডুয়ায় গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

এই কাহিনীর খুঁটিনাটিগুলি সব সত্য কিনা তা বলা যায় না, তবে এর মূল ভিত্তি যে সত্য, তা আমরা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের প্রসঙ্গের মধ্যে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করব।

বুকাননের বিবরণে 'রিয়াজে' প্রদত্ত এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। এতে আলা অল-হকের সোনারগাঁও-গমনের বর্ণনার (আগে উদ্ধৃত) ঠিক পরেই লেখা আছে, "...**but the king's son, Ghyashudin, having also taken disgust, retired to the same place (Sonargang), and afterwards made war against his father, who, after a reign of 32 years, fell in battle at a place called Satra, near Goyalpara.**"

পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধে সিকন্দর শাহ যে নিহত হয়েছিলেন, 'রিয়াজ' ও বুকানন-বিবরণীর এই উক্তির সমর্থন একটি সমসাময়িক সূত্র থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। বিহারের দরবেশ মুজঃফর শাম্স বল্‌খি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে লেখা এক চিঠিতে সিকন্দর শাহকে "শহীদ সুলতান" (**the Martyred Sultan**) বলে উল্লেখ করেছেন।

কোন্ স্থানে পিতা-পুত্রের যুদ্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য আছে। তবে এই গোয়ালপাড়ার অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

সিকন্দর শাহের রাজত্বকালেই দিল্লীর সঙ্গে বাংলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তার ফলে পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ থেকে সুরু করে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ পর্যন্ত সুলতানদের সম্বন্ধে দিল্লীর সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা প্রায় কিছুই লিপিবদ্ধ করেননি।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহী বংশের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বংশের প্রথম তিনজন রাজাই অত্যন্ত যোগ্য ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর

শাহ প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহ ও স্বাধীনতা রক্ষার মধ্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইলিয়াসের পৌত্র ও সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও পিতা ও পিতামহের মতই বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম বলে গণ্য হবেন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ক্ষেত্রে। বাংলার সমস্ত স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে তাঁর মত আকর্ষণীয় চরিত্র বোধহয় আর কারও নেই। লোকরঞ্জক ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর চরিত্রে নানারকম বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ হয়েছিল। এই সুলতানের যে সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই একটি উন্নত বৈচিত্র্যপ্রিয় রুচিমান্ বিদগ্ধ মনের পরিচয় মেলে। এঁর জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে সেগুলি থেকে এঁকে রূপকথার রাজপুত্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়। এখন আমরা এই অনন্যসাধারণ নরপতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হব।

'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে গিয়াসুদ্দীন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও পিতাকে যুদ্ধে নিহত করে রাজা হয়েছিলেন। এই ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে ঘোরতর কৃতঘ্নতা ও মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক বলে মনে হয়, কারণ সিকন্দর শাহ গিয়াসুদ্দীনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, প্রথমা স্ত্রীর প্ররোচনা সত্ত্বেও তাঁর উপর বিরাগ পোষণ করেননি এবং গিয়াসুদ্দীনের উপরেই রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু 'রিয়াজ'-এই লেখা আছে যে প্রথমা স্ত্রীর কথাতে সিকন্দর শাহের মন একটু টলেছিল; এর পরেও যে তিনি গিয়াসুদ্দীনের উপরে রাজ্যের পরিচালনা-ভার অর্পণ করেছিলেন, তা বোধ হয় গিয়াসুদ্দীনকে পরীক্ষা করবার জন্যই; এ ছাড়া গিয়াসুদ্দীনের বিমাতার চক্রান্তও সব সময় সক্রিয় ছিল। সম্ভবত এই সমস্ত কারণে গিয়াসুদ্দীন আত্মরক্ষার অনুরোধে সোনারগাঁওয়ে চলে গিয়েছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণ, তিনি সোনারগাঁওতে বেশীদিন পড়ে থাকলে পাণ্ডুয়ায় তাঁর বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা শক্তিশালী হয়ে উঠত, এবং তার ফলে তাঁর পক্ষে পিতার স্বাভাবিক মৃত্যুর পরে বাংলার রাজা হওয়া দুঃসাধ্য তো হতই, হয়তো সোনারগাঁও-ও হারাতে হত। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও গিয়াসুদ্দীন তাঁর অনুচরদের সিকন্দর শাহকে বধ করতে নিষেধ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর মধ্যে কোন সময়েই মনুষ্যত্বের অভাব সূচিত

হয়নি। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করলে গিয়াসুদ্দীনের আচরণ সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে ক্ষমা করা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে 'রিয়াজে'র ঐ বিবরণ কতদূর সত্য? ঐ বিবরণের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলি সত্য কিনা তা বলা যায় না। তবে মূল বিষয়টি সত্য। মূল বিষয়টির সমর্থন বুকাননের বিবরণ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া গিয়াসুদ্দীন যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর জীবদ্দশায় বাংলাদেশের একাংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন, তার কয়েকটি প্রমাণ আছে। সেগুলি এই,

(১) পূর্ববঙ্গের মুয়াজ্জমাবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁওয়ের টাকশালে উৎকীর্ণ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের এমন কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলি সিকন্দর শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

(২) পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন টাকশালে উৎকীর্ণ সিকন্দর শাহের যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, তাদের কোনটিই ৭৭৭ হিজরার পরবর্তী নয়।

এই দুটি বিষয় থেকে মনে হয়, ৭৭৭ হিজরার পরবর্তী ও ৭৯৩ হিজরার পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে গিয়াসুদ্দীন তাঁর পিতা সিকন্দর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং সোনারগাঁও ও সাতগাঁও সমেত বাংলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এই দুটি বিষয় এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে না। এ সম্বন্ধে অন্য যে প্রমাণ আছে, এখন তার উল্লেখ করছি।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' ইরাণের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের যোগাযোগের একটি কাহিনী পাওয়া যায়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই। একবার সুলতান গিয়াসুদ্দীনের খুব কঠিন অসুখ হয়েছিল, বাঁচবার কোন আশা ছিল না। তিনি সরুব্, গুল ও লালা নামে তাঁর হারেমের তিনটি মেয়েকে তাঁর মৃত্যুর পর শবদেহকে স্নান করাবার জন্য নির্বাচিত করেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন সেবার সেরে উঠ্লেন, উঠে মেয়ে তিনটিকে তিনি আগের চেয়েও বেশী অনুগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু অন্য মেয়েরা তাদের উপর ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে শবদেহ স্নান করানোর ব্যাপার নিয়ে তাদের টিট্‌কারী মারত। একদিন সুলতানের মেজাজ যখন প্রফুল্ল ছিল, তখন ঐ তিনটি মেয়ে সুযোগ বুঝে সুলতানের কাছে অন্য মেয়েদের টিট্‌কারী মারার কথা জানাল। সুলতান সঙ্গে সঙ্গে এক ছত্র ফার্সী কবিতা রচনা করলেন। চরণটির ইংরেজী অনুবাদ এই,

"Cup-bearer, this is the story of sarv (the cypress), Gul (the Rose) and Lalah (the Tulip)."

কিন্তু সুলতান কবিতাটির দ্বিতীয় চরণ আর রচনা করতে পারলেন না, তাঁর সভার কোন কবিও পারলেন না। তখন সুলতান এই চরণটি লিখে একজন দূত মারফৎ ইরাণের শিরাজ শহরে কবি হাফিজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হাফিজ সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চরণটি রচনা করলেন; তার ইংরেজী অনুবাদ, "The story relates to the three corpse-washers" * হাফিজ এই সঙ্গে একটি গজলও লিখে পাঠালেন এবং গিয়াসুদ্দীন তার প্রতিদানে কবিকে অনেক উপহার পাঠালেন। 'রিয়াজ-উস্ সলাতীনে' এই গজলটি থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। শ্লোক দুটির ইংরেজী অনুবাদ এই,

The parrots of Hindustan shall all be sugar-shedding
From this Persian sugar-candy that goes forth to Bengal.
Hāfiz, from the yearning for the company of Sulṭān
Ghiāṣ-ud-dīn,
Rest not; for thy (this) lyric is the outcome of lementation.

শেষ শ্লোকটি থেকে মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন হাফিজকে বাংলাদেশে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন এবং হাফিজ আসতে না পারার জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' বর্ণিত অন্যান্য কাহিনীর মত এই কাহিনীর'ও সব খুঁটিনাটিগুলি সত্য কিনা, তা বলা যায় না, তবে মূল বিষয়টি—অর্থাৎ হাফিজের গজল লিখে গিয়াসুদ্দীনকে প্রেরণের কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আছে। এই বিষয়ের উল্লেখ 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র দুশো বছর আগে রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তেও পাওয়া যায়। 'আইন-ই-আকবরী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নীচে উদ্ধৃত করছি,

"On Sikandar's death his son was elected to succeed him and was proclaimed under the title of Ghiyāsu'ddin. Khwājah

* "...the word used for 'morning draughts' being the same as that used for 'corpse-washers'". (Cambridge History of India, Vol III, Ch. XI, p. 265)

Hafiz of Shirāz sent him an ode in which occurs the following verse :

And now shall India's parroquets on sugar revel all,
In this sweet Persian lyric that is borne to far Bengal."

(Ain-i-Akbari, Vol. II, Jarrett's translation,
2nd Edition, p. 161)

সুতরাং ষোড়শ শতাব্দী থেকেই আমরা বিভিন্ন সূত্রে আলোচ্য কাহিনীটির উল্লেখ পাচ্ছি। কিন্তু হাফিজের নিজের লেখাই এসম্বন্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। হাফিজের মৃত্যুর সামান্য পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুহম্মদ গুলন্দম 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' নামে যে হাফিজ-রচিত গানের সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে প্রেরিত গজলটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়। তার মধ্যে 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উদ্ধৃত শ্লোকগুলিও রয়েছে। এইচ ডব্লিউ ক্লার্ক এই গজলটির যে ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, তা নীচে উদ্ধৃত করলাম,

"Saki ! the tale of the cypress and the rose and the
tulip—goeth.
And with the three washers (cups of wine),
this dispute—goeth.

Drink wine ; for the new bride of the sward hath found
beauty's limit (is peafect in beauty).
Of the trade of the broker, the work of this tale—goeth.

Sugar-shattering (verse of Hāfiz devouring), have become
all the parrots (poets) of Hindustān,
On account of this Farsī candy (sweet Persian ode)
that to Bangal—goeth.

In the path of verse, behold the travelling of place and
of time !
This child (ode) of one night, the path of (travel of)
one year (to Bengal)—goeth.

That eye of sorcery (of the beloved) 'Ābid fascinating behold:
How, in its rear, the Kārvān of sorcery—goeth.

Sweat expressed, the beloved proudly moveth ; and on
the face of the white rose,

The sweat (drops) of night dew from shame of his
(the beloved's) face—goeth.

From the path, go not to the world's blandishments.
For this old woman
Sitteth a cheat ; and a bawd, She—goeth.

Be not like Sāmirī, who beheld gold ; and, from assishness,
Let go Mūsā ; and, in pursuit of the (golden) calf,—goeth.

From the king's garden, the spring-wind bloweth :
And within the tulip's bowl, wine from dew—goeth.

Of love for the assembly of the Sulṭān Ghiyāṣu-d-Dīn,
Hāfiẓ !
Be not silent. For, from lamenting, thy work—goeth."

(Dīvān-i-Hāfiẓ, translated by H. W. Clarke,
1891, Vol. I, pp. 310-311)

এপর্যন্ত আবিষ্কৃত 'দিওয়ান-ই-হাফিজে'র অসংখ্য পুঁথিতে এই গজলটি পাওয়া গিয়েছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জা মুহম্মদ কজবীনী এবং ডঃ কাসিম গনী 'দিওয়ান-ই-হাফিজে'র যে শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে তাঁরা বিপুল পরিশ্রম করে নানারকম প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করে হাফিজের নামে প্রচলিত গানগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি তাঁর স্বরচিত, তা নির্ণয় করেছেন ; আলোচ্য গজলটিকে তাঁরা হাফিজের নিজের রচনা বলেই স্বীকার করেছেন (Fifty poems of Hafiz, edited by Arthur J. Arberry, Cambridge, 1953, pp. 10-11, 104-105, 160-161 দ্রষ্টব্য)। এই গজলটি হাফিজের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম এবং Fifty poems of Hafiz প্রভৃতি সংকলনগ্রন্থে এটি স্থান পেয়েছে। যাহোক্ হাফিজের নিজের লেখা এই গজলটিতে বলা হয়েছে যে পদটি বাংলাদেশে যাচ্ছে এক বছরের পথ অতিক্রম করে (সেসময় ইরাণ থেকে বাংলাদেশে আসতে এক বছরই সময় লাগত) ; সুলতান গিয়াসুদ্দীনের নামও হাফিজ এই গজলে প্রীতির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হাফিজ কর্তৃক বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে গজল লিখে পাঠানো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। *

* কোন কোন আধুনিক গবেষকের মতে হাফিজের এই গজলে উল্লিখিত সুলতান গিয়াসুদ্দীন আসলে বাহ্‌মনী রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ। কিন্তু বাহ্‌মনীর সুলতান মুহম্মদ

এই ঘটনা থেকে যেমন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কাব্যামোদিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেম্নি আবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশের একাংশে তাঁর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার কথাও প্রমাণিত হয়। কারণ, সিকন্দর শাহের ৭৯২ হিজরা অবধি তারিখের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হাফিজ যে ৭৯১ হিজরা বা ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, তা তাঁর সমাধি-ফলকের লিপি এবং তাঁর বন্ধু মুহম্মদ গুলন্ধমের লেখা 'দিওয়ান-ই-হাফিজে'র ভূমিকা থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায়। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সিকন্দর শাহের জীবদ্দশাতেই গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বাংলাদেশের একাংশে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করছিলেন এবং এই সময় তিনি নিজেকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই সময়েই কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং হাফিজ তাকে গজল লিখে পাঠান। কোন্ বছরে এই ঘটনা ঘটেছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না ; কোন কোন গবেষকের মতে গিয়াসুদ্দীন ৭৯০ হিজরা বা ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ; এই মত ঠিক হলে বলতে হবে, স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করার অব্যবহিত পরেই গিয়াসুদ্দীন হাফিজকে চিঠি লেখেন এবং গিয়াসুদ্দীনকে গজল পাঠানোর অব্যবহিত পরেই হাফিজের মৃত্যু হয়। অবশ্য গিয়াসুদ্দীন ৭৯০ হিজরার আগেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বলে মনে হয়। সিকন্দর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, 'রিয়াজ'-এর ও বুকাননের বিবরণীর এই উক্তির

(ফিরিশ্তায় "মাহ্মুদ" নামে উল্লিখিত) শাহের সঙ্গে হাফিজের যোগাযোগের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি কাহিনী 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা'য় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে আলোচ্য ব্যাপারের কোন উল্লেখ নেই ; আর এই সুলতানের নাম 'গিয়াসুদ্দীন' ছিল না। গিয়াসুদ্দীন শাহ নামেও বাহ্মনী রাজ্যে একজন সুলতান ছিলেন, কিন্তু তিনি হাফিজের মৃত্যুর আট বছর পরে—৭৯৯ হিজরায় মাত্র মাস দেড়েকের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন (**J. B. O. R. S., 1641, pp. 455-469** দ্রষ্টব্য)। আবার কোন কোন গবেষকের মতে হাফিজের গজলে উল্লিখিত গিয়াসুদ্দীন হীরাটের রাজপুত্র গিয়াসুদ্দীন পীর আলী, কিন্তু হাফিজ স্পষ্ট বলেছেন তাঁর এই গজল এক বছরের পথ অতিক্রম করছে ; স্বল্পদূরবর্তী হীরাটে গজলটি প্রেরিত হলে তিনি একথা লিখতেন না। এই দুদল গবেষকের মধ্যে কেউই লক্ষ্য করেননি যে—হাফিজ গজলটিতে বলেছেন যে এটি বাংলা দেশে যাচ্ছে এবং 'আইন-ই-আকবরী'র মত প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে যে হাফিজ বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে এই গান পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এঁদের এই সমস্ত স্বকপোলকল্পিত মত একেবারেই মূল্যহীন।

পিছনে অন্য কোন প্রমাণ না থাকলেও এই ব্যাপার খুবই সম্ভাব্য। ৭৯২ অথবা ৭৯৩ হিজরায় সিকন্দরের মৃত্যু ঘটে এবং গিয়াসুদ্দীন সারা বাংলার অধীশ্বর হন। 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে যে সিংহাসনে আরোহণ করার পর "প্রথমে তিনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভায়েদের চোখ অন্ধ করে তাদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজেকে ভায়েদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করলেন।" কিন্তু বুকাননের বিবরণীর মতে গিয়াসুদ্দীন ভাইদের অন্ধ করেননি, বধ করেছিলেন ; এতে লেখা আছে, **"Ghyashudin, on succeeding to the government, put seventeen brothers to death."**

'রিয়াজ'-এর মতে রাজা হয়ে বসবার পরে গিয়াসুদ্দীন ন্যায়বিচার করতে থাকেন। এই বইয়ের মতে গিয়াসুদ্দীন সুশাসক ছিলেন এবং ঐস্লামিক আইনের বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে 'রিয়াজ'এ একটি কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। কাহিনীটি সর্বজনপরিচিত। কিন্তু অনেকে এটিকে খানিকটা বিকৃত রূপ দিয়ে তাঁদের বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' থেকে কাহিনীটি হুবহু অনুবাদ করে দিলাম,

"একদিন তীর ছোঁড়বার সময় সুলতানের তীর আকস্মিকভাবে এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা করে। কাজি চিন্তিত হলেন। কারণ তিনি যদি রাজার প্রতি পক্ষপাত দেখান, তাহলে ভগবানের বিচারশালায় তিনি অপরাধী বলে গণ্য হবেন। আর যদি তা না দেখান, তাহলে রাজাকে বিচারালয়ে আহ্বান করা কঠিন কাজ হবে। অনেক বিচার-বিবেচনার পরে রাজার কাছে সমন জারী করার জন্য তিনি একজন পেয়াদা পাঠালেন এবং নিজে আদালতে বিচারকের মসনদে বসলেন, মসনদের তলায় একটি বেত রেখে দিয়ে। প্রাসাদে পৌঁছে কাজীর পেয়াদা দেখল রাজার কাছে যাওয়া অসম্ভব, সে তখন চীৎকার করে আজান দিতে সুরু করল। রাজা অসময়ে এই আজানধ্বনি শুনে মুঅজ্জিনকে (যে আজান দেয়) তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। যখন রাজার ভৃত্যেরা ঐ পেয়াদাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল, রাজা তাকে অসময়ে আজান দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, 'কাজী সিরাজুদ্দীন আমাকে পাঠিয়েছেন, রাজাকে বিচারালয়ে নিয়ে যাবার জন্য। রাজার কাছে আসতে পারা কঠিন বলে আমি (এখানে) প্রবেশ লাভের জন্য এই উপায় অবলম্বন

করেছি। এখন উঠুন এবং বিচারালয়ে চলুন। আপনি যে বিধবার ছেলেকে তীর মেরে আহত করেছেন, সে'ই অভিযোগ করেছে।' সুলতান তক্ষণি উঠলেন এবং বগলের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরোলেন। যখন সুলতান কাজীর সামনে উপস্থিত হলেন, কাজী তাঁকে কিছুমাত্র খাতির না করে বললেন, 'এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের হৃদয়কে শান্ত করুন।' রাজার পক্ষে যা সম্ভব ছিল সেই উপায়ে (অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দিয়ে) বৃদ্ধাকে শান্ত করে রাজা বললেন, 'কাজী! এখন বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হয়েছে।" কাজী বৃদ্ধার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ক্ষতিপূরণ পেয়েছ এবং সন্তুষ্ট হয়েছ?' স্ত্রীলোকটি বলল, 'হ্যাঁ! আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।' তখন কাজী মহানন্দে উঠে দাঁড়ালেন এবং রাজাকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে মসনদে বসালেন। রাজা বগল থেকে তলোয়ার বার করে বললেন, 'কাজী! আমি পবিত্র আইনের বিধান পালনে বাধ্য বলে তোমার বিচারালয়ে এসেছি। আজ যদি আমি তোমাকে আইনের নির্দেশের প্রতি নিষ্ঠা থেকে একচুল বিচ্যুত হতে দেখতাম, তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেলতাম। ভগবানকে ধন্যবাদ, সমস্তই ঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে।' কাজীও মসনদের তলা থেকে তাঁর বেতখানা বার করে বললেন, "হুজুর! যদি আপনাকে আজ আমি পবিত্র আইনের বিধান সামান্যমাত্রও লঙ্ঘন করতে দেখতাম তাহলে, ভগবানের দোহাই, এই বেত দিয়ে আমি আপনার পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিতাম।" (অর্থাৎ, আসামী যদি আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, তাহলে তার প্রাপ্য শাস্তি বেত্রদণ্ড ; সুলতান আদালতের নির্দেশ না মানলে কাজী তাঁকেও সেই শাস্তি দিতেন ; অবশ্য, সুলতানকে বেত্রাঘাত করলে কাজীকে সুলতান হয়তো বধ করতেন ; কিন্তু কাজীর কাছে নিজের জীবনের চেয়েও আইনের মর্যাদা বড়।) এই বলে কাজী বললেন, "একটি বিপদ এসেছিল, কিন্তু ভালয় ভালয় শেষ হয়েছে।" রাজা খুশী হয়ে কাজীকে অনেক উপহার ও পারিতোষিক দিয়ে ফিরে এলেন।

এই চমৎকার গল্পটি 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই এটি কতদূর সত্য, তা বলার কোন উপায় নেই। তবে গল্পটি অত্যন্ত মধুর। এটি যদি সত্য হয়, তাহলে এরকম ঘটনা আমাদের দেশে অতীতকালে ঘটেছিল বলে আমরা গর্বিত হতে পারি। কাজী সিরাজুদ্দীনের মত বিচারক যে কোন দেশেরই গৌরব। সুলতান গিয়াসুদ্দীনেরও ন্যায়নিষ্ঠা এই গল্পটিতে অতুলনীয় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। বিহারের দরবেশ মুজঃফর

শামস বলখি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছিলেন, তাদের অনেকগুলি থেকে জানা যায় যে গিয়াসুদ্দীন সত্যই ন্যায়নিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আলোচ্য গল্পটিতে গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র যে ভাবে ফুটেছে, সেইটিই তাঁর আসল রূপ বলে মনে করতে ইচ্ছা যায়।

পিতামহ ইলিয়াস শাহ ও পিতা সিকন্দর শাহের মত গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও মুসলিম সন্তদের অত্যন্ত ভক্তি করতেন। পূর্বোক্ত আলা অল-হকের পুত্র নূর কুৎব্ আলম গিয়াসুদ্দীনের সমসাময়িক ছিলেন। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "রাজার (গিয়াসুদ্দীন) প্রথম থেকেই সন্ত নূর কুৎব উল-আলমের উপর বিরাট আস্থা ছিল; তিনি তাঁর সমসাময়িক এবং সহপাঠী ছিলেন; দুজনেই শেখ হামিদুদ্দীন কুন্‌জ্‌নশীন নগোরীর আছে শিক্ষালাভ করেছিলেন।" বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, **"The most holy man at his court was Mukdum Shah Nur Kotub Alum, son of Alalhuk."** এই কথা সত্য হলে বলতে হবে, গিয়াসুদ্দীনের সভায় অনেক দরবেশ উপস্থিত থাকতেন এবং নূর কুৎব্ আলম ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতম।

নূর কুৎব্ আলমের শিষ্য শেখ হুসামুদ্দীন মাণিকপুরীর বাণী ও উপদেশের সংগ্রহ-গ্রন্থ 'রফীক অল-আরেফীন' থেকে জানা যায় যে নূর কুৎব্ আলম ও গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; গিয়াসুদ্দীন প্রায়ই নূর কুৎব্ আলমের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ চাইতেন। 'রফীক অল-আরেফীন'-এ লেখা আছে, একদিন সুলতান গিয়াসুদ্দীন কুৎব্ আলমকে প্রশ্ন করেন যে 'হাদিস্'-এ বলা হয়েছে, আচারনিষ্ঠাপালনকারী এবং আচার-নিষ্ঠা-বর্জনকারী দুই ধরণের লোকই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অভিশপ্ত বলে গণ্য হতে পারে; এই উক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে স্ববিরোধ দেখা যায়, তা নিরসনের উপায় কী? এর উত্তরে নূর কুৎব্ আলম বলেন যে প্রথমটি রাজা ও অমাত্যদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, অর্থাৎ তারা নিজেদের কর্তব্য-কর্মে অবহেলা করে আচারনিষ্ঠা নিয়ে পড়ে থাকলে ঈশ্বরের অভিশাপ লাভ করবে; আর দ্বিতীয়টি দরবেশদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য অর্থাৎ তারা আচারনিষ্ঠা বর্জন করলে ঈশ্বরের কাছে অভিশপ্ত হবে; ঈশ্বরসৃষ্ট প্রাণীদের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং ন্যায়বিচার করা রাজা ও অমাত্যদের প্রাথমিক কর্তব্য, অন্য কোন কাজে নিয়োজিত থাকার জন্যে যদি সেই কর্তব্যে বাধা পড়ে, তবে তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 'রফীক অল-

আরেফীন'-এর আর এক জায়গায় শিষ্যদের প্রতি শেখ হসামুদ্দীন মাণিকপুরীর এই উক্তিটি দেখতে পাওয়া যায়, "একদিন বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন হজরৎ কুৎব্ আলমের কাছে এক বারকোষ-ভর্তি খাবার পাঠান; কুৎব্ আলম তা নিজের হাতে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। ঐহিক জগতের রাজার প্রতি ধর্মজগতের রাজার এই ব্যবহার আমার কাছে অদ্ভুত লাগল; পরের দিন হজরৎ কুৎব্ আলম আমাকে 'মসাবিহ্' আনতে বললেন, আমার তখন হঠাৎ মনে হল আমি তাঁর অসন্তোষ উদ্রেক করেছি। হজরৎ কুৎব্ আলম ঐ বইয়ের পাতা খুলে রসূলের 'যে তার নেতাকে শ্রদ্ধা করে, সে তাঁকেই শ্রদ্ধা করে…' এই উক্তিটি পড়লেন; তারপর তিনি বললেন, 'আমরা রাজা এবং রাজ-পুরুষদেরও শ্রদ্ধা করি, যাতে আমাদের সন্তানেরা আমাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করে।' (এই পৃষ্ঠায় ও ৬৫/১ পৃষ্ঠায় 'রফীক অল-আরেফীন'-এর যে সমস্ত উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলির জন্য **Current Studies, No. 1, May 1953, pp. 4-11**-তে প্রকাশিত অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারির প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

আগেই আমরা বলেছি, দরবেশদের প্রাচীন জীবনীগ্রন্থ 'অখবার অল-আখিয়ার'-এ লেখা আছে যে নূর কুৎব্ আলমের ভ্রাতা আজম খান সুলতানের উজীর ছিলেন। কথিত আছে আজম খান নূর কুৎব্ আলমকে রাজদরবারে একটি উচ্চ পদ দিতে চান, কিন্তু নূর কুৎব্ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আর একজন দরবেশকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বিশেষ ভক্তি করতেন। তাঁর নাম মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খি। এঁর নিবাস ছিল বিহারে। ইনি শুধু দরবেশ ছিলেন না, একজন মস্ত বড় পণ্ডিতও ছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে ইনি অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে বারোটি চিঠি অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন এবং **Correspondence of the two 14th century Sufi Saints of Bihar with the contemporary sovereigns of Delhi and Bengal** প্রবন্ধে তাদের পরিচয় দিয়েছেন (**Proceedings of the Nineteenth session of Indian History Congress, 1956, pp. 206-224** দ্রষ্টব্য। অতঃপর বিভিন্ন চিঠির উল্লেখের সময় আমরা এই **Proceedings**-এর পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করব।) এই চিঠিগুলির প্রত্যেকটিতেই মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে, ইস্‌লামের বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে, কোরাণের শিক্ষা

গ্রহণ করতে, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রার্থনা ও অন্যান্যভাবে ভগবদ্‌ভক্তি প্রকাশ করতে, রাজার কর্তব্য পালন করতে এবং ন্যায়বিচার করতে উপদেশ দিয়েছেন, সেই সঙ্গে এই সব কাজের পন্থা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। একটি চিঠিতে (p. 214) তিনি লিখেছেন, "বন্ধু! ধর্মের বিধানগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং তাঁরই কাছে আশ্রয় গ্রহণ কর। যে সমস্ত প্রার্থনা করা দরকার এবং এই চিঠিতে আমি যে সব প্রার্থনার কথা লিখেছি, তা করতে হবে।" আর একটি চিঠিতে (p. 222) তিনি লিখেছেন, "রাজার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা উত্তরোত্তর বেশীভাবে করা উচিত, 'ভগবান! আমার হৃদয় এবং জিহ্বাকে ঠিক রাখবার শক্তি দাও এবং আমাকে দিয়ে মুসলমানদের কাজ ঠিকভাবে করাও ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত কর।' এই চিঠিতে বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে ৪০ দিন ধরে যাবতীয় পাপ থেকে বিরত থাকতে এবং ঈশ্বরের দয়া ভিক্ষা করতে উপদেশ দিয়েছেন। এছাড়া এই দরবেশ একাধিক চিঠিতে গিয়াসুদ্দীনকে হজরৎ মুহম্মদের এই বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এক মুহূর্তের ন্যায়বিচার ৬০ বছরের প্রার্থনা ও ভক্তি-প্রকাশের চেয়েও উৎকৃষ্ট। তিনি তাঁর বিভিন্ন চিঠিতে গিয়াসুদ্দীনকে এই রকম বহু উপদেশ দিয়েছেন। সবচেয়ে বেশী উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শেষ চিঠিতে। এটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং পুঁথির ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা হয়েছে। বল্‌খি চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে মক্কায় চলে যাবার আগে এই চিঠিটি লেখেন বলে এর মধ্যে তিনি গিয়াসুদ্দীনকে এত উপদেশ দিয়েছেন।

এই চিঠিগুলি থেকে গিয়াসুদ্দীন ও তাঁর পিতা সিকন্দর শাহ সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পাই। চিঠিগুলি গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র সম্বন্ধে যে আলোকপাত করেছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি চিঠিতে (p. 213) মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে "আমার সমৃদ্ধিশালী পুত্র" বলে সম্বোধন করেছেন এবং ফিরোজ শাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর দিল্লীতে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন। এই চিঠিতেই বল্‌খি লিখেছেন যে শেখ-উল্‌ ইস্‌লাম শরফুল্‌ হক্‌ ওয়াদ্দীন (বিহারের আর বিখ্যাত দরবেশ, ইনি শরফুদ্দীন য়াহিআ মনেরি নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন) বাংলাদেশকে খুব ভালবাসতেন এবং যৌবনে তিনি বাংলাদেশে বাস করেছিলেন; তিনি "শহীদ সুলতানে"র (অর্থাৎ সিকন্দর শাহ) উপর অত্যন্ত প্রসন্ন ও সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে তিনি প্রায়ই স্বেচ্ছায় ও সানন্দে চিঠি লিখতেন। এই চিঠিতেই মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে

লিখেছেন, "তুমি রাজা এবং যুবক। অতীতে কিছুকাল তুমি সুখ এবং আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন ছিলে, কিন্তু এখন তুমি পবিত্র ও ধর্মনিষ্ঠ জীবন কামনা করছ।" গিয়াসুদ্দীন একবার কোন একটি যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খি এই সময় গিয়াসুদ্দীনকে লেখেন (p.216), "তোমার শত্রুরা পরাজিত, বিপর্যস্ত এবং অমর্যাদা-লিপ্ত হোক্।" আর একটি চিঠিতে (p. 217) তিনি লেখেন, "আমি তুচ্ছ লোক। রাজার সেবা করার মত কিছুই আমার নেই, দুটি সুসজ্জিত ঘোড়া পর্যন্ত নেই, থাকলে আমি রাজার জন্যে যুদ্ধ করতে পারতাম।"

কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায় যে মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খি যখন শেষবার মক্কায় যান, তখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে যাত্রা করেন। কিন্তু তার আগে তাঁকে দীর্ঘ দু'বছর গিয়াসুদ্দীনের রাজ্যে কাটাতে হয়। বল্‌খি এই সময় অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর চুল পেকে গিয়েছিল, দাঁত শিথিল হয়ে গিয়েছিল। এর কয়েক বছর বাদে—৮০৩ হিজরায় তিনি এডেনে পরলোক গমন করেন। তাঁর সন্তানও ছিল না, অর্থ বা শক্তিও ছিল না। মক্কায় গিয়ে দেহত্যাগ করা ও সেখানে কবরস্থ হওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। গিয়াসুদ্দীন তাঁকে যে সমস্ত মূল্যবান উপহার শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ দিয়েছিলেন, তার অধিকাংশই তিনি অন্য লোকদের দান করেন এবং অবশিষ্ট অংশ পথ-খরচার জন্য রেখে দেন। গাঙ্গুরা নামক জায়গায় বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এরপর চট্টগ্রামে থাকার সময় বল্‌খি শহরের বাইরে একটি আলাদা এবং বাতাসভরা বেওয়ারিশ বাড়ীতে বাস করেছিলেন। চট্টগ্রামে তিনি মাসাধিককাল ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে বল্‌খি সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে একটি চিঠি (p. 218) লিখে চট্টগ্রামের কারকুনদের কাছে এক ফরমান পাঠাতে অনুরোধ জানান, যাতে তারা প্রথম জাহাজেই মক্কাযাত্রী দরবেশদের স্থান করে দেয়। এর থেকে বোঝা যায়, চট্টগ্রাম ঐ সময় গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্ভবত গিয়াসুদ্দীন বল্‌খিকে একাধিক ফরমান পাঠিয়েছিলেন। একটি ফরমানের সঙ্গে তিনি বল্‌খির কাছে একটি পোষাক পাঠিয়েছিলেন, বল্‌খি সেটি পরিধান করে সুলতানের জন্য ঈশ্বরের কাছে দু'বার হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানান। আর একটি ফরমানের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন একটি গজল পাঠিয়েছিলেন, তাতে বল্‌খির বিচ্ছেদে গিয়াসুদ্দীনের মনোবেদনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছিল। বল্‌খি এটি পড়ে বিহ্বল হন এবং সুলতানকে লেখেন, "আমার হাতে কার্যের কর্তৃত্ব থাকলে আমি রাজার (গিয়াসুদ্দীনের) এলাকা

ছেড়ে চলে যেতাম না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছার কাছে মানুষের ইচ্ছা হার মানে। গজলের প্রত্যেকটি শব্দ এক একটি শর।" (p. 221) কাব্যামোদী সুলতান গিয়াসুদ্দীন যে নিজেও কবি ছিলেন ও গজল লিখতেন, সে কথা 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' পাওয়া যায়, এখন এই সমসাময়িক চিঠি থেকে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল। এই চিঠিতেই মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে লিখছেন, "আমার মতে পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের মধ্যে তুমিই ভগবানের এই সমস্ত আশীর্বাদ (ভগবদ্ভক্তি, কবিত্বশক্তি প্রভৃতি) লাভ করেছ, কারণ তুমি অনেক ভালবাসা পেয়েছ এবং জনপ্রিয় হয়েছ। কোন কোন লোক (রাজা) তাদের রাজ্যের জন্য গর্ববোধ করে। বিধর্মীরা যেমন রাজ্য পায় তারা ঠিক্ তেমনিভাবেই রাজ্য পেয়েছে। কিন্তু তোমার যেরকম বিদ্যা, মহত্ত্ব, উদারতা, নির্ভীক হৃদয় এবং সিংহের মত সাহস প্রভৃতি গুণ আছে, তাদের তা নেই।" গিয়াসুদ্দীন সম্বন্ধে মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খির এই প্রশংসোক্তি খুব মূল্যবান। কারণ বল্‌খি চাটুকার ছিলেন না। তিনি অর্থ বা সম্মান কোন কিছুই চাইতেন না। সুলতান অযাচিতভাবে তাঁকে অর্থ বা উপহার দিলে তিনি তক্ষণি তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। যে সমস্ত উলেমা রাজাদের সভায় যেতেন, তিনি তাঁদের নিন্দা করতেন তাঁরা তাঁদের বিদ্যার অমর্যাদা করেছেন বলে। সুতরাং বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনের চরিত্র সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কথা যে সত্য, তা গিয়াসুদ্দীনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকেও প্রমাণিত হয়।

একবার গিয়াসুদ্দীন বল্‌খিকে একটি ফরমান পাঠান এবং সেই সঙ্গে অনুরোধ জানান, তিনি যেন তাঁর রাজ্যে আরও কিছুকাল থাকেন। এতে বল্‌খি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে লেখেন, "বন্ধু! যখন আমি যাত্রা সুরু করেছি, কী করে তার পরিবর্তন করতে পারি? ... ... (আর) অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নয় এবং তা আমার অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। ... ... দেরী করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমি রসূলকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি তিনবার আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ... ... অতএব আমি আমার অনুবর্তী এবং আশ্রিত লোকদের নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুমি যদি ফকীরদের যাত্রার দেরী করিয়ে তাদের মন না ভেঙে দিয়ে তাদের হৃদয় বুঝে তার তৃপ্তিবিধান করতে পারতে, তাহলেই ভাল হত। (pp. 218-219)

আর একটি ফরমান পেয়ে খুশী হয়ে বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লেখেন, "রাজকীয়

ফরমানটি নানারকম জ্ঞানের মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ। তার সঙ্গে এই চতুষ্ক শ্লোকটি (quatrain) আছে, 'যদি তুমি আধ্যাত্মিক কামনার মদে মাতাল হয়ে থাক, যদি তুমি স্বর্গীয় প্রেমে চিরমত্ত হয়ে থাক, এই ভিখারীর পাত্রে তার একটি ফোঁটা ফেলে দাও।' ... ... যদিও আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম, এই শ্লোকটি আমার মনে মহা উল্লাস জাগিয়ে তুলল।" (p. 221) এই চিঠিটি থেকে গিয়াসুদ্দীনের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বল্‌খি এই চিঠিতে লিখছেন যে গিয়াসুদ্দীন তাঁকে যে আলখাল্লা ও পাগড়ী পাঠিয়েছেন, তা তিনি পরিধান করেছেন এবং তার বিনিময়ে তিনি তাঁকে একটি আয়না উপহার দিচ্ছেন ; যে শেখের তিনি সেবা করেছিলেন, তিনি এই আয়নায় মুখ দেখতেন বলে বল্‌খি এই আয়নাটিকে তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে যত্নে রক্ষা করেছিলেন ; এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কেউ বল্‌খিকে কিছু দান করলে তিনি তাঁর সাধ্যমত প্রতিদান দেবার চেষ্টা করতেন। সর্বশেষ চিঠিতে বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লেখেন যে তিনি চিরদিনের মত চলে যাচ্ছেন বলে এই চিঠিতে তাঁকে ধর্ম সম্বন্ধে এত উপদেশ দিয়েছেন। আসন্ন যাত্রা সম্বন্ধে মানসিক উদ্বেগ থাকার দরুণ তিনি তাঁর বক্তব্যকে গুছিয়ে লিখতে পারেন নি, গিয়াসুদ্দীন তাঁর "মার্জিত রুচি"র দ্বারা এগুলিকে নিশ্চয়ই সাজিয়ে নিতে সমর্থ হবেন। (p. 222)

কিন্তু ঈশ্বরগতপ্রাণ, সর্বত্যাগী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি বিধর্মীদের উপর একেবারেই সদয় ছিলেন না। বিভিন্ন চিঠিতে তিনি বিধর্মীদের তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন এবং গিয়াসুদ্দীনের মনে বিধর্মীদের প্রতি বিরাগ বর্ধিত করবার চেষ্টা করেছেন। একটি চিঠিতে (pp. 215-216) তিনি গিয়াসুদ্দীনকে লিখেছেন যে বিধর্মীদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা ও মুসলমানদের উপরে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া উচিত নয়। পরে আমরা এই সম্বন্ধে আমরা আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি।

যাহোক্, মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খির এই সমস্ত চিঠি পড়ে মনে হয়, 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' গিয়াসুদ্দীনের ন্যায়পরায়ণতা ও কাজীর আদালতে আসামী হিসাবে দাঁড়ানো সম্বন্ধে যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা সত্য হওয়া খুবই সম্ভব। কারণ ঐ কাহিনীটিতে দেখি গিয়াসুদ্দীন কাজীকে বলছেন যে পবিত্র আইনের (শরিয়ৎ) বিধান পালনে বাধ্য হওয়ার জন্যই তিনি তাঁর আদালতে এসেছেন। বল্‌খির চিঠিগুলিতেও দেখি বল্‌খি বারবার গিয়াসুদ্দীনকে শরিয়তের

বিধান পালন করতে ও ন্যায়পরায়ণ হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। গিয়াসুদ্দীন যে ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং বল্‌খিকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, তা বল্‌খির চিঠি পড়েই বোঝা যায়। সেইজন্য তিনি সত্যই শরিয়তের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন বলে মনে হয়। কাজেই তাঁর পক্ষে শরিয়তের বিধান অনুসারে কাজীর বিচারালয়ে আসামী হিসাবে উপস্থিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খির পূর্বোদ্ধৃত একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ প্রথমজীবনে সুখ এবং আমোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু পরে ধর্মগতপ্রাণ হয়ে ওঠেন। মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি, নূর কুৎব্‌ আলম প্রভৃতি দরবেশদের প্রভাবে তাঁর ধর্মনিষ্ঠা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং এই ধর্মনিষ্ঠারই ফলে গিয়াসুদ্দীন বহু অর্থ ব্যয় করে মক্কা ও মদিনায় দুটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর আরবী পণ্ডিত আব্দ্‌ অল-রহমান অল-সখাওয়ী (জন্ম—কায়রোতে ৮৩০ হিজরা বা ১৪২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু—মদিনাতে ৯০২ হিজরা বা ১৪৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর 'অল্‌-জও অল্‌ লামে লে-অহ্‌ল্‌ অল্‌-করন্‌ অল্‌-তাসে' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (কায়রো থেকে প্রকাশিত সংস্করণ, ১৩০৩ হিজরা, পৃঃ ৩১৩) এই তথ্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন। অল-সখাওয়ী গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সামান্য পরবর্তী, তিনি মক্কা ও মদিনায় গিয়েছেন এবং মদিনাতে পরলোকগমন করেছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁর কথা সম্পূর্ণ প্রামাণ্য। অল-সখাওয়ী লিখেছেন, "শামসুদ্দীনের পুত্র ইস্‌কান্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আবুল মুজঃফর আজম শাহ অল-সিজিস্তানী ভারতবর্ষের অন্তর্গত বাংলাদেশের শাসক ছিলেন। তিনি হানাফী ছিলেন; বিদ্যা ও সম্পদে তিনি ছিলেন ধন্য, তত্ত্ববিদ ও ধার্মিক লোকেরা তাঁকে ভালবাসতেন: তিনি সাহসী, উদার এবং দানশীল ছিলেন। তিনি মক্কার উম্মে হানী ফটকে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন; এই মাদ্রাসা এবং এর সম্পত্তির (endowment) জন্য তিনি বারো হাজার মিশরী মিথ্‌কল খরচ করেন এবং এতে বক্তৃতা প্রবর্তন করান। চারটি মধ্‌হবের (হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হানবালী) লোকের জন্যই এই বক্তৃতা। ১৪ (৮১৪—কারণ ৮১৩ হিজরায় গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ পরলোক-গমন করেছিলেন) সালের (হিজরার) জমাদী অস্‌-সানী মাসে এই বক্তৃতা সমাপ্ত হয়। এইরকম, তিনি (গিয়াসুদ্দীন) রসূলের শহরে (মদিনায়) "শান্তির ফটকে'র কাছে 'পুরোনো কেল্লা' নামক স্থানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকবার হরময়নের (অর্থাৎ মক্কা ও মদিনা) লোকেদের মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন।"

গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামী নামে একজন পরবর্তী লেখক তাঁর 'খজানাহ্-ই-আমিরাহ্' বইয়ে এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত সংবাদ দিয়েছেন। বিলগ্রামী কাজী কুৎবুদ্দীন হানাফীর লেখা 'তারিখ-ই-মক্কা' নামক বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি নিজে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, সরাই, খাল প্রভৃতি দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। বিলগ্রামী লিখেছেন, "বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর ব্যক্তিগত ভৃত্য য়াকুৎ অনানী মারফৎ মক্কা ও মদিনায় এক বিরাট পরিমাণ অর্থ পাঠান ঐ দুই পবিত্র স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে তা বণ্টন করবার জন্য এবং পবিত্র মক্কা শহরে তাঁর নামে একটি মাদ্রাসা ও একটি সরাই স্থাপন করবার জন্য। তিনি (য়াকুৎ অনানী) ওয়াকৃফ্ তৈরী করার জন্য জমি কিন্‌লেন এবং শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য অর্থব্যয় করলেন। মক্কার শরীফ মৌলানা হাসান বিন অজলানের কাছে তিনি একটি চিঠি লিখলেন এবং তাঁকে মূল্যবান সব উপহার পাঠালেন। শরীফ তা গ্রহণ করে সুলতানের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার আদেশ জারী করলেন। শরীফ তাঁর পারিবারিক প্রথা অনুসারে (প্রেরিত অর্থের) এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করলেন এবং অবশিষ্টাংশ পবিত্র শহর দুটির বিদ্বান ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হল। এত অর্থ প্রেরিত হয়েছিল যে দুই পবিত্র স্থানের প্রত্যেক লোকেই তার অংশ পেল। য়াকুৎ 'বাব-ই-উম্মেহানী' নামক স্থানের কাছে মাদ্রাসা ও সরাই নির্মাণের জন্য দুটি বাড়ী কিনলেন। বাড়ী দুটি ভেঙে ফেলে (তাদের জায়গায়) মাদ্রাসা ও সরাই নির্মাণ করা হল। দুই আসীল চার রহ্‌বা জমি কেনা হল মাদ্রাসার সম্পত্তি হিসাবে। তিনি (য়াকুৎ) চারটি মধ্‌হবের চার জন শিক্ষককে নিযুক্ত করলেন এবং ষাট জন ছাত্র সংগৃহীত হল। এর খরচ (মাদ্রাসার) সম্পত্তির আয় থেকে নির্বাহ হবার ব্যবস্থা করা হল। তিনি মাদ্রাসার সামনে পাঁচশো স্বর্ণ-মিথ্‌কল দিয়ে আর একটি বাড়ী কিনলেন এবং এটিকে সরাইয়ের সম্পত্তি করে দিলেন। যে জমির উপর মাদ্রাসা ও সরাই তৈরী হয়েছিল, তার এবং দুই আসীল চার রহ্‌বা জমির জন্য মৌলানা হাসান বারো হাজার স্বর্ণ-মিথ্‌কল নিলেন। এ ছাড়াও তিনি এক বিরাট পরিমাণ অর্থ নিলেন, কত তা কেউ বলতে পারে না। সুলতান গিয়াসুদ্দীন আরাফাহ নামক স্থানে একটি খাল খনন করবার জন্য

পূর্বোক্ত য়াকুৎ মারফৎ অর্থ পাঠান। মৌলানা হাসান তা নিয়ে বললেন, 'এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরাই করব।'* ঐ অর্থের পরিমাণ ত্রিশ হাজার স্বর্ণ-মিথ্‌কল।"

[অল-সখাওয়ী এবং গোলাম আলী আজাদ বিলগ্রামীর বিবরণ **Social History of the Muslims in Bengal by Dr. Abdul Karim, pp. 47-50**তে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।]

বিদেশে দূত প্রেরণ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের একটি অভিনব ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। পারস্যের সিরাজে কবি হাফিজের কাছে এবং আরবের তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনায় তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন, তা আমরা দেখে এসেছি। অবশ্য সিরাজে তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাব্যামোদী মনের তাগিদে এবং মক্কা-মদিনায় দূত পাঠিয়েছিলেন ধর্ম-নিষ্ঠার তাগিদে। কিন্তু নিছক বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি দূত ও উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, এরকম দৃষ্টান্তও আমরা অন্তত দুটি পাই। প্রথমবার তিনি তা পাঠিয়েছিলেন ভারতবর্ষেরই আর একটি রাজ্যের শাসককে। এই সময়ে খওয়াজা-ই-জহান উপাধিধারী খোজা মালিক সারওয়ার স্বাধীন ও পরাক্রান্ত জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৯৬ হিজরার রজব মাসে (মে, ১৩৯৪ খ্রীঃ) তিনি দিল্লী থেকে জৌনপুরে যান এবং কনৌজ, করহ্‌, অযোধ্যা, সন্দীলহ্‌, দালমু, বহ্‌রাইচ, বিহার ও ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে তার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। প্রামাণিক গ্রন্থ 'তারিখ-ই-মুবারক শাহী'তে (**Eng. Translation, p. 165**) লেখা আছে, "জাজনগরের রায় এবং লখ্‌নৌতির অধিপতি, যাঁরা প্রতি বছর দিল্লীতে হাতী পাঠাতেন, তাঁরা এখন খওয়াজা-ই-জহানকে হাতী উপহার দিলেন।" বলা বাহুল্য, এই সময় লখ্‌নৌতি অর্থাৎ বাংলার অধিপতি ছিলেন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, জৌনপুর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ৪।৫ বছর আগেই তিনি রাজা হন এবং খওয়াজা-ই-জহানের মৃত্যুর ১০।১১ বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়। অতএব তিনিই খওয়াজা-ই-জহানকে হাতী পাঠিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই হাতী প্রেরণ বশ্যতা স্বীকারের নিদর্শন নয়, সমকক্ষ রাজা হিসাবে উপহার দান। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিক রচিত কোন গ্রন্থে গিয়াসুদ্দীনের এই একটিমাত্র কাজের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যে বিদেশী রাজার কাছে গিয়াসুদ্দীন দূত ও উপহার পাঠিয়ে-

---

* এই বিবরণ থেকে মৌলানা হাসানকে খুব সুবিধাজনক লোক বলে মনে হয় না।

ছিলেন, তিনি সুদূর চীনদেশের সম্রাট 'মিং' বংশীয় য়ং-লো (য়ুং-লো)। চীনদেশের বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে গিয়াসুদ্দীনের এই দূত প্রেরণের কথা জানা যায়।

'সি-য়ং-চও-কুং-তিয়েন-লু' ('শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু') নামে বইটিতে লেখা আছে,

"সম্রাট য়ং-লোর রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) (বাংলার) রাজা ন্‌গই-য়া-স্‌সে-তিং (গি-য়া-সু-দ্দীন) চীনদেশে ভেট সমেত এক দূত পাঠান।"

'শু-য়ু-চৌ-ৎসেউ-লু' ('শু-য়ু-চৌ-ৎজ্‌-লু') নামে বইটিতে লেখা আছে,

"য়ং-লো'র রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪০৫ খ্রীঃ) বাংলার রাজা ন্‌গই-য়া-স্‌সে-তিং চীনের রাজসভায় দূত পাঠান। (চীন) সম্রাটও বাংলার রাজা ও রাণীকে নানারকম রেশমী কাপড় উপহার পাঠাতে আদেশ দেন। য়ং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) ঐ দেশের (বাংলার) রাজা আবার দূত পাঠালেন। এই দূত ভেটসমেত তাই-ৎ-সাং বন্দরে এসে পৌঁছোলেন। (চীনের) সম্রাট তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে সেখানে পাঠালেন।

'মিং' রাজবংশের সরকারী ইতিহাসগ্রন্থ 'মিং-শে' ('মিং-শ্‌র্‌')তে এসম্বন্ধে লেখা আছে, "য়ং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) বাংলার রাজা উপহার সমেত চীনে একজন দূত পাঠান। চীনও প্রতিদানস্বরূপ অনেক উপহার পাঠায়। য়ং-লো'র রাজত্বের সপ্তম বর্ষে (১৪০৯ খ্রীঃ) তাঁদের (বাংলার) দূত ২৩০ জন রাজকর্মচারী সঙ্গে নিয়ে চীনে এসেছিলেন। (চীন) সম্রাট সেই সময় বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তিনি বাংলাদেশে অনেক উপহার পাঠালেন। এরপর থেকে তারা (বাংলার রাজদূতেরা) প্রতি বছরই (চীনে) আসত।"

এই সব চীনা গ্রন্থের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ চীন সম্রাটের কাছে প্রথমবার ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয়বার ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে ও তৃতীয়বার ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে দূত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রতি বছরই বাংলার দূতেরা চীনে যেত। চীন-সম্রাটও গিয়াসুদ্দীনকে নানারকম উপহার পাঠিয়েছিলেন। ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যু হয়। বাংলার দূতেরা ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে চীনে পৌঁছেছিল, একথা 'মিং-শে' থেকে জানা যায়। (এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৩-৮৯ দ্রষ্টব্য)।

এখানে একটি কথা বলবার আছে। ফিলিপ্‌স্‌ তাঁর এক প্রবন্ধে (**Journal of the Royal Asiatic Society, 1895, pp. 529-533** দ্রষ্টব্য) লিখেছিলেন যে চীন সম্রাট য়ং-লোই প্রথম বাংলাদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। ফিলিপ্‌সের মতে য়ং-লো তাঁর যে পূর্ববর্তী সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হয়েছিলেন, সেই হুই-তি সাগরপারের কোন দেশে লুকিয়ে আছেন ভেবে য়ং-লো বিভিন্ন দেশে দূত পাঠাতে সুরু করেন এবং এইভাবে বাংলাদেশেও দূত পাঠান। কিন্তু 'শু-য়ু-চৌ-ৎসেউ-লু'তে পরিষ্কার লেখা আছে যে বাংলার রাজা গিয়াসুদ্দীনই প্রথম ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন, তার পরে চীন-সম্রাট বাংলায় দূত পাঠান। পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে চীনে দূত প্রেরণ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের দূরদর্শিতা ও প্রগতিশীল মনের পরিচায়ক।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের যে সমস্ত কাযকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম, তাদের মধ্যে তাঁর কৃতিত্বই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু চাঁদের যেমন শুক্ল ও কৃষ্ণ দুটি পক্ষই থাকে, তেমনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কৃতিত্বের নিদর্শনের পাশে তাঁর ব্যর্থতারও বহু নিদর্শন দাঁড়িয়ে আছে। এখন এই দিক সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করব।

গিয়াসুদ্দীনের ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট হয়েছে যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে। যদিও তিনি নিজের পিতার সঙ্গে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন, তাহলেও এরই মধ্য দিয়ে তাঁর সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। কারণ, পিতার সঙ্গে অন্তত কয়েক বছরব্যাপী বিরোধের পর তিনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বিরোধের সময়টুকুতে দেশের সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর পিতা-পুত্রের যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষের যে ক্ষতি হয়েছিল, তাতে দেশের মোট সামরিক শক্তি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল সন্দেহ নেই।

সমগ্র বাংলার অধীশ্বর হবার পরেও গিয়াসুদ্দীন কয়েকবার বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং তারও ফল ভাল হয় নি। বুকাননের বিবরণীর মতে গিয়াসুদ্দীন সাহেব খাঁ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এই জাতীয় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও ক্রমাগত অসাফল্যের ফলে যে কোন রাজারই শক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য। বুকানন-বিবরণীর মতে দরবেশ নূর কুৎব্‌ আলম গিয়াসুদ্দীন ও সাহেব খাঁর মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। সন্ধির প্রস্তাব অনেকদূর এগিয়েছিল, এমন সময় গিয়াসুদ্দীন সাহেব খাঁকে হঠাৎ আক্রমণ করে পরাজিত করেন। (**"...Shah Nur Kotub**

Alam...attempted to make a peace with a Shaheb Khan, with whom Ghyashudin had been carrying on an unsuccessful war. While the treaty was going forward, Ghyashuddin seized on his adversary.") এ কথা সত্য হলে বলতে হবে, গিয়াসুদ্দীন বিশ্বাসঘাতকতা করে সাহেব খাঁকে পরাজিত করেছিলেন ; দীর্ঘকালব্যাপী ব্যর্থ সংগ্রামের পরে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা জয়লাভ করে গিয়াসুদ্দীন কোন রকমে তাঁর মান হয়তো বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু মোটের উপর তাঁর যে ক্ষতি হয়েছিল, এই জয়ে তা পূরণ হবার কথা নয়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন কামতা ও কামরূপ রাজ্যে অভিযান করেছিলেন। কুচবিহারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং গৌহাটিতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে মাটির নীচে পোঁতা মুদ্রাসমষ্টি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের সর্বাধুনিক মুদ্রা যথাক্রমে ৭৯৯ ও ৮০২ হিজরার এবং এগুলি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নামাঙ্কিত। এর থেকে মনে হয়, কামতা ও কামরূপ রাজ্যের কিয়দংশে অন্তত সাময়িকভাবে গিয়াসুদ্দীনের অধিকার স্থাপিত হয়েছিল। গৌহাটির যাদুঘরে বর্তমানে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের একটি শিলালিপি সংরক্ষিত আছে। মূলে এটি কোথায় ছিল, তা জানা যায় না। এটি যদি ঐ অঞ্চলেরই হয়, তাহলে কামরূপে গিয়াসুদ্দীনের অধিকার সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপে যে ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহের অধিকার ছিল, তা কামরূপের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ সিকন্দর শাহের ৭৫৯ হিজরার মুদ্রা থেকে বোঝা যায়। সিকন্দর শাহ ও গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের বিরোধের সময় সম্ভবত কামরূপ আবার সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, কারণ পরবর্তীকালে সেখানকার টাকশালে বাংলার সুলতানের আর কোন মুদ্রা উৎকীর্ণ হতে দেখি না। 'যোগিনীতন্ত্র' নামে একটি গ্রন্থে কামরূপে ১৩১৬ (?) (তারিখটি স্পষ্ট ভাবে পড়া যায় নি) শকাব্দে (= ১৩৯৪-৯৫ খ্রীঃ) মুসলমানদের আক্রমণের এবং দ্বাদশবর্ষব্যাপী আধিপত্যের অস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় (**Gait's Report on the progress of Historical Research in Assam, pp. 52-53** দ্রষ্টব্য)। কেউ কেউ মনে করেন এর দ্বারা কামরূপে বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আক্রমণ ও আধিপত্যের কথাই বোঝাচ্ছে, কারণ কামরূপের আশেপাশে সে সময় আর কোন মুসলিম রাজ্য ছিল না। যোগিনীতন্ত্রের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে মুসলমানেরা (যবন) কোচদের (কুবাচ)

সঙ্গে মিলিতভাবে কামরূপ শাসন করে, কিন্তু ১২ বছর যুক্ত শাসনের পর কোচদের সঙ্গে অহোমদের (সৌমর) সন্ধি স্থাপিত হয় এবং কামরূপে শান্তি ফিরে আসে। অবশ্য এই জাতীয় অর্বাচীন সূত্রের অস্পষ্ট উক্তি এবং তারিখের সন্দেহজনক পাঠের উপর নির্ভর করে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলে না। অসমীয়া বুরঞ্জীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে গিয়াসুদ্দীনের কাম্‌তা-রাজ্য জয়ের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কয়েকটি বুরঞ্জীতে লেখা আছে যে, অহোম্‌-রাজ সুদঙ্গফা (১৩৯৭-১৪০৭ খ্রীঃ) কামতা-রাজের উপরে অপ্রসন্ন হয়ে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, কারণ তাঁর স্ত্রীর গুপ্তপ্রণয়ী তাই-সুলাইকে কামতা-রাজ আশ্রয় দিয়েছিলেন। এইভাবে কামতা-রাজ্য একদিক থেকে অহোম্‌রাজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে বাংলার সুলতান সুযোগ বুঝে কামতা-রাজ্য আক্রমণ করেন। কামতা-রাজ তখন বিপদ দেখে অহোম্‌রাজের সঙ্গে তাঁর কন্যা ভাজনীর বিবাহ দিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করলেন এবং অহোম্‌-রাজ ও কাম্‌তা-রাজ তখন এক সঙ্গে বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁদের সৈন্যবাহিনী সমবেত করে রুখে দাঁড়ালেন। তার ফলে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে করতোয়া নদীর এপার পর্যন্ত গিয়েই ক্ষান্ত হতে হল (**The Delhi Sultanate, Bharatiya Vidya Bhavan, pp. 391-392** দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, এই সময়ে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহই বাংলার সুলতান ছিলেন।

এই সমস্ত বিবরণ পড়লে মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সামরিক অভিযানগুলির একটা বড় অংশই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং অনেক শক্তি ক্ষয়ের পর কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি মাত্র আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

সমসাময়িক কবি বিদ্যাপতির বিভিন্ন গ্রন্থ পড়লে মনে হয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। কারণ 'পুরুষপরীক্ষা'তে বিদ্যাপতি শিবসিংহ সম্বন্ধে বলেছেন, "যো গৌড়েশ্বর-গজ্জনেশ্বর রণক্ষৌণিষু লব্ধা যশো" এবং 'শৈবসর্বস্বসারে' শিবসিংহ সম্বন্ধে বলেছেন, "শৌর্যাবর্জিত গৌড়গজ্জনমহীপালোপনম্রীকৃতা"। 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহের রাজত্বকালে লেখা। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবসিংহের রাজত্ব শেষ হয় (বর্তমান গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩-২৭ দ্রষ্টব্য)। 'পুরুষপরীক্ষা' তার আগেই লেখা। শিবসিংহের সঙ্গে "গৌড়েশ্বর" বা "গৌড়মহীপালে"র যুদ্ধ তারও আগেকার ঘটনা। এদিকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ১৪১০-১১ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং শিবসিংহ কর্তৃক পরাজিত গৌড়েশ্বর গিয়াসুদ্দীন আজম

শাহ হবারই খুব বেশী সম্ভাবনা। কীভাবে, কখন ও কোথায় শিবসিংহের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যাচ্ছে না। নিজের পৃষ্ঠপোষক সম্বন্ধে বিদ্যাপতির এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য না অতিরঞ্জিত, তাও বোঝা যাচ্ছে না; তবে সত্য হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি শিবসিংহের কাছে যদি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ পরাজিত হয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে ঐ সময়ে তাঁর সামরিক শক্তি একেবারে দৈন্য-দশায় এসে পৌঁছেছিল। এর আগেকার দীর্ঘবিলম্বিত এবং অনেকাংশে ব্যর্থ সমর-প্রচেষ্টাগুলিই বোধহয় এর প্রধান কারণ।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ হিন্দুদের সম্বন্ধে যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন, তার সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা দরকার। আমাদের মনে হয়, তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি এই বিষয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তিনি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এখন আমরা সেই কথাতেই আসছি।

ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানেরা যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনকার্যের ব্যাপারে কেবলমাত্র মুসলমানদের উপরেই নির্ভর করতেন না, হিন্দুদেরও সাহায্য নিতেন। দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণকে প্রতিহত করে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ যে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন, এর পিছনে হিন্দুদের সাহায্য একটা বড় উপাদান জুগিয়েছিল। একডালার রণক্ষেত্রে ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে ইলিয়াস শাহের প্রধান সেনাপতিই ছিলেন হিন্দু সহদেব। অনুমান করতে পারি ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের রাজত্বকালেও হিন্দুদের প্রাধান্য হ্রাস পায় নি। সিকন্দরের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালের অন্তত প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে হিন্দুরা বহু উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিল, তা আমরা জানতে পারি গিয়াসুদ্দীনকে লেখা মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খির একটি চিঠি (Proceedings, Ind. Hist. Cong., 1956, pp. 215-216 দ্রষ্টব্য) থেকে। চিঠিটি ৮০০ হিজরার শেষে লেখা, কারণ এর মধ্যেই এক জায়গায় আছে, "আটশো সাল (হিজরা) সমাপ্ত হল।" এই চিঠিতেই বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে লিখছেন,

"মহান্ ঈশ্বর বলেছেন, 'বিশ্বাসিগণ! তোমাদের শ্রেণীর বাইরের কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন কোরো না।' টীকা এবং শব্দকোষগুলিতে এই বিষয়টির মর্মার্থস্বরূপ এই কথা বলা হয়েছে যে মুসলমানরা কাফের এবং অপরিচিত

লোকদের বিশ্বস্ত কর্মচারী বা মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করবে না। যদি তারা (মুসলমানরা) বলে যে তাদের (অমুসলমানদের) বন্ধু বা প্রিয়জন বানাচ্ছে না, সুবিধার জন্য এরকম করছে,—তার উত্তর এই যে, ভগবান বলেছেন এতে সুবিধা হয় না, এই ব্যাপার গোলযোগ ও বিদ্রোহের কারণ হয়। তিনি (ভগবান) বলেছেন, 'তারা তোমাকে দূষিত করতে ব্যর্থ হবে না' এবং 'তারা তোমার জন্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে ইতস্তত করবে না বা বিরত হবে না।' অতএব ভগবানের আদেশ শোনা এবং আমাদের দুর্বল বিচারকে বিসর্জন দেওয়াই আমাদের অবশ্যকর্তব্য। ভগবান বলেছেন, 'তারা কেবলমাত্র তোমার ধ্বংস কামনা করতে পারে' অর্থাৎ যখনই তুমি তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করবে, তারা তোমাকে মন্দ কাজে জড়িত করাই পছন্দ করবে। কাফেরদের কিছু কাজ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাদের 'ওয়ালি' (প্রধান তত্ত্বাবধায়ক বা শাসনকর্তা) নিযুক্ত করা উচিত নয়, কারণ তা করলে তারা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করবে এবং তাদের উপর মুরুব্বীয়ানা ফলাবে। ভগবান বলেছেন, 'মুসলমানরা যেন কাফেরদের বন্ধু বা সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করে ভগবানকে উপেক্ষা না করে। যদি কেউ তা করে, তাহলে ভগবানের সাহায্য তারা পাবে না এক সতর্কবাণী ছাড়া, যাতে আমরা তোমাদের তাদের (কাফেরদের) হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। যারা মুসলমানদের উপরে কাফেরদের কর্তৃত্ব দান করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোরান, হাদিস্ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে অনেক তীব্র সতর্কবাণী লেখা আছে। 'ভগবান অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে সাহায্য দান করেন এবং তিনিই মুক্তি দেন। খাদ্য, জয় এবং সমৃদ্ধি দান করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।' পরাজিত কাফেররা নতমস্তকে তাদের নিজেদের যে ভূমি রয়েছে সেখানে নিজেদের শক্তি ও কর্তৃত্ব ফলায় এবং সেই অঞ্চল শাসন করে। কিন্তু তারা ইসলামের দেশগুলিতে মুসলমানদের উপরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে এবং তাদের উপরে হুকুম চালাচ্ছে। এইরকম ব্যাপার ঘটা উচিত নয়।"

এই চিঠিটি পড়লে বোঝা যায় যে ঈশ্বরগতপ্রাণ, সর্বত্যাগী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য দরবেশ মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খি বিধর্মীদের উপর একেবারেই সদয় ছিলেন না। যাহোক, এই চিঠিখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকে দুটি বিষয় খুব পরিষ্কার-ভাবে জানা যাচ্ছে।

(১) অন্তত ৮০০ হিজরা পর্যন্ত গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যে বহু হিন্দু

উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অনেক মুসলমান ঐসব হিন্দুর অধীনে কাজ করতেন।

(২) বিধর্মী-বিদ্বেষী মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খি অমুসলমানদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা পছন্দ করেন নি এবং গিয়াসুদ্দীনকে এই নীতি পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, ধর্মপ্রাণ মুসলমানের কাছে দরবেশ বল্‌খির এই উপদেশ যতই মধুর লাগুক না কেন, ব্যাবহারিক দিক থেকে তা কোনমতেই সমর্থন করা চলে না। কারণ মুসলমান সুলতানেরা যে হিন্দু-প্রেমের বশবর্তী হয়ে হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন, তা নয়; সমস্ত পদের জন্য যোগ্য মুসলমান পাওয়া যেত না বলেই তাঁরা হিন্দুদের অনেক পদে নিয়োগ করতে বাধ্য হতেন। এইসব পদ থেকে হিন্দুদের অপসারণ করার অর্থ দেশের শক্তি ও শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করা। উপরন্তু হিন্দুদের এইসব পদ থেকে বরখাস্ত করলে তাদের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হত। তাদের রাখলে যে গোলযোগ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে বলে বল্‌খি বলছেন (ভগবানের আদেশের দোহাই দিয়ে), তাদের সরালে তার চেয়ে বেশী গোলযোগ ও বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বল্‌খি ঈশ্বর, কোরান, হাদিস্‌, ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রভৃতির দোহাই দিয়ে এবং ভগবানই খাদ্য, জয় ও সমৃদ্ধি দান করবেন ইত্যাদি কথা বলে গিয়াসুদ্দীনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে বিধর্মীদের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা উচিত নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই!

অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি বল্‌খির মতকে সমর্থন করে লিখেছেন, **"In view of what happened shortly after to the Ilyasshahi dynasty at the hands of the Hindu Minister, Raja Kans or Ganesh, the warning given by the saint of Bihar to Ghayāsu-ddin Azam Shah appears to be rather prophetic." (Procee-dings, Ind. Hist. Cong., 1956, p. 216)**।

কিন্তু, বাংলার সুলতান হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন বলে হিন্দুদের বাড় বেড়েছিল এবং তারই ফলে একজন হিন্দু অত্যধিক প্রতাপশালী হয়ে উঠে ইলিয়াস শাহী বংশকে উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, এই ধারণা সত্য নয়। মুজঃফর শাম্‌স্‌ বল্‌খির একান্ত ভক্ত ধর্মপ্রাণ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বল্‌খির উপদেশের ফলে হিন্দুদের সম্বন্ধে যে

নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার কথা পর্যালোচনা করলেই রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে। ৮০০ হিজরায় বল্‌খি গিয়াসুদ্দীনকে এই উপদেশ দেন। গিয়াসুদ্দীন যে বল্‌খির উপদেশ সত্যিই শুনেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ও তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের রাজত্বকালে চীনসম্রাটের কাছ থেকে কয়েকবার বাংলার রাজসভায় দূতের দল এসেছিলেন; তাঁরা বাংলার সুলতানের অমাত্যদের মধ্যে একজনও অমুসলমান দেখতে পান নি। চীনা দূতদলের দোভাষী মা-হুয়ান (মা-হোয়ান) তাঁর 'য়িং-য়ই-শেং-লান' ('য়িং-য়া-শ্যং-লান') গ্রন্থে বাংলাদেশ সম্বন্ধে লিখেছেন, "(বাংলার) রাজার প্রাসাদ এবং ছোট বড় সমস্ত অমাত্যের প্রাসাদ শহরের (রাজধানীর) মধ্যেই। তাঁরা সবাই মুসলমান।"

ফিরিশ্‌তার মতে রাজা গণেশ ইলিয়াস শাহী বংশীয় সুলতানদের অন্যতম অমাত্য ('অজ-উমরাএ') ছিলেন। অথচ মা-হুয়ান বলছেন যে, বাংলার রাজার ছোট বড় সমস্ত অমাত্যই মুসলমান। এর থেকে আমাদের মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে অতিমাত্রায় ধর্মান্ধ হয়ে ওঠেন এবং বল্‌খি প্রভৃতি দরবেশদের উপদেশ শুনে অমাত্যের পদ ও অন্যান্য উচ্চ রাজপদ থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করেন। অন্যতম হিন্দু অমাত্য রাজা গণেশও সম্ভবত এই সময়ে পদচ্যুত হন। এই ধর্মান্ধতার পরিচয় গিয়াসুদ্দীনের অন্যান্য কাজের মধ্যেও মেলে; তাঁর আমলে মা-হুয়ান প্রমুখ চীনা রাজপ্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের জীবনযাত্রাই দেখানো হয়েছিল, তাই মা-হুয়ান তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন, "এদেশের বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মুসলিম ধর্মের বিধান অনুসারে সম্পন্ন হয়।......এদেশের পাঁজীতে বারোটি মাস আছে, কিন্তু তাতে মলমাস গণনার কোন ব্যবস্থা নেই।" এদেশে হিন্দুদের মধ্যে যে বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং তাঁদের পাঁজীতে যে মলমাস গণনার রীতি প্রচলিত আছে, একথা মা-হুয়ান লেখেন নি, তার কারণ একমাত্র এ'ই হতে পারে যে এইসব বিষয় জানবার কোন সুযোগই তাঁরা পান নি বাংলার তৎকালীন রাজশক্তির হিন্দুবিরোধী নীতির দরুণ। আমাদের মনে হয়, —গিয়াসুদ্দীনের এই ধর্মান্ধতা ও অদূরদর্শী নীতির ফলেই রাজা গণেশ, যাঁর অপরিমিত সামরিক শক্তি ছিল (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯ দ্রষ্টব্য) এবং যিনি ইলিয়াস শাহী বংশীয় সুলতানদের মিত্র ও সেবক ছিলেন, তিনি এখন তাঁদেরই বিপক্ষে গেলেন এবং গিয়াসুদ্দীনকে চক্রান্ত করে হত্যা করিয়ে (পরে আলোচনা

দ্রষ্টব্য) তাঁর বংশকে উচ্ছেদ করে নিজে ক্ষমতা অধিকার করলেন। রাজা গণেশের অভ্যুত্থান কেবলমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের দরুণ ঘটেনি। হিন্দুদের সম্বন্ধে গিয়াসুদ্দীন যে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেই নীতিই এজন্য দায়ী। তবে যতদূর মনে হয়, গিয়াসুদ্দীন তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে এই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেন নি, শেষের দিকে করেছিলেন; এবং তারই ফলে এই মহান্ নৃপতির রাজত্ব ও জীবন এক করুণ পরিসমাপ্তির মধ্যে পর্যবসিত হয়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের ইতিহাস সম্বন্ধে যা জানা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করলাম। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটিবিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই এবং চিত্তাকর্ষক ও সুমধুর চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি সকলের অগ্রগণ্য।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মুদ্রাগুলি উত্তরবঙ্গের ফিরোজাবাদ, পূর্ববঙ্গের মুয়াজ্জমাবাদ এবং পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও-এর টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায়, মোটামুটিভাবে সারা বাংলাতেই তাঁর অধিকার ছিল। এ ছাড়া জন্নতাবাদ নামে আর একটি জায়গার টাকশাল থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল, এই জায়গার অবস্থান এপর্যন্ত নির্ণয় করা যায় নি। এই জন্নতাবাদ গৌড়ের সঙ্গে অভিন্ন নয়, কারণ গৌড়ের 'জন্নতাবাদ' নাম ষোড়শ শতাব্দীতে হুমায়ুন রাখেন। এই সমস্ত স্থান ছাড়া কামরূপ ও কাম্‌তা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে আগে দেখাবার চেষ্টা করেছি।

এখন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ের আলোচনা করে তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করব।

পারস্যের অমর কবি হাফিজের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের যোগাযোগ সম্বন্ধে আগে সবিস্তারে আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষের কোন সমসাময়িক কবির সঙ্গে তাঁর মত কাব্যামোদী সুলতানের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, সে প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। এখন আমরা এই প্রশ্নেরই বিচার করব।

মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতির জীবৎকাল আনুমানিক ১৩৭০-১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলাদেশে যে সময় গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ রাজা ছিলেন, সেই সময়ে মিথিলায় বসে বিদ্যাপতি তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ পদ রচনা করেছিলেন। অনেকে মনে করেন বিদ্যাপতির সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের যোগাযোগ ছিল

এবং বিদ্যাপতি তাঁর একটি পদে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নাম করেছেন। এরকম ধারণার কারণ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত একটি পদের (বিদ্যাপতি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ২ নং পদ) ভণিতা এই,

বেকতও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান।

মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিরে জীবে জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥

কিন্তু এই "বিদ্যাপতি কবি" কে এবং "গ্যাসদীন সুরতান" কে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। একদল পণ্ডিত বলেন "বিদ্যাপতি কবি" মৈথিল বিদ্যাপতি এবং "গ্যাসদীন সুরতান" গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ।

আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন এই "গ্যাসদীন সুরতান" দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলক (রাজত্বকাল ১৩২০-১৩২৫ খ্রীঃ) এবং "বিদ্যাপতি কবি" চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কোন অজ্ঞাতপরিচয় 'বিদ্যাপতি' নামধারী কবি; অথবা এটি ঐ সময়কার অন্য কোন কবির লেখা, গায়েন বা লিপিকরের ভ্রমক্রমে ভণিতায় 'বিদ্যাপতি'র নাম বসে গেছে।

আর একদল পণ্ডিত বলেন এই বিদ্যাপতি সুপরিচিত মৈথিল কবি বিদ্যাপতিই বটেন, কিন্তু "গ্যাসদীন সুরতান" দিল্লীর সুলতান দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তুঘলক, যিনি ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

এ সম্বন্ধে চতুর্থ মত হচ্ছে এই যে এই "গ্যাসদীন সুরতান" বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮ খ্রীঃ) এবং "বিদ্যাপতি কবি" ষোড়শ শতকের বিখ্যাত পদকর্তা কবিশেখর, যিনি 'বিদ্যাপতি' ভণিতাতেও পদ রচনা করতেন।

এই রকম অবস্থায় বিষয়টি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা খুবই দুরূহ। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, উপরে উল্লিখিত চারটি মতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতের ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। কারণ চতুর্দশ শতকের প্রথম দিককার কোন "বিদ্যাপতি কবি"র কথা এ পর্যন্ত জানা যায় নি অথবা পদটির ভণিতা পাল্টেছে বলেও বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত করা যায় না। সেই রকম দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন তুঘলক খুব অল্প সময়ের জন্য দিল্লী সমেত ছোট একটি অঞ্চলের রাজা হয়েছিলেন, বিদ্যাপতির দেশ মিথিলা বা তার প্রতিবেশী কোন অঞ্চলে এই রাজার কোন অধিকার ছিল না। সুতরাং বিদ্যাপতি এই নগণ্য সুলতানের নাম তাঁর পদের ভণিতায় উল্লেখ করবেন এবং তাঁকে "যুগপতি" বলবেন বলে বিনা

প্রমাণে বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং প্রথম ও চতুর্থ মতের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়, সে সম্বন্ধেই বিতর্ককে সীমাবদ্ধ করা চলে। এই "গ্যাসদীন সুরতান" যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ, সে কথা বলার স্বপক্ষে যুক্তি এই :—

(১) আলোচ্য পদটি মিথিলা-নিবাসী লোচন কর্তৃক সংকলিত 'রাগ-তরঙ্গিণী'তে পাওয়া যায়। 'রাগতরঙ্গিণী'র উপক্রমে লোচন মিথিলার বিখ্যাত কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। দ্বিতীয় কোন বিদ্যাপতির কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি। অতএব লোচন যে সমস্ত বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত পদ সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি সবই মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা বলে মনে করা যেতে পারে। এই পদটি মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা হলে "গ্যাসদীন সুরতান" তাঁর সমসাময়িক সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বলেই প্রতিপন্ন হন।

(২) গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ কাব্যরসিক ছিলেন। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন এবং মহাকবি হাফিজের কাছে এক ছত্র কবিতা পাঠিয়ে তাঁকে দিয়ে কবিতাটি পূরণ করিয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের কাব্যরসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব পদটিতে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কথাই বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

(৩) গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ অপদার্থ, বিলাসী ও দুশ্চরিত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই কারণে একমাত্র নির্লজ্জ চাটুকার ভিন্ন আর কেউ তাঁকে "যুগপতি" বলতে পারেন না। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সম্বন্ধে "যুগপতি" বিশেষণ খুব সার্থকভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে।

কিন্তু "গ্যাসদীন সুরতান" যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ, তা বলার দিকেও কয়েকটি যুক্তি আছে। এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে আমরা ঐ যুক্তিগুলির উল্লেখ করেছি। আজম শাহ ও মাহ্‌মূদ শাহ, উভয়েরই স্বপক্ষে যুক্তি আছে, আবার কারও পক্ষের যুক্তিই চূড়ান্ত নয়। এই অবস্থায় আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে শেষ কথা বলা বর্তমানে সম্ভব নয়। অবশ্য "গ্যাসদীন সুরতান"কে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে অভিন্ন ধরতেই ইচ্ছা যায়। পারস্যের অমর কবি হাফিজ তাঁর গজলের ভণিতায় যে সুলতানের নাম পরম সমাদরে উল্লেখ করেছেন, মিথিলার অমর কবি বিদ্যাপতিও তাঁর পদের ভণিতায় সেই সুলতানের নামই প্রশস্তি-সহকারে উল্লেখ করেছেন বলে ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু ঐতিহাসিকের কাছে তাঁর

ব্যক্তিগত রুচি বড় কথা নয়, তথ্য ও যুক্তিই প্রধান। সেই জন্যে "গ্যাসদীন সুরতান"-কে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করতে পারলাম না।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের রচয়িতা বাঙালী মুসলমান কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পৃষ্ঠ-পোষণ লাভ করেছিলেন। তিনি "চট্টগ্রামের পুঁথির সহিত মিলাইয়া ত্রিপুরার খণ্ডিত পুঁথির পত্র হইতে কবির যে আত্মবিবরণী" "প্রস্তুত" করেছিলেন, তা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের 'মাহে-নও' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ঐ আত্মবিবরণীর নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলি থেকেই ডঃ হক তাঁর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

রাজা রাজ্যেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত॥
মনুষ্যের মধ্যে যেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গেছ পৃথিবীর সার॥
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজয়।
পুত্র শিষ্য হস্তে তিহঁ মাগে পরাজয়॥
মহাজন বাক্য ইহ পুরণ করিআ।
লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল-গৌড়িআ॥
করুণা হৃদয় রাজা পুণ্যবন্ত তর।
সবগুণে অসীম অতুল মনোহর॥
পূর্ণমার চান্দ জনি বদন সুন্দর।
মধুর মধুর বাণী কহন্ত সুন্দর॥
রমণীবল্লভ নৃপ রসে অনুপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুণ মহিমা॥
... ...
মোহাম্মদ সগীর তান আজ্ঞাক অধীন।
তাহান আছুক যশ ভুবন এ তিন॥

এই ছত্রগুলির মধ্যে কোন একজন রাজার বন্দনা করা হয়েছে। শেষ দুই ছত্রের ভাষা থেকে মনে হয়, এই রাজা সগীরের সমসাময়িক। ডঃ এনামুল হক বলেন যে উদ্ধৃত অংশের চতুর্থ ছত্রের "নরপতি গেছ" কথার অর্থ "গেছ" নামক রাজা এবং গেছ = গিয়াস = গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। ঐ অংশের পঞ্চম

থেকে অষ্টম ছত্রে ঐ রাজার পিতাকে পরাজিত করে গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বলে ডঃ হক মনে করেন। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও তাঁর পিতা সিকন্দর শাহকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। এই দুটি বিষয় থেকেই ডঃ হক সিদ্ধান্ত করেছেন যে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ সগীরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ, ডক্টর আবদুল করিম প্রভৃতি বিশিষ্ট গবেষকেরা ডক্টর হকের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন।

ডঃ এনামুল হক এর পরে তাঁর 'মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' (১৯৫৭) গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬-৫৭) সগীরের "রাজ-বন্দনার সমগ্র অংশটুকু মূল বানানেই" উদ্ধৃত করেছেন এবং পুঁথির এই অংশের আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন (ঐ, পৃঃ ১৯২)। রাজ-বন্দনার যে অংশ আমরা পূর্ব-পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছি, তার তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্রের পাঠ "মূল বানানে" এই,

মনুস্তের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেছ পিরথিম্বীর সার॥

সগীরকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক ও পৃষ্ঠপোষিত কবি বলে গ্রহণ করার মত যথোপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে কিনা, তা বিচার-সাপেক্ষ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নীচে সংক্ষেপে দিলাম।

(১) "মহা নরপতি গ্যেছ পৃথিবীর সার" এই চরণটির "গ্যেছ" শব্দটি কোন রাজার নাম হিসাবে, বিশেষ করে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম হিসাবে গ্রহণ করা চলে কিনা, তা বিতর্কের বিষয়। পৃষ্ঠপোষক রাজার নামকে এরকম সংক্ষেপে ও বিকৃতভাবে কোনক্রমে মাত্র এক জায়গায় উল্লেখ করে চলে যাওয়া দস্তুরমত অস্বাভাবিক ব্যাপার।

(২) শব্দটি মূলে "গ্যেছ" ছিল কিনা, সে বিষয়েও নিঃসংশয় হওয়া যায় না। "যেহ্ন", "যেহ" প্রভৃতি শব্দ লিপিকর-প্রমাদে "গ্যেছ"-এ রূপান্তরিত হতে পারে, অথবা পুঁথির অস্পষ্ট অক্ষরের জন্য ঐ সব শব্দকে কেউ ভুল করে "গ্যেছ"-রূপে পড়তে পারেন। "গ্যেছ"-এর জায়গায় ঐ শব্দগুলি চরণটির মধ্যে সার্থকতরভাবে স্থান পেতে পারে। মোটের উপর "গ্যেছ"—এই ছোট্ট শব্দটির মধ্যে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নাম আবিষ্কার করতে হলে আরও জোরালো প্রমাণ দরকার।

(৩) এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ডঃ এনামুল হক

'ইউসুফ-জোলেখা'র পুঁথির যে আলোকচিত্র প্রকাশ করেছেন, তাতে "গেছ" শব্দটি (ম্যাগনিফাইং লেন্স ব্যবহার করেও) স্পষ্টভাবে পড়া যায় না।

(৪) "ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজয়" থেকে "লইলেন্ত রাজ্য পাট বঙ্গাল-গৌড়িআ" পর্যন্ত চরণগুলিতে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পিতাকে যুদ্ধে হারিয়ে রাজ্য অধিকার করার প্রসঙ্গ পরোক্ষভাবে উল্লিখিত হয়েছে বলে ডঃ হক মনে করেন। তিনি একরকমভাবে চরণগুলিকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু চরণগুলির স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এদের মধ্যে এমন একজন রাজার কথা বলা হয়েছে, যিনি মহাজন-বচন সার্থক করে নিজের পুত্র বা শিষ্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এবং অন্যদের হারিয়ে গৌড় ও বঙ্গের রাজ্য অধিকার করেছিলেন।

(৫) শাহ মোহাম্মদ সগীরকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক বলে মনে করলে বলতে হবে, সগীর বিদ্যাপতির সমসাময়িক এবং কৃত্তিবাসের চেয়ে প্রাচীনতর কবি। কিন্তু সগীরের কাব্যের যে সমস্ত অংশ ডঃ হক এবং অন্যান্য গবেষকরা এ পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছেন, তাদের ভাষা বিচার করলে সগীরকে এত প্রাচীন কবি বলে মনে হয় না। অবশ্য সগীর যে ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী নন, তাও তাঁর ভাষা থেকেই বলা যায়।

জনাব সুলতান আহমদ ভুঁইয়া সগীরের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। তিনি একাধিক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে ডঃ এনামুল হকের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত 'ইউসুফ-জোলেখা'র একটি পুঁথিতে কাব্যের কাহিনীর মধ্যে তার অন্যতম চরিত্র রাজা তৈমুসের গুণ-বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে,

মনুষ্যের মৈদ্ধে জেন ধর্ম্ম অবতার।
মোহা মোহা নরপতি পৃথিব্বির সার॥

*　　*　　*

রাজা রাজেশ্বর মোহা ধার্ম্মিক পণ্ডিত।
দেব অবতার নৃপ জগত বিদিত॥

*　　*　　*

করুণা হৃদএ রাজা পুণ্য ভতপর।
সর্বগুণে অসীম অতুল মেনোহর॥

পুর্ন্নিমার চন্দ্র জিনি বদন সোন্দর।
মধুর মধুর বানি কহে মৃতুশ্বর।
রমনি বল্লব নৃপ রসে নিউপমা।
কনে বা কহিতে পারে সে গুন মহিমা॥

এই ছত্রগুলিই আবার ডঃ এনামুল হক কর্তৃক প্রকাশিত সগীরের পূর্বোক্ত রাজ-বন্দনার মধ্যে প্রায় অবিকলভাবে পাওয়া যায়—ছু' একটি শব্দ মাত্র পরিবর্তিত হয়েছে। এইভাবে জনাব ভুঁইয়া রাজ-বন্দনার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে (তাঁরই ভাষায়) "ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ" সৃষ্টি করেছেন।

এরপর জনাব সুলতান আহমদ ভুঁইয়া 'নও বাহার' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় (পৃঃ ২২৫-২২৮) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লেখেন. "শাহ মোহাম্মদ সগীরের কাব্যে আমরা যে সমস্ত ভনিতা পাই তাহাতে দেখা যায় যে, কবি ইহা ফারসী কোনও কিতাব দেখিয়া রচনা করিয়াছেন। ··· পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাকবি ফেরদৌসী এবং মোল্লা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-৯২ খৃঃ) 'য়ুসুফ জোলেখা' নামীয় কাব্য যথাক্রমে একাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছেন। ······ ফেরদৌসী, জামী ও সগীরের কাব্য আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সগীরের কাব্যখানি জামীর কাব্যের অনুকরণে রচিত; ফেরদৌসীর কাব্যের কোন প্রভাব তাঁহার কাব্যে নাই। সুতরাং জামীর 'য়ুসুফ জোলেখা' কাব্য রচনার (রচনাকাল—৮৮৮হিঃ = ১৪৮৩ খৃঃ দ্রষ্টব্য—**Literary History of Persia—E. G. Brown, Vol. III, page 516**) অন্ততঃ পক্ষে একশত বৎসর পরে আমাদের বঙ্গাল দেশের কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর তাঁহার 'য়ুসুফ জোলেখা' কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই খুব নেক নজরে দেখিলেও শাহ মোহাম্মদ সগীরকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে ফেলা যায় না।"

আমি সগীরের 'ইউসুফ-জোলেখা'র কোন পুঁথি দেখিনি, জামীর সঙ্গে সগীরের কাব্যের তুলনা করবারও সুযোগ পাইনি, সগীরের কাব্য এখনও পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি। তাই জনাব সুলতান আহমদ ভুঁইয়ার প্রমাণগুলি কতদূর অখণ্ডনীয়, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এগুলি খণ্ডন করতেও কাউকে আমি দেখিনি। সগীর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক ছিলেন বলে প্রমাণিত হলে খুব ভালই হত; কারণ সেক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের

একজন সুপ্রাচীন কবির সন্ধান পাওয়া যেত, বিদগ্ধ সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের কাব্যামোদিতার আর একটি দৃষ্টান্ত মিলত এবং রুকনুদ্দীন বারবক শাহের অনেক আগে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ সুরু করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যেত। কিন্তু এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল, তার ফলে আশা করি সকলেই বুঝতে পারবেন যে সগীরকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সমসাময়িক বলার প্রচণ্ড অসুবিধা আছে। কোন কবিকে এতখানি প্রাচীন বলে নিঃসংশয়ে ঘোষণা করতে গেলে আরও জোরালো প্রমাণের প্রয়োজন।

মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ ৮১৩ হিজরা বা ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন, কারণ ঐ বছরেই তাঁর মুদ্রা সুরু হয়েছে। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে যে "রাজা কান্স্, যিনি ঐ অঞ্চলের একজন জমিদার ছিলেন, তাঁর কৌশলের দ্বারা রাজা (গিয়াসুদ্দীন)-কে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়।" অন্য কোন সূত্রে এই উক্তির সমর্থন না পাওয়া গেলেও এ ব্যাপার সম্পূর্ণ সম্ভাব্য। আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে গিয়াসুদ্দীন তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ধর্মান্ধ হয়ে উঠে হিন্দু-বিরোধী নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং তার ফলে গণেশ তাঁর পক্ষ থেকে বিপক্ষে চলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত এই ব্যাপারেরই পরিণতিস্বরূপ গণেশের ষড়যন্ত্রে গিয়াসুদ্দীন নিহত হন।

সৈফুদ্দীন হমজা শাহ

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জা শাহ রাজা হলেন। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, ইনি ৮১৩ হিজরায় (১৪১০-১১ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৮১৫ হিজরায় (১৪১২-১৩ খ্রীঃ) এঁর রাজত্ব শেষ হয়। 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা' এবং 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে যে এঁর উপাধি ছিল 'সুলতান-উস্-সলাতীন' (রাজাধিরাজ)। 'রিয়াজ'-এর মতে অমাত্য ও সেনাপতিরা সৈফুদ্দীনকে এই উপাধি দেন। সৈফুদ্দীনের এই উপাধি সত্যিই ছিল, কারণ তাঁর বিভিন্ন মুদ্রায় এই উপাধি উল্লিখিত আছে।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্তা'য় সৈফুদ্দীন হমজা শাহ সম্বন্ধে লেখা আছে, "তিনি ছিলেন সাহসী, ধৈর্যশীল এবং উদার নরপতি। তাঁর বুদ্ধি ও ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা

থাকার জন্য তাঁর কর্মচারীরা সাবধানে শাসনকার্য পরিচালনা করত। দেশের (হিন্দু) রাজারা তাঁর বশ্যতার জোয়াল থেকে মাথা বার করত না এবং রাজস্ব দিতে দেরী করত না। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে সৈফুদ্দীন সম্বন্ধে লেখা আছে, "তিনি দয়ালু, ধৈর্যশীল এবং সাহসী রাজা ছিলেন।"

এই সব প্রশংসোক্তি কতদূর সত্য, তা বলা যায় না। আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেন যে ফিরিশ্‌তার কথাগুলি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ফিরিশ্‌তা ভুলক্রমে এগুলি সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের উপরে আরোপ করেছেন (History of Bengal, D.U., Vol. II, pp. 115-116)। এই অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত।

সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের অভিষেকের উৎসবে চীন-সম্রাটের দূতেরা এসেছিল। এ সম্বন্ধে চীনের মিং রাজবংশের ইতিহাসগ্রন্থ 'মিং-শে'তে লেখা আছে, "য়ং-লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) বাংলার রাজদূতেরা চীনে পৌঁছোবার পূর্বাহ্ণে সম্রাট তাঁদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রীকে চেন-কিয়াং-এ পাঠালেন। ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ, এমন সময় বাংলার দূতেরা তাদের রাজার (গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ) মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে পৌঁছোলো। মৃত রাজার শোকানুষ্ঠানে এবং যুবরাজ সৈ-উ-তিং (সৈফুদ্দীন)-এর অভিষেক-উৎসবে যোগ দেবার জন্যে চীন থেকে রাজপুরুষদের পাঠানো হল।"*

কিন্তু এই বিবরণ পড়লে একটা কথা মনে হয় যে, সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ যখন ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তখন ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অভিষেক-উৎসব হল কেন? এর একটা কারণ এই হতে পারে যে রাজ্যের মধ্যে কোন উৎকট গোলযোগের জন্য এক বছরেরও বেশী তাঁর অভিষেক-উৎসব মুলতুবী ছিল। আমাদের মনে হয়, রাজা গণেশের ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টার ফলে এই জাতীয় উৎকট গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সৈফুদ্দীন বৎসরাধিক-

* ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর ইংরেজী অনুবাদ (Visva-Bharati Annals, Vol. I, p. 133 পৃঃ) থেকে এই অনুবাদ করা হয়েছে এবং এরই উপর নির্ভর করে পরবর্তী অনুচ্ছেদটি লেখা হয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক নারায়ণচন্দ্র সেন সর্বশেষ বাক্যটির অনুবাদ করেছেন, "(মৃত রাজার) শোকানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য রাজপুরুষ প্রেরিত হল। তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র সাই-উ-তিংকে রাজারূপে নিযুক্ত করা হল।" চীন-সম্রাটেরা পৃথিবীর অন্যান্য রাজাদের নিজেদের সামন্ত বলে মনে করতেন। যাহোক্, নারায়ণবাবুর অনুবাদ ঠিক হলে বলতে হবে, 'মিং-শে'তে চীনা রাজপ্রতিনিধিদের সৈফুদ্দীনের অভিষেক-উৎসবে যোগদানের স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

কাল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কাটাবার পর ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে একটু সামলে নিয়ে অভিষেক-উৎসবের বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ১৪১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ অভিষেক-উৎসবের অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণের পতনের পর যেমন নগণ্য শল্য সেনাপতি হয়েছিলেন, তেমনি ইলিয়াস শাহী বংশের শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, সিকন্দর শাহ এবং গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ—এই তিনজন দিকপাল সুলতানের পরে দুর্বল সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ রাজা হন; শল্যের সেনাপতিত্বের মত সৈফুদ্দীনের রাজত্বও অল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের যে সমস্ত মুদ্রা এপর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সাতগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ এবং ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়ার টাকশালে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাঁর কোন শিলালিপি এপর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজা গণেশের ক্ষমতা-অধিকার—ক্রীড়নক রাজবংশ

শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ

সৈফুদ্দীন হমজা শাহের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা কার্যত রাজা গণেশের হাতে এল। কিন্তু নামে রাজা হলেন অন্য ব্যক্তি। তাঁর নাম শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'আইন-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে সৈফুদ্দীন হমজা শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, সৈফুদ্দীনের পরবর্তী রাজার নাম শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ। শিহাবুদ্দীন তাঁর মুদ্রায় নিজেকে সৈফুদ্দীনের পুত্র বলেন নি। বাংলাদেশে যখনই কোন সুলতানের পুত্র সুলতান হয়েছেন, তিনি মুদ্রায় নিজেকে সুলতানের পুত্র বলেছেন। শিহাবুদ্দীন সুলতানের পুত্র হলে সে কথা তাঁর মুদ্রায় অনুল্লিখিত থাকত না। অতএব শিহাবুদ্দীন যে সৈফুদ্দীনের পুত্র ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'রিয়াজ'-এ শিহাবুদ্দীনের প্রকৃত নাম এবং সৈফুদ্দীনের পুত্র না হওয়ার ব্যাপারটা একটা মতান্তর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে; 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে, "কেউ কেউ লিখেছেন যে এই শামসুদ্দীন সুলতান-উস্-সলাতীনের ঔরসপুত্র ছিলেন না, পালিতপুত্র ছিলেন এবং তাঁর নাম ছিল শিহাবুদ্দীন।" একমাত্র বুকানন-বিবরণীতেই 'শামসুদ্দীন' নামের উল্লেখ নেই, তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, "**Syafudin, who governed three years, and was succeeded by his slave Sahabudin, who also governed three years.**"

বুকানন-বিবরণীতে আর একটি নতুন খবর দেওয়া হয়েছে যে শিহাবুদ্দীন ছিলেন সৈফুদ্দীনের ক্রীতদাস। এতদিন পর্যন্ত অন্য কোন সূত্রে এই কথার

সমর্থন পাওয়া যায় নি। কিন্তু সম্প্রতি আমি অল-সখাওয়ীর (জন্ম : কায়রোয় —১৪২৬ খ্রীঃ, মৃত্যু : মদিনায়—১৪৯৬ খ্রীঃ) লেখা হিজরার নবম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মুসলিমদের জীবনচরিতের কোষগ্রন্থ 'অল্-জও অল্-লামে লে-অহ্ল্ অল-করন্ অল্-তাসে'তে (অষ্টম খণ্ড, কায়রো, ১৩০৩ হিঃ, পৃঃ ২৮০) বুকানন-বিবরণীর উক্তির সমর্থন পেয়েছি। অল-সখাওয়ী জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা আমরা এই বইয়ের পরিশিষ্ট 'ঙ'তে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেছি। অল-সখাওয়ী জলালুদ্দীনের পিতা "কান্স্"-এর নাম উল্লেখ করার পরে লিখেছেন,

"শামসুদ্দীনের পুত্র সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পুত্র সৈফুদ্দীন হম্জার ক্রীতদাসদের অন্যতম শহাব তাঁকে আক্রমণ করে; সে বাংলাদেশে রাজা হয় এবং তাঁকে বন্দী করে। এই লোকটির (কান্সের) পুত্র মুসলমান হয়ে মুহম্মদ নাম নিলেন এবং তিনি শহাবকে আক্রমণ করে তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিলেন।"

অল-সখাওয়ীর এই বিবরণে সৈফুদ্দীন হম্জা শাহের ক্রীতদাস জনৈক শহাবের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই শহাব শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না। তবে অল-সখাওয়ী লিখেছেন যে, শহাব কান্স্ অর্থাৎ গণেশকে আক্রমণ ও বন্দী করে রাজা হয়েছিল এবং মুহম্মদ (জলালুদ্দীন) মুসলমান হয়ে শহাবের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই কথা ভুল। আসলে গণেশই শিহাবুদ্দীনকে পুতুল বানিয়ে নিজে কার্যত রাজা হয়ে বসেছিলেন এবং জলালুদ্দীন নিজের পিতার বিপক্ষে গিয়ে ও মুসলমান হয়ে পিতার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন; এই ব্যাপারটাকেই অল-সখাওয়ী এইভাবে বিকৃত আকারে লিখেছেন। অল-সখাওয়ী বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে বসে আলোচ্য ঘটনার কয়েক দশক পরে তাঁর এই বই লিখেছেন বলে তাঁর এরকম ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

অতএব শিহাবুদ্দীন সৈফুদ্দীনের ক্রীতদাস ছিলেন বলেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। কিন্তু ক্রীতদাস রাজা হলেন কী করে? হলেন খুঁটির জোরে। অমিতশক্তিধর গণেশই যে শিহাবুদ্দীনকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। গণেশ কীভাবে শিহাবুদ্দীনকে শিখণ্ডী খাড়া করে রেখে নিজে রাজত্ব করছিলেন, তার বর্ণনা ফিরিশ্তা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

"তাঁর (শিহাবুদ্দীনের) তরুণ বয়সের জন্য বুদ্ধি অত্যন্ত কম ছিল। কান্‌স্ নামে একজন বিধর্মী, যিনি এই বংশের (ইলিয়াস শাহী বংশের) অন্যতম অমাত্য ছিলেন, তিনি এঁর রাজত্বকালে বিরাট ক্ষমতা ও প্রাধান্য অর্জন করেন এবং রাজ্য ও রাজস্ব—সব কিছুরই উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন।"

এই বর্ণনা যে মূলত সত্য, তা এই বইয়ের অন্যত্র (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩-১৫ দ্রষ্টব্য) দেখাবার চেষ্টা করেছি। 'আইন-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' এই বর্ণনার সমর্থন আছে।

শিহাবুদ্দীন চীনসম্রাটকে (স্পষ্টত সৈফুদ্দীনের আমলে দূত ও উপহার প্রেরণের জন্য) ধন্যবাদ জানিয়ে এক লিপি পাঠান এবং সেই সঙ্গে নানারকম উপহার পাঠান। তার মধ্যে ছিল জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং বাংলার বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্য। তাঁর পাঠানো জিরাফ চীনদেশে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। 'সি-য়ং-চও-কুং-তিয়েন-লু', 'শু-য়ু-চৌ-ৎসেউ-লু', 'মিং-শে' প্রভৃতি চীনা ইতিহাসগ্রন্থে এর বিবরণ পাওয়া যায় (এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৮ দ্রষ্টব্য)।

শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ৮১৫ হিজরায় (১৪১২-১৪১৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে বসেন এবং ৮১৭ হিজরায় (১৪১৪-১৪১৫ খ্রীঃ) তাঁর রাজত্ব শেষ হয়। তাঁর মুদ্রাগুলি ফিরোজাবাদ বা পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এপর্যন্ত তাঁর কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নি।

শিহাবুদ্দীনের মৃত্যু সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ তিনটি মত উল্লিখিত হয়েছে, (১) স্বাভাবিক রোগভোগের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়; (২) রাজা গণেশের কৌশলে তিনি নিহত হন; (৩) রাজা গণেশ তাঁকে আক্রমণ করে বধ করেন। আমাদের মনে হয়, এদের মধ্যে প্রথম মতটিই সত্য, অর্থাৎ শিহাবুদ্দীন স্বাভাবিক ভাবেই মারা গিয়েছিলেন (এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪-১৫ দ্রষ্টব্য)। অন্য কোন সূত্রেও শিহাবুদ্দীনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল বলে লেখা নেই।

উদ্দীন ফিরোজ শাহ

মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ রাজা হন। তাঁর কেবলমাত্র ৮১৭ হিজরার (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এই মুদ্রাগুলি সাতগাঁও এবং মুয়াজ্জমাবাদের টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

আজ অবধি কোন ইতিহাস-গ্রন্থে বা মুদ্রা ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায়নি। যতদূর মনে হয়, ইনি ছিলেন “তরুণ” শিহাবুদ্দীনের বালক পুত্র ; শিহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পরে গণেশ এঁকে রাজা হিসাবে খাড়া করে আগের মত রাজ্যশাসন করতে থাকেন এবং কয়েকমাস বাদে যখন বোঝেন আর কাউকে শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করে না রাখলেও চলবে, তখন তিনি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে অপসারিত করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন ; সম্ভবত আলাউদ্দীন গণেশের হাতে প্রাণও হারান (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৫ দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রাজা গণেশ

অবতরণিকা

বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসে যাঁদের নাম ভাস্বর অক্ষরে লেখা রয়েছে, রাজা গণেশ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একক কৃতিত্বের দিক দিয়ে গণেশের সঙ্গে খুব কম লোকেরই তুলনা চলতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ছিল মুসলমানদের অধিকারে। এর মধ্যে কোন কোন সময় অঞ্চলবিশেষে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাংলার সিংহাসন অধিকার এই একটিমাত্র হিন্দুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গণেশ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত আবির্ভূত হয়ে অসাধ্যসাধন করেছিলেন, প্রবল বিরুদ্ধশক্তির বাধাকে জয় করে বাংলায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গণেশের কীর্তির অসামান্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

অবশ্য এই হিন্দু অভ্যুদয় বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। গণেশের বংশধররা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা বাংলার সিংহাসন বেশীদিন নিজেদের অধিকারে রাখতে পারেননি। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী হলেও গণেশ ও তাঁর বংশের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসের এক অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায়। কারণ, প্রথমতঃ এই বংশ হিন্দুর বংশ, দ্বিতীয়তঃ এই বংশের রাজারা বাংলা দেশেরই সন্তান। এর আগে যে সমস্ত মুসলমান সুলতান এদেশে রাজত্ব করেছিলেন, তাঁদের পিতৃভূমি ছিল বাংলার বাইরে। তাঁরা নিজেরাও বাংলাকে নিজেদের স্বদেশ বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই বাঙালী জনসাধারণও তাঁদের আপন বলে ভাবতে পারেনি। কিন্তু বাঙালী রাজা গণেশ যেদিন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেদিন থেকে বাংলার রাজশক্তির সঙ্গে বাংলার জনসাধারণের অন্তরের যোগ স্থাপিত হল। এই কারণে রাজা গণেশের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসের একটি যুগ-লক্ষণাক্রান্ত ঘটনা এবং এই ঘটনা থেকেই বাংলার ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় সুরু হল।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা রাজা গণেশ সম্বন্ধে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য বিবরণী রচনার চেষ্টা করব। অবশ্য এই অসামান্য রাজার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে খুব কমই তথ্য পাওয়া যায়। সেগুলি একত্র সংগ্রহ করে সতর্কভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

রাজার নাম

প্রথমে রাজার নাম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার। আমরা যাঁকে "রাজা গণেশ' বলছি, সত্যিই তাঁর নাম 'গণেশ' কিনা, সে সম্বন্ধে সকলে এখনও নিঃসংশয় হতে পারেননি। বাংলা দেশে রাজা গণেশ এবং তাঁর ছেলে যদুর সম্বন্ধে নানারকম মনোহর কিংবদন্তী ও শ্লোক প্রচলিত আছে। যদু যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জলালুদ্দীন নাম নিয়েছিলেন, এ সম্বন্ধে সব কিংবদন্তীই একমত : কিন্তু এই রাজা ও তাঁর ছেলে যদু-জলালুদ্দীন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবৃতি কেবলমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা ফার্সী বইয়েই মেলে। তাদের মধ্যে রাজার নাম 'কান্‌স', 'কনিস্', 'কনেস্', 'কান্‌সি'— এইভাবেই পাওয়া যায়। একমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টার ফ্রান্সিস বুকাননের লেখা বা সংগ্রহ করা একটি বিবরণীতে * (যা আনুমানিক ১৮১০ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার একটি পুরোনো ফার্সী পুঁথি অবলম্বনে রচিত হয়েছিল বলে প্রকাশ) রাজার নাম 'গণেশ' রূপে মেলে। এই অবস্থার জন্যে কেউ কেউ বলেন রাজার মূল নাম 'কংস', 'গণেশ' নয়।

দুখানি বাংলা বই এবং একখানি সংস্কৃত বইয়ে "রাজা গণেশ"এর নাম পাওয়া যায়। বাংলা বই দুটির নাম অদ্বৈতপ্রকাশ (রচনাকাল ১৫৬৮ খ্রীঃ বলে কথিত) ও প্রেমবিলাস (রচনাকাল ১৬০০ খ্রীঃ বলে কথিত) এবং সংস্কৃত বইটির নাম বাল্যলীলাসূত্র (রচনাকাল ১৪৮৭ খ্রীঃ বলে কথিত)। তিনখানি বইতেই বলা হয়েছে "রাজা গণেশ" অদ্বৈতের পূর্বপুরুষ নরসিংহ নাড়িয়ালকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রেমবিলাসের চতুর্বিংশ বিলাসে আছে,

প্রভাকরের পুত্র নরসিংহ নাড়িয়াল।
গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সর্বকাল ॥

* Martin's Eastern India, Vol. II, p. 616—621. এটি আসলে মেজর উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিনের লেখা বলে বেভারিজ মনে করেন (J. A. S. B., 1894, Pt. I, pp. 91—93 দ্রঃ)।

দৈবে শ্রীচণ্ডী হৈতে শ্রীগণেশ রাজা।
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পূজা ॥

'অদ্বৈতপ্রকাশে' আছে,

সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥
যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈল রাজা ॥

'বাল্যলীলাসূত্রে' আছে,

শ্রীমান নৃসিংহস্য মহাত্মনো বৈ যশঃপ্রসূনে স্ফুটিতে মনোজ্ঞে।
তৎসৌরভব্যূহবিমোহিতাত্মা রাজা গণেশো বহুশাস্ত্রদর্শী ॥

গ্রহপক্ষাক্ষিশশধৃতমিতে শাকে সুবুদ্ধিমান্।
গণেশো যবনং জিত্বা গৌড়ৈকচ্ছত্রধৃগভূৎ ॥

বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে এই তিনখানি বই যতটা প্রাচীনত্ব দাবী করছে, ততটা প্রাচীন নয়। সুতরাং এদের মধ্যে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিকতা সন্দেহজনক। কিন্তু রাজার নাম সম্বন্ধে এদের সাক্ষ্যকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা চলে না।

এই রাজার প্রকৃত নাম যে 'গণেশ', একথা মনে করার স্বপক্ষে আরও অনেক যুক্তি আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বেভারিজ এই যুক্তিগুলি দেখিয়েছিলেন —গ্ (গাফ্) এবং ক্ (কাফ্) অক্ষরের পার্থক্য ফার্সী পুঁথিতে সাধারণতঃ রক্ষিত হয় না এবং 'গাফ্' এর জায়গায় 'কাফ্'ই প্রায় সর্বত্র লেখা হয়। …১৮৯০ খৃষ্টাব্দের Journal Asiatique-এর ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কান্দাহার শিলালিপিতে দেখতে পাওয়া যায়, 'ঘোড়াঘাট', 'গৌড়' এবং 'বাঙ্গালা' নামগুলি লেখা হয়েছে যথাক্রমে 'কোড়াকাট', 'কৌড়' এবং 'বাঙ্কালা' রূপে। এই কারণে 'কান্স' ও 'কনেস' মূলে 'গণেশ' ছিল বলে মনে হয়।…তাছাড়া সব পুঁথিতেই 'কান্স' নাম পাওয়া যায় বললে ভুল হবে। অন্ততঃ একখানি পুঁথিতে নিশ্চয়ই 'গণেশ' নাম ছিল, যেখানি বুকানন ব্যবহার করেছিলেন।…শুধু তাই নয়, 'গণেশ' রাজার স্মৃতি এখনও জনপ্রবাদের মধ্যে বেঁচে আছে। এঁর প্রকৃত নাম যদি 'কংস' হত, তাহলে বলতে হবে, এতবড়

একজন হিন্দু রাজার আসল নাম তাঁর স্বধর্মের লোকেরা ভুলে গেছে, কেবল মুসলমানরাই মনে করে রেখেছে। এ ব্যাপার অসম্ভব বলেই মনে হয়। (J.A.S.B , 1892, Pt. I, No. 2, pp. 118-119)

'গণেশ' নামের আগুক্ষর 'গ্' যে ফার্সী পুঁথিতে 'ক্' হয়ে পড়ত, তার আরও প্রমাণ আমরা পেয়েছি। লোদী বংশের সুলতান সিকন্দর লোদীর সময়ে 'গণেশ' নামে একজন হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁর আসল নামটি কেবলমাত্র 'মখ্‌জান-ই-আফ্‌গানী'র পুঁথিতে বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায়। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র পুঁথিতে এঁর নাম পড়েছে 'কনিস্'। সুতরাং বাংলার এই বিখ্যাত রাজার নামও যে মূলে 'গণেশ' ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ নেই বললেই চলে।

ঐতিহাসিক সূত্র

যে সমস্ত সূত্রের মধ্যে গণেশ ও তাঁর বংশের ইতিহাস পাওয়া যায়, তার মধ্যে আইন-ই-আকবরী, তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা, রিয়াজ-উস্-সলাতীন এবং বুকাননের বিবরণী উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সূত্রগুলির মধ্যে একটিও গণেশের সমসাময়িক নয়। 'আইন-ই-আকবরী' ও 'তবকাৎ-ই-আকবরী' আকবরের রাজত্বকালে এবং 'মাসির-ই-রহিমী' ও 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত হয়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এর লেখক গোলাম হোসেন তাঁর ব্যবহৃত সূত্রগুলির নাম করেন নি, কিন্তু তিনি যে 'আইন-ই-আকবরী', 'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' এবং আরও কতকগুলি অধুনালুপ্ত বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন, তা বোঝা যায়। গোলাম হোসেনের ঐতিহাসিকোচিত দৃষ্টি ছিল। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে শিলালিপি থেকেও তথ্য আহরণ করেছেন; কিন্তু তিনি অনেক ক্ষেত্রে যে কিংবদন্তীর উপরও নির্ভর করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুকাননের বিবরণী একটি অজ্ঞাতনামা ফার্সী বই অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনের' সঙ্গে এই বিবরণীর উক্তির অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে কিন্তু পার্থক্যের পরিমাণও উপেক্ষণীয় নয়।

সমসাময়িক নয় বলে এই সমস্ত সূত্রের উক্তি নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়,

বিশেষতঃ এদের লেখকরা যে সমস্ত সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করেছেন, সেগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যখন আমরা কিছুই জানি না। বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে এই সব সূত্রের উক্তি অনেক ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকাল সম্বন্ধে এদের ভুল অত্যন্ত বেশী। এদের মধ্যে দেওয়া প্রায় কোন ঘটনার সালই শুদ্ধ নয়, এমন কি কোন কোন রাজার নাম সম্বন্ধেও এদের মধ্যে গোলমাল আছে।* এইসব কারণে এদের যে সমস্ত কথা সমসাময়িক সূত্রের উক্তি দ্বারা সমর্থিত, কেবলমাত্র সেইটুকুই নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য যে সব বিষয়ে একাধিক সূত্রের বিবৃতির মধ্যে মিল আছে এবং যে সব উক্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়, সেগুলিও মোটামুটি ভাবে বিশ্বাসযোগ্য। যাহোক্ গণেশ ও তাঁর বংশের ইতিহাস রচনায় আরও কতকগুলি উপকরণ † আমাদের হস্তগত হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি সমসাময়িক। অবশ্য এই সব সূত্রের মধ্যে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস মেলে না, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায় মাত্র। আলোচনার মধ্যে যথাস্থানে এগুলির উল্লেখ ও ব্যবহার করা হবে।

গণেশের পূর্ব-ইতিহাস ও দেশ

এবার গণেশ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথমে আমাদের জানা দরকার, বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করার আগে তিনি কী ছিলেন। এ সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্ সলাতীনে' খুব স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, গণেশ ছিলেন 'ভাতুড়িয়া'র জমিদার। রেনেলের মানচিত্রে

*এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্যে আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal, Vol. II, pp. 115-16 দ্রষ্টব্য।

† জনাব আহমদ হাসান দানী 'দেববংশের ইতিবৃত্তি' নামে আরএকটি সূত্রের বিবরণ দিয়েছেন ও ব্যবহার করেছেন (J.A.S., 1952, pp. 151-52)। এই 'দেববংশের ইতিবৃত্তি' যে আসলে 'বটুভট্টের দেববংশ' নামে একখানি জাল কুলগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, তা ৺নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজন্য-কাণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত 'বটুভট্টের দেববংশে'র সংক্ষিপ্তসারের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই বোঝা যাবে। 'বটুভট্টের দেববংশ' যে জাল বই, তা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন (ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৪৬, পৃঃ ৬৬০ দ্রষ্টব্য)।

(১৭৭৮) [illegible] একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল 'ভাতুড়িয়া' নামে চিহ্নিত হয়েছে। এই অঞ্চলটির পশ্চিম দিকে মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্ব দিকে করতোয়া নদী এবং উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। প্রাচীন দলিলপত্রেও 'ভাতুড়িয়া'র নাম পাওয়া যায়। জাফর খাঁর বন্দোবস্তে (১৭২২) 'ভাতুড়িয়া'কে চাকলা ঘোড়াঘাটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।* ভাতুড়িয়া নামটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং মীরজুমলার জায়গীরগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ভাতুড়িয়া। † 'আইন-ই-আকবরী'তে সরকার বাজুহার অন্তর্গত বাহড়িয়া বা বাহসুড়িয়া নামে একটি মহলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেভারিজ মনে করেন, 'ভাতুড়িয়া' নামই লিপিকর-প্রমাদে বাহড়িয়া বা বাহ্‌সুড়িয়া হয়েছে। ‡ যাহোক্ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাতুড়িয়া অঞ্চল বর্তমানে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত এবং অঞ্চলটির নাম অত্যন্ত প্রাচীন। সুতরাং গণেশ যে এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন, 'রিয়াজে'র এই কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। অন্য কোন বিবরণীতে 'রিয়াজ'এর উক্তির বিরোধী কোন কথা নেই। অবশ্য বুকানন লিখেছেন, "Gones, a Hindu, and Hakim, of Dynwaj (perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur), seized the government." বুকাননের উক্তিতে বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশটুকু থেকেই অনেকে মনে করেন, তাঁর ব্যবহৃত পুঁথির মতে গণেশ দিনাজপুর অঞ্চলের রাজা ছিলেন। কিন্তু বন্ধনীর মধ্যেকার অংশটুকু বুকাননের স্বরচিত। তাঁর ব্যবহৃত পুঁথিতে 'গণেশ' সম্বন্ধে 'দিনাজপুরের জমিদার' এই উক্তি ছিল না। ছিল এমন একটি শব্দ, বুকানন যার অনুবাদ করেছেন, "Hakim of Dynwaj"; এই শব্দটির বুকানন মানে করেছেন "Perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur." কিন্তু এই ব্যাখ্যা যে তাঁর নিজেরই কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি তার প্রমাণ হচ্ছে, দিনাজপুর অঞ্চলের বিবরণ দেবার সময় তিনি লিখেছেন," Whether or not, it is the same with Dynwaj, the governor (Hakim) of which, Gones, usurped the government of Gaur, I cannot say." (Martin's Eastern India, Vol. II, p. 624) তাছাড়া পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে 'দিনাজ' নামে কোন জায়গা

* J. A. S, B. 1892, Pt. I, No. 2., p. 120

† Do.

‡ Do.

ছিল না। বর্তমানে 'দিনাজপুর' নামে যে অঞ্চল পরিচিত তা বিজয়নগর নামে একটি ছোট পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল।* যাই হোক্ বুকাননের মনগড়া ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র সুস্পষ্ট উক্তিকে অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। অতএব গণেশ বর্তমান রাজশাহী জেলার অন্তর্গত ভাতুড়িয়া অঞ্চলের জমিদার ছিলেন বলেই মনে হয়। বুকাননের বিবরণীতে উল্লিখিত "Hakim, of Dynwaj" এর আসল মানে কি, সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের নামাঙ্কিত ও তাঁরই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, এতে নির্মাতার নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

"মালিক সদ্‌র্ অল্-মিলাৎ ওয়াদ্-দীন সুলতানী আমীর-এ-ডীহ্ (?) ভাতোরিয়া (?) খাস্।"

অবশ্য "ডীহ্" ও "ভাতোরিয়া" এই শব্দ দুটির পাঠ সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নয়। কিন্তু এই পাঠ ঠিক হলে রাজা গণেশের সঙ্গে ভাতুড়িয়ার সম্পর্কের আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়।

যাহোক্, গণেশ যে উত্তরবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের জমিদার ছিলেন, তাতো জানা গেল। তিনি যে জমিদার ছিলেন, তা তাঁর প্রতিপক্ষ মুসলিম দরবেশ নূর কুৎব্ আলমের একটি সম্প্রতি-আবিষ্কৃত চিঠি থেকেও জানা যায়। নূর কুৎব্ লিখেছেন—

"Oh soul of thy father, how strange is the affair and astonishing the time that···thousands of Doctors of religion and learned men and asceties and devotees had fallen under the command of an infidel, a zeminder of 400 years (standing)."

বাংলা ভাষায় এর মর্মানুবাদ এই,

"ঈশ্বরের কী অদ্ভুত লীলা। হাজার হাজার ধার্মিক এবং শিক্ষিত লোক আজ ৪০০ বছরের জমিদার এক বিধর্মীর অধীনস্থ হয়েছে।"

কিন্তু "৪০০ বছরের জমিদার" কথার অর্থ কী? কষ্টকল্পনা করে এই মানে

---

* অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬০, পৃঃ ৯০—৯৩ দ্রষ্টব্য)।

দাঁড় করানো যায়—যার বংশ ৪০০ বছর ধরে জমিদারী করে আসছে। মূলে এখানে ৪০০ মনসবের জমিদার বা এই ধরণের আর কোন কথা ছিল বলে মনে হয়।

গণেশের জাতি বা গোত্র সম্বন্ধে বা পূর্ব্বপুরুষদের নাম সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি।* তবে তাঁর সমসাময়িক দরবেশ নূর কুৎব্ আলম এবং আশ্‌রফ্ সিম্‌নানী তাঁদের চিঠিতে গণেশের নাম লিখেছেন 'কানস্ রায়', কিন্তু মুসলমানরা হিন্দু রাজাদের নামের সঙ্গে প্রায় সর্বদাই 'রায়' শব্দ যোগ করতেন। তাঁদের হাতে পড়ে পৃথ্বীরাজ 'রায় পিথোরা'য়, লক্ষ্মণসেন 'রায় লখমনিয়া'য়, দনুজমাধব 'রায় দনুজ'এ পরিণত হয়েছেন। সুতরাং এর থেকে কোন আলোক পাওয়া যায় না।

বাংলার শাসনক্ষমতা হস্তগত করার আগে গণেশ ইলিয়াস্ শাহী সুলতানদের অমাত্য ছিলেন এ কথা কেবলমাত্র ফিরিশ্‌তা বলেছেন। বলা বাহুল্য এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

গণেশের অভ্যুদয়

কীভাবে গণেশ ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেন, তার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ইলিয়াস শাহী বংশীয় সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর প্রসঙ্গে তাঁর প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি এবং গিয়াসুদ্দীনের পরবর্তী সুলতানদের সময়ে তাঁকে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন দেখতে পাচ্ছি। এই ক্ষমতারই পরিণতি হয়েছিল বাংলার সিংহাসন অধিকার করার মধ্যে। এক হিন্দু জমিদারের এতখানি ক্ষমতা অর্জন সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। আপাত-দৃষ্টিতে এই ব্যাপারকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র মনে হয়; কিন্তু ঐ সময়ের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে না। হিন্দু জমিদারদের শক্তি ঐ সময় নিতান্ত অল্প ছিল না। ফিরোজ শাহ তুঘলক যখন বাংলার বিদ্রোহী সুলতান ইলিয়াস শাহকে দমন করতে বাংলাদেশে আসেন, তখন বাংলার রাও, রাণা এবং জমিদাররা ইলিয়াস শাহের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেন, এই কথা জিয়াউদ্দীন বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে

* অনেকের বিশ্বাস, গণেশ 'ভাদুড়ী' পদবীধারী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পাওয়া যায়। 'তারিখ-ই-মোবারকশাহী'তে লেখা আছে, সহদেব নামে একজন হিন্দু বীর ইলিয়াস শাহের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছিল, তার জন্য হিন্দু জমিদারদের শক্তি অনেকখানি কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। এই যুগের হিন্দু জমিদারদের অন্যতম গণেশও অসামান্য সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। এটা আমাদের ধরে নেওয়া কথা নয়। জৌনপুরের বিখ্যাত দরবেশ আশ্‌রফ সিম্‌নানী গণেশের প্রতিপক্ষ নূর কুৎব্‌ আলমকে এক চিঠিতে লিখেছেন, "As regards what you have written about the overthrowing of the kingdom of Islam by the army of Kans Rai, the infidel,······everything has become evident." "কাফের কান্‌সের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইসলামের রাজত্বের উচ্ছেদ সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন··· সে সম্বন্ধে সবই স্পষ্ট হয়েছে।" এই উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে, গণেশ প্রধানতঃ সামরিক শক্তির জোরেই ইলিয়াস শাহী বংশের উচ্ছেদ করেছিলেন। ঐ সময়ে তাঁর সামরিক শক্তি ইলিয়াস শাহী সুলতানদের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ইলিয়াস শাহী সুলতানদের এরকম শক্তিহানি ঘটল কেন? এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম দু'জন সুলতান ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ অত্যন্ত সুযোগ্য রাজা ছিলেন। তাঁরা দিল্লীর সম্রাটের কাছেও নতি স্বীকার করেননি। সিকন্দর শাহের ছেলে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের যোগ্যতা পিতা ও পিতামহের তুলনায় কিছুমাত্র কম ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের পিতার সঙ্গে তাঁর শত্রুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি পূর্ববঙ্গে বহুদিন ধরে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এবং অবশেষে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে নিহত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। পিতাপুত্রের এই দ্বন্দ্বের ফলেই যে ইলিয়াস শাহী বংশের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে গৌড়ের রাজশক্তি ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে হীনবল হয়ে যায়। বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায়, গিয়াসুদ্দীন জনৈক সাহেব খাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ফল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অবশেষে ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাস-

আতকতা করে কোন রকমে জয়ী হন। ("...Shah Nur Kotub Alam... attempted to make a peace with a Shaheb Khan, with whom Ghyasuddin had been carrying on an unsuccessful war. While the treaty was going forward, Ghyasuddin seized on his adversary.") এই জাতীয় দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলে গিয়াসুদ্দীনের সামরিক শক্তি যে অনেকখানি খর্ব হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

অসমীয়া বুরঞ্জী থেকে জানা যায় যে, গিয়াসুদ্দীন কামতারাজ এবং অহোমরাজের বিরোধের সুযোগ নিয়ে কামতারাজ্য জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কামতারাজ ও অহোমরাজ এক হয়ে তাঁকে প্রতিহত করেন (History of Bengal, D. U., Vol, II, p. 118)। এই জাতীয় ব্যর্থ সমর-প্রচেষ্টাও নিশ্চয়ই গৌড়রাজ্যের সামরিক শক্তি হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলেই গণেশ মাথা তোলবার সমধিক সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

মিথিলার অমর কবি বিদ্যাপতি এই সময়েই বর্তমান ছিলেন। তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহ সম্বন্ধে 'পুরুষপরীক্ষা' নামে বইটিতে বলেছেন, "যো গৌড়েশ্বরগজ্জনেশ্বররণক্ষৌণিষু লব্ধা যশো" এবং 'শৈবসর্বস্বসারে' বলেছেন, "শৌর্যাবর্জিত গৌড়গজ্জনমহীপালোপনম্রীকৃতা।" 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৪১৫ খ্রীঃর আগে লেখা এবং গৌড়েশ্বরের সঙ্গে শিবসিংহের যুদ্ধ তারও আগেকার অর্থাৎ গণেশের অভ্যুত্থানের প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বা তাঁর ছেলে সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ। যা হোক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি শিবসিংহের হাতে গৌড়েশ্বরের পরাজয় তাঁর সামরিক শক্তির শোচনীয় অবস্থার সাক্ষ্য দেয়। এই পরাজয়ের পর বোধ হয় গৌড়েশ্বরের সামরিক শক্তি আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। শিবসিংহের সঙ্গে গণেশের বন্ধুত্ব ছিল (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য), সুতরাং গণেশের অভ্যুত্থানে সাহায্য করার জন্যেই বোধ হয় শিবসিংহ গৌড়েশ্বরের উপর চরম আঘাত হেনেছিলেন।

আকস্মিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গণেশ ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন না ধীরে ধীরে তাঁর সামরিক শক্তির প্রভাবে ইলিয়াস শাহী সুলতানদের কাছ থেকে একটু একটু করে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন, তা বলা খুবই শক্ত।

আশরফ সিম্‌নানী নূর কুৎব্ আলমকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে "কাফের কান্‌সের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইসলামের রাজত্বের উচ্ছেদ"এর কথা আছে। এর থেকে মনে হয়, গণেশ আকস্মিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। কিন্তু গণেশ যে কয়েক বছর মুসলমান সুলতানদের সিংহাসনে বসিয়ে রেখে রাজ্যশাসনে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলেন, তাও বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সুতরাং যতদূর মনে হয়, যখন গৌড়ের সুলতানের সামরিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ে রাজা গণেশ তাঁর সামরিক শক্তির জোরে সুলতানের উপর প্রভাব বিস্তার করেন, হীনবল সুলতান তাঁকে প্রতিহত করতে না পেরে তাঁকে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হন এবং নিজে নামে-মাত্র রাজা থাকেন। কয়েক বছর এইভাবে চলবার পর গণেশ সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে উচ্ছেদ করে সিংহাসন অধিকার করেন (যা আমরা পরে দেখাব)। সম্ভবতঃ এই সময়েই তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ও তাঁর সমর্থকদের নিহত করেছিলেন,—যাকে আশ্‌রফ্ সিম্‌নানী বলেছেন, "কাফের কান্‌সের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ"; কিন্তু আমরা দেখতে পাব, প্রকৃত ক্ষমতা তার অনেক আগেই গণেশের হস্তগত হয়েছিল।

আমরা আগেই বলেছি, সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুপ্রসঙ্গে গণেশের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' বলা হয়েছে, গিয়াসুদ্দীন গণেশের চক্রান্তের ফলে নিহত হয়েছিলেন। এই উক্তির মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই। বাংলার সিংহাসনে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও জনপ্রিয় রাজা আসীন থাকলে গণেশের পক্ষে ক্ষমতা অধিকার করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং তিনি যে ষড়যন্ত্র করে গিয়াসুদ্দীনকে হত্যা করিয়েছিলেন, 'রিয়াজ'-এর এই উক্তিতে অবিশ্বাস করার কোন কারণ আমি দেখি না। পরবর্তী ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখলেও এই কথা সত্য বলেই মনে হবে। গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকাল ৭৯৩—৮১৩ হিজিরা। সুতরাং আপাতত দেখা যাচ্ছে, ৮১৩ হিজিরা বা ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গণেশের প্রথম প্রবেশ।

গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ সিংহাসনে বসেন এবং মাত্র দু' তিন বছর (৮১৩ হিজিরা থেকে ৮১৫ হিজিরা অবধি)

রাজত্ব করেন। ‡ অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, সৈফুদ্দীন সম্ভবতঃ নামেই রাজা ছিলেন, ক্ষমতা তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না ; কারণ, 'তবকাৎ-ই-আকবরী,' 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' বলা হয়েছে অমাত্য ও সেনানায়কেরা তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী শিহাবুদ্দীনকেও অমাত্যেরাই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন এই কথা তবকাৎ, ফিরিশ্‌তা, রিয়াজ প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলার অনেক সুলতান সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। এমনকি সিকন্দর শাহ, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ প্রভৃতি প্রতাপশালী সুলতানদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে পিতার মৃত্যুর পরে অমাত্যেরা তাঁদের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। হয় এই কথা একটা বাঁধি গৎ, নয় তো সে সময় বাংলায় মৃত রাজার উত্তরাধিকারীর সিংহাসনে বসার আগে অমাত্যদের আনুষ্ঠানিক নির্বাচনের প্রথা ছিল। মোটের উপর এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য নেই।

যাহোক্ সৈফুদ্দীনের দু' তিন বছরের রাজত্ব যে বিশেষ আরামের হয়নি, তা মনে করার কারণ আছে। কারণ, চীন দেশের মিং রাজবংশের ইতিহাস-গ্রন্থ 'মিং-শে'তে বলা হয়েছে, চীন সম্রাট য়ং-লো তাঁর রাজত্বের দশম বর্ষে বা ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজার (গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের) মৃত্যুসংবাদ পান এবং যুবরাজ সৈ-উ-তিং (সৈফুদ্দীন) এর অভিষেক উৎসবে যোগ দেবার জন্যে প্রতিনিধিদের পাঠান। মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, সৈফুদ্দীন ৮১৩ হিজিরাতে বা ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে তাঁর অভিষেক-উৎসবের এত অস্বাভাবিক দেরী হবার কারণ কি ? রাজ্যের মধ্যে কোন উৎকট গোলযোগের জন্যেই অভিষেক-উৎসব স্থগিত ছিল বলে মনে হয়। এই গোলযোগ সম্ভবতঃ উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিদের ক্ষমতা-অধিকারের দ্বন্দ্ব। এই সব গোলযোগ গণেশের শক্তিবৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে, গণেশের অভ্যুত্থানই এই গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল। সৈফুদ্দীনের ৮১৫ হিজিরা অবধি তারিখের মুদ্রা পাওয়া গেছে। পরবর্তী সুলতান শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহেরও ৮১৫ হিজিরার মুদ্রা পাওয়া গেছে। সুতরাং সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ নিশ্চয়ই ৮১৫ হিজিরা বা ১৪১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন। অর্থাৎ অভিষেক-উৎসবের কিছুদিন পরেই তিনি মারা যান।

সৈফুদ্দীনের রাজত্বকালে গণেশের ক্ষমতা হস্তগত করার যদিও বা কিছু

বাকী থেকে থাকে, পরবর্তী রাজা শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের (৮১৫—৮১৭ হিজিরা) সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সেটুকুও সম্পূর্ণ হল। শিহাবুদ্দীন নিশ্চয়ই সৈফুদ্দীনের ছেলে ছিলেন না। সাধারণত সুলতানের ছেলে সুলতান হলে মুদ্রাতে তার উল্লেখ থাকে, কিন্তু শিহাবুদ্দীনের একটি মুদ্রাতেও তাঁর পিতার নাম মেলে না। বুকাননের বিবরণী ভিন্ন অন্যান্য বিবরণগুলিতে সৈফুদ্দীনের উত্তরাধিকারীকে তাঁর ছেলে বলা হয়েছে এবং তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে শামসুদ্দীন। অবশ্য 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উল্লেখ করা হয়েছে, "কারও কারও মতে শামসুদ্দীন সুলতান-উস্-সলাতীনের (সৈফুদ্দীনের) ঔরসপুত্র ছিলেন না, পালিত পুত্র ছিলেন এবং তাঁর নাম ছিল শিহাবুদ্দীন।" শামসুদ্দীন আর শিহাবুদ্দীন যে একই লোক, 'রিয়াজ'এর এই উক্তি সে সম্বন্ধে সব সন্দেহ ভঞ্জন করে। বুকাননের বিবরণীতে স্পষ্টই বলা হয়েছে, "সৈফুদ্দীনের উত্তরাধিকারী হন তাঁর ক্রীতদাস শিহাবুদ্দীন।" সুতরাং শিহাবুদ্দীন যে সৈফুদ্দীনের ছেলে ছিলেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় সিংহাসনের উপর তাঁর দাবী বিশেষ জোরালো ছিল বলে মনে হয় না। 'তবকাৎ' ও 'ফিরিশ্‌তা'র ভাষায় "অমাত্যেরা" এবং 'রিয়াজ' এর ভাষায় "রাজ্যের উপদেষ্টারা ও সচিবেরা" তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। আসলে গণেশই নিজের মনোনীত লোককে সিংহাসনে বসিয়ে আপনার অবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। শিহাবুদ্দীন নামেই রাজা ছিলেন; তাঁর রাজত্বকালে দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন গণেশ—অন্ততঃ তিনটি বিবরণীতে এই কথা পাচ্ছি। 'আইন-ই-আকবরী'তে আবুল ফজল বলেছেন, "কান্‌সি নাম্ বুমি অজ্ হীলা আন্দোজি বর্ শামসুদ্দীন্ নবিরে উ চিরা দস্তি য়ফ্‌ৎ"।* এর ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ যথাক্রমে হবে, "A native of that place (Bengal), named Kansi, through diplomacy got the upper hand over Shamsuddin, his (Ghiyasuddin's) grandson" এবং "সেই দেশের (বাংলার) অধিবাসী কান্‌সি নামে একজন হিন্দু কৌশলের

---

* আইন-ই-আকবরী, নওয়াল কিশোর সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬। এই অংশটির জ্যারেট অনুবাদ করেছেন, "A native of Bengal by name Kansi fraudfully dispossesed Shamsuddin who was his (Ghiyasuddin's) grandson"। তা যে ভুল, তা দেখাবার জন্যেই মূল উদ্ধৃত করলাম।

জোরে তাঁর (গিয়াসুদ্দীনের) পৌত্র শামসুদ্দীনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।" 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' পাচ্ছি, "ঐ সময় (শিহাবুদ্দীনের রাজত্বকালে) কান্‌স্ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন।" কিন্তু এসম্বন্ধে সবচেয়ে স্পষ্ট ও বিস্তারিত বিবৃতি পাওয়া যায় 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য়। ফিরিশ্‌তা বলেছেন, "তাঁর (শিহাবুদ্দীনের) তরুণ বয়সের জন্যে বুদ্ধি অত্যন্ত কম ছিল। কান্‌স্ নামে একজন বিধর্মী, যিনি এই বংশের একজন অমাত্য ছিলেন, তাঁর রাজত্বকালে বিরাট ক্ষমতা ও প্রাধান্য অর্জন করেন এবং রাজ্য ও রাজস্ব— সব কিছুরই উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন।" শিহাবুদ্দীন তরুণবয়স্ক ছিলেন, ফিরিশ্‌তার এই কথা সত্য বলে মনে হয়। কারণ শিহাবুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পৌত্রস্থানীয়। গিয়াসুদ্দীনের পিতৃবিয়োগ হয় ১৩৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে এবং তিনি নিজে মারা যান ১৪১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে—সম্ভবতঃ ষড়যন্ত্রের ফলে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৬০ বছরের বেশী হয়েছিল বলে মনে হয় না। তাঁর মৃত্যুর দু' বছর বাদেই শিহাবুদ্দীন রাজা হয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর বয়স বেশী না হবারই কথা।

সৈফুদ্দীনের মত শিহাবুদ্দীনের রাজত্বও দু'তিন বছরের মত স্থায়ী হয়েছিল। ৮১৭ হিজিরার পরে তাঁর আর কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। ৮১৭ হিজিরাতেই আবার শিহাবুদ্দীনের ছেলে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। শিহাবুদ্দীনের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ একাধিক মত লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'রিয়াজ'-রচয়িতা বলেছেন, "স্বাভাবিক কোন রোগ-ভোগের ফলে অথবা রাজা কান্‌সের কোন কৌশলে তাঁর মৃত্যু হয়।" এর পরেই তিনি বলেছেন, "কিন্তু প্রকৃত বিবরণ এই যে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা কান্‌স তাঁকে আক্রমণ করেন, হত্যা করেন এবং সিংহাসন অধিকার করেন।" একই রাজার মৃত্যু সম্বন্ধে এত পরস্পরবিরোধী মত প্রচারিত হবার কারণ কী? আমাদের মনে হয়, দুই বিভিন্ন রাজার মৃত্যু-প্রসঙ্গ এক সূত্রে জড়িয়ে যাওয়াতে এই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। শিহাবুদ্দীনের মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে হওয়ারই বেশী সম্ভাবনা, কারণ 'রিয়াজ' ভিন্ন অন্য কোন বিবরণে তাঁর মৃত্যুর পিছনে গণেশের হাত ছিল এমন কোন ইঙ্গিত নেই, এমন কি যে মুসলিম দরবেশরা গণেশের প্রতিপক্ষ ছিলেন, তাঁদের জীবনীগ্রন্থ 'মিরাৎ-উল্-আস্‌রারে' ও এরকম কোন কথা নেই; তাছাড়া শিহাবুদ্দীনের মৃত্যুর পরেই গণেশ সিংহাসনে বসেননি, শিহাবুদ্দীনের ছেলে

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং গণেশের পক্ষে তাঁরই হাতের পুতুল শিহাবুদ্দীনকে হত্যা করার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যে রাজাকে অপসারিত করে গণেশ সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তিনি শিহাবুদ্দীন নন, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। এই কারণে আমাদের মনে হয় এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহই গণেশের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন; পরবর্তীকালে আলাউদ্দীনের মৃত্যু প্রসঙ্গে শামসুদ্দীনের নাম আরোপিত হয়েছে।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের সমস্ত মুদ্রাই ৮১৭ হিজিরার। ঐ বছরেই তাঁর পিতার মুদ্রা পাওয়া গেছে এবং ঐ বছরের পরে তাঁর আর কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি। সুতরাং ফিরোজের রাজত্ব খুবই অল্পদিন—৮১৭ হিজিরার একটা অংশমাত্র—স্থায়ী হয়েছিল বলতে হবে। কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতেই আজ অবধি এই আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম পাওয়া যায়নি। আসলে যতদূর মনে হয়, এই রাজার অভিষেক একটা নামমাত্র ব্যাপার। গণেশই এই সময় রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন। তাঁরই খুশীমত এঁর অভিষেক ও অপসারণ (এবং সম্ভবতঃ নিধন) হয়েছিল, তাই ইতিহাসে এই নামটি স্থান পায়নি। এঁর পিতা তরুণ হলে ইনি বালক ছিলেন বলতে হবে।

গণেশ কি প্রথমেই নিজে রাজা হয়েছিলেন?

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে অপসারিত করে গণেশ সিংহাসন অধিকার করলে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পর তাঁর মুদ্রা পাওয়ার কথা। কিন্তু আলাউদ্দীনের ঠিক পরেই ৮১৮ হিজিরা থেকে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। অথচ প্রত্যেকটি বিবরণ থেকেই জানা যায় যে, গণেশের ছেলে যদু বা জিতমল্ল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জলালুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। এর থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ইতিমধ্যে রাজা গণেশের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। যে অবস্থার মধ্যে যদু ইস্‌লামধর্মান্তরিত ও সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, তার বর্ণনা 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' মেলে; তার সংক্ষিপ্তসার এই—

(১) ইলিয়াস শাহী বংশকে উচ্ছেদ করে গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেন।

(২) সিংহাসনে বসবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে ওঠে। গণেশ তখন অনেক মুসলমান দরবেশকে বধ করেন।

দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম তখন জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম শর্কীকে এক চিঠি লিখে গণেশকে দমন করতে আহ্বান জানান।

(৩) ইব্রাহিম সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে গণেশ নতি স্বীকার করেন এবং নূর কুৎব্ আলমের সঙ্গে আপোষ করেন। আপোষের সর্ত অনুযায়ী গণেশের ছেলে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করেন, ইব্রাহিমও দেশে ফিরে যান।

বুকাননের বিবরণীতে এই বিবরণের প্রায় সম্পূর্ণ সমর্থন আছে; অবশ্য ইব্রাহিমের পরিচয় ও পরিণাম সম্বন্ধে তার মধ্যে ভ্রান্ত উক্তি করা হয়েছে, তা আমরা পরে দেখাব। আপাততঃ আমাদের বিচার্য বিষয় হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত বিষয় তিনটি সত্য কিনা? এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ সত্য, কারণ সমসাময়িক চিঠিপত্র থেকে এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। তৃতীয়টিরও প্রায় ষোল আনা সমর্থন একটি সমসাময়িক সূত্র থেকে পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় দুটি ঠিক্ হলে প্রথমটিও সত্য হতে বাধ্য। অর্থাৎ ইলিয়াস শাহী বংশকে উচ্ছেদ করে গণেশ নিজেই কিছু সময়ের জন্যে সিংহাসনে বসেছিলেন। তারপর ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয় এবং তার ফলে তিনি নিজের ধর্মান্তরিত পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কেউ কেউ মনে করেন, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের ঠিক পরেই জলালুদ্দীন সিংহাসনে বসেছিলেন। কিন্তু এই অভিমত সমর্থন করা যায় না। কারণ ইব্রাহিমের সঙ্গে সংঘর্ষ পর্যন্ত গণেশ যদি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের নামেই রাজত্ব করতেন, তাহলে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সরিয়ে গণেশের ছেলেকে সিংহাসনে বসাবার কথা উঠত না। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, আলাউদ্দীন ফিরোজ ও জলালুদ্দীনের মাঝখানে গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেছিলেন। আলাউদ্দীনের সব মুদ্রাই ৮১৭ হিজিরার, জলালুদ্দীনের প্রাচীনতম মুদ্রা ৮১৮ হিজিরার। সুতরাং ৮১৭ হিজিরার শেষের দিকে খুব সামান্য সময় এবং ৮১৮ হিজিরার প্রথমাংশে কিছু সময়* গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসে রাজত্ব করেছিলেন সিদ্ধান্ত করলে কোন দিক দিয়ে কোন অসঙ্গতি থাকে না। ইব্রাহিম শর্কীর আক্রমণের প্রাক্কালে আশ্রফ সিম্নানী যে চিঠি লিখেছেন,

* সবশুদ্ধ অন্ততঃ ছ'মাস। কারণ এই সময়ের মধ্যে বাংলা থেকে জৌনপুর, জৌনপুর থেকে বাংলায় অনেকগুলি চিঠির আদানপ্রদান হয়েছিল।

তাতেও পাওয়া যায় যে গণেশ তাঁর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে "ইস্‌লামের রাজত্বের উচ্ছেদ" করেছেন। এর থেকেও মনে হয়, ঐ সময়ে বাংলার সিংহাসনে কোন নামমাত্র মুসলমান রাজাও ছিল না এবং গণেশ নিজেই সিংহাসনে বসেছিলেন। আরও একটি সমসাময়িক সূত্র থেকে এই সিদ্ধান্তের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি। চীন দেশের মিং রাজবংশের ইতিহাস 'মিং-শে' থেকে জানা যায় যে, চীন সম্রাট য়ং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাসে চীনসম্রাটের একদল প্রতিনিধি বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় এসে রাজার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। য়ং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাস ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গ্রীষ্মকালে * এবং ৮১৮ হিজিরার প্রথম দিকে পড়েছিল। আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ সময়ে গণেশের নিজেরই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবার কথা। বাংলার রাজার সঙ্গে চীনা প্রতিনিধিদের এই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত 'সিং-চা-শেং-লান' নামে একটি চীনা বইয়ে পাওয়া যায়। বর্ণনাটি চীনা প্রতিনিধিদলের একজন সদস্যেরই লেখা। এতে বাংলার রাজার নামটি পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এই বর্ণনাটুকু মেলে—

"প্রধান দরবারে দামী পাথরে খচিত উঁচু এক সিংহাসনে পায়ের উপর পা রেখে রাজা বসেছিলেন। তাঁর কোলের উপর ছিল দু-দিকে ধার-ওয়ালা তলোয়ার। ······তিনি আমাদের প্রত্যভিবাদন করে চীনসম্রাটের ফরমানটি একবার মাথায় ঠেকিয়ে তারপর খুললেন। রাজা চীনসম্রাটের প্রতিনিধিদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন এবং আমাদের সৈন্যদের অনেক উপহার দিলেন।······তার পর রাজা একটি সোনার আধারে রক্ষিত সোনার পাতের উপরে লেখা এক বাণী চীনসম্রাটকে দেবার জন্যে (প্রতিনিধিদলের নেতার হাতে) দিলেন।" ৮১৮ হিজিরাতে এক জলালুদ্দীন ছাড়া আর কোন রাজার মুদ্রা পাওয়া যায় না। কিন্তু চীনা প্রতিনিধিদের আগমনের সময়ের কথা ভাবলে মনে হয়, এই রাজা জলালুদ্দীন নন। এই রাজা যে হিন্দু, তারও ইঙ্গিত 'সিং-চা-শেং-লান'এ আছে। এতে বলা হয়েছে যে রাজা যে ভোজসভায় চীনা প্রতিনিধিদের আপ্যায়িত করেছিলেন সেখানে "গরু বা ভেড়ার মাংস নিষিদ্ধ

* চীনা প্রতিনিধিদের অন্যতম সদস্য এই সাক্ষাৎকারের ও তাঁদের দেখা বাংলা দেশের বিবরণ দেবার সময় বাংলার সুস্বাদু ফল হিসাবে আম ও কাঁঠালের উল্লেখ করেছেন—'সিং-চা-শেং-লান' গ্রন্থে। এ দুটিই গ্রীষ্মকালের ফল।

ছিল।"* তারপর হিন্দুদের সপ্রশংস বর্ণনা বিবরণীটির একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। এর আগে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালেও একদল চীনা প্রতিনিধি বাংলায় এসেছিলেন, এই প্রতিনিধিদলের সদস্য মা-হুয়ান বাংলার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাতে হিন্দুদের কথা একদম নেই, কেবল মুসলমানদের কথাই আছে। কিন্তু 'সিং-চা-শেং-লান্'এ মুসলমানদের সম্বন্ধে একটি কথাও পাওয়া যায় না, হিন্দুদের সম্বন্ধে অনেক কথাই মেলে। তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,—

"এখানে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, যাদের নাম য়িন্-তু (হিন্দু)। তারা গরুর মাংস খায় না এবং তাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা এক জায়গায় বসে খাওয়া দাওয়া করে না। তাদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করে না।……তাদের মধ্যে যদি কোন গরীব লোকের জীবিকানির্বাহের উপায় না থাকে, তাহলে গ্রামের বিভিন্ন পরিবার পালা করে তাকে সাহায্য করবে, কিন্তু অন্য কোন গ্রামে গিয়ে ভিক্ষা করতে দেবে না। এই লোকগুলি তাদের উদার সমাজ-চেতনার জন্যে সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য।"

সকলেই জানেন, কোন দেশে বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিরা এলে তাঁদের যে সমস্ত জিনিষ দেখানো হয়, তার পিছনে ঐ দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের প্রভাব থাকে। এই জন্যে গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকালে আগত চীনা প্রতিনিধিরা শুধু এদেশের মুসলমানদেরই দেখেছিলেন। 'সিং-চা-শেং-লান'এর বিবৃতিতে হিন্দুদের সম্বন্ধে এত কথা থাকায় মনে হয়, ঐ সময়ে গণেশই বাংলার

*জনৈক মুসলমান পণ্ডিত আমাকে বলেছেন, আগে মুসলমান রাজাদের ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভোজসভায় চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস দেওয়া হতো না, সুতরাং গরু-ভেড়ার মাংস নিষিদ্ধ থাকা থেকে এই রাজার হিন্দু হওয়া প্রমাণিত হয় না। কিন্তু গরু-ভেড়ার মাংসের বদলে অধিকতর সুস্বাদু পক্ষি-মাংস ভোজসভায় দেওয়া এক কথা আর গরু-ভেড়ার মাংস নিষিদ্ধ করা আর এক কথা। গরু হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ, ভেড়ার মাংসও বহু হিন্দু স্পর্শ করেন না। সুতরাং হিন্দু ভিন্ন কোন মুসলমান রাজা ভোজসভায় গরু-ভেড়ার মাংস নিষিদ্ধ করতে পারেন বলে মনে হয় না। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচীও লিখেছেন, "This does not look like a Muhammadan banquet." (Visva-Bharati Annals, Vol. I, p. 111)

রাজা ছিলেন। আর যদি এই রাজা জলালুদ্দীন হন, তাহলে বলতে হবে সময়ে রাজকার্যে গণেশের নির্দেশানুযায়ীই ব্যবস্থা হত। কিন্তু আমরা দেখতে পাব, জলালুদ্দীনের প্রথম সিংহাসনের আরোহণের পরে অল্প কিছুদিন গণেশের প্রভাব সাময়িকভাবে লোপ পেয়েছিল। অথচ চীনা রাজদূতেরা জলালুদ্দীনের রাজসভায় এসে তখনই এসেছিলেন।

মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে গণেশের বিরোধ

এবার এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। 'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, গণেশ সিংহাসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে ওঠে। গণেশ কঠোর হাতে দরবেশদের দমন করেন। কীভাবে এই বিরোধ চরমে উঠল সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' পাওয়া যায়—গণেশ একদিন সভায় বসেছিলেন, এমন সময় বদ্‌র্-উল্-ইস্‌লাম নামে একজন দরবেশ সেখানে এসে তাঁকে অভিবাদন না করেই বসে পড়েন। গণেশ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বদ্‌র্-উল্-ইস্‌লাম বলেন, "শিক্ষিত লোক বিধর্মীকে অভিবাদন করেন না।" গণেশ সেদিনকার মত তাঁকে কিছু বলেন না, কিন্তু আরও একদিন বদ্‌র্-উল্-ইস্‌লাম তাঁকে অপমান করাতে তিনি তাঁকে হত্যা করেন। সেইদিনই পাণ্ডুয়ার অন্যান্য দরবেশ এবং উলেমাকে তাঁর আদেশে জলে ডুবিয়ে বধ করা হয়। বুকাননের বিবরণীতে এই কথাগুলিই সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়।

নূর কুৎব্ আলম ও ইব্রাহিম শর্কী

যাহোক্ গণেশের দমননীতির প্রতিকার করবার জন্যে দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম (ইনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সহপাঠী ছিলেন) জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে এক চিঠি লিখে গণেশকে শাস্তি দিতে অনুরোধ জানান এবং সেই চিঠি পেয়ে ইব্রাহিম নিজেই এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে গণেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। আগেই বলেছি, এই কথাগুলি 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণীতে * পাওয়া যায়; কিন্তু এসম্বন্ধে

---

* ইব্রাহিম যে জৌনপুরের সুলতান, সেকথা বুকাননের পুঁথিতে লেখা ছিল না। বুকানন ইব্রাহিমের পরিচয় জানতেন না। তাই তিনি লিখেছেন, "The saint Kotub Shah············wrote to a Sultan Ibrahim, who seems to have retained part of the kingdom, while the remainder fell to the share of Gones."

সমসাময়িক সূত্রেই পাওয়া গেছে * বলে আর জল্পনার আশ্রয় নেবার দরকার নেই। জৌনপুরে এই সময় একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন, তাঁর নাম আশ্‌রফ সিম্‌নানী। আশ্‌রফ সিম্‌নানীকে স্বয়ং সুলতান ইব্রাহিম অত্যন্ত ভক্তি করতেন এবং ইনি ছিলেন নূর কুৎব্‌ আলমের পিতার শিষ্য। আশ্‌রফ সিম্‌নানীর লেখা তিনখানি চিঠি সৈয়দ হাসান আস্‌কারি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। † এই চিঠিগুলির মধ্যে আলোচ্য ঘটনার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। আমরা চিঠিগুলি উদ্ধৃত করছি।

প্রথম চিঠিখানি স্বয়ং ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা। নূর কুৎব্‌ আলমের চিঠি পেয়ে ইব্রাহিম তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে আশ্‌রফ সিম্‌নানীর কাছে উপদেশ চেয়ে এক চিঠি লেখেন। এই চিঠিখানি তারই উত্তর। এতে তিনি লিখেছেন,—

"কাফের কানসের জোর করে ক্ষমতা দখল করার বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য চেয়ে কুৎব্‌ আলম আপনাকে যে চিঠি লিখেছেন, তার সারমর্ম এই,—

'প্রায় ৩০০ বছর বাদে ঐশ্লামিক ভূমি বাংলা দেশে বিশ্বাস(ধর্ম)-ধ্বংসকারী

---

* 'তবকাৎ-ই-আকবরী,' 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' প্রভৃতি বইতে ইব্রাহিমের বাংলা আক্রমণের উল্লেখ নেই বলে ইব্রাহিম সত্যিই আক্রমণ করে ছিলেন কিনা সে বিষয়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার মনে করেছিলেন আক্রমণের কথা সত্য হলেও ইব্রাহিম নিজে এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন নি। কিন্তু আশ্‌রফ সিম্‌নানীর চিঠি, মুল্লা তকিয়ার বয়াজ, সঙ্গীত-শিরোমণি প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত সূত্রগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে ৮১৮ হিজিরায় ইব্রাহিম সত্যিই বাংলা আক্রমণ করেছিলেন এবং তিনি নিজেই সে অভিযানে অধিনায়কতা করেছিলেন।

† Bengal, Past and Present, Vol. LXVII, 1948, pp, 32-39 দ্রষ্টব্য। আসকারি সাহেব চিঠিগুলির যে ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছিলেন, আমরা তার বঙ্গানুবাদ দিলাম। দরবেশদের চিঠিপত্র তাঁদের ভক্তেরা সংকলন করে রাখতেন। বহু দরবেশের চিঠি-পত্রের সংকলন-গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। আশ্‌রফ সিম্‌নানীর পত্রাবলীর একাধিক পুঁথি পাওয়া গেছে। এদের ভিতর বহু চিঠি আছে, যেগুলির মধ্যে সুফী দর্শন ও তত্ত্বোপদেশ ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। মাত্র এই তিনটি চিঠিতে প্রসঙ্গক্রমে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ আছে।

কাফেরদের কালো ছায়া পড়াতে দেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। মুসলমানরা অমর্যাদার মধ্যে পতিত হয়েছে। দেশের প্রতিটি কোণে ইস্‌লামের প্রদীপ তার জ্যোতি বিকীরণ করে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করত, কান্‌স্ রায় অবিশ্বাসের যে ঝড় বইয়ে দিয়েছে তাতে তা নিভে গেছে। আপনার বিজয়ী সেনাবাহিনীর আগুন দিয়ে নূরি (স্বয়ং নূর কুৎব্) আর হুসেনির (শেখ হুসেন নামে আর একজন দরবেশ) প্রদীপকে জ্বালিয়ে দিন।······ইস্‌লামের পীঠস্থানের যখন এই অবস্থা হয়েছে, তখন আপনি কেন শান্ত ও সুখী মনে সিংহাসনে বসে রয়েছেন? উঠুন এবং ধর্মের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। আপনার এত শক্তি যখন রয়েছে, তখন এ কাজ করা আপনার অবশ্যকর্তব্য। সাহেব কিরান * আমীর তৈমুর কেন দিল্লীর সাম্রাজ্য জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন? ধর্মের ফতোয়াই তার কারণ নয় কি? তিনি দু' তিনটি খারাপ জিনিষ দেখেছিলেন বলেই তো দিল্লীর মত এমন একটা জনাকীর্ণ শহর ধ্বংস করেছিলেন! † আপনি নিজে হিন্দুস্থানের সাহেব কিরান, তবুও যে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে বাংলাদেশ ধ্বংস হচ্ছে তা আপনি সহ্য করছেন! কাফেরীর আগুন সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে আর আপনি আপনার তলোয়ার খাপে ভরে রেখেছেন! এরকম ব্যাপার থেকে কোন বন্ধু যে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন, তা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি! বাংলাদেশকে স্বর্গ বলা হয়; কিন্তু তা আজ নরকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।···প্রত্যেকের উপর এমন ধরণের অত্যাচার করা হচ্ছে যে, লেখায় তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা যায় না। আর এক ঘণ্টাও সিংহাসনে বসে বিশ্রাম করবেন না। আসুন, এসে বিধর্মীকে আপনার অসি দিয়ে উচ্ছেদ করুন।'

এই হচ্ছে মহাপুরুষ নূরের চিঠির মর্ম, যে চিঠি আপনি পেয়েছেন। আপনি লিখেছেন যে, আপনি আপনার অসংখ্য দিগ্বিজয়ী সৈন্যকে বাংলা আক্রমণের জন্যে সমবেত করেছেন। এসম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করা উচিত। আমি আপনার সাফল্য প্রার্থনা করি। ধার্মিক রাজাদের পক্ষে মুসলমান ধর্মের রক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার চেয়ে আনন্দের কাজ আর কিছুই নেই।······বাংলাদেশে বড় শহরের তো কথাই নেই, এমন ছোট শহর বা গ্রামও মিলবে না, যেখানে দরবেশরা এসে বসতি করেননি। অনেক দরবেশ

* দুই শতাব্দীর প্রভু (Lord of two centuries)

† তৈমুর এই অজুহাতই দেখিয়েছিলেন।

পরলোকগমন করেছেন; কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সংখ্যাও অ.. হবে না। তাঁদের সন্তানসন্ততিকে, বিশেষতঃ হজরৎ নূর কুৎব আলমে.. ছেলেকে এবং পরিবারকে যদি দুরাত্মা বিধর্মীদের কবল থেকে উদ্ধার কর.. যায়, তাহলে খুবই ভাল কাজ হবে।"

ইব্রাহিম শর্কীকে এই চিঠি দেবার পর আশ্‌রফ সিম্‌নানী বাংলার দরবেশ শেখ হুসেনকে একখানি চিঠি লেখেন। শেখ হুসেনের ছেলেকে গণেশ বধ করেছিলেন। তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে আশ্‌রফ সিম্‌নানী লেখেন, "আপনাদের সাহায্য করবার জন্যে রাজার সৈন্যবাহিনী এখান থেকে যাচ্ছে; এর ফল শীঘ্রই বোঝা যাবে।" এই চিঠিতে আশ্‌রফ সিম্‌নানী আর্তত্রাতা এবং ইস্‌লাম ধর্মের রক্ষকদের শিরোমণি হিসাবে তৈমুরলঙ্গের নাম করেছেন।

তৃতীয় চিঠিখানি স্বয়ং নূর কুৎব্‌ আলমকে লেখা। এই চিঠিখানি আগের দু'খানি চিঠির কিছু পরে লেখা হয়; কারণ, এতে আশ্‌রফ সিম্‌নানী বলেছেন যে, ইব্রাহিম ইতিমধ্যে সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। এই চিঠির কতকাংশ উদ্ধৃত করছি,—

"কাফের কান্‌সের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ এবং হতভাগা কান্‌স্‌রূপ প্রচণ্ড ঝড়ে 'ভগবানের সন্তানদের' (অর্থাৎ মুসলমানদের) বাসস্থানের ধ্বংসপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আপনি যা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে সবই স্পষ্ট হয়েছে। প্রসিদ্ধ আলাইয়া এবং খলিদিয়া বংশের লোকেরা যে অত্যাচার সহ্য করছেন তা জানলাম। সুলতানের ধ্বজা এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই আপনার দেশের দিকে রওনা হয়েছে। সুলতান তাঁর অসংখ্য সৈন্যবাহিনী দ্বারা কাফেরদের তাড়াতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আশা করা যাচ্ছে যে, মুসলমানরা কান্‌স রায় এবং তার লোকদের কবল থেকে মুক্তি পাবে।"

আশ্‌রফ সিম্‌নানীর এই চিঠিগুলি থেকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাচ্ছে। গণেশের অভ্যুদয়ে মুসলমান দরবেশরা যে কতদূর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তা এগুলির মধ্য থেকে বোঝা যায়। নূর কুৎব আলম কতখানি আগ্রহ নিয়ে ইব্রাহিম শর্কীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাও আমরা উপলব্ধি করি। তেম্‌নি গণেশ যে তাঁর বিরোধীদের প্রতি দমন-নীতি প্রয়োগ করেছিলেন এবং অনেককে বধ করেছিলেন, তাও এই চিঠিগুলি থেকে জানতে পারছি।

ইব্রাহিম শর্কীর বঙ্গাভিযান—মিথিলায় শিবসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ

ইব্রাহিম শর্কী কোন্ পথে বাংলায় এসেছিলেন এবং তাঁর অভিযানের মাঝে কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা সে সম্বন্ধে এতদিন কিছু জানা যায়নি; কিন্তু সম্প্রতি-আবিষ্কৃত একটি সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে যে, ইব্রাহিম মিথিলা বা ত্রিহুতের উপর দিয়ে এসেছিলেন এবং মাঝপথে মিথিলার রাজা শিবসিংহ তাঁকে বাধা দেন। এর ফলে শিবসিংহ পরাজিত, বন্দী ও রাজ্যচ্যুত হন। এই সূত্রটি হচ্ছে আকবর ও জাহাঙ্গীরের সভাসদ্ মুল্লা তকিয়ার লেখা একটি বয়াজ (ভ্রমণলিপি)। সৈয়দ হাসান আস্কারি এই সূত্র থেকে আলোচ্য তথ্যটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, "Moulvi Muhammad Ilyas Rahman, a friend of the writer, has discovered a Bayaz of Mulla Taqyya, a courtier of Akbar and Jahangir, and copied in 1023 by Mulla Abul Hasan of Darbhanga, and in it we find references to 'Raja Kans', a Hindu zamindar, acquiring ascendency in Bengal and instigating Sheo Singh, the 'rebellious son of Deva Sing, the Raja of Tirhut', to commit depredations upon the Muslims. Sheo Singh is said to have killed many holy personages and contemplated a similar action against 'Makhdam Shah Sultan Hussain', the Khalifa of Makhdum Ala-ul Huq of Pandua. We are also told that Sultan Ibrahim Sharqi of Jaunpur, being requested by Makhdum Nur Qutb Alam, marched against Bengal, but had to face the opposition of Sheo Singh in Tirhut. The latter was defeated, pursued and captured and his stronghold, Lehra, was taken. (Bengal, Past and Present, Vol LXVII, 1948, p. 36, f. n. 31)

মুল্লা তকিয়ার বয়াজে এ সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার ইংরেজী অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র মূল পার্শী থেকে এই অনুবাদ করেছেন।

"When Raja Kans, the Hindu zaminder, became dominant over the whole of the province of Bengal, he determined to wipe out the Muslims, and made it his aim to exterminate the root of Islam from of his kingdom. During that time, Sheo Singh, the zaminder of Tirhut, rebelled against his father, Raja Deva Singh and made an

alliance with Raja Kans and thus became an independent ruller of the province of Tirhut. He grew in power and through the incitement of Raja Kans, he began to rob and plunder the Muslims of his territory and caused most of the missionaries and leaders of Islam in Darbhanga to taste the beverage of martyrdom and thus made his holiness Makhdum Shah Sultan Hussain an object of his injury. At this time, the successor of Makhdum Shah was Alaul Auq at Pandua, when Sultan Ibrahim Sharqi sent an army in the year 805 * at the request of Nur Qutb-ul-Islam, the worthy son of Alaul Huq with a view to wage war against the wicked Kafirs of Bengal in order to suppress Raja Kans. When the royal retinue reached Tirhut, Sheo Singh made a stand against him. Although the Sultan was on his way to Bengal, when he heard the news of Sheo Singh reaching the neighbourhood of his camps, the flames of Sultan's anger rose high and with great courage, he turned the range of his attention in his direction. In the end, he (Sheo Singh) found that it was not possible for him to oppose him (Ibrahim) in oppen battle. He escaped into some other direction till he reached Lehra, which was the strongest fort there and he took shelter there. After some time, the fort was conquered and he was taken prisoner. The whole territory of Tirhut was again transferred to his father as a loyal servant of the Sultan. As all the roads, which were being blocked. were open again, the Sultan set out in the direction of Bengal in order to suppress Raja Kans. It so happened that the orders for the building of a mosque near the abode of Makhdum Shah were passed, which is still in existence and which bears the following inscription :—

His holiness the prophet has said that one who builds a mosque in the name of Allah enters heaven. This

* অর্থাৎ ৮০৫ হিজিরা। এই তারিখ ভুল। পরবর্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

mosque was built by Amir-ul-mominin (the chief of the believers) Abul Fath Ibrahim Shah, Sultan, in the year 805."†

এর বাংলা ভাবানুবাদ নীচে দিলাম,

"যখন হিন্দু জমিদার কান্‌স সমগ্র বাংলা প্রদেশের উপর আধিপত্য অর্জন করলেন, তিনি মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প করলেন এবং তাঁর রাজ্য থেকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর লক্ষ্য। এই সময়ে ত্রিহুতের জমিদার শিও সিং (শিবসিংহ) তাঁর পিতা ত্রিহুতের রাজা দেবসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং রাজা কান্‌সের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিজে ত্রিহুত প্রদেশের স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে তিনি রাজা কান্‌সের প্ররোচনায় তাঁর রাজ্যের মুসলমানদের উপরে লুঠপাট চালাতে লাগলেন, দারভাঙ্গার অধিকাংশ ধর্মপ্রচারক ও ইসলামের নায়কদের শহীদীর আস্বাদ গ্রহণ করালেন এবং পবিত্রাত্মা মখদুম শাহ সুলতান হোসেনকে আঘাতের পরিকল্পনা করলেন। এই সময়ে মখদুম শাহের উত্তরসূরী ছিলেন পাণ্ডুয়ার আলাউল হক, যখন আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্র নূর কুৎব-উল্-ইসলামের অনুরোধে সুলতান ইব্রাহিম শর্কী বাংলার দুর্বৃত্ত কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে এবং রাজা কান্‌সকে দমন করার জন্যে ৮০৫ হিজিরায় এক সৈন্যবাহিনী পাঠান। রাজকীয় সৈন্যবাহিনী যখন ত্রিহুতে পৌছোলো, শিও সিং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। যদিও সুলতান বাংলার দিকে যাচ্ছিলেন,

† এই শিলালিপিটি দেখেই মুল্লা তকিয়া স্থির করেছিলেন ইব্রাহিম ৮০৫ হিজিরায় বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ইব্রাহিম যে ৮১৮ হিজিরা বা ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ৮০৫ হিজিরায় সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ বাংলাদেশ শাসন করছিলেন, তখন ইব্রাহিমের বাংলা আক্রমণের কথা ওঠে না। অবশ্য ঐ শিলালিপির অকৃত্রিমতা সন্দেহের অতীত। আসল কথা, মুল্লা তকিয়া জানতেন না যে ইব্রাহিম শর্কী দুবার ত্রিহুতে এসেছিলেন—প্রথমবার রাজা কীর্তিসিংহের পিতৃরাজ্য-অপহরণকারী অসলানকে শাস্তি দিতে, যার বর্ণনা বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় পাওয়া যায়; আর দ্বিতীয়বার এই বাংলা আক্রমণের সময়। সম্ভবতঃ তাঁর প্রথমবারের ত্রিহুতে আগমনই ৮০৫ হিজিরায় ঘটেছিল, আর সেই সময়েই তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন।

তিনি যখন খবর পেলেন শিও সিং তাঁর তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছেছেন, সুলতানের রোষানল দাউ দাউ শিখায় জ্বলে উঠল এবং তিনি খুব সাহস নিয়ে তাঁর দিকে মন দিলেন। শেষে শিও সিং বুঝলেন প্রকাশ্য সংগ্রামে ইব্রাহিমের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি পালিয়ে অন্যদিকে গিয়ে অবশেষে সেখানকার সবচেয়ে সুদৃঢ় দুর্গ লেহ্‌রায় পৌঁছে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিছু সময় পরে ঐ দুর্গের পতন ঘটল এবং তিনি বন্দী হলেন। সমগ্র ত্রিহুত রাজ্য আবার তাঁর পিতাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল সুলতানের অনুগত ভৃত্য হিসাবে। যে সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল, সেগুলি আবার খুলে দেওয়া হল, তার ফলে সুলতান রাজা কান্‌সকে দমন করার জন্যে বাংলার দিকে রওনা হলেন। মখদুম শাহের বাসস্থানের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ পালিত হল। এখনও সেটি বর্তমান আছে এবং তাতে এই শিলালিপি আছে :—

পবিত্রাত্মা নবী বলেছেন, যে আল্লার নামে মসজিদ তৈরী করে, সে স্বর্গে প্রবেশ করে। এই মসজিদ বিশ্বাসীদের প্রধান আবুল ফতে ইব্রাহিম শাহ সুলতান ৮০৫ হিজিরায় নির্মাণ করিয়েছিলেন।"

এই বিবৃতির অধিকাংশই সত্য বলে মনে হয়; কারণ, গণেশ ও শিব-সিংহের আবির্ভাবকাল সমসাময়িক। গণেশের মত শিবসিংহও মুসলমানদের প্রাধান্য হ্রাস করে হিন্দু অভ্যুদয় ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন। শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি তাঁর দু' একটি পদে লিখেছেন যে, শিবসিংহ যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে গুরুতর প্রতাপ দেখিয়েছিলেন। ইব্রাহিমের সঙ্গে শিবসিংহের সম্পর্ক সম্ভবতঃ আগে থেকেই তিক্ত হয়েছিল। তার কারণ, মিথিলা ইব্রাহিমের সামন্ত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও শিবসিংহ স্বাধীন রাজার মত নিজের নামে মুদ্রা চালিয়েছিলেন।* তাছাড়া মিথিলায় প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, দিল্লীর সুলতান

* Annual Report of the Archeological Survey of India, 1913-14, pp. 248-49 দ্রষ্টব্য। ইব্রাহিমের সঙ্গে শিবসিংহের যে আগে থাকতেই বিরোধ ছিল, তার আরও প্রমাণ আছে। বিদ্যাপতি শিবসিংহ সম্বন্ধে 'পুরুষপরীক্ষা'তে বলেছেন, "যো গৌড়েশ্বরগজ্জনেশ্বররণক্ষৌণিষু লব্ধা যশো" এবং 'শৈবসর্বস্বসারে' বলেছেন, "শৌর্যাবর্জিত গৌড়গজ্জনমহীপালোপনম্রীকৃতা"। বিদ্যাপতি-কথিত 'গৌড়েশ্বর' বা 'গৌড়মহীপাল' কে হতে পারেন,

শিবসিংহকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন যে, ঐ সময় দিল্লীর সৈয়দ বংশীয় সুলতানেরা এত দুর্বল ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে সুদূর মিথিলায় অভিযান চালিয়ে সেখানকার রাজাকে বন্দী করা সম্ভব ছিল না; সুতরাং, প্রবাদোক্ত দিল্লীর সুলতান আসলে সম্ভবতঃ জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। বিমানবিহারী বাবু এতদূর পর্যন্ত অনুমান করেছেন যে, শিবসিংহ "গণেশের সঙ্গে যোগ" দিয়েছিলেন এবং "জৌনপুরের সৈন্যদল ৮১৮ হিজরীতে বাংলা অভিযানের পথে অথবা প্রত্যাবর্তনের সময় শিবসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।"† মুল্লা তকিয়ার বয়াজে গণেশের উস্কানীতে শিবসিংহের মুসলমানদের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে যে কথা পাই তা কতদূর সত্য বলা যায় না; সম্ভবতঃ ত্রিহুতের দরবেশরা নুর কুৎব্ আলম প্রভৃতির পক্ষ নিয়েছিলেন বলে গণেশের অনুরোধে শিবসিংহ তাঁদের দমন করেছিলেন। কিন্তু এই সূত্র থেকে উদ্ধৃত অংশের বাকীটুকু পূর্বোক্ত বিষয়গুলি থেকে সমর্থিত হওয়ায় সত্য বলেই বিশ্বাস হয়। পূর্ব ভারতের দুই স্বাধীনচেতা হিন্দু রাজা মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং গণেশের বিপদে সাহায্য করতে গিয়ে শিবসিংহ নিজে চরম বিপদ বরণ করেছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে এই ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

সে সম্বন্ধে আগে আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে 'গজ্জনেশ্বর' বা 'গজ্জনমহীপাল' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? মনোমোহন চক্রবর্তী ও রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন, এই 'গজ্জনেশ্বর' আসলে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। এঁদের অনুমান যে ঠিক্, তার প্রমাণ আমি 'সঙ্গীতশিরোমণি'র ইব্রাহিম-প্রশস্তির (পরে এটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হবে) মধ্যে পেয়েছি, তাতে রয়েছে,

আদক্ষিণোদধেরা চ হিমাদ্রেরা চ গাজনাৎ।
আগৌড়াদুজ্জ্বলংরাজ্যমিব্রাহিমভূভুজঃ ॥

প্রথম চরণের 'গাজনাৎ' শব্দটি থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাপতি-কথিত গজ্জনেশ্বর বা গজ্জনমহীপাল হচ্ছেন ইব্রাহিম শর্কী। 'গাজন' ও 'গজ্জন' দুইই 'গজনীর' অপভ্রংশ। 'পুরুষপরীক্ষা' শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৪১৫ খ্রীঃএর মধ্যে লেখা। সুতরাং তারও আগে ইব্রাহিমের (বা তাঁর লোকেদের) সঙ্গে শিবসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল।

ইব্রাহিমের বাংলায় আগমনের ফলে গণেশের সিংহাসনত্যাগ

যাহোক্ শিবসিংহকে পরাজিত করে ইব্রাহিম তো বাংলায় এলেন। ইব্রাহিমের আসার ফলে গণেশের বিরোধী পক্ষের অভিপ্রায় সাময়িক ভাবে সিদ্ধ হয়। গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁর ছেলেকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' এই ঘটনার বর্ণনা অতিরঞ্জিত আকারে পাওয়া যায়। যাহোক্ 'রিয়াজে'র বর্ণনার মূল বিষয়টুকু যে সত্য, তার প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে। ইব্রাহিম শর্কীর অধীনে এলাহাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরে 'কড়' নামে একটি জায়গায় মালিক সুলুতা শাহী নামে এক সামন্ত রাজত্ব করতেন। তিনি নানা দেশ থেকে সঙ্গীতশাস্ত্রের বই আনিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিয়ে একখানি বই লেখান। বইখানির নাম 'সঙ্গীতশিরোমণি'। এর রচনাকাল ১৪৮৫ বিক্রমাব্দ ও ১৩৫০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪২৮-২৯ খৃষ্টাব্দ। * এই বইখানির প্রথমেই জৌন-পুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর এক প্রশস্তি পাওয়া যায়। প্রশস্তিটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল,

"সংগ্রাম (ব) হ্রিয়্॥
অসপত্নং ব্যধাদ্রাষ্ট্রমিবরাহিমভূপতেঃ।
ব্যানম্রাখিল-ভূমিপাল-মুকুট-প্রত্যগ্র-রত্নপ্রভা-
কির্মীরাভবদংঘ্রিযুগ্মনখরজ্যোতির্বিতানোজ্জ্বলং॥
কীর্তিছত্রসুবর্ণদণ্ড সদৃশস্ফূর্জৎ প্রতাপোচ্চয়ং
লোকেস্মিন্নিবরাহিম ক্ষি (তি) পতিং কোনাশ্রয়েৎ পার্থিবঃ।
ঘনাটোপং গর্জদ্গজতুরগসেনাজলধরৈঃ
সমং নীত্বাশঙ্কং শকশলভসপ্তার্চিষময়ং।
তুরুষ্কং নির্মায় প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং
ব্যধাদ্ গৌড়ান্ প্রৌঢ়ঃ পুনরপি শকানাং জনপদান্॥

* দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ কবি সর্বপ্রথম এই সূত্রটি থেকে আলোচ্য তথ্যটি আবিষ্কার করে Journal of the Andhra Research Society, Vol. XI-এ প্রকাশ করেন। পরে এ সম্বন্ধে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিশদ আলোচনা করেছেন (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬০, পৃঃ ৯০-৯৩ দ্রষ্টব্য)। 'সঙ্গীতশিরোমণি'র পুঁথি বর্তমানে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে।

আদক্ষিণোদধেরা চ হিমাদ্রেরা চ গাজনাৎ।
আগৌড়াত্বজ্জ্বলং রাজ্যমিবরাহিমভূভুজঃ ॥”

এই প্রশস্তির নিম্নরেখ অংশটুকুর অনুবাদ :—

এই প্রবীণ (ইব্রাহিম) প্রচুর গর্বসহকারে গর্জনকারী হস্তী, অশ্ব ও সেনারূপ মেঘবর্ষণে সেই অগ্নিকে নিঃশঙ্কে নির্বাপণ করেছিলেন, যে অগ্নিতে শকেরা (অর্থাৎ মুসলমানেরা) শলভের মত (পুড়ে মরেছিল) এবং রাজনীতিজ্ঞ * তাঁর পুত্রকে তুরস্ক নির্মাণ করে (মুসলমান করে) গৌড় দেশকে আবার শকরাজ্যে (মুসলমান রাজ্যে) পরিণত করেছিলেন।'

বলা বাহুল্য, এখানে গণেশকেই 'অগ্নি' বলা হয়েছে। এই সমসাময়িক সূত্রের সাক্ষ্য গণেশ এবং ইব্রাহিমের সংঘর্ষের ফলাফল সম্বন্ধে সমস্ত জল্পনার অবসান করছে। 'রিয়াজ'এ এই সন্ধি সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা যে সর্বাংশে সত্য নয়, সেও এর থেকে বোঝা যায়। 'রিয়াজ'এ বলা হয়েছে, নূর কুৎব্ আলমের মধ্যস্থতায় সন্ধি হয় এবং ইব্রাহিম সন্ধির প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ফলে নূর কুৎব্ আলমের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিল। কিন্তু

*"প্রকটিতনয়ং" কথার আসল অর্থ 'রাজনীতিজ্ঞ'। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এর অনুবাদ করেছিলেন "সুনয়নসম্পন্ন"। কিন্তু তাহলে "প্রকটিতনয়ং" এর বদলে "প্রকটিতনয়নং" পাঠ ধরতে হয়; এই পরিবর্তনের কোন হেতু নেই এবং এতে ছন্দ থাকে না। আমার 'রাজা গণেশের আমল' বই-এ ঐ অংশটির অনুবাদ করার সময় "প্রকটিতনয়ং"কে আমি দীনেশবাবুর মত অনুযায়ী "সুনয়নসম্পন্ন" রূপেই অনুবাদ করেছিলাম। এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন লেখেন, "এখানে 'প্রকটিতনয়' কোন যুক্তিতে 'সুনয়ন-সম্পন্ন' মানে করা যায় তা বুঝতে পারছি না। মানে তো এখানে স্পষ্ট, 'যিনি নয় অর্থাৎ রাজনীতিচাতুর্য প্রকট করেছিলেন।' এই কথাটির আসল তাৎপর্য সুখময় বাবু এবং তাঁর অথরিটি ধরতে পারেন নি।" (যাত্রী, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৩-৬৪, পৃঃ ৬৭) ডঃ আহমদ হাসান দানী তাঁর Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal পুস্তিকায় (p. 122) "Mr. Mukhopadhyay translates the last two lines as follows" বলে আমার অনুবাদ উদ্ধৃত করেন এবং "প্রকটিতনয়ং" এর আসল অর্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'সঙ্গীতশিরোমণি'তে বলা হয়েছে, ইব্রাহিম নিজেই গণেশের ছেলেকে ধর্মান্তরিত করে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।*

কিন্তু উদ্ধৃত অংশটির "প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং" উক্তিটির অর্থ আরও বেশী গভীর। এর "আসল তাৎপর্য" সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "যদু-জালালুদ্দীন যে চালাকি করে (বাপের সঙ্গে বিরোধ করে?) ধর্মান্তর গ্রহণ গ্রহণ করে ইব্রাহিমশাহ শর্কীর সাহায্যে রাজ্য লাভ করেছিলেন এতো তারই ইঙ্গিত।" সুতরাং আসল ব্যাপারটা এখন মোটামুটিভাবে বোঝা যাচ্ছে। ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলার উপস্থিত হলে রাজা গণেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁর সুচতুর পুত্র তখন সুযোগ বুঝে পিতার বিরোধি-পক্ষে যোগ দেন এবং তাঁরা তাঁকে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। সম্ভবতঃ নূর কুৎব্ আলমের দলই গণেশ-নন্দনকে নানারকম কৌশল করে নিজেদের দলে টেনেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে রাজা গণেশ তখন কী করছিলেন? এ সম্বন্ধে কতকটা নিঃসংশয়েই অনুমান করা যেতে পারে রাজা গণেশ ইব্রাহিমের বিপুল

---

* 'সঙ্গীতশিরোমণি'র "তুরুষ্কং নির্মায়...তস্য তনয়ং" উক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। কিন্তু ডঃ দানী তা মানতে চান না। তাঁর মতে গণেশের পুত্র ইব্রাহিমের আগমনের আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি "তুরুষ্কং নির্মায়...তস্য তনয়ং" এর অনুবাদ কচ্ছেন, "having established his son, who was a Turushka." এ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "nirmaya (meaning 'having constructed, built, or established'. It can hardly be construed to mean 'having converted'). ঠিক কথা, কিন্তু "তুরুষ্কং নির্মায়...তস্য তনয়ং" এর আক্ষরিক অনুবাদ তো আমরা "having converted his son into a Turushka (Muslim)" করছি না, করছি "having made his son into a Turushka (Muslim)" এবং এইটিই এর সহজ অর্থ। "নির্মায়" ক্রিয়াপদটি "তুরুষ্কং" এর পরে এবং "প্রকটিতনয়ং তস্য তনয়ং" এর আগে থাকায় মনে হয়, আমাদের অনুবাদই ঠিক। উদ্ধৃত অংশের রচয়িতা যদি ডঃ দানীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্তি করতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই "নির্মায় তনয়ং তস্য তুরুষ্কং প্রকটিতনয়ং" লিখে বা অন্য কোনভাবে সোজাসুজি নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতেন।

সামরিক শক্তির কাছে দাঁড়াতে না পেরে পলায়ন করেছিলেন। তিনি ইব্রাহিমের সঙ্গে খুব বেশী যুদ্ধ করেছিলেন বলে মনে হয় না; মোটেও না করতে পারেন।

যাহোক্, গণেশের অপসারণ এবং তাঁর ধর্মান্তরিত পুত্রের সিংহাসনে আরোহণের ফলে গণেশের প্রতিপক্ষ মনে করলেন তাঁদেরই জয় হল। ইব্রাহিম শর্কীও তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। ডঃ দানী মনে করেন জলালুদ্দীন ইব্রাহিম শর্কীর সামন্ত (feudatory) হিসাবে বাংলা দেশ শাসন করতে সম্মত হয়েছিলেন। আমি এই অভিমত সমর্থন করি। পূর্বে উদ্ধৃত 'সঙ্গীতশিরোমণি'র ইব্রাহিম-প্রশস্তির শেষ ছত্রের "আগৌড়াত্তুজ্জল-রাজ্যমিব্রাহিমভূভুজঃ" উক্তি থেকে বোঝা যায়, জৌনপুরের লোকেরা গৌড়কে ইব্রাহিমের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই মনে করতেন।

জলালুদ্দীনের প্রথম দফার রাজত্ব

যা হোক্, আমরা দেখতে পাচ্ছি নূর কুৎব্ আলমের আহ্বানে ইব্রাহিম শর্কী সসৈন্যে বাংলায় এলেন এবং গণেশকে অপসারিত করে, জলালুদ্দীনকে* সিংহাসনে বসিয়ে ফিরে গেলেন। এ সম্বন্ধে ডঃ দানী বলেন, "Ibrahim's main purpose of invasion was solved by setting aside the influence of Raja Ganesa from over his son, and making an amicable settlement of local affairs." একথা ঠিকই, কিন্তু এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে হবে। ইব্রাহিমের আগমনের ফলে গণেশের প্রভাব মাত্র সাময়িকভাবে লোপ পেয়েছিল, তাঁর বিদায়গ্রহণের পরেই আবার বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে গণেশের আবির্ভাব ঘটল। জলালুদ্দীন বেশী দিন তাঁর পিতার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারলেন না। এর অকাট্য প্রমাণস্বরূপ আমরা স্বয়ং নূর কুৎব্ আলমের একটি চিঠি উদ্ধৃত করছি।

---

* 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে প্রথম সিংহাসনে আরোহণের সময় জলালুদ্দীনের বয়স ১২ বছর ছিল। কিন্তু এই কথা সত্য হতে পারে না। ১২ বছরের বালকের পক্ষে এই রাজনীতিচতুরতার পরিচয় দেওয়া ও প্রকাশ্যে পিতার পক্ষ ত্যাগ করে শত্রুর পক্ষে যোগ দেওয়া অসম্ভব।

এ চিঠিতেও সৈয়দ হাসান আসকারী আবিষ্কার করেছেন। * চিঠিটি জায়গায় জায়গায় একটু দুর্বোধ্য বলে প্রথমে আস্‌কারী সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করে তারপর তার বাংলা ভাবানুবাদ দিলাম।

"I, the poor man, reminded that shah of myself now and then but at this time, when spirits are so low and morbidity so prevalent, I, the poor man. feel extremely unsettled and perturbed. I am so paralysed by the anguish of my existence that I have abandoned the world. May He draw the pen of His forgiveness accross the pages of my short comings..........Oh soul of thy father, how strange is the affair and astonishing the time that the river of God, the unapproachable and unmovable, has become ruffled and thousands of Doctors of religion and learned men and asceties and devotees had fallen under the command of an infidel, a zaminder of 400 years (standing), and benefits of true significance have gone. He has allowed the commands and prohibitions to go under the control of an infidel.......The reins of Islam have gone into the hands of those who associate others with God. He had caused Islam to be replaced by infidelity with the results that the benefits of religion have been destroyed and the standard of unbelief has risen to the sky. He has allowed the ruin of faith......How exalted is God, He has bestowed, without apparent reason, the robe of faith on the lad of an infidel and installed him on the throne of the kingdom over his friends. Kufry (infidelity) has gained predominance and the Kingdom of Islam has been spoiled. Who knows what divine wisdom ordains and what is fated for what individual existence ?···Alas, Alas, oh, how painful, with one gesture and freak of independence He caused the consumption of so many souls, the destruction of so many

* Bengal, Past and Present, Vol. LXVII, 1948, pp 38-39 থেকে উদ্ধৃত।

lives, and shedding of so much of bitter tears. Alas, woe to me, the sun of Islam has become obscured and the moon of religion has become eclipsed......It is obligatory on every Musalman to render assistance to and champion the cause of the faith of God. Although so far as the apparent signs are concerned there is no possibility of assistance reaching us, yet at the inside of things and returning to God one should make earnest supplication and sincerely pray and lament throughout the night and solicit the aid from God."

"হতভাগ্য আমি সেই 'শাহ'কে যখন তখন নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম, কিন্তু এই সময়ে মন এত খারাপ এবং বিষাদের ভার এত গুরু যে, আমি অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ করছি। নিজের অস্তিত্বের বেদনা আমাকে এত বিকল করে ফেলেছে যে, পৃথিবীর সঙ্গে সব সম্পর্ক আমি ছিন্ন করেছি। ভগবান যেন আমার দোষত্রুটির পৃষ্ঠাগুলির উপর দিয়ে তাঁর ক্ষমার কলম চালিয়ে দেন। হাজার হাজার ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং দরবেশ ও ভক্ত আজ ৪০০ বছরের জমিদার একজন বিধর্মীর অধীনস্থ হয়েছে। প্রকৃত ধর্মের সমস্ত ফলই নষ্ট হয়েছে। ভগবান রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব একজন বিধর্মীর হাতে তুলে দিয়েছেন।...ইস্‌লামের রাজত্ব আজ তাদের হাতে গিয়ে পড়েছে, যারা অন্যদের ভগবানের সঙ্গে একাসনে বসায়। ভগবান কাফেরী দিয়ে ইস্‌লামের স্থান অধিকার করিয়েছেন। তার ফল হয়েছে এই যে, ধর্মের মাহাত্ম্য নষ্ট হয়েছে এবং অবিশ্বাসের (বিধর্মের) ধ্বজা আকাশ পর্যন্ত উঠেছে। ভগবান বিশ্বাস (ইসলাম ধর্ম) ধ্বংস হতে দিয়েছেন।...কী মহিমা তাঁর। আপাত কোন কারণ ভিন্নই একজন কাফেরের 'বাচ্ছা'কে তিনি বিশ্বাসের (ইস্‌লাম ধর্মের) পোষাক দিয়ে দেশের সিংহাসনে, তার বন্ধুদের উপরে, অধিষ্ঠিত করেছেন। কাফেরী প্রাধান্যলাভ করেছে এবং ইসলামের রাজ্য ধ্বংস হয়েছে। কে জানে ভগবানের কী ইচ্ছা এবং কার ভাগ্যে কী আছে?.........হায়! ওঃ! কি যন্ত্রণাদায়ক! এক লহমায় তিনি এতগুলি আত্মার অপচয় ঘটালেন, এতগুলি জীবন নষ্ট হল, এত চোখের জল পড়ল। হায় কি দুঃখ! ইসলামের সূর্য আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং ধর্মের চাঁদ রাহুগ্রস্ত হয়েছে।...প্রত্যেকটি মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং সেই বিশ্বাসকে জয়যুক্ত করা। যদিও

লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবুও প্রত্যেকের উচিত সারা রাত্রি ধরে প্রার্থনা করা, শোক করা এবং ভগবানের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা।"

নূর কুৎব্ আলমের এই চিঠিখানির মূল্য অপরিসীম। এটি বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই,

(১) এই চিঠি লেখবার সময় এমন একজন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, যিনি কাফেরের সন্তান হয়েও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য এই রাজা জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না।*

(২) কিন্তু রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব গিয়ে পড়েছে একজন বিধর্মীর হাতে। এই "বিধর্মী"টি রাজা গণেশ ভিন্ন আর কে হতে পারেন?

সুতরাং ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ইব্রাহিমের সৈন্যবাহিনীর সাম্‌নে দাঁড়াতে না পেরে রাজা গণেশ পলায়ন করেছিলেন এবং কিছুকাল তিনি অন্তরালেই ছিলেন। তারপর জলালুদ্দীনকে সিংহাসনে বসিয়ে যখন ইব্রাহিম জৌনপুরে ফিরে যান, তখন গণেশ সুযোগ বুঝে আবার প্রত্যাবর্তন করেন এবং হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। জলালুদ্দীনের পক্ষে পিতার প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া ভিন্ন কোনও উপায়ই ছিল না। হয়তো তিনি প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। কারণ তাঁর পিতার হাতে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের উপরে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। তাছাড়া যিনি একাধিক সুলতানকে ইতিপূর্বে হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন, নিজের পুত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করা তাঁর পক্ষে তুচ্ছ ব্যাপার। সুতরাং দেশের শাসনে গণেশের একাধিপত্য আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, যদিও জলালুদ্দীন নামে-মাত্র সুলতান রয়ে গেলেন। বাংলায় ইসলামের প্রভাব আবার মন্দীভূত হয়ে গেল, তার বদলে হিন্দুধর্মেরই জয়ধ্বজা উড়তে লাগল। নূর কুৎব্ আলম দুঃখ করে লিখেছেন, "আপাত কোন কারণ ভিন্নই" (without apparent reasons) ভগবান এই

* নূর কুৎব্ আলম জলালুদ্দীনকে "কাফেরের বাচ্ছা" (the lad of an infidel) বলেছেন, এর থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন জলালুদ্দীন ঐ সময়ে সময়ে বালক ছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। বৃদ্ধ নূর কুৎব্ যুবক জলালুদ্দীনকেও "বাচ্ছা" (lad) বলতে পারেন। তাছাড়া এই ধরণের উক্তি সব বয়সেরই লোকের সম্বন্ধে করা হয়ে থাকে।

কাফেরনন্দনকে মুসলমান করে সিংহাসনে বসিয়েছেন। "আপাত কোন কারণ ভিন্নই"—কারণ জলালুদ্দীন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকাতে মুসলমানদের বা ইসলামধর্মের কোন লাভ হচ্ছিল না।

আরও একটি ব্যাপার দেখতে হবে। নূর কুৎব্ আলমের এই চিঠি থেকে বোঝা যায় যে, এর আগে যেমন নূর কুৎব্ আলম গণেশকে দমনের জন্য ইব্রাহিমকে আহ্বান করে এনেছিলেন, এবার যে কোন কারণে সে পথ বন্ধ; কারণ, চিঠির শেষে নূর কুৎব্ বলছেন, "লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।" চিঠির প্রথম ছত্রটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,—"হতভাগ্য আমি সেই 'শাহ'কে যখন তখন নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম কিন্তু এই সময়ে···আমি অত্যন্ত বিব্রত ও বিচলিত বোধ করছি।" যদিও 'শাহ' শব্দটির নানারকম মানে হয়, তবু এখানে 'রাজা' অর্থে এবং ইব্রাহিমের প্রতিভূস্বরূপে শব্দটিকে গ্রহণ করলে সব দিক দিয়ে অর্থসঙ্গতি হয়।

দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা

'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' এবং বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায়, জলালুদ্দীন সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার কিছুদিন পরে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয় এবং গণেশ তখন ছেলেকে সরিয়ে আবার নিজে সিংহাসনে বসেন। এর মধ্যে ইব্রাহিমের মৃত্যুর কথাটি সর্বৈব মিথ্যা; কারণ ইব্রাহিমের মৃত্যু ৮১৯-২০ হিজিরায় হয়নি, তিনি ৮৪৪ হিজিরা বা ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। 'রিয়াজ' ও বুকাননের পুঁথিতে মনগড়া কথা লেখা হয়েছিল। কীভাবে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও দুই সূত্রের উক্তির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। 'রিয়াজে' বলা হয়েছে, নূর কুৎব্ আলমের অভিশাপের ফলে ইব্রাহিমের মৃত্যু হয়েছিল, আর বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায়, জলালুদ্দীন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। কল্পনার উপর নির্ভর করাতেই দুই বিবৃতিতে এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু ছেলেকে সরিয়ে গণেশের সিংহাসনে বসার কথাটি সত্য। কারণ, জলালুদ্দীনের ৮১৮ হিজিরার অনেক মুদ্রাই পাওয়া গেছে, তাঁর ৮১৯ হিজিরার খুব অল্প মুদ্রাই পাওয়া গেছে। ৮২০ হিজিরার একটিও মুদ্রা পাওয়া যায়নি এবং ৮২১ হিজিরা থেকে আবার তাঁর মুদ্রা মিলছে। এদিকে যে

সময়টুকু জালালুদ্দীনের মুদ্রা মিলছে না, মোটামুটিভাবে সেই সময়েই দু'জন হিন্দু রাজার বাংলা অক্ষরে ক্ষোদিত মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। এই মুদ্রাগুলির এক পিঠে রাজার নাম, অপর পিঠে টাকশালের নাম, সাল এবং "শ্রীচণ্ডীচরণ-পরায়ণস্য" লেখা আছে। এই হিন্দু রাজাদের নাম, মুদ্রায় উল্লিখিত সাল এবং তাঁদের মুদ্রা যে টাকশালে তৈরী হয়েছিল, তাদের নাম নীচে দেওয়া হল।

	রাজার নাম	মুদ্রায় উল্লিখিত সাল	টাকশালের নাম
১।	দনুজমর্দনদেব	১৩৩৯ শকাব্দ=৮২০ হিজিরা ১৩৪০ শকাব্দ=৮২১ হিজিরা	পাণ্ডুনগর, সুবর্ণ-গ্রাম এবং চাটিগ্রাম
২।	মহেন্দ্রদেব	১৩৪০ শকাব্দ=৮২১ হিজিরা	পাণ্ডুনগর ও চাটিগ্রাম

স্পষ্টই বোঝা যায়, পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম যথাক্রমে পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁর সংস্কৃত রূপ। এই সব জায়গার টাকশাল থেকে জলালুদ্দীনের মুদ্রাও বেরিয়েছিল। সুতরাং এই দু'জন রাজা ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে যে প্রায় সারা বাংলারই শাসনক্ষমতা লাভ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

গণেশ ও দনুজমর্দনদেব অভিন্ন লোক

এঁরা কে, সেই প্রশ্নই এখন আলোচ্য। এঁদের মধ্যে মহেন্দ্রদেবের সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। কিন্তু দনুজমর্দনদেব যে স্বয়ং গণেশ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই বললেই চলে।* কারণ নূর কুৎব্ আলমের উদ্ধৃত চিঠি জালালুদ্দীনের প্রথম রাজ্যাভিষেকের পরে লেখা। ঐ সময়ে গণেশ জীবিত ও সর্বশক্তিমান ছিলেন; সুতরাং তার দুই বছরের মধ্যেই যে দনুজমর্দন-দেবের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, তিনি গণেশ ছাড়া আর কেউ হতে পারেন বলে মনে করা যায় না। দনুজমর্দনদেবের এই মুদ্রাগুলিই প্রমাণ করছে যে, জলালুদ্দীনের প্রথম রাজ্যাভিষেকের কিছুদিন পরে গণেশ তাঁকে অপসারিত করে সিংহাসনে বসেছিলেন, 'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণীর এই কথা সত্য। অন্য কোন হিন্দু, যাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা শোনা নেই, তিনি আচম্‌কা আবির্ভূত হয়ে সারা বাংলা জয় করে দনুজমর্দনদেব নামে একই সঙ্গে

* গণেশ ও দনুজমর্দনদেবের অভিন্নতা প্রথমে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখান (Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, pp. 109—115 দ্রষ্টব্য)।

পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁর টাকশাল থেকে মুদ্রা বার করলেন, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

এই যুক্তি এতই অকাট্য যে যাঁরা অন্য কিছু সিদ্ধান্ত করেছেন, তাঁদের কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন দনুজমর্দনদেবের মুদ্রায় উল্লিখিত পাণ্ডুনগর মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া না হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া? ডঃ দানী এই পাণ্ডুনগরকে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার সঙ্গে অভিন্ন ধরতে চান। কিন্তু হুগলী জেলার পাণ্ডুয়াতে কোন দিন কোন টাকশাল ছিল বলে জানা যায় না। এই পাণ্ডুয়া থেকে মাত্র ১০।১১ মাইল দূরে সাতগাঁওতে একটি চালু টাকশাল এই সময় ছিল বলে এখানে সাময়িক ভাবেও কোন টাকশাল স্থাপিত হবার সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না। মুদ্রায় উল্লিখিত পাণ্ডুনগর যে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া, সে সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ আছে। বুকানন প্রায় দেড়শো বছর আগে লিখেছিলেন, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া পাণ্ডববংশের জনৈক রাজা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস। শ'থানেক বছর আগে রাভেনশ' লিখেছিলেন যে, পাণ্ডুয়ায় সাতাশ-ঘড়া নামে যে দীঘিটি আছে, লোকে বলে সেটি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাতাশ-ঘড়া দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পুরোনো বাড়ী আছে, লোকে সেটিকে বলে 'পাণ্ডব রাজার দালান'। অতএব মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার মূল নাম যে পাণ্ডুনগর ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই; দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রাগুলির প্রাপ্তিস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখলেও সব সন্দেহ ভঞ্জন হবে। পাণ্ডুনগরের টাকশালে তৈরী অধিকাংশ মুদ্রাই উত্তর বঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে। দনুজমর্দনদেবের সর্বপ্রথম যে মুদ্রাটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেটি গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল।* খাস পাণ্ডুয়াতেই (মালদহ জেলা) দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের একটি করে মুদ্রা পাওয়া গেছে। দু'টি মুদ্রাই পাণ্ডুনগরের টাকশালে তৈরী। এই সমস্ত প্রমাণ থেকে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ক্রেটন এটি আবিষ্কার করেন। তিনি রাজার নাম পড়েন 'দনুজমদনদেব'; তাঁর Ruins of Gaur (1817) বইয়ে এই মুদ্রার বিবরণ প্রকাশিত হলেও তা তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের আরও অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় এবং তখন থেকেই এগুলির সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হয়।

করা যায় যে, দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় উল্লিখিত পাণ্ডুনগর বর্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত পাণ্ডুয়া।

আমরা নীচে রিয়াজ-উস্-সলাতীন ও বুকাননের বিবরণীর উক্তি এব সমসাময়িক সূত্র ও মুদ্রা থেকে লব্ধ তথ্যের সংক্ষিপ্তসার পাশাপাশি দিলাম। এর থেকেই বোঝা যাবে, গণেশ ও দনুজমর্দনদেব একই লোক।

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণী	সমসাময়িক সূত্র ও মুদ্রা
গণেশ দরবেশদের উপর অত্যাচার করায় নূর কুৎব্ আলম সুলতান ইব্রাহিমকে আহ্বান জানান—গণেশকে দমন করার জন্যে। ইব্রাহিম এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হন।	আশরফ সিম্নানীর চিঠিতে লেখা আছে, গণেশ দরবেশদের উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং তাঁকে দমন করার জন্যে নূর কুৎব আলম ইব্রাহিম শর্কীকে আহ্বান জানান। ইব্রাহিম এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সসৈন্যে বাংলার দিকে রওনা হন।
ইব্রাহিম সসৈন্যে উপস্থিত হলে গণেশ নত হন এবং তাঁর পুত্রকে ধর্মান্তরিত করে জলালুদ্দীন নাম দিয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়।	'সঙ্গীতশিরোমণি' থেকে জানা যায় যে, ইব্রাহিমের বাংলায় অভিযানের ফলে গণেশের ক্ষমতার উচ্ছেদ হয়েছিল এবং তাঁর পুত্র মুসলিমধর্মে দীক্ষিত হয়ে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।
	৮১৮ ও ৮১৯ হিজিরায় উৎকীর্ণ জলালুদ্দীনের মুদ্রা পাওয়া গেছে।
	নূর কুৎব আলমের চিঠি থেকে জানা যায় যে, একজন বিধর্মী ক্ষমতা অধিকার করেছেন এবং জলালুদ্দীন রাজা থাকায় মুসলমানদের কোন লাভ হচ্ছে না।

'রিয়াজ' ও বুকাননের বিবরণী

এর কিছুদিন পরে জলালুদ্দীনকে অপসারিত করে গণেশ নিজেই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন।

এর কয়েকবছর বাদে গণেশের মৃত্যু হয় এবং জলালুদ্দীন রাজা হন।

সমসাময়িক সূত্র ও মুদ্রা

৮২০ হিজিরায় উৎকীর্ণ জলালুদ্দীনের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে না।

১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে (=৮২০-৮২১ হিঃ) উৎকীর্ণ দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

১৩৪০ শকাব্দে (=৮২১ হিঃ) উৎকীর্ণ মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

৮২১ হিজিরা থেকে আবার নিয়মিতভাবে জলালুদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

অতএব দনুজমর্দনদেব স্বয়ং গণেশ ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না। ফার্সী বইগুলিতে গণেশের 'দনুজমর্দনদেব' উপাধির কথা উল্লিখিত হয়নি বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়; কিন্তু অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, বুকানন যে পুঁথিটি ব্যবহার করেছিলেন, তাতে এই উপাধিটি উল্লিখিত ছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, "Hakim of Dynwaj পদটি দনুজমর্দন শব্দের ফারসী অনুবাদ—অন্যায় অধিকারী অর্থেও হাকিম শব্দের ব্যবহার আছে। ইহা ছাড়া পদটির অন্য কোন অর্থই সঙ্গত হয় না—দিনাজপুর নিতান্তই আধুনিক নাম।......নামটির মধ্যে একটি 'w' অক্ষর আছে—তদ্দ্বারা 'দনুজ'ই প্রতিপন্ন হয়—'দিনাজ' নহে।" † 'Hakim, of Dynwaj'এর বুকানন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'perhaps a petty Hindu chief of Dinajpur'; কিন্তু এই ব্যাখ্যা কী কারণে স্বীকার করা চলে না, তা আগেই দেখানো হয়েছে; সুতরাং, অধ্যাপক ভট্টাচার্য 'Hakim, of Dywnaj'এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই এর যথার্থ ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। আমাদের মনে হয়, মূল ফার্সী পুঁথিতে পদটি যে ভাবে ছিল, তার প্রকৃত অর্থ, 'দনুজ' নামধারী হাকিম; ফার্সী লিপিতে 'দনুজ' 'দিনওয়াজ' হয়েছে।

* প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৬০, পৃঃ ৯৩

† ঐ

কিন্তু গণেশ ও দনুজমর্দনদেব যে পৃথক লোক, এই মতও কোন কোন কোন গবেষক ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁদের মতের পিছনে কী কী যুক্তি আছে, তা ভালভাবে বিচার করে দেখা দরকার।

প্রথম যুক্তিটি অনেকটা সংস্কারমূলক। এঁরা বলেন জলালুদ্দীনের প্রথম মুদ্রার তারিখ ৮১৮ হিজিরা=১৪১৫-১৬ খ্রীঃ, আর দনুজমর্দনদেবের প্রথম মুদ্রার তারিখ ১৩৩৯ শক=১৪১৭-১৮ খ্রীঃ। সুতরাং গণেশ ও দনুজমর্দনদেবকে অভিন্ন ধরলে স্বীকার করতে হয় যে—আগে পুত্র, এবং তারপরে পিতা রাজা হয়েছিলেন। এ ব্যাপার অস্বাভাবিক। এর উত্তরে বলা যায়, অস্বাভাবিক হলেও এরকম ব্যাপার ঘটেছিল বলে যখন 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে এবং বিভিন্ন সমসাময়িক সূত্র থেকে তার সমর্থন মিলছে, তখন একে স্বীকার করে নিতেই হয়।

দ্বিতীয় যুক্তি, দনুজমর্দন নামে একজন স্বতন্ত্র রাজার সন্ধানও পাওয়া গেছে। ইনি চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই সব গবেষকেরা মনে করেন, ইনিই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে প্রায় সারা বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁর টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন। এখনও কেউ কেউ এই মতে বিশ্বাস করেন বলে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার মনে করি।

চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন

প্রথমেই বলা দরকার, চন্দ্রদ্বীপে যে দনুজমর্দন নামে কোনও রাজা ছিলেন, তা কোন প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায় না। এই দনুজমর্দন কেবলমাত্র কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থে উল্লিখিত। অবশ্য এই কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থের একটা বড় অংশই দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কারের পরে সৃষ্টি হয়েছে। কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তারও ইতিহাস বেশ কৌতুকজনক। প্রথমে এই মুদ্রাগুলি পড়তে পারা যায়নি। তখন কেউ কেউ মত প্রকাশ করলেন, এই দনুজমর্দন এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমাধব বা দনুজ রায় অভিন্ন। এই সময় কতকগুলি কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হল, যাতে লেখা রয়েছে দনুজমর্দন ও দনুজমাধব অভিন্ন। এর পরে মুদ্রাগুলির তারিখ কেউ কেউ আংশিকভাবে পড়তে পারলেন, কিন্তু তাঁরা মহেন্দ্রদেবকে অগ্রবর্তী ও দনুজমর্দনদেবকে পরবর্তী রাজা মনে করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কুলগ্রন্থও বেরোল, যাতে লেখা আছে দনুজমর্দন মহেন্দ্রের পুত্র। 'বটুভট্টের দেববংশে'ও (নামান্তর 'দেববংশের ইতিবৃত্তি') এই কথা লেখা আছে; এইসব জঞ্জাল এই সময়ের সৃষ্টি। আবার তারিখ ঠিকভাবে পড়তে পারার পর সেই অনুযায়ী কুলগ্রন্থও বেরিয়েছে।

এই সব আবর্জনাকে আমরা হিসাবের মধ্যে গণ্য করব না। আমাদের দেখতে হবে দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা নিয়ে আলোচনা সুরু হবার আগে এ-সম্বন্ধে কী কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল এবং কুলগ্রন্থে কী লেখা ছিল। তা জানা যায় চার জায়গা থেকে—(১) এইচ এস বেভারিজ রচিত The District of Backergaunj বই (১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত), (২) জেমস ওয়াইস লিখিত On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal প্রবন্ধ (J. A. S. B., 1874, pp. 197-214), (৩) খোসাল চন্দ্র রায় রচিত 'বাখরগঞ্জের ইতিহাস' (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত), (৪) রোহিণীকুমার সেন বিরচিত 'বাকলা' (লেখকের মৃত্যুর দশ বছর পরে—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)। (আরও কয়েকখানি বইয়ের নাম শুনেছি, কিন্তু এগুলি সংগ্রহ করতে পারিনি।)

একথা জেনে রাখা দরকার, প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য বর্তমান বরিশাল জেলার কিয়দংশ ও নোয়াখালি জেলার কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। মোগল আমলে এই অঞ্চল ছিল 'সরকার বাকলা'র অন্তর্গত। যা হোক্, উপরে যে চারটি বই বা প্রবন্ধের উল্লেখ করা হল, প্রত্যেকটিতেই বলা হয়েছে, চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম (বা নামের অংশ) ছিল দনুজমর্দন। কিন্তু এদের উক্তির মধ্যে কিছু কিছু অনৈক্য দেখা যায়। বেভারিজ ও রোহিণীকুমার সেনের মতে চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতার নাম রামনাথ দনুজমর্দন দে (বাঙালীর পক্ষে অদ্ভুত নাম), খোসালচন্দ্র রায়ের মতে এঁর নাম দনুজমর্দন দে এবং এঁর পুত্রের নাম রামনাথ দে, জেমস ওয়াইজের মতে এঁর নাম দনুজমর্দন দে, 'রামনাথ'এর কোন উল্লেখ ওয়াইজের লেখায় নেই।

কীভাবে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, সে সম্বন্ধে বেভারিজ, ওয়াইজ ও রোহিণীকুমার সেন দুটি প্রাচীন কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। এই দুটি কিংবদন্তীর সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

(১) কোন এক সময় বিক্রমপুরে চন্দ্রশেখর নামে একজন ব্রাহ্মণ এমন একটি কন্যাকে বিবাহ করেন, যার নাম তাঁর উপাস্যা দেবীর নামের সঙ্গে

অভিন্ন। ব্রাহ্মণ এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মহত্যা করবার জন্য একটি ছোট নৌকোয় চড়ে জলপথে আসেন এবং দুদিন পরে এক জায়গায় এসে এক ধীবরকন্যার দেখা পান। এই ধীবরকন্যা তাঁকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত করেন এবং অবশেষে প্রকাশ পায় ইনিই চন্দ্রশেখরের উপাস্যা দেবী। দেবী বলেন শীঘ্রই এই জলময় অঞ্চল শস্যশ্যামলা মেদিনীতে পরিণত হবে এবং চন্দ্রশেখর তার রাজা হবেন। চন্দ্রশেখর রাজা হতে অস্বীকার করেন। শুধু প্রার্থনা করেন যেন তাঁর নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হয়। দেবী এই প্রার্থনা পূরণ করেন। ফলে জল সরে গেলে এই অঞ্চল চন্দ্রশেখরের নাম অনুসারে 'চন্দ্রদ্বীপ' নামে পরিচিত হয়।

(২) আগে যখন চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল জলমগ্ন ছিল, তখন চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী তাঁর কয়েকজন শিষ্য নিয়ে এই জায়গা দিয়ে নৌকায় চড়ে তীর্থ অভিমুখে যাচ্ছিলেন। এই শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম দনুজমর্দন দে। একদিন রাত্রে জগদম্বা কালিকাদেবী ব্রহ্মচারীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, এখানে জলের তলায় তিনটি পাষাণময়ী দেবমূর্তি আছে, এগুলি যদি দনুজমর্দন দে তোলেন, তাহলে জল অপসারিত হয়ে এই অঞ্চল ভূখণ্ডে পরিণত হবে। পরদিন সকালে চন্দ্রশেখরের আদেশ অনুযায়ী দনুজমর্দন দে দুবার জলে ডুব দিয়ে প্রথমবার ক্যাত্যায়নীর এবং দ্বিতীয়বার মদনগোপালের মূর্তি পেলেন, কিন্তু তৃতীয়বার ডুব দিতে সাহস করলেন না। গুরু বললেন, "তৃতীয়বার ডুব দিলে মহালক্ষ্মীর মূর্তি পাওয়া যেত।" যাহোক্, অবিলম্বেই সমস্ত জল সরে গিয়ে অঞ্চলটি ভূখণ্ডে পরিণত হল এবং দনুজমর্দন দে তার প্রথম রাজা হলেন। গুরুর নাম অনুসারে তিনি নতুন রাজ্যের নাম রাখলেন 'চন্দ্রদ্বীপ'।

বলা বাহুল্য, অলৌকিক রসাশ্রিত এই সব কিংবদন্তী থেকে আমরা ইতিহাসের কোন উপকরণ পাই না।

পূর্বোল্লিখিত চারজন লেখকই প্রাচীন কুলগ্রন্থ বা কিংবদন্তী অবলম্বনে দনুজমর্দন দের অধস্তন বংশধরদের নামের তালিকা দিয়েছেন। কিন্তু চারটি তালিকার পরস্পরের মধ্যে মিল নেই। আমরা চারটি তালিকা থেকেই বংশলতা প্রস্তুত করে নীচে লিপিবদ্ধ করলাম।

বেভারিজ	ওয়াইজ	রোহিণীকুমার সেন	খোসালচন্দ্র রায়
রামনাথ দনুজমর্দন দে	দনুজমর্দন দে	রামনাথ দনুজমর্দন দে	দনুজমর্দন দে
রমাবল্লভ	রমাবল্লভ	রমাবল্লভ	রামনাথ
শ্রীবল্লভ	কৃষ্ণবল্লভ	কৃষ্ণবল্লভ	রমাবল্লভ
হরিবল্লভ	হরিবল্লভ	হরিবল্লভ	শ্রীবল্লভ
কৃষ্ণবল্লভ	জয়দেব / কন্যা	জয়দেব	হরিবল্লভ
কমলা = বলভদ্র বসু	পরমানন্দ	কমলা = বলভদ্র বসু	কৃষ্ণবল্লভ
পরমানন্দ	জগদানন্দ	পরমানন্দ	কমলা
জগদানন্দ	কন্দর্পনারায়ণ	জগদানন্দ	প্রেমানন্দ
কন্দর্পনারায়ণ	রামচন্দ্র	কন্দর্পনারায়ণ	জগদানন্দ
রামচন্দ্র		রামচন্দ্র	কন্দর্পনারায়ণ
			রামচন্দ্র

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই চারটি বংশলতার শেষ চারটি নামের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধ না থাকলেও (কেবল খোসালচন্দ্র রায় 'পরমানন্দ'র জায়গায় 'প্রেমানন্দ' লিখেছেন) তার আগের নামগুলি সম্বন্ধে বিরোধ অল্প নয়। সুতরাং আগের অংশের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে। শেষ চারজনের মধ্যে রামচন্দ্র যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা এবং বহু প্রামাণিক সূত্রে উল্লিখিত। কন্দর্পনারায়ণও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। জগদানন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থের বাইরে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু পরমানন্দের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত প্রমাণ আছে, তাঁর আবির্ভাব-কালও জানা গেছে। গোয়ায় রক্ষিত পর্তুগীজ ভাষায় লেখা একটি চুক্তিপত্র

পাওয়া গেছে; এর থেকে জানা যায় ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বাকলার রাজা (Rae de Bacola) পরমানন্দ রায় পর্তুগীজদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন এবং তাঁর দুজন প্রতিনিধি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। (এই অঞ্চলের আর একজন পরমানন্দের নাম আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায়। আবুল ফজল লিখেছেন, আকবরের রাজত্বের ২৯শ বর্ষে অর্থাৎ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট ঝটিকাবর্ত ও জলপ্লাবন হয়ে 'সরকার বাকলা'কে একেবারে নিমজ্জিত করে দেয়। বাকলার রাজা তখন গীতবাদ্য উপভোগ করছিলেন। প্রাণ বাঁচাবার জন্য নৌকায় উঠেও তিনি আত্মরক্ষা করতে পারেন না। কিন্তু তাঁর পুত্র পরমানন্দ রায় উঁচু মন্দিরের চূড়ায় উঠে কোনরকমে রক্ষা পেয়ে যান।)

যা হোক্, বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের রাজা পরমানন্দ অন্ততঃ ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন পুরুষদের নাম প্রামাণিকভাবে জানা যায় না। কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থ থেকে যা জানা যায়, সে সম্বন্ধেও বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে মতৈক্য নেই। বেভারিজ ও রোহিণীকুমার সেনের মত অনুসারে যদি চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দন পরমানন্দের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ হন তাহলে তিনি মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন; ওয়াইজের মত অনুসারে যদি তিনি পরমানন্দের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ হন, তাহলে মোটামুটিভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এবং খোসালচন্দ্র রায়ের মত অনুসারে যদি তিনি পরমানন্দের ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ হন, তাহলে মোটামুটিভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে ছিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দনের কোন পূর্বপুরুষের নাম কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় না। 'বটুভট্টের দেববংশ' বা দেববংশের ইতিবৃত্তি'তে এ সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার কোন মূল্য নেই। সুতরাং এদিক দিয়ে তাঁর আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করার কোন উপায় নেই।

যাহোক্, চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দনুজমর্দনের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সেগুলি অলৌকিক উপাদানে পূর্ণ। তাঁর অধস্তন বংশলতা বিভিন্ন কুলগ্রন্থে যেভাবে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে ঐক্য নেই এবং এদের পিছনে কোন প্রামাণিক সূত্রের সমর্থন নেই। কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস করে যদি এই দনুজমর্দনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহলেও তাঁর সম্ভাব্য আবির্ভাবকাল

সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়না। সুতরাং এই চন্দ্রদ্বীপরাজ দনুজমর্দন ১৩৩৯-৪০ শকাব্দে সারা বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও ও চাটগাঁও থেকে এক সঙ্গে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন ধরে নিলে তা আষাঢ়ে কল্পনার পর্যায়ে পড়বে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। সমস্ত প্রাচীন কিংবদন্তী ও কুলগ্রন্থ অনুসারে দনুজমর্দন কেবল চন্দ্রদ্বীপেরই রাজা ছিলেন। তিনি যে সারা বাংলা দেশ জয় করেছিলেন, এরকম কোন কথা তাদের মধ্যে বলা হয়নি। সুতরাং মুদ্রার দনুজমর্দনদেব চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন হতে পারেন না, তিনি রাজা গণেশ ছাড়া আর কেউ নন। চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দন সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, চন্দ্রদ্বীপের এই নামের একজন রাজা সত্যিই ছিলেন এবং তিনি গণেশ-দনুজমর্দনের পরবর্তী কালের লোক; গণেশ-দনুজমর্দনদেবের অনুকরণেই তিনি 'দনুজমর্দন' নাম নিয়েছিলেন।

গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ ও পরবর্তী ঘটনাবলী

অতএব সিদ্ধান্ত করা গেল, গণেশ ও দনুজমর্দনদেব একই লোক। ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দেই যিনি বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকা নিয়ে অবতরণ করেছিলেন, অনিবার্য কারণ বশতঃ ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে তিনি নিজের নামে মুদ্রা বার করতে পারেন নি। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখিয়েছেন, 'দনুজমর্দন' নামটি বিশেষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ; এর দ্বারা বিধর্মী প্রতিপক্ষদের দমন করার অভিপ্রায় প্রকাশ পাচ্ছে।

জলালুদ্দীনের অন্যান্য বছরের মুদ্রার তুলনায় ৮১৯ হিজিরার মুদ্রা অচিন্ত্যনীয় রকমের কম। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর অন্য বছরের বহু মুদ্রা পেয়েছিলেন, কিন্তু ৮১৯ হিজিরার মুদ্রা মাত্র একটি পেয়েছিলেন। অতএব ৮১৯ হিজিরাতেই গণেশ জলালুদ্দীনকে অপসারিত করে সিংহাসনে বসেছিলেন এবং পরের বছর থেকে 'দনুজমর্দনদেব' উপাধি নিয়ে মুদ্রা বার করেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। দনুজমর্দনদেব ১৩৪০ শকাব্দের প্রথমাংশ অবধি অর্থাৎ ৮২১ হিজিরার মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসে গণেশ প্রায় দু'বছর রাজত্ব করেছিলেন।

আমরা দেখে এসেছি, ইব্রাহিম শর্কীর হস্তক্ষেপের ফলে গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এখন তাঁর এমন কী সুযোগ ঘটল, যাতে তিনি সিংহাসনে বসলেন? ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনুমান করেছিলেন যে, ইতিমধ্যে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যু হওয়াতেই গণেশ এই সুযোগ পেয়েছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যুর বিভিন্ন তারিখ পাওয়া যায়। * বেভারিজ নানা যুক্তি সহকারে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, তার মধ্যে ৮১৮ হিজিরা তারিখটিই গ্রহণযোগ্য। † ডঃ ভট্টশালীর অনুমান বেভারিজের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। তাঁর এই অনুমান খুবই যুক্তিযুক্ত। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের সময়ে নূর কুৎব্ জীবিত ছিলেন। কিন্তু গণেশের মৃত্যুর পরে

* এইসব বিভিন্ন তারিখ হচ্ছে ৮০৮, ৮১৩, ৮১৮, ৮২৮, ৮৪৮, ৮৫১ ও ৮৬৩ হিজিরা। ৮৬৩ হিজিরা তারিখটি পাওয়া যায় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত নূর কুৎব্ আলমের দরগার রান্নাঘরের একটি শিলালিপিতে। শিলালিপিটিতে একজন দরবেশের মৃত্যুর কথা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় লেখা আছে। ডঃ দানী মনে করেন এই দরবেশ স্বয়ং নূর কুৎব্ আলম। কিন্তু বেভারিজ বহু পূর্বে লিখেছিলেন, "863 is, I think, an impossible date for the death of a man who was a contemporary and fellow student of Sultan Ghiyasuddin and whose father died (after the son was grown up) in 786, or at least in 800." বেভারিজের মতে শিলালিপিটিতে উল্লিখিত তারিখ সমাধিনির্মাণের, নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যুর নয়। আবিদ আলীর মতে এটি নূর কুৎবের পৌত্র শেখ জাহিদের মৃত্যুর তারিখ। যাহোক শিলালিপিটি বোধহয় সমসাময়িক নয়। কারণ এতে উল্লিখিত সম্পূর্ণ তারিখটি—২৮শে জিলহিজ্জা, সোমবার, ৮৬৩ হিজিরা। কিন্তু মনোমোহন চক্রবর্তী জ্যোতিষগণনা করে দেখিয়েছিলেন ৮৬৩ হিজিরার ২৮শে জিলহিজ্জা সোমবারে পড়েনি। সুতরাং এর সাক্ষ্যের খুব একটা মূল্য নেই।

† ইলাহী বখ্শের 'খুর্শিদ-ই-জহান-নামা'তে উল্লিখিত একটি শিলালিপিতে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যুর তারিখ দেওয়া আছে—৭ই জিল্কদ, ৮১৮ হিজিরা। ব্রিটিশ মিউজিয়াম রক্ষিত 'মিরাৎ-উল্-আস্রার'এর এক পুঁথিতে লেখা আছে—১০ই জিল্কদ, ৮১৮ হিজিরা।

যখন জলালুদ্দীন দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসলেন, তখন যে নূর কুৎব্ জীবিত ছিলেন, এমন কথা ঐ বইয়ে লেখা নেই। তার বদলে তাতে আমরা দেখি জলালুদ্দীন নূর কুৎবের পৌত্র শেখ জাহিদকে (গণেশ কর্তৃক উৎপীড়িত ও সোনারগাঁওয়ে নির্বাসিত) আনিয়ে সংবর্ধনা করছেন। সুতরাং গণেশের দ্বিতীয়বার রাজত্বের সময় যে নূর কুৎব্ আলমের মৃত্যু হয়েছিল, এই ধারণার সমর্থন 'রিয়াজ' থেকেও পাওয়া যাচ্ছে। নূর কুৎব্ আলমের যে চিঠিটি আগে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি জলালুদ্দীনের প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণের কিছু পরেই রচিত। এই চিঠিতে নূর কুৎবের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে। যতদূর মনে হয়, ৮১৮ হিজিরার কোন এক সময়ে এই চিঠিটি লেখবার কিছু পরেই নূর কুৎব্ আলম ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। রাজা গণেশও এই শক্তিশালী দরবেশের মৃত্যুতে নিষ্কণ্টক হন এবং পুত্রকে অপসারিত করে নিজের মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করেন। এই সময়ে গণেশের পক্ষে সিংহাসনে বসবার যে অনুকূল সুযোগ অন্য দিক থেকেও এসেছিল, তার স্পষ্ট আভাস নূর কুৎব্ আলমের চিঠিতেই পাওয়া যায়; ঐ চিঠির শেষাংশে তিনি বলেছেন, "লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে, তাতে আমাদের কাছে কোন সাহায্য আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।" এর থেকেই বোঝা যায় যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে গণেশ এই সময় সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। কীভাবে তিনি এই নিরাপত্তা অর্জন করেছিলেন তা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না, অনুমানে বলা যায় যে, গণেশ প্রায় দুবছর জলালুদ্দীনকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখে ভিতরে ভিতরে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন এবং রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত করেছিলেন; তাই ইব্রাহিম শর্কী বা আর কোন বহিঃশত্রুর কাছ থেকে তাঁর আর এখন কোন ভয় ছিল না। সুতরাং তাঁর সিংহাসনে আরোহণেরও আর কোন বাধা ছিল না। নূর কুৎব্ আলম পূর্বোক্ত চিঠিখানি লেখবার অল্প পরেই গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে মনে হয়।

গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের আনুষঙ্গিক দু'টি ঘটনা 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে জলালুদ্দীনকে তিনি শুদ্ধি করিয়ে হিন্দু করেছিলেন, দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাঁর আদেশে নূর কুৎব্ আলমের ছেলে আনোয়ারকে হত্যা করা হয়েছিল। দু'টি ঘটনাই সত্য বলে আমাদের মনে হয়। গণেশ নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু; অবস্থার চাপে পড়ে ছেলেকে মুসলমান হতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, সুতরাং অনুকূল সুযোগ এলে

যে তিনি আবার তাকে হিন্দু করবেন, এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। উপরন্তু 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র বিবৃতিতেও 'রিয়াজ'-এর উক্তির প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে; ফিরিশ্‌তা বলেছেন, "পিতার মৃত্যুর পরে জিতমল (যদু) অমাত্যদের এবং রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় লোকদের আহ্বান করে বললেন যে, 'আমার কাছে ইসলাম ধর্মের সত্য পরিষ্কার এবং এই ধর্ম গ্রহণ করা ভিন্ন আমার আর কোন উপায় নেই'।" এখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, যদু বা জিতমল পিতার জীবদ্দশাতেই একবার মুসলমান হয়েছিলেন। সুতরাং মাঝে যদি তাঁর শুদ্ধি না হয়ে থাকে, তাহলে পিতার মৃত্যুর পরে এই কথা বলার কোন কারণ থাকতে পারে না। 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ' দুই বিবরণীর উক্তি মিলিয়ে দেখে আমাদের মনে হয়, গণেশ জলালুদ্দীনের শুদ্ধি করিয়েছিলেন। শুদ্ধির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ বলা হয়েছে, জলালুদ্দীনকে সুবর্ণনির্মিত কতকগুলি গাভীর মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অধোদ্বার দিয়ে নির্গত করা হয়েছিল এবং পরে সুবর্ণনির্মিত গাভীর অংশগুলি ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল। এই বর্ণনা কতদূর সত্য তা বলা যায় না। 'রিয়াজ'-এ বলা হয়েছে শুদ্ধির পরেও ইসলাম ধর্মের প্রতি জলালুদ্দীনের আকর্ষণ কিছুমাত্র শিথিল হয়নি। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য।

'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে যে রাজা গণেশ জলালুদ্দীনকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এ কথাও সত্য বলে আমাদের মনে হয়। কারণ জলালুদ্দীন একবার পিতার বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। আবার হয়তো যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় রাজা গণেশের পক্ষে তাঁকে বন্দী করে রাখা স্বাভাবিক। তাছাড়া যিনি একবার রাজা হবার স্বাদ পেয়েছিলেন, সিংহাসনচ্যুত হয়ে তিনি আবার তা ফিরে পাবার চেষ্টা করবেন, এই আশঙ্কাতেও গণেশের পক্ষে ছেলেকে বন্দী করা স্বাভাবিক। এমনও হতে পারে, জলালুদ্দীন সত্যিই আবার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন, তাই তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল।

নূর কুৎব্‌ আলমের ছেলে আনোয়ারকে বধ করার কথাও যে সত্য, এ কথা মনে করার কারণ, আশ্‌রফ্‌ সিম্‌নানীর পূর্বোদ্ধৃত একটি চিঠির এক জায়গায় আছে, "নূর কুৎব্‌ আলমের ছেলেকে এবং পরিবারকে যদি দুরাত্মা বিধর্মীদের গ্রাস থেকে উদ্ধার করা যায়, তাহলে খুবই ভাল কাজ হবে।" নূর কুৎব্‌ আলমের ছেলের প্রাণ তখনই গণেশের হাতে বিপন্ন হয়েছিল। সুতরাং গণেশ যে সুযোগ পাবা মাত্র তাঁর প্রাণবধের আদেশ দেবেন, এই

ব্যাপার স্বাভাবিক। তবে এই ঘটনা গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের পরে ঘটেছিল না আগে ঘটেছিল, সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। নূর কুৎব্ আলমের পূর্বোদ্ধৃত চিঠি গণেশের দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণের আগেই লেখা। এর মধ্যে যে শোকের উচ্ছ্বাস দেখা যায়, তা ছেলের হত্যাকাণ্ডের দরুণ হতে পারে।

গণেশের মৃত্যু

১৩৪০ শকাব্দের পর আর দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যায় না। ঐ একই বছরে আবার মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীনের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং ১৩৪০ শকাব্দ বা ৮২১ হিজিরা বা ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে যে গণেশের মৃত্যু হয়েছিল এবং তারপর প্রথমে মহেন্দ্রদেব ও পরে জলালুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কীভাবে গণেশের মৃত্যু হল, সে প্রশ্ন রহস্যাবৃত হয়ে আছে। 'রিয়াজ'-রচয়িতা বলেছেন, "কেউ কেউ বলেন, তার (গণেশের) ছেলে, যিনি বন্দী ছিলেন, ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পিতাকে হত্যা করেছিলেন।" ৮১৮—৮২১ হিজিরা বা ১৪১৫—১৮ খ্রীষ্টাব্দে গণেশের সক্রিয়তার যে পরিচয় পাই, তাতে এই সময় তাঁর মৃত্যু নিতান্ত আকস্মিক বলে মনে হয়। এই কারণে মনে হয়, 'রিয়াজ'-এর উক্তির মূলে কিছু সত্য থাকা অসম্ভব নয়; অন্তত গণেশের মৃত্যু যে স্বাভাবিকভাবে হয়নি, এরকম সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

গণেশের পুনর্গঠিত ইতিহাস

যাহোক্, এই দীর্ঘ আলোচনার পরে রাজা গণেশের ইতিহাসটি পুনর্গঠিত হয়ে যা দাঁড়াচ্ছে তা এই :—

রাজা গণেশ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী একজন জমিদার। উত্তর বঙ্গের ভাতুড়িয়া অঞ্চলে তাঁর জমিদারী ছিল; তিনি ইলিয়াস-শাহী বংশের সুলতানদের অন্যতম অমাত্যও ছিলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সিংহাসনে আরোহণের পরে গৌড়ের রাজশক্তি পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, কোনটিতে দীর্ঘকাল যুদ্ধের পরে কোনরকমে জয়ী হয়, কোনটি নিষ্ফল হয় এবং কোনটিতে পরাজয় বরণ করে। ক্রমাগত এই জাতীয় বলক্ষয়কর যুদ্ধ করে

গৌড়রাজের সৈন্যবল যখন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে পড়ে, তখন রাজা গণেশ মাথা তোলবার সুযোগ পান। প্রথমে তিনি চক্রান্ত করে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করান। গণেশ তাঁর সামরিক শক্তির জোরে পরবর্তী দুর্বল সুলতানদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন এবং এইসব অপদার্থ সুলতান গণেশকে প্রতিহত করতে না পেরে তাঁর হাতে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হন ও নিজেরা নাম-মাত্র রাজা থাকেন।

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের মৃত্যুর তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হমজা শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে অমাত্যেরা তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এর থেকে সৈফুদ্দীনের দুর্বলতা ও পরনির্ভরতা এবং অমাত্যদের (যাঁদের অন্যতম গণেশ) শক্তিবৃদ্ধির খানিকটা আভাস পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন। গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে উৎকট গোলযোগ ও ক্ষমতা অধিকারের দ্বন্দ্ব সুরু হয়ে যায় বলে মনে হয়। বোধ হয় তারই ফলে, সৈফুদ্দীনের অভিষেক-উৎসব অনুষ্ঠিত হতে প্রায় দুই বছর দেরী হয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে, ইতিমধ্যে রাজা গণেশ নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। অভিষেক-উৎসবের কিছুদিন পরেই সৈফুদ্দীন হমজা শাহের মৃত্যু হয়।

সৈফুদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর দত্তক পুত্র বা ক্রীতদাস শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ। ইনি তরুণবয়স্ক। এঁর রাজত্বকালে গণেশই সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন এবং রাজ্য ও রাজস্বের উপরে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। শিহাবুদ্দীনকে সম্ভবত গণেশই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন নামে রাজা, কার্যতঃ গণেশের হাতের পুতুল।

দুই তিন বছর এইরকম "রাজত্ব" করার পরে শিহাবুদ্দীন পরলোকগমন করলেন। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর মৃত্যুর পর গণেশ তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্রকে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম দিয়ে সিংহাসনে অভিসিক্ত করলেন এবং কয়েকমাস এই ফিরোজকে নাম-মাত্র রাজা করে রেখে তিনি সর্বেসর্বা হয়ে যথেচ্ছভাবে দেশশাসন করতে লাগলেন।

এরপরে রাজা গণেশ তাঁর সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মুসলমান রাজত্বের উচ্ছেদ করলেন। অর্থাৎ রাজা ও রাজবংশের লোকদের হত্যা করে রাজপ্রাসাদ ও রাজার সব সম্পত্তি অধিকার করে নিলেন এবং রাজার সিংহাসনও দখল

করলেন। যতদূর মনে হয় ৮১৭ হিজিরার শেষ দিকে অর্থাৎ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি এইভাবে পূর্বতন রাজবংশকে উচ্ছেদ করে নিজে রাজা হন।

এর কিছুদিন পরে অর্থাৎ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে চীনসম্রাটের কাছ থেকে নানারকম উপহার নিয়ে একদল প্রতিনিধি বাংলার রাজসভায় এল। সম্ভবত গণেশই বাংলার রাজা হিসাবে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। অভ্যর্থনা শেষ হলে বাংলার রাজা চীনা রাজদূতদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন। এই ভোজসভায় গোমাংস, মেষমাংস বা মদ দেওয়া হয়নি।

কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করা গণেশের পক্ষে সম্ভব হল না। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ একজন বিধর্মীর রাজা হওয়া বরদাস্ত করতে পারল না। এদের নেতা ছিলেন দরবেশরা। তাঁরা প্রকাশ্যে প্রচণ্ডভাবে গণেশের বিরোধিতা করতে লাগলেন। রাজা গণেশকে তখন আত্মরক্ষার অনুরোধে প্রকাশ্য সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে হল এবং তিনি বিরোধিপক্ষের কয়েকজনকে শাস্তি দিলেন। তার ফলে দরবেশরা গণেশের উপর আরও জাতক্রোধ হয়ে উঠলেন। দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম বাংলার সীমান্তবর্তী বিহার পর্যন্ত অঞ্চলের একচ্ছত্র সম্রাট জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর কাছে উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় এক চিঠি লিখলেন এবং এই চিঠিতে গণেশকে মুসলমানদের শত্রু এবং ঘোরতর অত্যাচারীরূপে বর্ণনা করলেন। পরিশেষে তিনি ইব্রাহিমকে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি সসৈন্যে বাংলায় এসে এই অত্যাচারী বিধর্মীকে উচ্ছেদ করেন। ইব্রাহিম শর্কী এই চিঠি পেয়ে এবিষয়ে জৌনপুরের দরবেশ আশরফ সিম্নানীর উপদেশ প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর সম্মতি পেয়ে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে যাত্রা করলেন।

যে সব দেশের উপর দিয়ে ইব্রাহিম গেলেন, তাদের মধ্যে মিথিলা বা ত্রিহুত অন্যতম। ত্রিহুত জৌনপুররাজের অধীনস্থ সামন্তরাজ্য। কিন্তু এই সময়ে ত্রিহুতের রাজা দেবসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাঁর পুত্র শিবসিংহ রাজা হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক, তাই জৌনপুররাজের অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। শিবসিংহ রাজা গণেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং গণেশের সঙ্গে যেমন বাংলার দরবেশদের সংঘর্ষ বেধেছিল, শিবসিংহের সঙ্গেও তেমনি

ত্রিহুতের দরবেশদের সংঘর্ষ বেধেছিল। নির্ভীক, স্বাধীনচেতা এবং বন্ধুবৎসল শিবসিংহ এই সময়ে বীরোচিত কার্য করলেন। ইব্রাহিম যখন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার পথে ত্রিহুতে এসে উপস্থিত হলেন, তখন শিবসিংহ তাঁর স্বল্প পরিমিত শক্তি নিয়েই ইব্রাহিমকে বাধা দিলেন। কিন্তু ইব্রাহিমের বিপুল সৈন্যবাহিনীর কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে শিবসিংহ পলায়ন করলেন। ইব্রাহিম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ইব্রাহিম শিবসিংহের সুদৃঢ় দুর্গ লেহ্‌রা জয় করে শিবসিংহকে বন্দী করলেন এবং তাঁর পিতা দেবসিংহকে আনুগত্যের সর্তে ত্রিহুতের রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

শিবসিংহকে দমন করে ইব্রাহিম আবার তাঁর অভিযান সুরু করলেন এবং বাংলায় এসে উপস্থিত হলেন। রাজা গণেশ তাঁর বিপুল সামরিক শক্তির কাছে দাঁড়াতে পারলেন না। তাছাড়া তাঁর পুত্র যদু (নামান্তর যদুসেন, গদুসেন, জিৎমল) পিতার পক্ষ ত্যাগ করে ইব্রাহিমের পক্ষে যোগ দিলেন। তখন রাজা গণেশ সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। যদু রাজ্যের লোভে নিজের ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন। ইব্রাহিম যদুকে মুসলমান করে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। যদু জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম নিয়ে সুলতান হলেন। সম্ভবতঃ ৮১৮ হিজিরার শেষার্ধে ইব্রাহিমের বাংলা আক্রমণ এবং জলালুদ্দীনের সিংহাসন লাভ সংঘটিত হয়েছিল।

কিন্তু রাজা গণেশ বেশী দিন ক্ষমতাহীন অবস্থায় বসে রইলেন না। ইব্রাহিম চলে গেলে তিনি সুযোগ বুঝে আবার প্রত্যাবর্তন করলেন এবং অল্পায়াসে নিজের সমস্ত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে ফেললেন। পুত্র জলালুদ্দীন নামে সুলতান রইলেন, কিন্তু তিনি পিতার হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হলেন। রাজ্যে আবার হিন্দু ধর্মের জয়পতাকা উড়তে লাগল। গণেশ আবার তাঁর প্রতিপক্ষ দরবেশদের ও অন্যান্য মুসলমানদের দমন করতে লাগলেন। এ ব্যাপার দেখে নূর কুৎব্ আলম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং সম্ভবতঃ এর কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করলেন।

এদিকে রাজা গণেশ নানা দিক দিয়ে যখন নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করলেন, তখন পুত্র জলালুদ্দীনকে অপসারিত করে 'দনুজমর্দনদেব' নাম নিয়ে নিজে রাজা হলেন। সমগ্র ১৩৩৯ শকাব্দ ও ১৩৪০ শকাব্দের কিয়দংশ নিজের নামে রাজত্ব করার পর রাজা গণেশ বা দনুজমর্দনদেব পরলোকগমন করলেন। সম্ভবত তিনি জলালুদ্দীনকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মে

পুনর্দীক্ষিত করিয়েছিলেন এবং তাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। সম্ভবত [illegible] ষড়যন্ত্রেই গণেশের মৃত্যু হয়।

যে রাজা গণেশকে কেন্দ্র করে এত কিংবদন্তী ও গালগল্প গড়ে উঠেছে, তাঁর প্রকৃত ইতিহাস উপরে দেওয়া হল। এখন তাঁর রাজ্যের আয়তন ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

গণেশের রাজ্যের আয়তন

গণেশের রাজ্যের আয়তন যে অত্যন্ত বিশাল ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তর বঙ্গের পাণ্ডুয়া, উত্তরপূর্ব বঙ্গের সোনারগাঁও এবং দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের চট্টগ্রাম থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল, এর থেকে বোঝা যায়, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের অধিকাংশই তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া মধ্যবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশও যে তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা আলোচনা করে দেখাচ্ছি।

বিখ্যাত জীব গোস্বামী তাঁর লেখা 'লঘু বৈষ্ণবতোষণী'র (রচনাকাল ১৪৭৬ খ্রী:) শেষে তাঁর পূর্বপুরুষদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার থেকে জানা যায় যে, রাজা দনুজমর্দন তাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ, রূপ-সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং এই পদ্মনাভ শিখরভূমি (পঞ্চকোট অঞ্চল) পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে ভাগীরথীতীরবর্তী "নবহট্টকে" এসে বসতিস্থাপন করেন। জীব গোস্বামী লিখেছেন।

> "বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
> স্ফুরৎসুরতরঙ্গিনীতটনিবাসপর্যুৎসুকঃ ॥
> ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
> দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥"

[রাজা দনুজমর্দন নিত্য যাঁর পাদপূজা করতেন, সেই গুণিশ্রেষ্ঠ কৃতী পদ্মনাভ শিখরভূমি বাসের স্পৃহা পরিত্যাগ করে গঙ্গাতীরে বাস করতে উৎসুক হয়ে নবহট্টকে (নৈহাটিতে) বসতি করেছিলেন।]

রূপ-সনাতন সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩—১৫১৯ খ্রী:) সভাসদ ছিলেন। সুতরাং তাঁদের প্রপিতামহ পদ্মনাভকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই পাওয়া যাচ্ছে। অতএব যে দনুজমর্দনের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, তিনিই পদ্মনাভের পাদপূজা করতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'নবহট্টক' এখনকার 'নৈহাটি'র পূর্ব-নাম। কিন্তু বাংলা দেশে নৈহাটি নামে দুটি জায়গা আছে; একটি কাটোয়ার উত্তরে আধুনিক সীতাহাটির কাছে নৈহাটি গ্রাম; অপরটি বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমারহট্ট-হালিশহরের দক্ষিণে অবস্থিত সুপরিচিত নৈহাটি শহর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ নৈহাটিতে পদ্মনাভ বসতি করেছিলেন? প্রথম নৈহাটি বর্তমানে ছোট একটি গ্রাম হলেও তার ঐতিহ্য বেশ প্রাচীন। এখানে বল্লালসেনের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছিল এবং এর অনতিদূরবর্তী ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ডক্টর সুকুমার সেন একটি ছোট পুঁথিতে সংস্কৃত ভাষায় লেখা একটি রূপ-সনাতন-জীবের স্বতন্ত্র বংশপরিচয় পেয়েছেন। এর রচনাকাল ১৬২০ শক ও ১০০৪ সন (মল্লাব্দ)=১৬৯৮-৯৯ খ্রীঃ, পুঁথিটির লিপিকাল ১৬২৯ শক ও ১০১৩ সন (মল্লাব্দ)=১৭০৭-০৮ খৃঃ।* এতে লেখা আছে, "স চ পদ্মনাভ গঙ্গাতীরবাসলুব্ধ শিখরদেশং পরিত্যজ্য কুমারহট্ট নামা গ্রামে বাসং চকার।" যদিও এই বংশপরিচয় পরবর্তী কালের লেখা এবং কার লেখা জানা নেই, তাহলেও এর সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করা চলে না, কারণ এর বিরোধী কোন প্রমাণ নেই। অতএব সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে, পদ্মনাভ যে নবহট্টকে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তা বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত নৈহাটি। পদ্মনাভ রাজা দনুজমর্দনের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সুতরাং তিনি শিখরভূমি ছেড়ে এসে বাংলাদেশের যে অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, তা যে দনুজমর্দনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব অন্তত নৈহাটি পর্যন্ত ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চল গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে স্থির করা যায়।

---

* বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩০২-৩০৩। ডঃ সেনের মতে বংশপরিচয়টির রচনাকাল ১৫৩২ শক, কিন্তু ১৫৩২ শক জীব গোস্বামীর মৃত্যু-শক হিসাবে এতে উল্লিখিত (পৃঃ ৩০৩ দ্রঃ)—রচনাকাল হিসাবে নয়। ডঃ সেন পুঁথির যে ফটো প্রকাশ করেছেন (৩০৩ পৃঃর আগে) তাতে ১৬২০ শক ও ১৬২৯ শক দুই তারিখই আছে, শেষেরটি অস্পষ্ট (ফটোর ডান দিকের নীচের অংশ দ্রষ্টব্য)। প্রথমটি রচনাকালের তারিখ, শেষেরটি পুঁথি লিপিকালের। ২৬।১।৫৭ তারিখে আমি পুঁথিটি চাক্ষুষ করেছিলাম, তখন শেষ তারিখটি শকে ও সনে স্পষ্ট করে লেখা ছিল।

দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশও যে গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ আছে। ৮২১ হিজিরা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও, উত্তরবঙ্গের পাণ্ডুয়া, পূর্ব-বঙ্গের সোনারগাঁও ও মুয়াজ্জমাবাদ ভিন্ন অন্য কোন জায়গার টাকশাল থেকে জলালুদ্দীন, দনুজমর্দনদেব বা মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা বেরোয়নি। কিন্তু ৮২১ হিজিরা থেকে ফতেহাবাদ নামে আর একটি জায়গার টাকশাল থেকেও জালালুদ্দীনের মুদ্রা বেরোতে দেখা যাচ্ছে। ফতেহাবাদ ফরিদপুরেরই প্রাচীন নাম। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় কোন ফতেহাবাদ ছিল বলে জানা যায় না।* ৮২১ হিজিরার বেশীর ভাগ সময়েই দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব এবং শেষের দিকে খুব অল্প সময়ের জন্য জলালুদ্দীন রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং ফতেহাবাদের যে টাকশাল থেকে ৮২১ হিজিরার একেবারে শেষের দিকে জলালুদ্দীনের মুদ্রা বেরিয়েছিল, তার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই অন্তত ৮২১ হিজিরার মাঝামাঝি সময়ে হয়েছিল এবং ঐ সমস্ত অঞ্চল তারও আগে গৌড়-রাজ্যের অধীনে এসেছিল। ৮২১ হিজিরার মাঝামাঝি অবধি গণেশ বা দনুজমর্দনদেব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং ফতেহাবাদ সমেত দক্ষিণবঙ্গের কতকাংশ যে গণেশের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণবঙ্গের খুলনা জেলায় দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা মেলাতে এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হচ্চে। আর একটি জিনিস দেখতে হবে। বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চল ফতেহাবাদের কাছেই। আগে আমরা অনুমান করে এসেছি, গণেশ-দনুজমর্দনের কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলের রাজা দনুজমর্দন আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর থেকেও অনুমান করা যেতে পারে এই অঞ্চল গণেশ দনুজমর্দনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই এখানকার পরবর্তী এক রাজা এই নামটিই গ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের অঞ্চলে গণেশের কোন অধিকার ছিল বলে এখনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সাতগাঁও-তে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে একটি চালু টাকশাল ছিল। সাতগাঁও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ দনুজমর্দনদেবের কোন মুদ্রা এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এর থেকে

* আলোচ্য সময়ের প্রায় ১০০ বছর পরে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে হুসেন শাহের রাজত্বকালে যুবরাজ নসরৎ শাহ চট্টগ্রাম অঞ্চল জয় করে চট্টগ্রামের অদূরবর্তী একটি শহরের নাম ফতেহাবাদ রাখেন; এই কথা 'তারিখ-ই-হামিদী' নামে একটি ফার্সী বইয়ে পাওয়া যায়।

মনে হয়, ভাগীরথীর পশ্চিমে গণেশের অধিকার বিস্তৃত হয়নি। পদ্মনাভের বসতিস্থান নবহট্টক যে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটি নয়, তা এর থেকেও বলা যেতে পারে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রায় সারা বাংলাই গণেশের অধীনে ছিল। আগেই দেখানো হয়েছে, ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দের অল্প কিছু পরেই গণেশ কার্যত বাংলার রাজা হয়ে বসেন এবং ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতএব পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের অধিকাংশ সময়ই তিনি বাংলা শাসন করেছিলেন বলা চলে।

গণেশের চরিত্র

রাজা গণেশের চরিত্র সম্বন্ধেও সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে যিনি সারা বাংলা অধিকার করে হিন্দু-শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি যে অসামান্য লোক এবং দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেভারিজ বলেছেন, "Raja Kans is the most interesting figure among the kings of Bengal. We feel that this obscure Hindu, who rose to supreme power in Bengal, and who for a time broke the bonds of Islam, must have been a man of vigour and capacity." অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও গণেশের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বিস্ময়মুগ্ধ প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেছেন।

গণেশ একজন জন্মগত প্রতিভাসম্পন্ন কুশাগ্রবুদ্ধি কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। ইব্রাহিম শর্কী যখন বাংলাদেশ আক্রমণ করলেন, তখন তিনি প্রতিরোধ নিষ্ফল বুঝে নিজের অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন, তাঁর পুত্র ধর্মান্তরিত হয়ে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু ইব্রাহিম চলে গেলেই তিনি আবার আত্মপ্রকাশ করে পুত্রের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এর থেকে তাঁর তীক্ষ্ণ কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় মেলে। ইব্রাহিম শর্কীর সামরিক শক্তি ও নূর কুৎব্ আলমের নামডাক গণেশের তুলনায় অনেক বেশী ছিল বটে, কিন্তু কূটনৈতিক বুদ্ধিতে যে গণেশ তাঁদের অনেক উপরে, তা এই ব্যাপার থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। তাঁদের সমবেত বিরোধিতা সত্ত্বেও তাই গণেশের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। তবে গণেশের কূটনীতিজ্ঞানের প্রশংসা করা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে আদর্শ বীর বলব

না; সে দিক দিয়ে শিবসিংহকে আদর্শ বীর বলতে পারি। তিনি প্রধানত গণেশের জন্যেই ইব্রাহিমের মত প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজে শোচনীয় পরিণাম বরণ করেছিলেন।

গণেশের ধর্ম-সম্বন্ধীয় নীতি বিশেষভাবে আলোচ্য। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। মুদ্রাতে 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য' লেখা এবং ব্রাহ্মণ পদ্মনাভের চরণপূজা করা থেকে তা বোঝা যায়। নূর কুৎব্ আলমের চিঠি থেকেও বুঝতে পারা যায় যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় গণেশ সর্বপ্রকারে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন।

এই হিন্দু রাজা বাংলার মুসলমান জনসাধারণের প্রতি কীরকম ব্যবহার করতেন, তা জানতে বিশেষ কৌতূহল হয়। তাঁর সমসাময়িক দরবেশ নূর কুৎব্ আলম ও আশ্‌রফ সিম্‌নানী তাঁদের চিঠিতে লিখেছেন গণেশ মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছিলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ইব্রাহিম শর্কীর দেশের লোকের লেখা 'সঙ্গীতশিরোমণি'তে গণেশকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এই আগুনে মুসলমানেরা পতঙ্গের মত পুড়ে মরেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এগুলি গণেশের শত্রুপক্ষের উক্তি। গণেশের সঙ্গে এক শ্রেণীর মুসলমানের তীব্র বিরোধ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিরোধের জন্যে সম্ভবতঃ তাঁর প্রতিপক্ষেরাই দায়ী। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন' এবং বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, বদর্-উল্ ইস্‌লাম গণেশকে অপমান করাতেই বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। নূর কুৎব্ আলম ও আশ্‌রফ সিম্‌নানীর চিঠিতে এই সব কথা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁদের হিন্দুবিদ্বেষ যে কত প্রচণ্ড ছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি তাঁরা তৈমুরলঙ্গকে কাফেরদের দমনকারী এবং মুসলমানদের ত্রাণকর্তা বলে প্রশস্তি করেছেন; অথচ এঁদের জীবৎকালেই তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করে নৃশংসতার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই শ্রেণীর হিন্দুবিদ্বেষ্টারা গণেশের প্রাধান্যলাভে রুষ্ট হয়ে প্রথম থেকেই তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন, ফলে গণেশও বাধ্য হয়ে তাঁদের দমন করেছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য নূর কুৎব্ আলম যে ভাবে গণেশের অত্যাচার বর্ণনা করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। ইব্রাহিম শর্কীকে উত্তেজিত করার জন্যই নূর কুৎব্ আলম কয়েকজন প্রতিপক্ষের উপরে গণেশ যে দমননীতি প্রয়োগ করেছিলেন তাকে অতিরঞ্জিত করে এইভাবে দাঁড় করিয়েছেন সন্দেহ

নেই। সুতরাং গণেশ যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছিলেন, তাঁর শত্রুপক্ষের উক্তি থেকেই সেই সিদ্ধান্ত করলে তাঁর উপর অবিচার করা হবে। এই সমস্ত উক্তি থেকে কেবলমাত্র এইটুকু বোঝা যায় যে গণেশ তাঁর বিরুদ্ধ-বাদীদের মধ্যে কয়েকজনকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীন', বুকাননের ব্যবহৃত পুঁথি এবং মুল্লা তকিয়ার বয়াজেও গণেশের মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের কথা আছে। এই সমস্ত সূত্রের লেখকরা গণেশের শত্রুপক্ষের উক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ এগুলির মধ্যে, বিশেষত 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' গণেশের প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

যে সব মুসলমান তাঁর বিরোধিতা করেনি, গণেশ তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার করেছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ গণেশ সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন কুশলী রাজনীতিক ছিলেন সন্দেহ নেই। তিনি মুসলমান প্রজাদের প্রতি অহেতুক অত্যাচার করে অযথা সমস্যা সৃষ্টি করবেন বলে মনে হয় না, মানবতার প্রশ্ন ছেড়েই দিলাম। মুসলমানদের প্রতি গণেশের আচরণ সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তা বলেছেন, "যদিও রাজা কানস্‌ মুসলমান ছিলেন না, তাহলেও তিনি মুসলমানদের সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে কোন কোন মুসলমান তাঁকে মুসলমান বলে ঘোষণা করে ইস্‌লামের প্রথা অনুযায়ী কবর দিতে চেয়ে-ছিলেন।" অবশ্য ফিরিশ্‌তার অন্যান্য উক্তির মত এই উক্তিও অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই উক্তির যে একেবারে কোনই ভিত্তি নেই, তাও বিনা প্রমাণে বলা চলে না। এই উক্তির মধ্যে অন্তত একটু সত্য আছে বলেই মনে হয়। সেটুকু এই,—গণেশের কিছু কিছু মুসলমান বন্ধুও ছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতেন এবং তিনিও তাঁদের সঙ্গে পরিপূর্ণ সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতেন। অবশ্য ফিরিশ্‌তার উক্তি থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে গণেশকে হিন্দু ও মুসলমানেরা সমানভাবে ভালবাসতেন এবং গণেশ বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই ধারণা সত্য বলে আমার মনে হয়না। কারণ মধ্যযুগের মুসলমান সম্প্রদায়ের (যে কোন সম্প্রদায়েরই) মধ্যে এতখানি উদারতা আশা করা যায় না। আসল কথা, গণেশ তাঁর বিপুল সামরিক শক্তির বলেই ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন এবং তাঁর

সাফল্যের প্রধান কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্ব কোটিতে একজনেরও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। এই ব্যক্তিত্বের বলেই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন, মধ্যযুগের অবিচ্ছিন্ন মুস্লিম শাসনের মধ্যে কয়েক বছর বাংলায় হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এজন্যে তাঁর বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষ করার দরকার হয়নি। গণেশের হিন্দু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের কণামাত্রও ছিল না, তাই তাঁর মৃত্যুর অল্প কয়েকমাসের মধ্যেই বাংলায় হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়েছিল।

ফিরিশ্‌তা গণেশকে দক্ষ সুশাসক বলেছেন। তাঁর কথায় গণেশ "মাথায় রাজমুকুট ধারণ করে এবং ছত্র প্রভৃতি রাজকীয় প্রতীকচিহ্নে ভূষিত হয়ে পরিপূর্ণ প্রাধান্যের সঙ্গে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাত বছর রাজত্ব করেছিলেন।"

গণেশ সাহিত্য ও বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস তাঁর কাছে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন, কিন্তু আমার লেখা 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' বইয়ে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তিনি গণেশ নন, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজা গণেশের বংশ

মহেন্দ্রদেব কে?

১৩৪০ শকাব্দের পর আর দনুজমর্দনদেবের মুদ্রা পাওয়া যায়নি। ঐ বছরেই মহেন্দ্রদেব নামে আর একজন রাজার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর মুদ্রাগুলি দনুজমর্দনদেবেরই মত; তারও এক পিঠে তাঁর নাম এবং অপর পিঠে 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য' লেখা আছে এবং এইগুলি পাণ্ডুয়া ও চাটগাঁর টাঁকশালে তৈরী হয়েছিল।

এর থেকে বোঝা যায়, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দনদেবের উত্তরাধিকারী এবং সম্ভবতঃ ছেলে। আমরা গণেশের একজন ছেলের কথাই জানি, তিনি যদু বা জলালুদ্দীন। মহেন্দ্রদেবের ঠিক পরেই আবার তাঁর মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে।

এর থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন অভিন্ন লোক; জলালুদ্দীন নতুনভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার আগে কিছুদিন মহেন্দ্রদেব নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। কারণ জলালুদ্দীনের ইসলাম ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে অনেক বেশী ছিল (এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তিনি যে কিছু সময়ের জন্যে মুদ্রাতে 'চণ্ডীচরণপরায়ণস্য' বলে নিজের পরিচয় দেবেন, একথা বিশ্বাস করা যায় না। পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে জলালুদ্দীন ইসলাম ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, এ সম্বন্ধে 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ' এক মত। এই কারণে মনে হয়, মহেন্দ্রদেব গণেশের ছেলে; কিন্তু জলালুদ্দীন নয়, অন্য আর এক ছেলে।* এখন কোন সূত্র থেকে গণেশের দ্বিতীয় কোন পুত্রের কথা জানা যায় কিনা দেখি। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় গণেশের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া আছে, তাতে গণেশের দ্বিতীয় পুত্রের উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, গণেশের মৃত্যুর পর

* এইচ এস্ স্টেপলটন সর্বপ্রথম এই মত প্রতিষ্ঠা করেন (J. A. S. B., Vol. XXVI, 1930, N. S. pp. 12-13 দ্রষ্টব্য)। আচার্য যদুনাথ সরকারও এই মত সমর্থন করেছেন (History of Bengal, Vol. II, p. 122 দ্রষ্টব্য)।

তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। 'ফিরিশ্‌তা'র বিবৃতিটি নীচে উদ্ধৃত হল,—

"পিতার মৃত্যুর পরে জিৎমল অমাত্যদের এবং রাজ্যের অন্য সব শীর্ষস্থানীয় লোকদের আহ্বান করে বললেন, 'ইসলাম ধর্মের সত্য আমার কাছে পরিষ্কার, তাকে গ্রহণ করা ভিন্ন আমার অন্য কোন উপায় নেই। তোমরা যদি আমাকে মানো এবং আমার সার্বভৌমতা অস্বীকার না কর, তাহলেই আমি এই পবিত্র সিংহাসনে পদার্পণ করব। নয়ত আমার ছোট ভাই রাজা হোক্, আমাকে ক্ষমা কর।' সমস্ত রাজপুরুষ তখন একবাক্যে ঘোষণা করলেন, 'আমরা রাজাকে কেবল জাগতিক ব্যাপারে অনুসরণ করি, (তাঁর) ধর্মের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।' তখন জিৎমল লখ্‌নৌতির শিক্ষিত ও গণ্যমান্য লোকদের আমন্ত্রণ করে এনে কল্‌মা উচ্চারণ করলেন এবং জলালুদ্দীন উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।"

'ফিরিশ্‌তার' এই বিবৃতির মধ্যে অতিরঞ্জন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এর মধ্যে জলালুদ্দীনকে অতিমাত্রায় নিঃস্বার্থপরায়ণ করে দেখানো হয়েছে এবং গণেশের অমাত্যদের (যাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকে হিন্দু) অতিমাত্রায় উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন করে তোলা হয়েছে। 'ফিরিশ্‌তা'র এই বিবৃতির সঙ্গে মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার সাক্ষ্য মিলিয়ে নিলে আমাদের এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, মহেন্দ্রদেব জলালুদ্দীনের ছোট ভাই। গণেশের মৃত্যুর পরে তিনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন; কিন্তু জলালুদ্দীন রাজ্যের বহু ক্ষমতাশালী লোককে নিজের দলে ভিড়িয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে অপসারিত করে সিংহাসন পুনরধিকার করেন। 'ফিরিশ্‌তা' যে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেছেন, তা জলালুদ্দীনের তরফের বিবৃতি। এর মধ্যে ছোট ভাইকে অপসারিত করে জলালুদ্দীনের সিংহাসন পুনরধিকারের ব্যাপারটি একটু ঘুরিয়ে মনোহর ভঙ্গীতে পরিবেশন করা হয়েছে। এর মধ্যে বলতে চাওয়া হয়েছে, জলালুদ্দীনের কোন দোষ নেই, তিনি তো ছোট ভাইকে সিংহাসন ছেড়ে দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত অমাত্য তাঁকে ছাড়তে রাজী না হওয়ায় তিনি সিংহাসনে বসেছেন ইত্যাদি। মোটের উপর, মহেন্দ্রদেব যে গণেশের দ্বিতীয় পুত্র, সে সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলি মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না বলেই মনে হয়।

মহেন্দ্রদেবের কেবলমাত্র ১৩৪০ শকাব্দেরই মুদ্রা পাওয়া গেছে; কিন্তু

১৩৪০ শকাব্দেরই প্রথমাংশে তাঁর পিতা দনুজমর্দনদেব রাজত্ব করে গিয়েছেন। এদিকে জলালুদ্দীনেরও ৮২১ হিজিরার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৪০ শকাব্দ = ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল এবং ৮২১ হিজিরা = ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী। অতএব দেখা যাচ্ছে, ১৩৪০ শকাব্দের তিন-চতুর্থাংশ শেষ হবার আগেই মহেন্দ্রদেবের রাজত্ব শেষ হয়ে জলালুদ্দীনের রাজত্ব সুরু হয়েছে। মহেন্দ্রদেবের রাজত্বকাল যে কত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা এর থেকে বোঝা যায়। ১৪১৮ খ্রীঃর এপ্রিল থেকে ১৪১৯ খ্রীঃর জানুয়ারী—মাত্র এই নয় মাসের মধ্যে দনুজমর্দনদেব, মহেন্দ্রদেব ও জলালুদ্দীন—এই তিনজন রাজাই রাজত্ব করেছিলেন।

জলালুদ্দীনের দ্বিতীয় দফার রাজত্ব

৮২১ হিজিরার শেষের দিকে জলালুদ্দীন সিংহাসন পুনরধিকার করেন এবং ৮৩৬ হিজিরা অবধি রাজত্ব করেন। এর আগে ৮১৮ ও ৮১৯ হিজিরাতেও তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁর পিতাই ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং জলালুদ্দীনের প্রকৃত রাজত্ব ৮২১ হিজিরা থেকেই সুরু হল বলা যায়।

মুসলমান ঐতিহাসিকেরা শাসক হিসেবে জলালুদ্দীনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। 'ফিরিশ্‌তা' বলেছেন, "তিনি ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করে সে যুগের নওশেরোয়াঁ হয়েছিলেন। অপূর্ব দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে সতেরো বছর ধরে বাংলা ও লখ্‌নৌতি শাসন করবার পরে তিনি পরলোকগমন করেন।" বখ্‌শী নিজামুদ্দীন 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে বলেছেন, "তাঁর রাজত্বকালে জনসাধারণ সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল।" 'রিয়াজ'-রচয়িতা গোলাম হোসেন বলেছেন "তিনি যোগ্যভাবে শাসনকার্য সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করতেন। তাঁর রাজত্বকালে লোকেরা আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে দিন কাটাত। কথিত আছে, তাঁর সময়ে পাণ্ডুয়া এত জনাকীর্ণ হয়েছিল যে তা বর্ণনার অতীত।" 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' বলা হয়েছে, জলালুদ্দীন বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন।

জলালুদ্দীনের রাজ্যের আয়তন খুবই বিশাল ছিল। পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, চাটগাঁও ও ফতেহাবাদ থেকে তাঁর মুদ্রা বেরিয়েছিল, এর থেকে

বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবটাই এবং দক্ষিণবঙ্গের এক বৃহৎ অংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া ডঃ দানী তাঁর মুদ্রার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে অনুমান করেছেন যে, তিনি ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারের কিয়দংশ অন্ততঃ সাময়িকভাবেও অধিকার করেছিলেন। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব, ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান জলালুদ্দীনের সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে ইব্রাহিম শর্কীর দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ

প্রামাণিক সূত্র থেকে জলালুদ্দীনের রাজত্বকালের কয়েকটি মাত্র ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। সেগুলির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ঘটনাটি জানতে পারা যায় চীনের 'মিং' রাজবংশের ইতিহাস 'মিং-শে' থেকে। 'মিং-শে'র ৩২৬শ অধ্যায়ে জৌনপুরের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে এই কথাগুলি পাওয়া যায়,—

"স্‌সে-ন-পু-উল্ (Sse-na-pu-eul—জৌনপুর)বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত।) একে মধ্যভারতও বলা হয়। প্রাচীন যুগে এখানে বুদ্ধ থাকতেন। য়ং-লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) তাদের রাজা য়ি-পু-লা (ইব্রা=ইব্রাহিম শর্কী)র কাছে……একজন দূত পাঠানো হয়। য়ং-লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে (১৪২০খ্রীঃ) বাংলার রাজদূত (চীনের সম্রাটকে) জানান যে, তাঁদের (জৌনপুরের) রাজা কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছেন। ……হো-হিয়েনকে তখন (চীন সম্রাটের আদেশ দিয়ে পাঠানো হল তাঁকে (জৌনপুরের রাজাকে) বলবার জন্যে যে, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেই তিনি নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেন। তাঁকে রেশম ও টাকাকড়ি উপহার দেওয়া হল।"

'মিং শে'র ৩৪০শ অধ্যায়ে এই ঘটনাটির বিবরণ একটু ভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। এই বিবরণের শেষাংশ নীচে উদ্ধৃত হল,—

"য়ং-লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষের (১৪২০ খ্রীঃ) নবম মাসে (চীন) সম্রাট হো-হিয়েনকে আদেশ দিলেন, (জৌনপুরে) গিয়ে তাঁদের (জৌনপুর ও বাংলার রাজাদের) শান্ত করতে। (জৌনপুরের রাজাকে) সোনা এবং টাকাকড়ি উপহার দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা হল।

১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জলালুদ্দীনই বাংলার রাজা ছিলেন। ঐ বছরেই জৌন-পুরের রাজা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। 'মিং-শে'র ৩২৬শ অধ্যায়ে বলা

হয়েছে, ইব্রাহিম শর্কী কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন, এর দ্বারা সম্ভবত ১৪১৫ ও ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ, এই দু'বারের আক্রমণের কথাই বোঝাচ্ছে।

তৈমুরের পুত্র শাহ্ রুখ কর্তৃক দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রেরিত দূত আবদুর রজ্জাকের লেখা বিখ্যাত বই 'মত্‌লা-ই-সদাইনে' (রচনাকাল ১৪৪২খ্রী:) জৌনপুররাজ ইব্রাহিম শর্কীর বাংলা আক্রমণের কথা পাওয়া যায়,—যদিও আক্রমণের সাল এবং বাংলার রাজার নাম তার মধ্যে মেলে না। আবদুর রজ্জাক লিখেছেন,—

"বাংলা থেকে সম্রাটের (শাহ রুখ, রাজত্বকাল ১৪০৪—৪৭ খ্রী:) রাজদূতেরা যখন দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কালিকটে এক দুর্ঘটনা ঘটে। ঐ জায়গার রাজার কাছে সম্রাটের শক্তির কথা পৌছেছিল। তিনি বিশ্বস্ত লোকেদের কাছে শুনেছিলেন যে, মহামান্য সম্রাটের দরবারে সমস্ত দেশের রাজারা দূত এবং আবেদন-নিবেদন পাঠিয়ে থাকেন। তাঁরা জানেন যে, এইখানে সমস্ত প্রয়োজন মেটে, সমস্ত প্রার্থনা সফল হয় এবং ঐ সময়ে বাংলার রাজা সুলতান ইব্রাহিম জৌনপুরীর জুলুমের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন; সম্রাট (শাহ্ রুখ) জনাব শেখ অল-ইসলাম-খওয়াজা-করিমের মারফৎ এই মর্মে একটি ফরমান পাঠান যে, তিনি (ইব্রাহিম) বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না, করলে তাঁকে ফলভোগ করতে হবে। জৌনপুরের রাজা এই পবিত্র ফরমানের মর্ম শুনে, বাংলাদেশ থেকে হিংসার হস্ত প্রত্যাহার করে নিলেন।"

'মতলা-ই-সদাইনে' ইব্রাহিমের ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের আক্রমণের কথাই বলা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। * এরকম ধারণার কারণ, 'মিং-শে'তে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের আক্রমণের যে বর্ণনা পাই, তার সঙ্গে 'মতলা-ই-সদাইনে'র বর্ণনার বেশ মিল আছে। দুই বিবরণীতেই দেখি, বাংলার রাজা ইব্রাহিমের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিদেশের সম্রাটের কাছে নালিশ জানাচ্ছেন এবং বিদেশী সম্রাটের

* স্টুয়ার্ট তাঁর 'History of Bengal'এ (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১০, পৃ: ১২০—১২৩) লিখেছেন যে, এই আক্রমণ জলালুদ্দীনের ছেলে শামসুদ্দীনের রাজত্বকালে ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর এরকম ধারণার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি। শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে ইব্রাহিম বাংলা আক্রমণ করেছিলেন, এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কথাতে ইব্রাহিম আক্রমণ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। অতএব দুই বিবরণীতে একই ঘটনার কথা বলা হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

কেন ইব্রাহিমের সঙ্গে জলালুদ্দীনের বিরোধ হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। তবে 'মতলা-ই-সদাইনে' দেখছি শাহ্ রুখ ইব্রাহিমকে আদেশ করছেন, তিনি যেন বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন। এর থেকে মনে হয়, ইব্রাহিম বাংলার কোন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং জলালুদ্দীন তা বরদাস্ত না করায় বিরোধ বেধে উঠেছিল। ৮১৮ হিজরাতে গণেশের সঙ্গে সংঘর্ষ হবার পর থেকে ইব্রাহিম সম্ভবত বাংলাকে তাঁর সামন্ত-রাজ্য বলেই মনে করতেন। 'সঙ্গীত শিরোমণি'র "আগৌড়াত্তুজ্জলংরাজ্যমিব-রাহিম ভূভুজঃ" ছত্রটিও এই ধারণা জন্মায়। জলালুদ্দীনকে প্রথমবার ইব্রাহিম নিজেই সিংহাসনে বসিয়েছিলেন বলে জলালুদ্দীনকে সামন্ত রাজা মনে করা তাঁর পক্ষে আরও স্বাভাবিক এবং আগেই বলেছি, ইব্রাহিমের কৃপায় প্রথম রাজ্যলাভের সময় জলালুদ্দীন সম্ভবত ইব্রাহিমের সামন্ত হিসাবে বাংলা দেশ শাসন করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি হয়তো বাংলার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

যাহোক্ আমরা দেখছি জলালুদ্দীন ইব্রাহিমের আক্রমণের সময় একই সঙ্গে পারস্যের শাহ্ রুখ ও চীনের সম্রাট য়ং-লোর'কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন এবং পেয়েও ছিলেন। শক্তিশালী বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তা এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে। এই পররাষ্ট্রনীতি নিঃসন্দেহে জলালুদ্দীনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

তবে এখানে এখানে একটা কথা আছে। স্টুয়ার্টের বইয়ে শামসুদ্দীন আহমদ শাহের রাজত্বকাল দেওয়া আছে ৮১২-৮৩০ হিজরা। কিন্তু এখন শিলা-লিপি ও মুদ্রার প্রমাণ থেকে জানা যাচ্ছে,৮৩৬ হিজরা অবধি শামসুদ্দীনের পিতা জলালুদ্দীন সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং এমনও হতে পারে যে, স্টুয়ার্ট শামসুদ্দীনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ভুল ধারণার দ্বারা চালিত হয়েই 'মতলা-ই-সদাইনে' বর্ণিত ঘটনাকে শামসুদ্দীনের রাজত্বকালে স্থাপন করেছেন; স্টুয়ার্ট হয়ত কোন সূত্র থেকে জানতে পেরেছিলেন, ঐ আক্রমণ ৮১২-৮৩০ হিজরার মধ্যে ঘটেছিল (১৪২০ খ্রীষ্টাব্দ বা ৮২৩ হিজিরা যার অন্তর্গত), তাই শামসুদ্দীনের নাম এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। ডঃ দানী স্টুয়ার্টের নিষ্প্রমাণ উক্তিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

জলালুদ্দীন ও আরাকানরাজ

আরাকান দেশের ইতিহাস থেকে জলালুদ্দীনের রাজত্বের আর একটি ঘটনার কথা জানা যায়। ফেয়ার এবং হার্ভের সঙ্কলিত বিবরণে এই ঘটনার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, * তার সংক্ষিপ্তসার এই :—

আরাকান দেশের একজন রাজা ব্রহ্মের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজের রাজ্য হারান। হারিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালান এবং বাংলার রাজার কাছে আশ্রয় নেন। বাংলার রাজাকে তিনি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করায় বাংলার রাজা তাঁর রাজ্য উদ্ধারের জন্য সাহায্য করেন। প্রথমে একজন মুসলমান সেনাপতিকে (ফেয়ারের বিবরণীতে এঁর নাম বলা হয়েছে উলুখেং বা ওয়ালি খান) তাঁর সঙ্গে দেওয়া হয় ; কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতা করে আরাকান-রাজের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেয় এবং আরাকানরাজকে বন্দী করে। আরাকানরাজ কোনক্রমে পালিয়ে এসে বাংলার রাজাকে সব জানান। তখন বাংলার রাজা বিশ্বস্ততর লোকের উপর তাঁর রাজ্য উদ্ধারের ভার দেন এবং এইবার আরাকান রাজের রাজ্য উদ্ধার হয়। কিন্তু এই উপকারের বিনিময়ে তাঁকে বাংলার রাজার সামন্ত হতে হয়। তখন থেকে আরাকানের রাজাদের মুদ্রার উপরে ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম লেখার প্রথাও চালু হল।

আরাকানরাজের নাম ফেয়ারের বিবরণীতে পাওয়া যায় Meng-tsau-mwun এবং হার্ভের বিবরণীতে পাওয়া যায় Narameikhla। এর থেকে বোঝা যায়, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সূত্র ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দু'জনেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ হৃতরাজ্য ফিরে পান। ঐ সময়ে বাংলার রাজা ছিলেন জলালুদ্দীন। † সুতরাং বাংলার যে রাজা

---

* Phare : History of Burma, pp. 77-78 ; J. A. S. B., Pt. I, 1844, pp. 44-46 এবং Harvey : History of Burma, p. 139 দ্রষ্টব্য।

† ফেয়ার তাঁর 'History of Burma' (London, 1884, p. 78) তে ভুল করে বলেছেন, বাংলার এই রাজার নাম নাজির শাহ। ফেয়ারের ভুল হবার কারণ তাঁর নিজের উক্তির মধ্য দিয়েই উদ্ঘাটিত হয়েছে। তিনি বলেছেন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত জ্ঞান মার্শম্যানের 'History of Bengal' থেকে পাওয়া (History of Burma, p. 77, f.n. দ্রষ্টব্য)। মার্শ-ম্যানের বইয়ে স্টুয়ার্টের 'History of Bengal'এর অনুকরণে ১৪২৬-১৪৫৭

আরাকান-রাজকে হৃতরাজ্য ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন, তিনি জলালুদ্দীন ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না।

আরাকান দেশে প্রচলিত কিংবদন্তীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তের অনুকূল। এতে বলা হয়েছে, যে বহিঃশক্রর আক্রমণের সময় আরাকানরাজ বাংলার রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি দিল্লীর রাজা।* এ সম্বন্ধে ফেয়ার মন্তব্য করেছেন, "As the Arakanese make sad confusion of all cities and countries in India, this may mean any king between Bengal and Delhi, probably the king of Jaunpur. The fugitive (Meng-tsau-mwun) must have reached Thu-ra-tan (Bengal) about the year A.D. 1407, when, and for some years after, in consequence of Timur's invasion, the Delhi sovereign was not in a condition to attack Bengal." জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম শর্কী যে আক্রমণ করেছিলেন, সম্ভবত তাইতেই আরাকানরাজ জলালুদ্দীনকে সাহায্য করেছিলেন।

জলালুদ্দীনের পূর্ব-নাম

জলালুদ্দীন যখন হিন্দু ছিলেন, তখন তাঁর কি নাম ছিল, তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে তাঁর নাম ছিল যদু। বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে তাঁর নাম ছিল Godusen (গদুসেন)। বুকানন মুসলমান রাজাদের নাম ও রাজত্বকালের যে তালিকা পরিশিষ্টে দিয়েছেন (Martin's Eastern India, Vol II, Appendix V), তাতে জলালুদ্দীনের পূর্ব নাম দেওয়া হয়েছে Judoosein (যদুসেন)। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র মতে

খ্রীষ্টাব্দ নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের রাজত্বকাল বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।• এই জন্যে ফেয়ার ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাজির শাহ বা নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের রাজত্ব-কাল ভেবেছিলেন। ডঃ দানী ফেয়ারের এই উক্তিকে যাচাই না করেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

* ফেয়ারের সঙ্কলিত আরাকানী কিংবদন্তীর মধ্যে দিল্লীর রাজার সঙ্গে বাংলার রাজার যুদ্ধের এক আষাঢ়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; যুদ্ধের ফলাফলও বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। (J.A.S.B., 1844, Pt. I., pp. 45 দ্রষ্টব্য।)

জলালুদ্দীনের পূর্ব নাম জিৎমল, স্টুয়ার্টের মতে চেৎমল। যদু যদুসেনের সংক্ষিপ্তরূপ, গদুসেন যদুসেনের বিকৃতরূপ। সেইরকম চেৎমল জিৎমল-এর বিকৃতরূপ। যদুসেন ও জিৎমল, এ দুটির কোন্‌টি জলালুদ্দীনের প্রকৃত পূর্বনাম, তা অন্য কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত বলা যাবে না।

জলালুদ্দীনের ধর্ম-নিষ্ঠা

'সঙ্গীত-শিরোমণি'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, জলালুদ্দীন রাজ্যের লোভে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন। মুস্‌লিম সাধুদের জীবনী-গ্রন্থ 'মিরাৎ-উল্‌-আস্‌রারে' জলালুদ্দীন সম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল উক্তি থাকলেও এই একটি কথা এতে সঠিক্ ভাবেই লেখা আছে। এতে আছে, "...he became a convert to Islam because of his lust for kingdom." (ডঃ দানীর অনুবাদ)

কিন্তু জলালুদ্দীনের ইস্‌লাম-ধর্ম গ্রহণের কারণ যাই হোক না কেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরে এই ধর্মে তাঁর গভীর নিষ্ঠা জন্মেছিল।* তাঁর পিতা সম্ভবত তাঁর শুদ্ধি করিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোনই ফল হয়নি। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি নিজের ইস্‌লাম ধর্মে বিশ্বাসের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। ধর্মনিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী জাত-মুসলমান সুলতানদেরও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তাঁর আগে প্রায় ২০০ বছর ধরে বাংলায় মুসলমান সুলতানরা তাঁদের মুদ্রায় কল্‌মা খোদাই করাতেন না। জলালুদ্দীন কিন্তু তাঁর মুদ্রায় কল্‌মা খোদাই করে বাংলাদেশে আবার এই প্রথা চালু করেন। তিনি আরাকানরাজকে তাঁর হৃত সিংহাসনে পুনরধিষ্ঠিত করার পর থেকে ঐ রাজা ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মুদ্রায় ফার্সী অক্ষরে মুসলমানী নাম লেখার প্রথা চালু হয়, এর পিছনেও সম্ভবত জলালুদ্দীনের নির্দেশ ছিল এবং তাঁর ধর্ম-প্রীতিই এর কারণ বলে মনে হয়।

শুধু তাই নয়, আর এক ব্যাপারেও জলালুদ্দীন নতুনত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানরা সকলেই খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতেন এবং কখনও কখনও তাঁদের মুদ্রায় বা শিলালিপিতে নিজেকে 'খলিফার সেবক'

---

* স্টুয়ার্টের মতে জলালুদ্দীনের জননী গণেশের জনৈকা মুসলমানী উপপত্নী। একথা সত্য হলে বলতে হবে জলালুদ্দীনের রক্তের মধ্যেই ইসলামের প্রতি টান ছিল।

বলে অভিহিত করেছেন। জলালুদ্দীনও প্রথমদিকে তা'ই করেছেন। কিন্তু জলালুদ্দীন তাঁর শেষ দিককার মুদ্রা ও শিলালিপিতে 'খলীফৎ-আল্লাহ' উপাধি ধারণ করেছেন, অর্থাৎ নিজেকেই খলিফা বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবী করেছেন। তাঁর পরবর্তী সুলতানরাও তাঁর অনুসরণে এই উপাধি ধারণ করতেন।

জলালুদ্দীনের ধর্ম-নিষ্ঠা সম্বন্ধে সম্প্রতি আরও কতকগুলি তথ্য পাওয়া গেছে। অল-সখাওয়ী নামে একজন পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক এই তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। অল-সখাওয়ী কায়রোতে ৮৩০ হিঃ বা ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ৯০২ হিঃ বা ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মদিনাতে পরলোকগমন করেন। হাজী দবীর নামে জনৈক সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক তাঁর 'জাফর অল-ওয়ালিহ্' নামে আরবী ভাষায় লেখা গুজরাটের ইতিহাসে অল সখাওয়ী বর্ণিত তথ্যগুলির পুনরুক্তি করেছেন। অল সখাওয়ীর লেখা থেকে জানা যায়, বাংলার সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ ইসলামের উন্নতি-সাধন করেন, ইসলামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন, তাঁর পিতা যে সমস্ত মসজিদ প্রভৃতি ধ্বংস করেছিলেন, সেগুলি সংস্কার করেন এবং আবু হানিফার সম্প্রদায়ের মতবাদ গ্রহণ করেন। মক্কাধামে তিনি অনেকগুলি ভবন, বিশেষত একটি সুন্দর মাদ্রাসা তৈরী করান। জলালুদ্দীন মিশরের রাজা আশরফ অর্থাৎ অল-আশরফ বার্স্‌বায়-এর কাছে উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেছিলেন; খলিফা মক্কার শেরিফের মারফৎ জলালুদ্দীনকে সম্মান-পরিচ্ছদ (robe of honour) পাঠান; জলালুদ্দীন সম্মান-পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করেন এবং খলিফাকে অনেক উপহার পাঠান। অলা-উল বুখারি নামে একজন লোক মারফৎ জলালুদ্দীন মিশর ও দামাস্কাসে অবিরতভাবে এইসব উপহার পাঠিয়েছিলেন। হাজী দবীর লিখেছেন, জলালুদ্দীন পবিত্র মক্কাধামে একটি মাদ্রাসার পরিচালনব্যয় নির্বাহ করতেন। এই মাদ্রাসাটি সকলের সম্ভ্রম উদ্রেক করত (Social History of the Muslims in Bengal, Dr. Abdul Karim, pp. 50 দ্রষ্টব্য)

অল সখাওয়ী জলালুদ্দীনের প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি এবং মিশর ও আরব ছিল তাঁর বাসভূমি। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর উক্তি সম্পূর্ণ প্রামাণিক।

এই সমস্ত বিষয় থেকে বোঝা যায়, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরে জলালুদ্দীন মনে-প্রাণে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে উঠেছিলেন এবং নানা

সাধারণ ও অসাধারণ বিষয়ের অনুষ্ঠান করে তিনি তাঁর ধর্ম-প্রীতি চরিতার্থ করেছিলেন।

অবশ্য মিশরের সুলতান এবং দামাস্কাসের খলিফার কাছে উপহার পাঠানোর পিছনে জলালুদ্দীনের আরও দুটি উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। প্রথমত জলালুদ্দীন কাফেরের সন্তান এবং বাংলার পূর্বতন মুসলিম রাজবংশের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এই কারণে বাংলার সিংহাসনে তাঁর অধিকার এবং তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে সকলে হয়তো একমত ছিলেন না। তাঁর কায়রো ও দামাস্কাসে উপহার পাঠানোর পরোক্ষ উদ্দেশ্য, মুসলিম দুনিয়ার অধিনায়কের কাছে নিজের অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ। দ্বিতীয়ত আগেই আমরা দেখে এসেছি, জলালুদ্দীন সম্ভবতঃ ইব্রাহিম শর্কীর সামন্ত রাজা হয়ে থাকার সর্তে বাংলার সিংহাসন লাভ করেছিলেন, অথচ তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতেন এবং ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিমের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল; তাই ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব শক্তিশালী হয়ে থাকবার জন্যও তিনি মুসলিম জহানের নেতাদের সঙ্গে এইভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়।

যাহোক্, বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে জলালুদ্দীন এক বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করেছেন। এতগুলি পররাষ্ট্রের অধিনায়কের কাছে আর কেউ দূত পাঠিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, * পারস্যের কবি হাফেজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন † এবং মক্কায় মাদ্রাসা তৈরী

* এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† আইন-ই-আকবরীতে সর্বপ্রথম এই আমন্ত্রণের কথা পাওয়া যায়। হাফিজ বাংলায় আসতে না পেরে গিয়াসুদ্দীনকে একটি গজল লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেটির একটি শ্লোক আইন-ই-আকবরীতে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে বাংলাদেশের নাম আছে। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এ এই আমন্ত্রণ ও গজল পাঠানোর কাহিনী বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়, তাতে ঐ শ্লোকটি এবং আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে গিয়াসুদ্দীনের নাম পাওয়া যায়। 'দিওয়ান-ই-হাফিজে' এই গজলটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 26), এতেও বাংলাদেশ ও গিয়াসুদ্দীনের নাম

করিয়েছিলেন। ‡ কিন্তু জলালুদ্দীন চীনসম্রাট য়ং-লো, পারস্যের হিরাটে অবস্থানকারী শাহ্ রুখ, মিশরের সুলতান অল আশ্‌রফ বার্স্তায় এবং দামাস্কাসের খলিফার কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকেও অতিক্রম করেছেন।

জলালুদ্দীনের হিন্দু সেনাপতি

জলালুদ্দীনের রাজত্বকালের একটি ঘটনার কথা আমরা সমসাময়িক পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের 'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানতে পারি। বৃহস্পতি লিখেছেন, জলালুদ্দীন মূর্ধ্বাভিষিক্ত-কুলোৎপন্ন জগদত্তের পুত্র রায় রাজ্যধরের গুণরাশিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিয়োগ উপলক্ষে বিরাট আড়ম্বর অনুষ্ঠান করে তাঁকে হাতী, ঘোড়া, সোনা, রূপো, ছাতার সারি প্রভৃতি দান করে তূর্য ও শঙ্খের ধ্বনিতে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে অসামান্য বলে মনে না হলেও জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান আলোকপাত করে। এবার সেই আলোচনাতেই আসা যাচ্ছে।

হিন্দুদের সম্বন্ধে জলালুদ্দীনের নীতি

কোন হিন্দু মুসলমান হলে সাধারণত যা হয়, জলালুদ্দীনের বেলায়ও তাই হয়েছিল। তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ জন্ম-মুসলমানদের চেয়েও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেই তিনি অনেক হিন্দুর উপর অত্যাচার করেন, একথা দু'টি বিবরণীতে পাই। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' পাই, "তিনি বহু হিন্দুকে মুস্লিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন এবং যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাঁর শুদ্ধি-অনুষ্ঠানে স্বর্ণনির্মিত গাভীর অংশ নিয়েছিল, তাদের যন্ত্রণা দিয়ে শেষ পর্যন্ত গোমাংস খেতে বাধ্য করেন।" বুকাননের বিবরণীতে পাই, "সিংহাসন অধিকার করে জলালুদ্দীন হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে সুরু করেন এবং তাদের মুসলমান হতে বাধ্য করেন, ফলে অনেক হিন্দু করতোয়া নদীর ওপারে কামরূপ দেশে পালিয়ে যায়।" এদের কথা সত্য বলেই

যথাযথভাবে উল্লিখিত আছে। এর থেকে বোঝা যায়, 'রিয়াজ'-এ প্রদত্ত বিবরণের খুঁটিনাটি সত্য হোক্ বা না হোক্, গিয়াসুদ্দীন কর্তৃক হাফেজকে আমন্ত্রণ এবং কবির অসামর্থ্য জ্ঞাপন করে গজল পাঠানোর কাহিনীটি সত্য।

‡ Social History of the Muslims in Bengal, Dr. Abdul Karim, pp. 47-50 দ্রষ্টব্য।

মনে হয়। অথচ এই জলালুদ্দীনের সেনাপতির পদ পেলেন রায় রাজ্যধর, যিনি শুধু হিন্দু নন, নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং বৃহস্পতি মিশ্রের উক্তি অনুসারে যিনি ব্রাহ্মণদের দারিদ্র্য দূর করে ও নানারকম যজ্ঞ করে 'ধর্মপুত্র' আখ্যা পেয়েছিলেন। আমাদের মনে হয় নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীনের পক্ষে এই রকম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পদে হিন্দুর নিয়োগ আসলে বাস্তব অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ। রাজা গণেশের আমলে হিন্দুরা ক্ষমতার যে শীর্ষে পৌঁছেছিল, আত্যন্তিক ইস্লামধর্মনিষ্ঠা ও হিন্দুদ্বেষ সত্ত্বেও তাদের সেখান থেকে নামিয়ে আনা জলালুদ্দীনের সাধ্য ছিল না। তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন, উৎকট সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ করতেও বাধ্য হয়েছেন। অতএব গণেশের মৃত্যুর পরেও যে বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রাধান্য লোপ পায়নি তা দেখা যাচ্ছে।

জলালুদ্দীনের দু'টি মুদ্রা পাওয়া গেছে, যাদের উল্টোপিঠে লম্ফনোদ্যত সিংহের ছবি আঁকা। কোনরকম প্রাণীর ছবি আঁকা ইস্লাম ধর্মের অনুশাসনের বিরোধী। সুতরাং কোন হিন্দু এই জাতীয় মুদ্রার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে সুলতানের উপর তাঁর প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। জলালুদ্দীনের আমলে হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে এ থেকেও একটা ধারণা করা যায়।

অবশ্য একটা কথা আছে। ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রাতেও এই ছবি থাকত। তার সঙ্গে এই মুদ্রাগুলির কোন সম্বন্ধ আছে বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন—"Reference may be made for similar figures of lion on coins, to those of Hill Tippera....The design on the coins of the neighbouring Hindu state may have suggested the adoption of a similar design on his own coins to the renegade Hindu king, but the dictates of the faith which he adopted soon led to its abandonment." ডঃ দানী এ সম্বন্ধে বলেন— "The adoption of this new design calls for some better explanation. We know that the Scythians adopted the coin-designs of the Indo-Bactrians when they conquered their territory. The same was the case with the Kushans. Chandra Gupta II, Vikramaditya of the Gupta dynasty, adopted the coins of the Western Kshatrapas after conquering their territory of Gujarat and Malwa. Can we, likewise, not suppose that some portion of Tripura was con-

quered by Jalal-ud-din and this type of coinage was issued in order to make it acceptable to the local people? The fact that both the coins, so far discovered, were found in Dacca district, lend support to this suggestion. From the Tripura Rajamala.... we learn that at this time insignificant rulers like Mukuta-manikya and Maha-manikya were on the throne of Tripura. Therefore, there is a strong probability that a portion of Tripura State was conquered by Jalal-ud-din. But soon after the losses must have been made good by Dharma-manikya, the famous successor of Maha-manikya. Hence, this type of coin soon went out of vogue." ডঃ দানীর এই অনুমান অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। তবে জলালুদ্দীন যে সাময়িকভাবে ত্রিপুরার কিয়দংশ দখল করেছিলেন, এরকম সিদ্ধান্তে সুনিশ্চিতভাবে পৌছাতে হলে আরও জোরালো প্রমাণের দরকার।

জলালুদ্দীনের মুদ্রা

জলালুদ্দীনের মুদ্রাগুলি থেকে দেখা যায়, পূর্ববর্তী রাজাদের তুলনায় তাঁর রাজত্বকালে টাকশালের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর আমলে নতুন যে সমস্ত জায়গার টাকশালের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি হল ফতেহাবাদ। আর একটি জায়গার নাম পড়া যায়নি, আন্দাজে বলা হয়েছে রোটাসপুর। এই সব নতুন নতুন জায়গায় টাকশাল খোলা থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন, জলালুদ্দীন এই সব জায়গা দখল করে নিজের রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আমরা আগে দেখবার চেষ্টা করেছি যে, ফতেহাবাদ অন্তত গণেশের সময় থেকে গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথাকথিত রোটাসপুরের অবস্থা আজও পর্যন্ত ঠিক করা যায়নি বলে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক মত প্রকাশ করা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে ডঃ দানী যা লিখেছেন, তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন, "The mint-town is really written without dots, and these dots have been restored by Lanepool. If the restoration is correct, then what town is meant by Rhotaspur? A near possibility is Rhotas or Rhotasgarh on the river Son in South Bihar. But South Bihar was, then, under Ibrahim Sharki of Jaunpur. If this identification is held, we will have to suppose that this portion of Ibrahim's dominion was conquered by Jalal-ud-din." হয়তো জলালুদ্দীন

এই অঞ্চল অধিকার করাতেই ইব্রাহিম শর্কী রুষ্ট হয়ে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধেই জলালুদ্দীন এই অঞ্চল জয় করেছিলেন।

অবশ্য নতুন টাকশাল খোলাতে রাজ্যের সম্প্রসারণই যে সব ক্ষেত্রে বোঝায় তা নয়, এতে রাজ্যের ঐশ্বর্যবৃদ্ধিই বিশেষভাবে বোঝায়। জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে দেশের ঐশ্বর্য যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এই সব নতুন টাকশাল তার প্রমাণ।

জলালুদ্দীন ও বৃহস্পতি মিশ্র

জলালুদ্দীন সম্বন্ধে আর একটি কথা বহু গবেষক লিখেছেন। তাঁরা বলেন জলালুদ্দীন মহিন্তা-বংশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত এবং স্মৃতিরত্নহার, পদচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বৃহস্পতি মিশ্রকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেছিলেন এবং রায়মুকুট ও পণ্ডিতসার্বভৌম উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা রুকনুদ্দীন বারবক শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখাবার চেষ্টা করব বারবক শাহই বৃহস্পতিকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা করেছিলেন ও এইসব উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতি যে জলালুদ্দীনের কাছেও কিছু সম্মান পেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্য ছিলেন জলালুদ্দীনের সেনাপতি রায় রাজ্যধর এবং বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলি—রঘুবংশ-টীকা, শিশুপালবধ-টীকা প্রভৃতি রায় রাজ্যধরের পৃষ্ঠপোষণে লেখা। এই বইগুলিতে বৃহস্পতি নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন, তিনি "গৌড়াধিপাদুপচিতপ্রচুরপ্রতিষ্ঠঃ"। এই "গৌড়াধিপ" নিশ্চয়ই রায় রাজ্যধরের প্রভু জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ। কিন্তু হিন্দুধর্মত্যাগী জলালুদ্দীন হিন্দু পণ্ডিত বৃহস্পতিকে প্রতিষ্ঠা দিলেন, এর কারণ কী? কারণ এই, জলালুদ্দীন প্রথম জীবনে যখন হিন্দু ছিলেন, তখন নিশ্চয় সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হয়েও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছাড়তে পারেননি। তাই সংস্কৃত-পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রকে তিনি সমাদর করেছিলেন।

অন্যান্য তথ্য

বর্তমানে জলালুদ্দীন সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন তথ্য জানা যাচ্ছে না। ঢাকা জেলার মান্দ্রায় এক ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদে এবং রাজশাহী জেলার জাহানাবাদে এক সমাধিস্থলে সম্প্রতি দু'টি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, এ দু'টি

জলালুদ্দীনের রাজত্বকালেই খোদাই হয়েছিল। প্রথমটির নির্মাতা শিকদার উলুঘ খান মুআজ্জম দীনার খান। দ্বিতীয়টির নির্মাতা মালিক সদর্-অল-মিলাৎ ওয়াদ্-দীন সুলতানী। দু'টিতেই জলালুদ্দীনের নাম আছে।

রিয়াজ-উস্-সলাতীনের মতে জলালুদ্দীন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র পাণ্ডুয়ার এক্‌লাখী প্রাসাদে সমাধিস্থ হন। ঐ প্রাসাদের মধ্যে তিনটিই সমাধি রয়েছে। এগুলি জলালুদ্দীন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের সমাধি বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

জলালুদ্দীনের মৃত্যুর সময়

এপর্যন্ত সকলেরই ধারণা ছিল জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ৮৩৫ হিজরায় পরলোকগমন করেন, কারণ ঐ বছরের পরে আর তাঁর মুদ্রা পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখন সুনিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে, তিনি ৮৩৬ হিজরা অবধি জীবিত ছিলেন। বিশ্বভারতী পুঁথিশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল আমাকে বলেছিলেন, তিনি সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের নামাঙ্কিত ৮৩৬ হিজরার কয়েকটি মুদ্রা পেয়েছিলেন। এই মুদ্রাগুলি আমি দেখতে পাইনি, কাজেই এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারলাম না। তবে সম্প্রতি রাজশাহী জেলার জাহানাবাদ গ্রামে জলালুদ্দীদের যে শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার তারিখ ৮৩৫ হিজরার ৫ই জমাদি অল-আউয়ল। ৮৩৫ হিজরার পঞ্চম মাসে যিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর ৮৩৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার। ইতিপূর্বে ঢাকা জেলার মান্দরা গ্রামে জলালুদ্দীনের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল, তার তারিখ প্রথমে পড়া হয়েছিল ৮৩০ হিজরার ১০ই জমাদি অল-আউয়ল। কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞেরা স্থির করেছেন সালাঙ্কের প্রকৃত পাঠ ৮৩০ নয়—৮৩৬ হিজরা ‡ (Social History of the Muslims in Bengal, p. 30 দ্রষ্টব্য। অতএব জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ ৮৩৬ হিজরার পঞ্চম মাস বা ১৪৩৩ খ্রীঃর জানুয়ারী মাস পর্যন্ত নিঃসন্দেহে জীবিত ছিলেন। ঐ সময়ের অল্পকাল পরেই তিনি পরলোকগমন করেন, কারণ তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহের ৮৩৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। অল-সখাওয়ীর মতে ৮৩৭ হিঃর রবিয়স্ সানী মাসে জলালুদ্দীনের মৃত্যু হয়। সম্ভবত তিনি '৮৩৬'এর জায়গায় '৮৩৭' লিখেছেন।

জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের ৮৪০ হিজরার একটি মুদ্রাও নাকি পাওয়া গিয়েছে। এই মুদ্রাটি সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন, "It was

probably posthumus." কিন্তু ৮৪০ হিজরায় শুধু জলালুদ্দীন নন, তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহও সম্ভবত জীবিত ছিলেন না ; সুতরাং এই সময়ে জলালুদ্দীনের নামে "posthumus" মুদ্রা বার হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহেন্দ্রদেবের সব মুদ্রা ১৩৪০ শকাব্দের হলেও দুটি মুদ্রায় তারিখের অঙ্ক অস্পষ্ট। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রথমটির তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দ হতে পারে (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, ১৩২৪, পৃঃ ১৮৯)। স্টেপলটনের মতে অপর মুদ্রাটির তারিখ সম্ভবত ১৩৪১ শকাব্দ (J. A. S. B, 1930, N.S., p. 8)। দুটি মুদ্রাই পাণ্ডুনগরের টাকশালে উৎকীর্ণ। এর থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন মহেন্দ্রদেব ১৩৩৯ শকে দনুজমর্দনদেবের রাজত্বকালে একবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং ১৩৪১ শক বা ৮২২ হিজরায় জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে সাময়িকভাবে জলালুদ্দীনের কাছ থেকে পাণ্ডুয়া অধিকার করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এইসব মুদ্রার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা অনুচিত। কারণ নেলসন রাইট বলেছেন, "In many cases the execution of the Bengal coins is very poor owing to mistakes made by ignorant or careless engravers, and the difficulty of deciphering them is greatly increased by the frequency of counter stamps and cuts with a chisel : it is believed that these were made by the money changers and bankers in order to give an artificial depreciation to coins of a previous year or a previous reign."

মহেন্দ্রদেবের ১৩৩৯ বা ১৩৪১ শকাব্দের মুদ্রা এবং জলালুদ্দীনের ৮৪০ হিজরার মুদ্রার সৃষ্টি এইভাবেই হয়েছে সন্দেহ নেই।

শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ

জলালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে শামসুদ্দীন আহ্মদ শাহ রাজা হন। শামসুদ্দীনের কেবলমাত্র ৮৩৬ হিজরার মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। কোন্ সময়ে শামসুদ্দীনের রাজত্ব শেষ হয়েছিল, তা বর্তমানে বলবার উপায় নেই। তবে পরবর্তী সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের ৮৪১ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর থেকেই বোঝা যায়, শামসুদ্দীনের রাজত্ব তার আগেই শেষ হয়েছিল এবং 'আইন-ই আকবরী', 'তবকাৎ-ই আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'রিয়াজ-

উস্‌-সলাতীন' প্রভৃতিতে যে বলা হয়েছে শামসুদ্দীন ১৬ বা ১৮ বছর রাজত্ব করেছিলেন, সে কথা সত্য হতে পারে না। বুকাননের বিবরণীতে বলা হয়েছে শামসুদ্দীন তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন; এই উক্তি যথার্থ হতে পারে।

আজ অবধি কোন সমসাময়িক বিবরণে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। পরবর্তী সময়ে রচিত বিবরণীগুলির মধ্যে 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন' ভিন্ন অন্যান্য বিবরণীতে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা মেলে না। 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজে'র উক্তি পরস্পরবিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। 'ফিরিশ্‌তা' বলেছেন, "তিনি (শামসুদ্দীন) তাঁর মহান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতার আদর্শ প্রাণপণে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়ে বহু লোক বাধিত হয়েছিল।" কিন্তু 'রিয়াজ'এ পাওয়া যাচ্ছে, "তিনি (শামসুদ্দীন) অত্যন্ত বদমেজাজী, অত্যাচারী এবং রক্তপিপাসু ছিলেন। বিনা কারণে তিনি রক্তপাত করতেন এবং গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরতেন। অত্যাচার যখন চরম সীমায় পৌছোলো এবং উচ্চনীচনির্বিশেষে সকলেই যখন তাঁর নৃশংসতায় শোচনীয়ভাবে পীড়িত হতে লাগল, তখন সাদী খাঁ এবং নাসির খাঁ নামে তাঁর দুই ক্রীতদাস, যাঁরা অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ষড়যন্ত্র করে আহ্‌মদ শাহকে হত্যা করেন।" শামসুদ্দীন ভাল ছিলেন না মন্দ ছিলেন, সে সম্বন্ধে নতুন কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বলা যাবে না। বর্তমান অবস্থায় 'ফিরিশ্‌তা'র অতি প্রশংসা এবং 'রিয়াজ'এর অতি নিন্দা এই দুইএর মাঝখান থেকে সত্য নির্ধারণ করা দুরূহ।

অল-সখাওয়ীর মতে শামসুদ্দীন মাত্র ১৪ বছর বয়সে রাজা হয়েছিলেন। এ কথা সত্য হলে তাঁর সম্বন্ধে ফিরিশ্‌তার প্রশংসা ও 'রিয়াজ' এর নিন্দা দুই-ই অতিরঞ্জিত বলতে হবে।

'রিয়াজ'এর নিন্দাসূচক উক্তি সম্বন্ধে ডঃ দানী বলেন, "......this statement of the Riyad was born out of his (or his informant's) desire to justify the action of the usurpers,......Such aspersion of personal and private character was the only justification for usurpation in the eyes of old historians." কিন্তু শামসুদ্দীনকে যারা উচ্ছেদ করেছিল, সেই সাদী খাঁ ও নাসির খাঁর পক্ষ

সমর্থন 'রিয়াজ'-এ দেখা যায় না। বরং তাঁদের হেয় করেই আঁকা হয়েছে এই বইয়ে।

শামসুদ্দীনের মৃত্যু কিভাবে হল, সে সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণীগুলি নীরব; কেবল 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' এবং বুকাননের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, শামসুদ্দীনের দুই ক্রীতদাস সাদী খাঁ ও নাসির খাঁ ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা-করেছিলেন। শামসুদ্দীনের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বের কথা স্মরণ রাখলে এই কথা সত্য বলেই মনে হবে। পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদের মধ্যে জলালুদ্দীনের ও শামসুদ্দীনের সমাধিফলক বলে পরিচিত যে দুটি সমাধিফলক রয়েছে, সে সম্বন্ধে আবিদ আলী লিখেছেন, "There are two stone posts at the head of the tombs of Jalaluddin and Ahmed Shah. The stone on that of the latter is raised a little above the tomb, which shows that the grave belongs to a martyr." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 126)। সুতরাং শামসুদ্দীনকে যে হত্যা করা হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলা চলে। শামসুদ্দীনের পিতা জলালুদ্দীনের যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর কবর থেকে তা বোঝা যায়।

শামসুদ্দীনের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আপাততঃ বুকাননের বিবরণীর উক্তিকেই বিশ্বাস করে স্থির করছি শামসুদ্দীন তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং ৮৩৯ হিজরায় পরলোকগমন করেছিলেন।

ঢাকা জেলার মুয়াজ্জমপুরের শাহ লঙ্গর দরগার একটি মসজিদে একটি খণ্ডিত শিলালিপি পাওয়া গেছে, এতে তারিখ পাওয়া যায়নি, সমসাময়িক রাজার নামের একাংশ পাওয়া গেছে, তাতে লেখা আছে,"মসনদ শাহী আহ্মদ শাহ"। বাংলার সিংহাসনে একমাত্র শামসুদ্দীন আহ্মদ শাহ ভিন্ন অন্য কোন "আহ্মদ শাহ" বসেছিলেন বলে জানা যায় না। সুতরাং এটি তাঁরই শিলালিপি বলে মনে হয়।

পরবর্তী সুলতান নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে গণেশের বংশের কোন সংস্রব নেই। শামসুদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে গণেশের বংশের রাজত্ব চিরদিনের মত শেষ হল।

তৃতীয় অধ্যায়

মামুদ শাহী বংশ

("পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ")

নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ

শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর প্রকৃত বৎসরটি যতদিন না সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে, ততদিন নাসিরুদ্দীন মামুদ (বা মহ্‌মুদ) শাহের সিংহাসনে আরোহণের সময়ও স্থিরভাবে নির্ণয় করা যাবে না। এক সময়ে সকলের ধারণা ছিল নাসিরুদ্দীন ৮৪৬ হিজিরায় (১৪৪২-৪৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নাসিরুদ্দীন যে তার কয়েক বছর আগেই রাজা হয়েছিলেন, তার বহু প্রমাণ আছে। সেগুলি এই :—

(১) ৮৪১ হিজিরায় (১৪৩৭-৩৮ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে (Journal of the Numismatic Society of India, Vol. IX, Pt. I, p. 47 দ্রষ্টব্য)।

(২) ৮৪২ হিজিরায় (১৪৩৮-৩৯ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের দুটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে একটি চাটগাঁওয়ের টাকশালে এবং অপরটি সম্ভবত ফিরোজাবাদের টাকশালে তৈরী (P.A.S.B., 1893, p. 143 এবং J.A.S.B., 1893, pp. 232-33 দ্রষ্টব্য)। ৮৪৩ হিঃর মুদ্রাও মিলেছে।

(৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় একটি দাসবিক্রয়পত্র রক্ষিত আছে ; এটির তারিখ ২৩৮ পরগণাতি সংবৎ (১৪৪০ খ্রীঃ) ; এতে তৎকালীন রাজা হিসাবে "সুলতান মাহামুদ সাহ গজন"এর উল্লেখ আছে (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 133)।

সুতরাং নাসিরুদ্দীন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। শামসুদ্দীনের আনুমানিক মৃত্যু-সাল ৮৩৯ হিঃ (১৪৩৫-৩৬ খ্রীঃ)। ঐ বছরেই নাসিরুদ্দীন রাজা হয়েছিলেন বলে আপাতত স্থির করা যেতে পারে।

কী করে নাসিরুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন'-এ এই বিবরণ পাওয়া যায়,

"আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর ফলে যখন সিংহাসন খালি হল, তখন শাদী খান নাসির খানকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে রাজ্যের সর্বময় কর্তা হতে চাইলেন। কিন্তু নাসির খান তাঁর মৎলব অনুমান করে তাঁর উপরে টেক্কা দিলেন। তিনি শাদী খানকে হত্যা করলেন এবং সাহস করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করে আদেশ জারী করতে লাগলেন। আহ্‌মদ শাহের অমাত্য এবং সচিবেরা তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে তাঁকে বধ করলেন। তাঁর রাজত্বকাল কারও মতে সাতদিন স্থায়ী হয়েছিল, কারও মতে আধ দিন।

"ক্রীতদাস নাসির খান যখন তার দুষ্কার্যের ফল স্বরূপ নিহত হল, অমাত্য এবং সেনানায়কেরা তখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরার (শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ) এক পৌত্রকে সিংহাসনে বসালেন। এঁর এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা ছিল। এঁর উপাধি হল নাসির শাহ।"

তবকাৎ-ই-আকবরী ও তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তাতে এই বিবরণের সমর্থন আছে; তবে শাদী খান ও নাসির খান যে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহকে হত্যা করেছিলেন, একথা তাদের মধ্যে বলা হয়নি। কিন্তু শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পরে শাদী খান ও নাসির খানের ক্ষমতা অধিকার, তাদের নিধন প্রাপ্তি এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসির শাহের (নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ) সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে রিয়াজ, তবকাৎ ও ফিরিশ্‌তা তিনটি বিবরণীই একমত। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই তিনটি বিবরণীর উক্তিকে সত্য বলেই গ্রহণ করেছেন এবং নাসিরুদ্দীন যে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর ছিলেন, এ সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ নেই। তার ফলে তাঁরা নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের বংশকে "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন।

কিন্তু বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, "Ahmed Shah...... reigned three years. He was destroyed by two of his nobles, Sadi Khan and Nasir Khan, the latter of whom was made king, and erected many buildings at Gaur, to which he seems to have transferred the royal residence. He governed 27 years, and was succeeded by Sultan Barbuck Shah." অন্যান্য বিবরণীর মতে শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের হত্যাকারী (বা তাঁর মৃত্যুর পরে ক্ষমতা অধিকারী) নাসির খান এবং নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ

আলাদা লোক, কিন্তু বুকানন-বিবরণীর মতে তাঁরা একই লোক (Cambrige History of India-তেও এঁদের একই লোক বলা হয়েছে)। এই অবস্থায় নাসিরুদ্দীন সত্যিই শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। সন্দেহের আরও একটি কারণ আছে। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ আনুমানিক ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁরই পৌত্র নাসিরুদ্দীনের পক্ষে ১৪৫৯ খ্রীঃ অবধি বেঁচে থাকা অসম্ভব না হলেও অস্বাভাবিক ব্যাপার। এ অবস্থায় ইলিয়াস শাহ ও নাসিরুদ্দীনের সম্পর্ক সম্বন্ধে অতিনিশ্চিত হওয়া এবং নাসিরুদ্দীনের বংশকে "পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ" নাম দেওয়া অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। আমার মনে হয়, নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের বংশকে তাঁর নাম অনুসারে 'মামুদ শাহী বংশ' নাম দেওয়া উচিত।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় লেখা আছে যে সিংহাসন লাভের আগে নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ লোকচক্ষের অন্তরালে গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং বাংলার রাজা হবার কথা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি। রাজা গণেশ, জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ও শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের রাজত্বকালে ইলিয়াস শাহী বংশের লোকেরা ও তাঁদের সমর্থকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, নাসিরুদ্দীন রাজা হলে তাঁরা আবার একত্র সমবেত হলেন। ফিরিশ্‌তা আরও লিখেছেন যে নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালে জৌনপুর, দিল্লী ও বাংলার সুলতানদের মধ্যে রেষারেষি দূর হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

'রিয়াজ'-এ নাসিরুদ্দীন সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে,

"নাসির শাহ সমস্ত কাজ ন্যায়পরায়ণতা এবং উদারতার সঙ্গে করতেন। যার ফলে বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সমস্ত লোকে তৃপ্ত হল এবং আহ্‌মদ শাহের অত্যাচার-জনিত ক্ষত শুকিয়ে গেল। এই মহান্‌ রাজা গৌড়ের দুর্গ ও প্রাসাদগুলি নির্মাণ করান।"

এই কথাগুলি যে মোটামুটিভাবে সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সুশাসক না হলে নাসিরুদ্দীনের পক্ষে সুদীর্ঘ ২৪।২৫ বছর ধরে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করা সম্ভব হত বলে মনে হয় না। আর তাঁর আমলে নির্মিত অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মসজিদ অথবা তাদের ধ্বংসাবশেষ এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। বহু শিলালিপিতেও তাঁর নাম

পাওয়া গিয়েছে। এগুলির মধ্যে তাঁর নামের সঙ্গে অনেক লম্বা-চওড়া উপাধি যুক্ত রয়েছে।

কেউ কেউ অনুমান করেন নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালটা পরিপূর্ণ শান্তিতেই কেটেছিল, কোন যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে তিনি যান নি। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা পরবর্তী আলোচনা থেকে দেখা যাবে।

প্রথমত, উড়িষ্যারাজ কপিলেন্দ্রদেবের এক শিলালিপিতে লেখা আছে যে তিনি গৌড়েশ্বরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। কপিলেন্দ্রদেবের অন্যতম সামন্ত কোণ্ডাবিড়ুর গণদেব প্রদত্ত ১৩৭৭ শকের ভাদ্র মাসের (=১৪৫৫ খ্রীঃ) এক শাসন থেকে জানা যায় যে তিনি দুজন "তুরুষ্ক-নৃপতি"কে পরাজিত করেছিলেন। ঐ সময়ে উড়িষ্যার পাশে মাত্র দুজন "তুরুষ্ক" (মুসলমান) নৃপতিই ছিলেন—বাহমনীর রাজা এবং বাংলার রাজা। ঐ সময়ে নাসিরুদ্দীনই বাংলার রাজা ছিলেন। কপিলেন্দ্রদেব তাঁর শিলালিপিতে "গৌড়েশ্বর" উপাধিও ধারণ করেছেন এবং "মল্লিকা পারিস"কে (মালিক বাদশাহ) পরাজয়ের দাবী করেছেন। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল এবং এই যুদ্ধেই তিনি ও তাঁর সামন্ত জয়ের দাবী করেছেন বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, খুলনা-যশোহর অঞ্চলে ব্যাপক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, খান-জহান নামে বাংলার সুলতানের একজন সেনাপতি এই অঞ্চলে প্রথম মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ এই কথা সত্য এবং বাংলার এই সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ। কারণ তাঁর রাজত্বকালে—৮৬৩ হিজিরার ২৬শে জিলহিজ্জা তারিখে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি বাগেরহাট অঞ্চলে পাওয়া গেছে—এতে খান-জহানের মৃত্যুর উল্লেখ আছে। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সামরিক অভিযানের এটি একটি নিদর্শন বলে গৃহীত হতে পারে।

তৃতীয়ত, মিথিলার বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিত বিদ্যাপতি তাঁর 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা নরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র ভৈরবসিংহ সম্বন্ধে লিখেছেন,

> শৌর্যাবর্জিত পঞ্চগৌড়ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা-
> ঽনেকোত্তুরঙ্গ-তুরঙ্গ সঙ্গত সিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ।
> শ্রীমদ্ভৈরবসিংহদেব নৃপতির্যস্যাম্বুজন্মাজয়-
> ত্যাচন্দ্রার্কমখণ্ড কীর্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ॥

'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৪৫০ খ্রীঃর কাছাকাছি সময়ে রচিত হয়েছিল (প্রাচীন

বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ৪৬ দ্রষ্টব্য)। এই সময়ের দু'এক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে, কিন্তু এই বই যে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার আগে ভৈরবসিংহ যে "পঞ্চগৌড়ধরণীনাথ" অর্থাৎ বাংলার রাজাকে "নম্রীকৃত" করেছিলেন, তিনি নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ ভিন্ন আর কেউই হতে পারেন না। 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার সময়ে ভৈরবসিংহের বয়স খুব বেশী ছিল না, কারণ তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুজনেই ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের আগে অর্থাৎ 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনার ১৫ বছরেরও বেশী আগে ভৈরবসিংহের কোন গৌড়েশ্বরকে "নম্রীকৃত" করবার মত বয়স নিশ্চয়ই হয়নি।

সুতরাং ভৈরবসিংহ কর্তৃক "নম্রীকৃত" গৌড়েশ্বর যে নাসিরুদ্দীন তা জানা গেল। কিন্তু ত্রিহুতের এক ক্ষুদ্র ভূস্বামীর পুত্র ভৈরবসিংহ প্রবলপ্রতাপ গৌড়েশ্বরকে নম্রীকৃত করেছিলেন, এ ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হয়? আমার মনে হয়, নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ মিথিলার অঞ্চলবিশেষ নিজের অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং ভৈরবসিংহ প্রশংসনীয় বীরত্ব দেখিয়ে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। মোটের উপর, ভৈরবসিংহ তথা মিথিলার রাজাদের সঙ্গে যে নাসিরুদ্দীনের যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ত্রিহুতের পাশে ভাগলপুর অঞ্চলে নাসিরুদ্দীনের অধিকার ছিল। একথা নাসিরুদ্দীনের এই অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়। সুতরাং নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে ত্রিহুতের রাজাদের যুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে চীনের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৩৪ বছর ধরে এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবার পর নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালেই তা ছিন্ন হয়। চীনদেশের ইতিহাসগ্রন্থগুলির মধ্যে চীন-বাংলা রাজনৈতিক সংযোগের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি।

যে সমস্ত চীনা বইতে বাংলার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিশদ ও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তার মধ্যে তিনখানি বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই তিনখানি বইয়ের নাম 'সি-য়ং-চও-কুং-তিয়েন,' 'শু-য়ু--চৌ-ৎসেউ-লু' এবং 'মিং-শে'। এই বইগুলির রচনাকাল আলোচ্য সময়ের পরবর্তী হলেও এগুলি সমসাময়িক দলিলপত্র অবলম্বনে লেখা বলে এদের প্রামাণিকতা

অবিসংবাদিত। এই তিনখানি বই থেকে যা জানতে পারা যায়, তা নীচে দেওয়া হল।

'সি-য়ং-চও-কুং-তিয়েন' (রচনাকাল ১৫২০ খ্রীঃ—রচয়িতা হুয়াং-সিং-ৎ-সেং)এ এইটুকু বিবরণ পাওয়া যায়,—

"সম্রাট্ য়ং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) (বাংলার) রাজা নগই-য়া-স্সে তিং (গি-য়া-সু-দ্দীন) চীনদেশে ভেট সমেত এক দূত পাঠান। এক দূত য়ং-লো'র রাজত্বের নবম বর্ষে (১৪১১ খ্রীঃ) তাই-ৎ-সাং-এ পৌছোন। পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন রাজকর্মচারীকে সেখানে পাঠানো হয় তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। য়ং-লো'র রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪ খ্রীঃ) বাংলা থেকে পা-য়ি-ৎ-সি (বায়াজিদ) নামে একজন মন্ত্রী কি-লিন (জিরাফ) এবং অন্যান্য উপহার সমেত চীনে আসেন। সম্রাট চেং-তং-এর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪৩৮ খ্রীঃ) বাংলা থেকে একই ধরণের উপহার সমেত আর একজন দূত আসেন।"

'শু-য়ু-চৌ-ৎসেউ-লু' (রচনাকাল ১৫৭৪ খৃঃ—রচয়িতা য়েন-ৎসং-কিয়েন)এ বলা হয়েছে,—

"য়ং-লো'র রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪০৫ খ্রীঃ) বাংলার রাজা নগই-য়া-স্সে-তিং চীনের রাজসভায় দূত পাঠান। (চীন) সম্রাটও বাংলার রাজা ও রাণীকে নানারকম রেশমী কাপড় উপহার পাঠাতে আদেশ দেন। য়ং-লোর রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮ খ্রীঃ) ঐ দেশের (বাংলার) রাজা আবার দূত পাঠালেন। এই দূত ভেটসমেত তাই-ৎ-সাং বন্দরে এসে পৌছোলেন। (চীনের) সম্রাট তাঁকে অভ্যর্থনা জানবার জন্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে সেখানে পাঠালেন। য়ং-লোর রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪ খ্রীঃ) বাংলার রাজা পা-য়ি-ৎ-সি নামে তাঁর একজন মন্ত্রীকে চীনে পাঠালেন, জিরাফ এবং অন্যান্য উপহার সঙ্গে দিয়ে। তাইতে আচার-অনুষ্ঠান দপ্তরের মন্ত্রী (চীন) সম্রাটকে অভিনন্দন জানালেন। সম্রাট উত্তরে বললেন, "দেশের শাসনকার্যে তোমরা আমাকে রাত্রিদিন সাহায্য করছ, এতেই দেশের উপকার হচ্ছে। জিরাফ দেশে থাকুক বা না থাকুক, কিছু আসে যায় না।" (চীন) সম্রাটও বাংলার রাজাকে ভেট পাঠালেন। বাংলার প্রতিনিধিদলের লোকদেরও পদমর্যাদা অনুসারে নানারকম উপহার দেওয়া হল। য়ং-লো'র রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৪১৫ খ্রীঃ) চীনসম্রাট হৌ-হিয়েন নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষকে অনেক লোকজন এবং এক বিরাট নৌবহর ও সৈন্যসামন্ত সমেত বাংলায় পাঠিয়েছিলেন।"

চীনের 'মিং' রাজবংশের সরকারী ইতিহাসগ্রন্থ 'মিং-শে' (রচনাকাল ১৭৩৪ খৃঃ) থেকে এই দুই বিবরণীরও অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 'মিংশে'র 'ওয়াই-কুও-চুয়ান' বা পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে বাংলা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা নীচে উদ্ধৃত হল :—

"য়ং-লো'র রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে (১৪০৮) বাংলার রাজা উপহার সমেত চীনে একজন দূত পাঠান। চীনও প্রতিদানস্বরূপ অনেক উপহার পাঠায়। য়ং-লো'র রাজত্বের সপ্তম বর্ষে (১৪০৯) তাঁদের দূত ২৩০ জন রাজকর্মচারী সঙ্গে নিয়ে চীনে এসেছিলেন। (চীন) সম্রাট সেই সময় বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই তিনি বাংলা দেশে অনেক উপহার পাঠালেন। এর পর থেকে তারা (বাংলার রাজদূতেরা) প্রতি বছরই (চীনে) আসত। য়-লো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২) বাংলার রাজদূতেরা চীনে পৌঁছোবার পূর্বাহ্নে সম্রাট্ তাঁদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করার জন্যে কয়েকজন মন্ত্রীকে চেন-কিয়াং-এ পাঠালেন। ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ, এমন সময় বাংলার দূতেরা তাদের রাজার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে পৌঁছোলো। মৃত রাজার শোকানুষ্ঠানে এবং যুবরাজ সৈ-উ-তিং(সৈফুদ্দীন=বাংলার সুলতান সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহ, রাজত্বকাল ১৪১১-১৪১৩ খ্রীঃ) এর অভিষেক-উৎসবে যোগ দেবার জন্যে চীন থেকে রাজপুরুষদের পাঠানো হল। য়ং-লো'র রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে (১৪১৪) নতুন এক রাজা ধন্যবাদ জানিয়ে এক লিপি পাঠালেন, সেই সঙ্গে নানারকম উপহার পাঠালেন —তার মধ্যে ছিল জিরাফ, বাংলার বিখ্যাত ঘোড়া এবং সেখানকার নানারকম উৎপন্ন দ্রব্য। চীনের রাজপুরুষেরা এর জন্যে সম্রাটকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু সম্রাট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। পরের বছর (১৪১৫) রাজা, রাণী এবং রাজপুরুষদের জন্যে অনেক উপহার সমেত হৌ-হ্যিয়েনকে ঐ দেশে পাঠানো হল। তারপর চেং-তং-এর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৪৩৮) তারা আর একবার জিরাফ উপহার পাঠায়। সমস্ত রাজপুরুষেরা এই ঘটনা উপলক্ষে সম্রাটকে অভিনন্দন জানান। পরের বছর (১৪৩৯) আবার ঐ দেশ থেকে উপহার আসে। তারপর থেকে ঐ দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়।"

কিন্তু 'মিং-শে'র অন্য কয়েকটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক উল্লেখের মধ্য দিয়ে বাংলার সম্বন্ধে আরও নতুন ও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 'মিং-শে', 'সিং-চা-শেং-লান' প্রভৃতি বইগুলিতে বলা হয়েছে এই সময় সৃসে-ন-পু-উল্

বা চও-ন-ফু-উল্ নামে ভারতের একটি রাজ্যের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, যে রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের স্থানটি। এই স্‌সে-ন-পু-উল্ বা চও-ন-ফু-উল্ হচ্ছে জৌনপুর রাজ্য; ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের স্থান গয়া ঐ সময়ে এই রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'মিং-শে'র ৩২৬শ অধ্যায়ে জৌনপুরের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বাংলা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে। নীচে এই বিবরণটি উদ্ধৃত হল :—

"স্‌সে-ন-পুল-উল—বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত। একে মধ্য ভারতও বলা হয়। প্রাচীন যুগে এখানে বুদ্ধ থাকতেন। য়ংলো'র রাজত্বের দশম বর্ষে (১৪১২ খ্রীঃ) (চীনের) একজন রাজদূতকে রাজকীয় সনদ দিয়ে এই রাজ্যে পাঠানো হয়। তাদের রাজা য়ি-পুলা (ইব্রা=ইব্রাহিম শর্কী)কে সোনালী জরির কাজ করা রেশমী কাপড় উপহার দেওয়া হয়। য়ং-লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে (১৪২০ খ্রীঃ) বাংলার রাজদূত (চীন সম্রাটকে) জানান যে, তাদের (জৌনপুরের) রাজা কয়েকবার বাংলা আক্রমণ করেছেন। হৌ-হিয়েনকে তখন সম্রাটের আদেশ দিয়ে পাঠানো হল তাঁকে (জৌনপুররাজকে) বলবার জন্য যে, প্রতিবেশীর প্রতি ভাল ব্যবহার করেই তিনি নিজের সম্পত্তি বাঁচাতে পারেন। তাঁকে রেশম এবং টাকাকড়ি দেওয়া হল। হৌ-হিয়েন তখন বজ্রাসন (গয়া) পরিদর্শন করে সেখানে কিছু দান করলেন। এই রাজ্যটি চীন থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই এরা চীনে কোন ভেট পাঠাতে পারে নি।"

উপরের বিবরণে হৌ-হিয়েন নামে যে চীনা রাজপুরুষের নাম করা হয়েছে, 'মিং-শে'র ৩৪০শ অধ্যায়ে তাঁর জীবনী পাওয়া যায়। এই জীবনীর মধ্যেও এক জায়গায় বাংলা ও জৌনপুর সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তথ্য মেলে। এই অংশটি নীচে উদ্ধৃত করছি :—

"য়ং-লো'র রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের (১৪১৫ খৃঃ) সপ্তম মাসে সম্রাট বাংলা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে হৌ-হিয়েনকে এক নৌবহর সমেত পাঠালেন।* এই দেশটি (বাংলা) হচ্ছে ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে। চীন থেকে এর দূরত্ব খুব বেশী। তাদের রাজা সৈ-ফো-তিং + (চীনেতে)

---

* হৌ-হিয়েনের দৌত্য 'সিং-চা-শেং-লান' বইয়ে বর্ণিত আছে।

+ সৈ-ফো-তিং-এর সঙ্গে বাংলার যে রাজার নামের মিল আছে, তিনি হচ্ছেন সৈফুদ্দীন (হম্‌জা শাহ)। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, সৈফুদ্দীনের রাজত্বকাল ৮১৩-৮১৫ হিজরা। সুতরাং ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে

কি-লিন (জিরাফ) এবং অন্যান্য দেশজ সামগ্রী ভেট পাঠিয়েছিলেন। ‡ সম্রাট এতে খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনিও প্রতিদানে অনেক জিনিস পাঠিয়েছিলেন। বাংলার পশ্চিমে স্‌সে-ন-পু-উল্ নামে একটি রাজ্য আছে। রাজ্যটি ভারতবর্ষের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। এই হচ্ছে বুদ্ধের আদি পীঠস্থান। এই দেশের রাজা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। সৈ-ফো-তিং তখন চীনসম্রাটকে খবর দেন। য়ং-লো'র রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষের (১৪২০ খ্রীঃ) নবম মাসে সম্রাট হৌ-হিয়েনকে আদেশ দেন (ভারতবর্ষে) গিয়ে তাঁদের (বাংলা ও জৌনপুরের রাজার) মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে। (জৌনপুরের রাজাকে) সোনাদানা এবং টাকাকড়ি উপহার দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করা হল।"

সৈফুদ্দীন রাজত্ব করতে পারেন না। অথচ উপরে উদ্ধৃত বিবরণীতে বলা হয়েছে, সৈ-ফো-তিং ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে ভেট পাঠিয়েছিলেন এবং ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুররাজ বাংলা আক্রমণ করায় চীনসম্রাটকে খবর দিয়েছিলেন। সুতরাং এই বিবরণীতে বাংলার রাজার নাম নির্দেশে যে ভুল হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ভুল কেন হল তাও বোঝা যায়। 'মিং-শে'রই অন্যত্র রয়েছে, ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাটের প্রতিনিধিরা সৈফুদ্দীনের অভিষেক-উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে যাঁর অভিষেক হয়েছিল, ১৪১৪ ও ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই বাংলার রাজা ছিলেন, এই সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই হৌ-হিয়েনের জীবনী-লেখক ঐ দুই সালের ঘটনার উল্লেখের সময় 'সৈ-ফো-তিং' নামটি বসিয়ে দিয়েছেন। নামটি যে তাঁর নিজেরই সংযোজনা, তার প্রমাণ হচ্ছে, 'মিং-শে'র ৩২৬শ অধ্যায়ে ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা-জৌনপুর সংঘর্ষের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে বাংলার রাজার নাম উল্লিখিত হয়নি। উপরের বিবরণীটি বর্ণিত ঘটনার তিন শো বছর পরে লেখা এবং লেখকও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তাঁর পক্ষে এটুকু ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

‡ বাংলার রাজার এই জিরাফ ও অন্যান্য দেশজ সামগ্রী প্রেরণ যে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার ঘটনা, তা বর্ণনার ভাষা থেকেই বোঝা যায়। আসলে এগুলি ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত হয়েছিল (৮৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী ছত্রে চীন-সম্রাটের যে প্রতিদানে অনেক জিনিস পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলিই হৌ-হিয়েনের মারফৎ পাঠানো হয়।

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ১৪০৫, ১৪০৮, ১৪০৯, ১৪১১, ১৪১২, ১৪১৪, ১৪২০, ১৪৩৮ এবং ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থেকে চীনে দূত গিয়েছিল এবং ১৪০৯, ১৪১২ ও ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে বাংলায় দূত এসেছিল। বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খ্রীঃ) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পরে দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন রাজা গণেশ ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা। তাঁদের আমলেও চীনের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু গণেশের বংশ ক্ষমতাচ্যুত হবার এবং নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিন বাদেই এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

চীনা বিবরণীগুলি থেকে জানা যাচ্ছে; বাংলার রাজা কয়েকবার চীন-সম্রাটকে জিরাফ পাঠিয়েছিলেন। এই তথ্যটুকু নানাদিক দিয়ে বিশেষ মূল্যবান। জিরাফ আফ্রিকারই জন্তু অথচ বাংলার রাজা চীনসম্রাটকে জিরাফ উপহার পাঠিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, ঐ সময় সুদূর আফ্রিকার সঙ্গেও বাংলার সংযোগ ছিল। চীনদেশে বাংলার পাঠানো জিরাফ যে বিরাট উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তা সম্রাটকে মন্ত্রীদের অভিনন্দন জানানো থেকেই বোঝা যায়। চীনের বিখ্যাত কবিরা বাংলার পাঠানো জিরাফকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। ক্রমশ এই জিরাফকে নিয়ে নানারকম রূপকথার গল্প রটল—একবার রটে গেল, একটি জিরাফ এক বাঘের ছানা প্রসব করেছে; তার আবার গরুর মত ক্ষুর আছে, লেজটিও গরুরই মত। এই গল্পগুলি পড়লে অনাবিল কৌতুকরস উপভোগ করা যায়।

যাহোক্ মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে পাঁচশো বছর আগেকার চীন-বঙ্গ মৈত্রীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। চীনা বইগুলির প্রসাদেই আমরা এই ইতিহাস জানতে পেরেছি। কিন্তু এর চেয়েও মূল্যবান বস্তু কয়েকখানি চীনা বইয়ে পাওয়া যায়। চীন থেকে যে সব প্রতিনিধিরা বাংলায় এসেছিলেন, তাঁরা তাঁদের দেখা বাংলার বিবরণও লিখে রেখে গেছেন। এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণগুলি দু'খানি সমসাময়িক বইতে প্রথম সঙ্কলিত হয়; তাদের মধ্যে একখানির নাম 'য়িং-য়ই-শেং-লান'; এর রচনাকাল ১৪২৫ থেকে ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, লেখকের নাম মা-হুয়ান। দ্বিতীয় বইটির নাম 'সিং-চা-শেং-লান'; এর রচনাকাল ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দ, লেখকের নাম ফে-সিন। আমরা এই বইয়ের অন্যত্র এই দুটি বিবরণ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছি।

যাহোক্, চীনা বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে, নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ দুবার—১৪৩৮ ও ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাটের কাছে উপহার সমেত রাজদূত পাঠিয়েছিলেন। একবার তিনি জিরাফও পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে নাসিরুদ্দীন তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরই রাজত্বকালে চীনের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হল কেন? আমাদের মনে হয়, এজন্যে তিনি দায়ী নন, চীনসম্রাট চেং-তং-ই দায়ী। তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাট য়ং-লো (১৪০২-৩৫ খ্রীঃ) বিদেশের, বিশেষত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু নতুন সম্রাটের সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল বলে মনে হয় না। তার প্রমাণ, নাসিরুদ্দীন তাঁকে পরপর দু'বছর উপহার পাঠালেও তিনি বাংলার রাজাকে কোন উপহার পাঠাননি। বলা বাহুল্য, এই একতরফা উপহার প্রেরণ বেশী দিন চলা সম্ভব ছিল না। ফলে উভয় দেশের সংযোগও ছিন্ন হয়ে যায়।

নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের যে সমস্ত মুদ্রা এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, সেগুলি ফতেহাবাদ, মামুদাবাদ ও নসরতাবাদের টাকশালে তৈরী। ফতেহাবাদ বর্তমান ফরিদপুর অঞ্চল, নসরতাবাদ উত্তরবঙ্গের ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্গত। কিন্তু মামুদাবাদের অবস্থান আজও পর্যন্ত চূড়ান্ত ভাবে ঠিক হয়নি। আজ পর্যন্ত এই সব জায়গায় তাঁর শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে—বালিয়াঘাটা (জঙ্গীপুর), গৌড়, সাতগাঁও, হজরৎ পাণ্ডুয়া, নসওয়ালাগলি (ঢাকা), ভাগলপুর, ঘঘরা (ময়মনসিংহ) ও কিওয়ারজোর (ময়মনসিংহ)। সুতরাং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ ও বিহারের কতকাংশ তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া নরিণ্ডা (ঢাকা), ত্রিবেণী ও বাগেরহাটে তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, এগুলি তাঁরই রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হলেও এদের মধ্যে রাজা হিসাবে তাঁর নাম উল্লিখিত হয় নি। ত্রিবেণীর শিলালিপির তারিখ ৮৬০ হিজরা এবং এতে তাঁর পুত্র বারবক শাহের নাম আছে। এর কারণ সম্বন্ধে আমরা বারবক শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করব।

নাসিরুদ্দীন ৮৬৩ হিজরা অবধি নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ বছর অবধি তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। পাণ্ডুয়ায় হজরৎ নূর কুৎব্ আলমের দরগার রান্নাঘরে উৎকীর্ণ এক শিলালিপিতে লেখা আছে, নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ ৮৬৩ হিজরার ২৮শে জিলহিজ্জা তারিখে (৪ঠা নভেম্বর, ১৪৫৮ খ্রীঃ) রাজা ছিলেন। সম্ভবত ৮৬৪ হিজরার গোড়ার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিভিন্ন শিলালিপিতে নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের যে সমস্ত কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়, নীচে তা উল্লিখিত হল।

(১) খান জহান। (২) সর্‌ফরাজ খান, খান মজলিশ। (৩) তর্‌বিয়ৎ খান। (৪) লতিফ খান। (৫) খওয়াজা জহান। (৬) হিলাৎ, বান্দা-ই-দরগাহ্‌। (৭) কাদার খান।

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান তো বটেই, সর্বদেশের ও সর্বকালের নরপতিদের মধ্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। অথচ এঁর সম্বন্ধে এতদিন আমাদের বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। পরবর্তী কালে লেখা ফার্সী বিবরণীগুলিতে বারবক শাহ সম্বন্ধে যে বিবরণী আছে, তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। একটি সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থ ও কয়েকটি শিলালিপি থেকে তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এ ছাড়া সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লেখা কয়েকটি গ্রন্থে বারবক শাহ সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই বইগুলির মধ্যে কয়েকটি তাঁর সমসাময়িক। এদের সাক্ষ্যই সবচেয়ে মূল্যবান। কারণ বারবক শাহ যে কত বড় ছিলেন, তার স্পষ্ট আভাস কেবল মাত্র এদের মধ্য থেকেই পাওয়া যায়।

বারবক শাহ একুশ বছর বা তারও বেশী সময় রাজত্ব করেন। ৮৬৩ থেকে ৮৭৮ হিঃ পর্যন্ত তাঁর মুদ্রা পাওয়া যায়। এই কারণে ঐতিহাসিকেরা ঐ সময়ই তাঁর রাজত্বকাল বলে নির্দিষ্ট করেছেন। History of Bengal (D.U., Vol.II) তেও ঐ তারিখই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে বারবক শাহ ৮৬৩ হিঃর কিছু আগে থাকতেই রাজত্ব করছিলেন এবং ৮৭৮ হিঃর কয়েক বছর পরেও রাজত্ব করেছিলেন বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। ত্রিবেণীতে বারবক শাহের নামাঙ্কিত একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তার তারিখ ৮৬০ হিঃ। ঐ সময় যে ন্যায়বিচারক, উদারপ্রকৃতি, বিদ্বান এবং আদর্শচরিত্র মালিক বারবক শাহ রাজত্ব করছিলেন, তা শিলালিপিটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। অথচ বারবক শাহের পিতা নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহ তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁর ৮৬৩ হিঃ অবধি মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়।

এদিকে সমসাময়িক স্মৃতিগ্রন্থকার বিশারদের একটি বচনে দেখছি, বারবক শাহ ১৩৯৭ শকাব্দ বা ৮৮১ হিজিরাতেও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বচনটি হরিদাসের শ্রাদ্ধবিবেকে ধৃত হয়েছে। নীচে সেটি উদ্ধৃত হল। ১৩৯৭ শকাব্দে যে দুটি মলমাস ও একটি ক্ষয়মাস ছিল—এই জ্যোতিষিক তথ্য এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এটি সম্পূর্ণ সত্য।

"তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি সপ্তনবত্যধিকত্রয়োদশশতীমিত শকাব্দে চান্দ্রাশ্বিনসংক্রান্তিং কৃত্বা প্রতিপদ্যেব সংচর্য রবেরমাবস্যায়াং কুম্ভসংক্রমে প্রতিপদি মীনসংক্রান্তাবেকস্মিন্নব্দে দ্বয়োঃ সংক্রান্তিশূন্যত্বং দৃষ্টমিতি বিশারদেনোক্তং।"

অথচ ৮৮০ হিঃ থেকে বারবক শাহের পুত্র শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের মুদ্রা পাওয়া যায়। তাঁর নামাঙ্কিত একটি শিলালিপির তারিখ অনেকের মতে ৮৭৮ হিঃ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বারবক শাহ অন্ততঃ ৮৬০-৮৬৩ হিঃ অবধি তাঁর পিতার সঙ্গে এবং অন্তত ৮৮০ (৮৭৮ ও হতে পারে)-৮৮১ হিঃ অবধি তাঁর পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে, বারবক শাহ কি তাঁর পিতার রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজে রাজা হয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের রাজত্বের শেষ দিকেও কি তাঁর পুত্র য়ুসুফ শাহ বিদ্রোহী হয়েছিলেন? আমাদের মনে হয়, তা নয়। সম্ভবত নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের বংশে এই নতুন নিয়ম চালু হয়েছিল যে রাজার পুত্র যুবরাজপদে অভিষিক্ত হবার সময় থেকে পিতার সঙ্গে যৌথভাবে রাজত্ব করবেন এবং ঐ সময় থেকেই পিতার মত তাঁরও নামে মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উৎকীর্ণ হবে। হোসেন শাহী বংশেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, হোসেন শাহের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। রাজার মৃত্যুর পর যাতে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ না ঘটে, সেই জন্যই সম্ভবত এই ব্যবস্থা হয়েছিল।

মাসির-ই-রহিমী, তবকাৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা, রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন প্রভৃতি গ্রন্থে বারবক শাহ সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না, তাদের মধ্যে দু' একটা মামুলী প্রশংসাসূচক কথা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু লেখা নেই। পরে প্রসঙ্গক্রমে এগুলির উক্তি উদ্ধৃত করব। আপাততঃ আমরা অন্যান্য সূত্র অবলম্বনে বারবক শাহের ইতিহাসটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করব।

বাংলাদেশে দু'জায়গায়—রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ার এবং হুগলী জেলার মান্দারণে ইসমাইল গাজী নামে একজন মুসলমান বীরের সমাধি আছে। কাঁটাদুয়ারের সমাধি-ক্ষেত্রে একজন ফকিরের কাছে 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' নামে একটি ফার্সী ভাষায় লেখা বই আছে। এই বইতে ইস্‌মাইল গাজী সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। এতে বলা হয়েছে, ইব্রাহিম বারবক শাহের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন এবং সুলতানের আজ্ঞায় ৭৮ (৮৭৮) হিজরায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' শাজাহানের রাজত্বকালে —১০৪২ হিজিরার ২২শে শাবান অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩ খ্রীঃ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এতে ইব্রাহিম সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার সংক্ষিপ্ত-সার এই :—

ইসমাইল গাজী কোরেশ-বংশীয় আরব, মক্কাতে তাঁর জন্ম হয়। যৌবন থেকেই তিনি ধর্মগতপ্রাণ। একদল সঙ্গী নিয়ে তিনি আরব থেকে রওনা হয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং সুলতান বারবকের রাজধানী লখনৌতিতে এসে উপস্থিত হন। এঁর রাজ্যের মধ্যে ছুটিয়া পটিয়া নামে একটি খরস্রোতা নদী ছিল। এই নদীতে বর্ষাকালে প্রবল বন্যা হয়ে বহু লোকের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করত। সুলতান অনেক চেষ্টা করেও এই নদীকে বাঁধতে পারেন নি। অবশেষে একদিন জনসাধারণের মধ্যে আদেশ জারী করা হল, তারা কোন একদিন নদীর ধারে জমায়েৎ হয়ে নদীতে মাটী ফেল্‌বে, সুলতান নিজে এক ঝুড়ি মাটি ফেলবেন। একথা শুনে ইসমাইল সুলতানকে বললেন তিনদিন সময় পেলে তিনি এর প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন। রাজা তাতে রাজী হলেন এবং ইসমাইলের কাছ থেকে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় জেনে নিলেন।

তিন দিন ধরে চিন্তা করে এবং জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে ইসমাইল ছুটিয়া পটিয়া নদীর উপর এক সেতু নির্মাণের একটি পরিকল্পনা তৈরী করলেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী এমন একটি মজবুত সেতু তৈরী করা সম্ভব হল, যার উপর দিয়ে হাতী ঘোড়াও চলে যেতে পারত। এতে খুব খুশী হয়ে রাজা ইসমাইলকে সম্মানিত করলেন এবং তাঁর উপর আরও কঠিন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন।

এর কয়েক বছর বাদে মান্দারণের রাজা গজপতি বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী যখন

পরাজিত হল, তখন ইসমাইলকে এ কাজের ভার দেওয়া হল। গজপতি পিতল দিয়ে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরী করেছিলেন। গজপতি যখন শুনলেন ইসমাইল নামে একজন ফকির ১২০ জন জ্ঞানী লোককে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে, তখন তিনি হাসলেন। কিন্তু তাঁর রাণী "ভগবানের সৈনিক" ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাঁকে নিষেধ করলেন। রাজা কিন্তু যুদ্ধ করলেন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হলেন এবং তাঁর মাথা কাটা গেল। ইব্রাহিম সুলতানের কাছে তখন আরও বেশী সম্মান পেলেন।

এর কয়েক বছর বাদে ইস্‌মাইলের উপর কামরূপের রাজা কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব করার ভার পড়ল। এর আগে বারবার এই রাজা বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। ইসমাইল এবং তাঁর সঙ্গীরা এই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব দেখালেন, কিন্তু এই রাজা ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ বীর এবং উৎকৃষ্ট সামরিক প্রতিভার অধিকারী। সন্তোষের রণক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হল এবং তাতে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল, এইপক্ষে ইসমাইল, তাঁর ভাইপো মুহম্মদ শাহ এবং বারোজন পাইক ভিন্ন আর সকলেই নিহত হলেন। বারোপাইকা-তে ইসমাইলদের দুর্গ ছিল। মুহম্মদ শাহকে এই দুর্গের রক্ষা-ভার দিয়ে ইব্রাহিম দুই দল সৈন্য নিয়ে জলা মকাম নামক জায়গায় গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এখানে শুধুই জল। ইসমাইল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে উপাসনার জন্যে একটু ডাঙা চাইলেন। আকাশবাণী হল "একটা ঢাল মাটিতে ভর্তি করে ফেলে দাও, ডাঙা তৈরী হবে।" হলও তাই। ইসমাইল তখন রাজার কাছে এক দূত পাঠিয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। রাজা সদর্পে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন আবার যুদ্ধ বাধল, কিন্তু যুদ্ধের মীমাংসা হবার আগেই রাত্রি এসে গেল। রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ইসমাইল ঘোড়ায় চড়ে রাজার প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে রাজা-রানী আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, ইসমাইল তাঁদের বধ করার সুযোগ পেয়েও করলেন না, তার বদলে তাঁদের চুলে চুলে বেঁধে দিয়ে এবং দুজনের বুকের উপরে একখানি খোলা তলোয়ার রেখে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ব্যাপার দেখে রাজা-রাণী

অবাক্। গোড়ায় তাঁরা ভাবলেন দুষ্ট কোন প্রেতাত্মা এ কাজ করেছে, কিন্তু পরে ঘোড়ার মল এবং খুরের ছাপ প্রাসাদের মধ্যে দেখে তাঁরা বুঝলেন এ কাজ মানুষেরই। রাজা অনেক অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করেও এ ব্যাপারের কিনারা করতে পারলেন না। এদিকে সেদিন রাত্রেও সেই একই ব্যাপার। তার পরদিন রাত্রেও তাই। রাজা তখন বুঝলেন এ কাজ করেছেন শাহ ইসমাইল গাজী, তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। রাজা তখন ইসমাইলের কাছে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ইসমাইল তাঁর এই স্বেচ্ছামূলক আত্মসমর্পণের পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে "বড়া লড়াইয়া" উপাধি দিলেন এবং বাংলার সুলতানের কাছে খবর পাঠালেন। সুলতান এ খবর শুনে আত্মহারা হলেন এবং ইসমাইলকে নানারকম রত্ন বসানো ঘোড়া, তলোয়ার ও কটিবন্ধনী প্রভৃতি উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন।

এর কিছুদিন পরে ঘোড়াঘাটের হিন্দু সেনাধ্যক্ষ ভান্দসী রায় ইসমাইলের কাছে রাজ্যের সীমান্তে একটি দুর্গ তৈরী করার প্রার্থনা জানালেন। এই অনুরোধ মঞ্জুর করা হল। কিন্তু ভান্দসী রায় তাঁর উপকারী ইসমাইলের উপর ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়ে তাঁর সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সুলতানের কাছে এই মিথ্যা অভিযোগ করলেন যে ইসমাইল কামরূপের রাজার সঙ্গে যোট বেঁধে এক স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় আছেন। সুলতান এই হিন্দুর চক্রান্তে ইসমাইলকে শেষ পর্যন্ত অবিশ্বাস করলেন ও তাঁর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন।

ইসমাইল অশেষ বীরত্ব দেখিয়ে সুলতানের সৈন্যবাহিনীকে বহুবার প্রতিহত করলেন, কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গীরা সকলেই নিহত হল, তখন নিজে বেঁচে থাকতে অনিচ্ছুক হয়ে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন।

সুলতানের আদেশে ১৪ই শাবান, ৭৮ (৮৭৮) হিজিরা (৪ঠা জানুয়ারী, ১৪৭৪ খ্রীঃ) তারিখে তাঁর মাথা কেটে ফেলা হল। মৃত্যুকালে তাঁর সঙ্গীদের তিনি দূরে পাঠিয়ে দিলেন, কেবল শেখ মুহম্মদ নামে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁকে ছাড়তে রাজী হল না। ইব্রাহিমের কাটা মাথা যখন সুলতানের কাছে এল, তখন তিনি আসল ব্যাপার জানতে পেরেছেন। তিনি আদেশ দিলেন রাজাদের জন্য নির্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে যেন ইসমাইলকে সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু ইসমাইল তাঁকে সশরীরে দেখা দিয়ে বললেন তাঁর কাটা মাথাকে যেন কাঁটাদুয়ারেই কবর দেওয়া হয়।

ইসমাইলের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল এবং মান্দারণ ও ঘোড়াঘাটে রক্ষিত তাঁর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সুলতানের দরবারে পাঠানো হল। যারা এইসব জিনিষ নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের সামনে ইসমাইল আবির্ভূত হলেন। এতে তারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে তাঁকে সব সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু ইসমাইল তাদের বললেন ভগবানের দয়াই তাঁর কাছে যথেষ্ট। এই সব বাহকেরা সুলতানের দরবারে যাবার পথে যেখানে যেখানে থামছিল, সেখানে সেখানে একটি করে দরগা উঠল। অবশেষে তাঁর মাথা কাঁটাদুয়ারে এবং তাঁর দেহ মান্দারণে সমাধিস্থ করা হল। দুটি জায়গাই বিখ্যাত তীর্থস্থানে পরিণত হল। স্বয়ং বারবক শাহ এবং তাঁর বেগম মান্দারণ ও কাঁটাদুয়ারে আগমন করে সমাধিক্ষেত্রে বহুমূল্যবান অনেক অর্ঘ্য দিয়েছিলেন।

রিসালৎ-ই-শুহাদার এই বিবরণীতে অনেক অতিপ্রাকৃত উপাদান আছে এবং এটি বারবক শাহের রাজত্বকালের দেড় শো বছরেরও বেশী পরে লেখা। সুতরাং তার উক্তির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করার আগে তাকে যাচাই করে নেওয়া দরকার। অলৌকিক ঘটনাগুলি বাদ দিলে এই বিবরণীর উক্তি যে মোটামুটি ভাবে ঠিক, তা মনে করা চলে। কারণ এতে বলা হয়েছে ইসমাইল বারবক শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং (৮)৭৮ হিজরায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ঐ সময়ে বারবক শাহ সত্যিই বাংলার সুলতান ছিলেন। দ্বিতীয়ত এতে বলা হয়েছে গজপতি নামে একজন রাজার কাছ থেকে ইসমাইল মান্দারণ দুর্গ জয় করেছিলেন; ঐ সময় উড়িষ্যায় গজপতি বংশীয় কপিলেন্দ্রদেব রাজত্ব করছিলেন, তাঁর শিলালিপি থেকে জানা যায় মান্দারণ অঞ্চল পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত ছিল। কিন্তু গজপতি একজন স্থানীয় রাজা মাত্র ছিলেন এবং তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে ইসমাইল মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেছিলেন, ইত্যাদি উক্তি অতিরঞ্জিত। আসল ব্যাপার সম্ভবত এই যে, মান্দারণ দুর্গ ঐ সময়ে কপিলেন্দ্রদেবের অধিকারে ছিল। তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তাকে পরাজিত ও বন্দী করে ইসমাইল মান্দারণ দুর্গ জয় করেছিলেন।

রিসালৎ-ই-শুহাদার মতে ইসমাইলের সঙ্গে কামরূপরাজ কামেশ্বরের যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কামরূপে ঐ সময় কামেশ্বর নামে কোন রাজা ছিলেন না। সম্ভবত 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'য় "ত্রিহুত"এর জায়গায় ভ্রমবশত কামরূপ লেখা হয়েছে। ত্রিহুতে ঐ সময় কামেশ্বর নামে কোন রাজা না থাকলেও কামেশ্বর

বংশীয় রাজারা সেখানে তখন রাজত্ব করছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত একজন—ভৈরব সিংহের সঙ্গে বারবক শাহের সত্যিই সংঘর্ষ হয়েছিল। অবশ্য এমনও হতে পারে কামরূপের রাজার সঙ্গেই ইসমাইলের যুদ্ধ হয়েছিল, 'রিসালৎ'-এ রাজার নাম ভুল লেখা হয়েছে। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'য় রাজা কামেশ্বরের জয় লাভ করেও ইসমাইলের গুণপনায় অভিভূত হয়ে নতি স্বীকার ও ইসলামধর্ম গ্রহণের যে কথা লেখা হয়েছে, তার মধ্যে অতিরঞ্জনের ছাপ সুস্পষ্ট। সম্ভবত এর ভিতরে রাজার জয়লাভের ঘটনাটুকুই সত্য, ইসমাইলের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকবার জন্যে বাকীটুকু ইসমাইলের ভক্তরা পরে রচনা করেছেন।

ইসমাইলের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ঘোড়াঘাটের হিন্দু শাসনকর্তা ভান্দসী রায় তাঁর নামে বারবক শাহের কাছে মিথ্যা নালিশ করেছিলেন এবং সেই অভিযোগের উপর নির্ভর করে বারবক ইসমাইলের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, এ কথা সত্য বলে মনে হয় না। বারবক শাহের মত একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান উপযুক্ত তদন্ত না করে একজন হিন্দু কর্মচারীর উস্কানিতে ইসমাইলের মত একজন বীর সেনাপতির প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, এরকম ব্যাপার সম্ভবপর বলে মনে হয় না। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'র লেখক ইসমাইলের অন্ধ ভক্ত, তাই এক্ষেত্রে তাঁর উক্তির উপর নির্ভর করা চলে না। সম্ভবত ইসমাইল সত্যিই "কামরূপের" রাজার সঙ্গে যোট বেঁধে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই বারবক তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

যাহোক্, ইসমাইল তাঁর মৃত্যুর পরে যে মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করেছেন, তা সত্যিই অসামান্য। মুসলমানরা তাঁকে শুধু গাজী আখ্যা দেন নি, পীর বলে পূজা করেছেন। কালক্রমে পীর ইসমাইল হিন্দু জনসাধারণের মনেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। কাঁটাদুয়ার ও মান্দারণে ইসমাইলের সমাধি শুধু মুসলমানের নয়, হিন্দুরও তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। এই দুই সমাধি আজ পর্যন্ত বর্তমান আছে। মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যের দিক্‌বন্দনা পালায় কবিরা বিভিন্ন দেবদেবী ও পীরের সঙ্গে পীর ইসমাইলেরও বন্দনা করেছেন। ইসমাইল গাজীর কাহিনী নিয়ে বহু কবি কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন গোরক্ষবিজয়-রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লাহ। শেখ ফয়জুল্লাহ তাঁর 'সত্যপীরের পাঁচালী'র ভূমিকায় লিখেছেন—

খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী।
গাজীর বিজয়ে সেহ মোক হইল রাজী॥

ইসমাইলের অধিনায়কত্বে বারবকের সৈন্যবাহিনী যে সমস্ত যুদ্ধাভিযান করেছিল, তার কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত বর্ণনা পেলাম 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'য়। কিন্তু বারবক ত্রিহুতেরও কতকাংশ জয় করেছিলেন। এর বিস্তৃত বিবরণ পাই মুল্লা তকিয়ার বয়াজে। এই সূত্রটির পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। মুল্লা তকিয়া এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা আমরা শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রের ইংরেজী অনুবাদ (কৃত্তিবাস পরিচয়, পৃঃ ৪৬-৪৭ দ্রষ্টব্য) থেকে যথাযথ অনুবাদ করে দিচ্ছি (মূলের জন্য পাটনা থেকে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা মাসির, মে-জুন, ১৯৪৯ দ্রষ্টব্য)।

"সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক (বাংলার) সুলতান শামসুদ্দীন হাজী ইলিয়াসকে তাঁর অধীনে এনেছিলেন এবং ত্রিহুত নিজের অধিকারভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ১২১ বছর পরে, অর্থাৎ ৮৭৫ সালে (হিজরায়) বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ তাঁর সৈন্য বাহিনীতে বহু আফগান—যারা সংখ্যায় পঙ্গপালের চেয়েও বেশী—সংগ্রহ করে ত্রিহুত রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। ঐ রাজ্য (জৌনপুরের) সুলতান হোসেন শাহ শর্কীর অধিকারভুক্ত ছিল। অনেক যুদ্ধের পরে তিনি (বারবক শাহ) সম্পূর্ণভাবে জয়ী হলেন। ফলে হাজীপুর দুর্গ এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলি, যে পর্যন্ত হাজী ইলিয়াসের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সবই তাঁর অধিকারে এল। এর সঙ্গে উত্তরে বুড়ি গণ্ডক নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হল। এই অংশ ত্রিহুতের জমিদারের হাতে ছিল (অর্থাৎ ত্রিহুতের জমিদার বারবক শাহের অধীনে করদ ভূস্বামী হিসাবে এই অংশ শাসন করতে লাগলেন)। এখানে তিনি (বারবক শাহ) কেদার রায়কে রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার জন্য তাঁর নায়েব নিযুক্ত করলেন কিন্তু জমিদারের পুত্র ভরতসিংহ তাঁকে উচ্ছেদ করে নিজে প্রভু হয়ে বসল। সুলতান বারবক শাহ এই খবর শোনবামাত্র জমিদারকে শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু রাজা তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং সুলতানকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।"

এই বিবরণ থেকে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে ত্রিহুতের রাজনৈতিক অবস্থা যে কি ছিল, এ পর্যন্ত তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ত্রিহুত জয় করেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁর কাছ থেকে ঐ অঞ্চল জয় করে নেন। তুঘলক বংশের প্রতিপত্তি

হ্রাস পেলে তাঁদের সাম্রাজ্যের অধিকাংশই পরহস্তগত হয়ে যায়। এই সময় জৌনপুরের সুলতানেরা প্রবল হয়ে ওঠেন এবং তাঁরাই ত্রিহুত অধিকার করেন। ইব্রাহিম শাহ শর্কীর আমলে ত্রিহুতে জৌনপুরের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেকদিন তা অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু শর্কী বংশের শেষ সুলতান হোসেন শাহের অক্ষমতার জন্য তাঁর আমলে জৌনপুর সাম্রাজ্য ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। ফলে ত্রিহুতে রাজ্যেরও অধিকারী পরিবর্তন ঘটে। বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের শিলালিপি পাওয়া গেছে। সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিহুত বাংলার সুলতানদের অধিকারে ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেছিলেন। এই অনুমান যে সত্য, মুল্লা তকিয়ার বয়াজ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, মুল্লা তকিয়ার উক্তি যে অভ্রান্ত, তারই বা প্রমাণ কী? তারও প্রমাণ আছে। মিথিলা বা ত্রিহুতের রাজা ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে বিখ্যাত স্মার্ত গ্রন্থকার বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর 'দণ্ডবিবেক' লেখেন। ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহের ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে। ভৈরবসিংহের নিজের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৪৬০-১৪৮০ খ্রীঃ। সুতরাং তিনি বারবক শাহের সমসাময়িক। 'দণ্ডবিবেকের' সূচনায় ভৈরব-সিংহের একটি প্রশস্তি আছে। তার একটি শ্লোক এই,

> যঃ শ্রীহুসেনমপনীত সমস্ত সেন-
> মাত্মীয় সৈনিকমিবাত্মমতে নিযুংক্তে।
> গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ (?)
> কেদাররায়মবগচ্ছতি দারতুল্যম্ ॥

(ছাপা বইয়ে 'শ্রীহুসেন' এর জায়গায় 'শ্রীকুসেন' পাঠ মেলে)

এই শ্লোকের শেষ দুই ছত্রে বলা হয়েছে যে রাজা ভৈরবসিংহ গৌড়েশ্বরের প্রতিশরীর অতিপ্রতাপ কেদার রায়কে স্ত্রীলোকের মত দেখেন।

৺মনোমোহন চক্রবর্তী 'প্রতিশরীর' এর অর্থ করেছিলেন 'প্রতিনিধি'। মিথিলাতে যে এই সময় তৎকালীন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের কেদার রায় নামে একজন প্রতিনিধি ছিলেন, সে কথা মুল্লা তকিয়ার বয়াজে আছে, 'দণ্ড-বিবেকে' এরই সমর্থন পাওয়া গেল। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে যে 'শ্রীহুসেন'এর উল্লেখ আছে, তিনি বোধ হয় হুসেন শাহ শর্কী। যা হোক্, "দণ্ডবিবেকে"র

মত প্রামাণ্য সূত্রের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এবং বারবক শাহের রাজত্বকালের একটি বছর (৮৭৫ হিঃ) সঠিকভাবে উল্লিখিত হওয়ায় এ বিষয়ে মুল্লা তকিয়ার বয়াজের উক্তিকে সঠিক্ বলেই গ্রহণ করতে হবে।

সুতরাং বারবক শাহ মিথিলা বা ত্রিহুত অধিকার করেছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। ভরতসিংহ নামে একজন জমিদার পুত্র তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন বলে মুল্লা তকিয়া উল্লেখ করেছেন। এই ভরতসিংহ বারবক শাহের প্রতিনিধি কেদার রায়কে উচ্ছেদ করে ত্রিহুতের ঐ অঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—কেদার রায়ের সঙ্গে ভৈরবসিংহেরও সম্পর্ক ভাল ছিল না। এখানে একটা কথা। ভরতসিংহ নামে ত্রিহুতের কোন জমিদারপুত্রের কথা অন্য কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। ভরতসিংহের সঙ্গে ভৈরবসিংহ ও তাঁর পুত্র রামভদ্র সিংহের নামের মিল আছে। মুল্লা তকিয়া এঁদের কারও কথা লিখতে গিয়ে ভুল করে 'ভরতসিংহ' নাম লিখেছেন, এমন হওয়াও বিচিত্র নয়।

কেবলমাত্র যুদ্ধবিগ্রহে সাফল্যলাভ ও রাজ্যজয়ই বারবক শাহের একমাত্র কীর্তি নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব কোন্‌খানে, সেই বিষয়ই এবার আলোচনা করা হবে।

বারবক শাহ নিজে ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁর বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর নাম এবং বিভিন্ন রাজকীয় উপাধির সঙ্গে আরও দুটি উপাধি যুক্ত দেখা যায়,—অল-ফাজিল এবং অল-কামিল। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক আহ্‌মদ হাসান দানী বলেন, "The titles al-Fadil and al-Kamil suggest that he attained the highest academic qualifications."

কিন্তু বারবক শাহ শুধুমাত্র নিজে পাণ্ডিত্য অর্জন করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। শুধু পণ্ডিত নয়, কবিরাও তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করতেন। আর শুধু মাত্র মুসলমান কবি-পণ্ডিত নয়, হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের উপরও তিনি মুক্তহস্তে দাক্ষিণ্যবর্ষণ করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষিত কবি-পণ্ডিতদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছেন, শত শত বৎসরের ব্যবধানেও যাঁদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অম্লান রয়েছে। এঁদের নাম নীচে দেওয়া হল।

(ক) বিশারদ

বারবক শাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা এক বিশারদের একটি বচন উদ্ধৃত করেছি। বচনটি যেভাবে "তথা গৌড়প্রৌঢ়পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি" দিয়ে সুরু হয়েছে; তার থেকে মনে হয়, বিশারদ

বারবক শাহের সাক্ষাৎ পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন ; ৺ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে এই বিশারদ বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা। এই মত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

(খ) রায়মুকুট

রায়মুকুট উপাধিধারী বৃহস্পতি মিশ্র বাংলার একজন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তাঁর লেখা অমরকোষের টীকা 'পদচন্দ্রিকা' অত্যন্ত বিখ্যাত। এছাড়া তিনি গীতগোবিন্দ, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত ও শিশুপালবধের উপরও টীকা লিখেছিলেন। তাঁর লেখা স্মৃতিগ্রন্থ 'স্মৃতিরত্নহার' "বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসে একখানি অমূল্য রত্ন।" বৃহস্পতির কৌলিক পদবী ছিল মহিন্তাপনীয়। তাঁর বিরাট পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে মিশ্র, আচার্য, কবিচক্রবর্তী, পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিত-সার্বভৌম এবং রায়মুকুট—এতগুলি উপাধি লাভ করেন। কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা ও শিশুপালবধটীকার সূচনাতে বৃহস্পতি গৌড়েশ্বরের কাছে তাঁর প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভের কথা বলেছেন। 'স্মৃতিরত্নহারে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন রায় রাজ্যধর উপাধিধারী একজন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষের কাছে তিনি আচার্য এবং কবিচক্রবর্তী উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর 'পদচন্দ্রিকা'র ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, গৌড়াধিপের কাছে তিনি "পণ্ডিতসার্বভৌম" উপাধি লাভ করেছিলেন এবং কোন একজন "নৃপ" তাঁকে উজ্জ্বল মণিময় হার, দ্যুতিমান দুটি কুণ্ডল, রত্নখচিত দশ আঙুলের আংটি দিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে স্বর্ণ-কলসের জলে অভিষেক করিয়ে ছাতা ও ঘোড়া সমেত শোভাময় "রায়মুকুট" উপাধি দান করেছিলেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সকলের ধারণা ছিল, রাজা গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহই একমাত্র গৌড়েশ্বর, যিনি বৃহস্পতিকে পৃষ্ঠপোষণ ও উপাধিদান করেছিলেন। এরকম ধারণার কারণ,

(১) 'স্মৃতিরত্নহারে'র ভূমিকায় বৃহস্পতি লিখেছেন তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রায় রাজ্যধর "জল্লালদীন" (অর্থাৎ জলালুদ্দীন) নৃপতির সেনাধিপতি ছিলেন।

(২) 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশে এই অনুচ্ছেদটি পাওয়া যায়,

"ইদানীং চ শকাব্দা ১৩৫৩ দ্বাত্রিংশদব্দাধিকপঞ্চবর্ষোত্তরচতুঃসহস্রবর্ষাণি কলিসন্ধ্যায়া ভূতানি ৪৫৩২।"

১৩৫৩ শকাব্দ (=১৪৩১-৩২ খ্রীঃ) জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বের অন্তর্গত।

কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা, ও শিশুপালবধটীকা প্রভৃতি বৃহস্পতির প্রথম জীবনের গ্রন্থগুলিতে যে গৌড়াধিপের উল্লেখ আছে, তিনি জলালুদ্দীনের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন। বৃহস্পতির 'পদচন্দ্রিকা'র প্রথমাংশ জলালুদ্দীনের রাজত্বকালেই লেখা হয়। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা' সম্পূর্ণ হয়েছিল অনেক পরে—১৩৯৬ শকাব্দে। ৺দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি পুঁথিতে 'পদচন্দ্রিকা'র এই রচনাসমাপ্তিকাল বাচক শ্লোকটি আবিষ্কার করেছিলেন,

সেনানীবদনগ্রহাগ্নিবিধুভিঃ শাকে মিতে হায়নে
শুক্রে মাস্যসিতে দিনাধিপতিথৌ সৌরেহ্নি মধ্যন্দিনে।
সদ্যঃ সংশয়সঞ্চয়াপচয়কৃদ্ব্যাখ্যাবিশেষোজ্জ্বলা
পর্যাপ্তা পদচন্দ্রিকাভবদিয়ং সংরক্ষণীয়া বুধৈঃ॥

বৃহস্পতির প্রথম দিককার বইগুলিতে তাঁর বিভিন্ন উপাধি উল্লিখিত হয়েছে—কিন্তু 'পণ্ডিতসার্বভৌম' ও 'রায়মুকুট' উপাধির ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নেই। সুতরাং অনিবার্যভাবেই এই সিদ্ধান্ত আসে যে ঐ বইগুলি লেখার পরে ও 'পদচন্দ্রিকা' সম্পূর্ণ হবার কিছু আগে তিনি ঐ উপাধি দুটি পান। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বারবক শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন তখন তিনিই যে বৃহস্পতিকে ঐ দুটি উপাধি দিয়েছিলেন. তাতে কোন সন্দেহ নেই। এসম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

(গ) মালাধর বসু

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যের অমর গ্রন্থ। তিনি "গুণরাজ খান" নামেই বেশী পরিচিত। তিনি নিজে বলেছেন গৌড়েশ্বর তাঁকে এই উপাধি দিয়েছিলেন—"গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।" অনেকের ধারণা এই গৌড়েশ্বর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রাচীনতম পুঁথিতে (লিপিকাল ১৪৮৪ খ্রীঃ) তার এই রচনাকালবাচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥

১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃতে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা সুরু হয় এবং ১৪৮০-৮১ খ্রীঃতে শেষ হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীঃতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল তো বটেই, পুঁথির লিপিকালও তার পূর্ববর্তী। সুতরাং হোসেন শাহ মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন না।

অনেকে বলেন শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ মালাধরকে "গুণরাজ খান" উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের আরম্ভই যখন ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, তখন তার বেশ কিছুকাল আগে মালাধর এই উপাধি পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কাব্যের সুরু থেকেই "গুণরাজ খান" ভণিতা পাওয়া যায়। অতএব য়ুসুফ শাহ নয়, বারবক শাহই মালাধরের পৃষ্ঠপোষক। তিনিই তাঁকে "গুণরাজ খান" উপাধি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা আরম্ভের কয়েক বছর পরেও বারবক শাহ জীবিত ছিলেন।

(ঘ) কৃত্তিবাস

এইবার আমাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি। বাংলার বাল্মীকি কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই জানেন তিনি এক গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। এই গৌড়েশ্বর যে কে, তাই নিয়ে আজ ৬৫ বছর ধরে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম করেন নি, কিন্তু তাঁর কয়েকজন সভাসদের নাম করেছেন; তাঁরা সকলেই হিন্দু। এর থেকে পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন এই গৌড়েশ্বরও হিন্দু এবং তিনি রাজা গণেশ ভিন্ন আর কেউ নন। আমার "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম" গ্রন্থে আমি সর্বপ্রথম বলি যে এই রাজা মুসলমান এবং কৃত্তিবাস গণেশের রাজত্বকালের অনেক পরে—১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। সেই সিদ্ধান্তেই এখনও অবিচল আছি। উপরন্তু এই গৌড়েশ্বরের নামটিও স্থির করতে পেরেছি। ইনি আর কেউই নন, এতক্ষণ যাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছি, সেই রুকনুদ্দীন বারবক শাহ। প্রমাণগুলি এক এক করে উপস্থাপিত করছি।

প্রথম প্রমাণ, ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসের পিতৃব্য

অনিরুদ্ধের সুষেণ নামে এক প্রপৌত্র ছিলেন।* কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র এই সুষেণ যে হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগ করে নীলাচল যাত্রার সময় জীবিত ছিলেন, সেকথা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায়। জয়ানন্দ লিখেছেন,

শুনিঞা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল।
ফুল্যার স্ত্রীপুরুষ কান্দে হয়্যা চঞ্চল॥
হরিদাসপ্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত॥
দুর্গাদাস মনোহর মহা কুলীন।†
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ॥

আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে হরিদাস ফুলিয়া ত্যাগ করে নীলাচলে যান। ঐ সময়ে সুষেণ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন। পিতামহের সঙ্গে পৌত্রের সময়ের স্বাভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর। এই হিসাবে ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আমরা কৃত্তিবাসকে জীবিত পাই। তখন বারবক শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন।

কিন্তু কৃত্তিবাস যে বারবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন, তা বলার স্বপক্ষে এর চাইতেও ভাল প্রমাণ আছে। আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভাসদদের এই তালিকা দিয়েছেন,

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগতানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছেন ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন॥
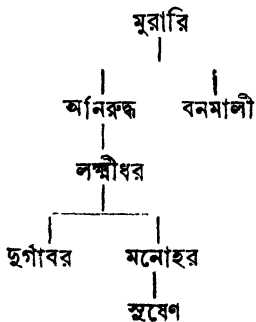
* বংশলতা,

† এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয়, জয়ানন্দ সুষেণ পণ্ডিতের বংশের চারজন লোকের নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহরের নাম পাশের বংশলতায় দ্রষ্টব্য। হৃদয়ানন্দের নাম অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না।

গন্ধর্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব-অবতার।
রাজসভাপূজিত তিহোঁ গৌরব আপার॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥

এই তালিকায় কেদার রায় ও নারায়ণের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার সুলতানের এই নামের দুজন Officerএর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। নারায়ণ বা নারায়ণদাস ছিলেন গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক, ভরত মল্লিক তাঁর 'চন্দ্রপ্রভা'তে বলেছেন নারায়ণের "অন্তরঙ্গ" উপাধি ছিল, বাংলার রাজাদের চিকিৎসকরাই এই উপাধি লাভ করতেন। ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যচরিতকার চূড়ামণি দাস তাঁর 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' নারায়ণদাসকে "রাজবৈদ্য" বলেছেন। নারায়ণদাসের পুত্র মুকুন্দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের চিকিৎসক ছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি চট্টগ্রাম-শাসক পরাগল খানের পিতা রাস্তি খান বারবক শাহের কর্মচারী ছিলেন। সেই নজীরে আমরা বলতে পারি, মুকুন্দের পিতা নারায়ণও সম্ভবতঃ বারবক শাহেরই চিকিৎসক ছিলেন।

তারপর কেদার রায়। কেদার রায় যে বারবক শাহেরই কর্মচারী ছিলেন, সে কথা মুল্লা তকিয়ার বয়াজ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে। মুল্লা তকিয়া লিখেছেন ত্রিহুত জয় করে সেখানে বারবক শাহ "কেদার রায়কে" তাঁর নায়েব (ফার্সী ভাষায় নায়েব শব্দের মূল অর্থ প্রতিনিধি) নিযুক্ত করলেন এবং রাজস্ব আদায় ও সীমান্ত রক্ষার ভার দিলেন।

"কেদার রায়"এর নাম বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দণ্ডবিবেকে'ও উল্লিখিত হয়েছে। বর্ধমান উপাধ্যায় বলেছেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা ভৈরব সিংহ

গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ (?)
কেদাররায়মবগচ্ছতি দারতুল্যাম্॥

কৃত্তিবাস যে বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তা উপরে দেখানো হয়েছে। তার সঙ্গে মুল্লা তকিয়া ও বর্ধমানের উক্তিকে মিলিয়ে নিলে এবং

বারবক শাহের বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণের কথা স্মরণ রাখলে—কৃত্তিবাস যে বারবক শাহেরই সভাতে গিয়েছিলেন ও তাঁরই কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। বারবক শাহের বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্যানুরাগের খবর পেয়েই কৃত্তিবাস সাতটি শ্লোক নিয়ে তাঁর সভায় গিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

কৃত্তিবাস রাজার সভাসদদের মধ্যে গন্ধর্ব রায়েরও নাম করেছেন। কায়স্থদের কুলপঞ্জীতে এক "গন্ধর্ব খান"এর নাম পাওয়া যায়, ইনি মালাধর বসুর জ্ঞাতি এবং বাংলার সুলতানের "ধনাধ্যক্ষ" ছিলেন বলে প্রকাশ। মালাধর বসু যখন বারবক শাহের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন, তখন তাঁর এই জ্ঞাতিও বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন ও তাঁরই কর্মচারী ছিলেন বলে মনে হয়। এঁকেই সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস "গন্ধর্ব রায়" বলেছেন। যাহোক এই সমস্ত বিষয় থেকেই বোঝা যায়, কৃত্তিবাস বারবক শাহের সভাতেই গিয়েছিলেন।

বারবক শাহ যে সমস্ত মুসলমান কবি ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে এতদিন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকী নামে বারবক শাহের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত কৃত একটি ফার্সী ভাষার শব্দকোষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী', কিন্তু এটি 'শরফনামা' নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। এই বইয়ে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী সুলতান বারবক শাহ সম্বন্ধে এই প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করেছেন,

"আবুল-মুজঃফর বারবক শাহ শাহ-ই-আলম (পৃথিবীপতি) হোন্ এবং তিনি তাই। জমশিদের রাজত্ব তাঁর অধীনে থাকুক এবং তা আছে। ……যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়েছেন। যারা পায়ে হেঁটে যায়, তারা হাজার হাজার ঘোড়া দানস্বরূপ পেয়েছে। এই মহান আবুল মুজঃফর, ইনি অনুগ্রহের সাগর (world of favour), যাঁর সবচেয়ে সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

এই প্রশস্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ইব্রাহিম কায়ুক ফারুকী বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন এবং তাঁর কাছে তিনি (অন্তত কয়েকটি) ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন। বারবক শাহ যে একজন শ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন, তাও এর থেকে বোঝা যায়। তিনি প্রার্থীদের বিশেষভাবে ঘোড়া দান করতেন। কৃত্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন, তাঁর সম্পর্কিত পিতৃব্য

নিশাপতি গৌড়েশ্বরের কাছে একটি ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন। এই গৌড়েশ্বর নিশ্চয়ই বারবক শাহ। কৃত্তিবাস যে বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন, এটি তার আর একটি প্রমাণ। ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী 'শরফনামা'তে তাঁর সমসাময়িক আরও কয়েকজন কবি ও পণ্ডিতের নাম করেছেন। নীচে এঁদের একটি তালিকা দেওয়া হল।

(১) আমীর জৈনুদ্দীন হর্‌উয়ি। এঁকে ফারুকী বলেছেন "রাজকবি" ("মালেকুশ শোয়ারা")।

(২) আমীর শহাবুদ্দীন হকীম কিরমানী। এঁকে ফারুকী "চিকিৎসকদের (বা জ্ঞানীদের) গর্ব" ("ইফতেখারুল হোকামা") আখ্যায় অভিহিত করেছেন। ইনিও কবি ছিলেন এবং ফরঙ্গ-ই-আমীর শহাবুদ্দীম হকীম কিরমানী নামে একখানি ফার্সী শব্দকোষ রচনা করেছিলেন।

(৩) মনশূর শিরাজী। ইনি ফার্শী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন।

(৪) মলিক য়ুসুফ বিন হামিদ। ইনি কবি ছিলেন।

(৫) সৈয়দ জলাল। ইনিও কবি ছিলেন।

(৬) সৈয়দ মুহম্মদ রুক্‌ন্। ইনিও কবি ছিলেন।

(৭) সৈয়দ হসান। ইনিও কবি ছিলেন।

এঁদের মধ্যে "রাজকবি" আখ্যায় অভিহিত আমীর জৈনুদ্দীন হর্‌উয়ি বারবক শাহের সভাকবি ছিলেন বলেই মনে হয়। অন্যদেরও বিদ্যোৎ-সাহী ও কাব্যামোদী সুলতান বারবক শাহের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

(ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর "শরফনামা"র পুঁথি ঢাকার আলীয়াহ্ মাদ্রাসা লাইব্রেরীতে আছে। এর বিবরণ করাচী থেকে প্রকাশিত 'উর্দু' নামক পত্রিকায় ১৯৫২ খ্রীঃ-র অক্টোবর মাসের সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ডঃ আবদুল করিম তাঁর Social History of the Muslims in Bengal বইয়ে এর কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন। এই বই থেকেই আমার উপরের বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে।)

আশা করি, বারবক শাহের অসামান্যতা এবং বাংলার ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্ট স্থান এখন সকলেই উপলব্ধি করবেন। বাংলার পণ্ডিত ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ করে, উৎসাহ দিয়ে তিনি সর্বকালের বাঙালীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দুজন শ্রেষ্ঠ কবি—কৃত্তিবাস ও

মালাধর বসু তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন, এটি একটি বিরাট উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করি। প্রচলিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে লেখা আছে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড় দরবার কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ সুরু হয় এবং বিভিন্ন সুলতান এই সময়ে বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিককে সংবর্ধিত করেছিলেন। কিন্তু আসলে পণ্ডিত বা কবিদের পৃষ্ঠপোষণের সবটুকুই প্রায় বারবক শাহ একা করেছেন। তাঁর আগে জলালুদ্দীনের কাছে বৃহস্পতি মিশ্রের প্রতিষ্ঠালাভ ভিন্ন গৌড়েশ্বরের কাছে কবি-পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষণ লাভের আর কোন উদাহরণ পাই না; তাঁর পরবর্তী সুলতানদের মধ্যেও হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালের দুই একটি নিদর্শন ছাড়া অন্য কোন সুলতানের এই বিষয়ে সক্রিয়তার কোন উদাহরণ পাই না। হোসেন শাহ এবং নসরৎ শাহও এ ব্যাপারে বারবক শাহের কাছে একান্তই নিষ্প্রভ।

হিন্দু-কবি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষণ থেকে বারবক শাহকে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মনে করলে ভুল হবে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন নরপতি বাংলার ইতিহাসে তো বটেই, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দুর্লভ। তিনি যেমন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফার্সী ভাষায় নিজের মুদ্রা প্রকাশ করেছেন, তেমনি হিন্দুদের ভাষা সংস্কৃতেও মুদ্রা প্রকাশ করেছেন। পাটনা কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আসকারির কাছে সম্প্রতি রুকনুদ্দীন বারবক শাহের ছয়টি নতুন মুদ্রা পরীক্ষার জন্য এসেছিল, তাদের মধ্যে একটির ভাষা আগাগোড়াই সংস্কৃত।

কিন্তু বারবক শাহের উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সবচেয়ে বড় নিদর্শন দেওয়া এখনও বাকী রয়েছে। তিনি হিন্দুদের তাঁর রাজ্যের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত হিন্দুকে তিনি বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছিলেন, নীচে তাঁদের একটি তালিকা দেওয়া হল।

(১) অনন্ত সেন

ইনি বারবক শাহের চিকিৎসক। এঁর পুত্র শিবদাস সেন চরকের দ্রব্য-গুণের বিখ্যাত টীকাকার। দ্রব্যগুণের টীকায় শিবদাস সেন স্পষ্টই বলেছেন,

তাঁর পিতা অনন্ত সেন বারবক শাহের কাছে "অন্তরঙ্গ" অর্থাৎ খাস চিকিৎসকের পদবী লাভ করেন,

যোঽন্তরঙ্গ পদবীং তুরবাপাং, চ্ছত্রমপ্যতুলকীর্ত্তিমবাপ।
গৌড়ভূমিপতিবার্ব্বকশাহাৎ, তৎসুতস্য কৃতিনঃ কৃতিরেষা॥

(২) কেদার রায়

মুল্লা তকিয়ার বয়াজ, বর্ধমান উপাধ্যায়ের দণ্ডবিবেক ও কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

ইনি বারবক শাহের একজন বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। কৃত্তিবাস যখন গৌড়েশ্বরের সভায় যান, তখন অন্য সভাসদদের সঙ্গে এঁকেও সভায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। বারবক শাহ এঁকে ত্রিহুতে তাঁর প্রতিনিধি (প্রতিশরীর) বা নায়েব নিযুক্ত করে পাঠান এবং রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। কৃত্তিবাস বোধহয় তার আগেই গৌড় রাজসভায় গিয়েছিলেন।

(৩) ভান্দসী রায়

'রিসালৎ-ই-শুহাদা' অনুসারে ইনি বারবক শাহের রাজ্যের সীমান্তে, কাঁটাদুয়ার থেকে কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে করতোয়া নদীর তীরে ঘোড়াঘাট অঞ্চলে দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনিই ইসমাইলের বিরুদ্ধে বাববক শাহের কাছে অভিযোগ করেন, যার ফলে ইসমাইলের প্রাণদণ্ড হয়। বারবক যে হিন্দু ভান্দসী রায়ের অভিযোগ অনুসারে বিচার করে মুসলমান ইসমাইলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন, এর থেকে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) বিশ্বাস রায়

ইনি রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্র। রায়মুকুটের 'পদচন্দ্রিকা'র সূচনায় তাঁর পুত্রদের সম্বন্ধে এই বর্ণনা পাওয়া যায়,

যৎপুত্রা নৃপমন্ত্রিমৌলিমণয়ো বিশ্বাসরায়াদয়ঃ
খ্যাতা দিগ্‌জয়িনামপীহ জয়িনো লোকে কবীন্দ্রাশ্চ যে।
ব্রহ্মাণ্ডামরপাদপাদিসহিতং যেঽতুস্তুলাপুরুষং
তত্তদ্‌গ্রন্থবিশেষনির্মিতকৃতঃ কৃৎস্নেষু শাস্ত্রেষু তে॥

(যাঁর বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে মুকুটমণি, দিগ্-বিজয়ী পণ্ডিত ও কবি হিসাবে যাঁরা পৃথিবীতে বিখ্যাত, যাঁরা ব্রহ্মাণ্ড, কল্পতরু এবং তুলাপুরুষ দান অনুষ্ঠান করেছেন এবং নানা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়েছেন।)

বিশ্বাস রায় রাজার অন্যতম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বলে এই শ্লোক থেকে জানা যায়। বিশ্বাস রায়ের ভ্রাতারাও যে রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন, তাও এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের নাম বা বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না। যাহোক্, 'পদচন্দ্রিকা' ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। সুতরাং বিশ্বাস রায় ও তাঁর ভ্রাতারা যে তৎকালীন গৌড়েশ্বর বারবক শাহেরই মন্ত্রী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোকটিতে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বাস রায় ও তাঁর ভ্রাতারা পণ্ডিতদের দিয়ে নানা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। এইরকম একজন পণ্ডিতের নাম জানা গেছে। ইনি মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার অর্জুন মিশ্র। অর্জুন মিশ্র তাঁর 'মোক্ষধর্মার্থদীপিকা'তে বলেছেন, তিনি গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী বিশ্বাস রায়ের অনুজ্ঞা পেয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন,

গৌড়েশ্বরমহামন্ত্রী শ্রীমদ্বিশ্বাসরায়তঃ।
লব্ধানুজ্ঞেন লিখিতা মোক্ষধর্মার্থদীপিকা॥

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশ্বাস রায়ই যে রায়মুকুটের পুত্র বিশ্বাস রায়, তার প্রমাণ কী? তারও প্রমাণ আছে। অর্জুন মিশ্রের আর একজন পৃষ্ঠপোষকের নাম সত্য খান। সত্য খান উপাধিধারী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বারবক শাহের রাজত্বকালেই বর্তমান ছিলেন, এঁর কথা এখনই আমরা বলব। সুতরাং অর্জুন মিশ্রের পৃষ্ঠপোষক বিশ্বাস রায়ও বারবক শাহেরই সমসাময়িক এবং তাঁরই মহামন্ত্রী। সুতরাং তিনি রায়মুকুটের পুত্র ভিন্ন আর কেউ হতে পারেন না।

(৫) সত্য খান বা শুভরাজ খান

এঁর প্রকৃত নাম কুলধর, জাতিতে ইনি সুবর্ণ বণিক। এঁর আজ্ঞায় গোবর্ধন নামে একজন ব্রাহ্মণ ১৩৯৫ শকাব্দ বা ১৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'পুরাণসর্বস্ব' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গোবর্ধন

বলেছেন, কুলধর গৌড়েশ্বরের কাছে প্রথমে সত্য খান এবং পরে শুভরাজ খান উপাধি লাভ করেন,

শ্রীমদ্ গৌড়মহীমহীপতিপতিপ্রাপ্তপ্রসাদোদয়ঃ
পুণ্যাৎ প্রাক্তনকর্মণোঽতিপদবী শ্রীসত্যখানাঙ্কিতা।
পশ্চাৎ শ্রীশুভরাজখানপদবী লব্ধা ধরামণ্ডলে
জীয়াদ্ধর্মধুরন্ধরঃ কুলধরো ধীরো গভীরো গুণৈঃ॥

গৌড়েশ্বর কর্তৃক বারবার এই উপাধি দান থেকে মনে হয়, কুলধর তৎকালীন গৌড়েশ্বর বারবক শাহের অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বারবক শাহ নিজে যেমন বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তেমনি তাঁর মন্ত্রী ও কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। বিশ্বাস রায় ও তাঁর ভ্রাতারা এবং শুভরাজ খান এর দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে সম্ভবত তাঁদের উপর সুলতানের প্রভাবই কার্যকরী হয়েছিল।

(৬) নারায়ণদাস

ইনিও পঞ্চদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। এঁর এক পুত্র মুকুন্দ হোসেন শাহের চিকিৎসক হন। মুকুন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরহরি সরকার এবং পুত্র রঘুনন্দন। মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন তিনজনেই চৈতন্যদেবের পার্ষদ ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে শেষোক্ত দুজন বাংলার বৈষ্ণব মহলে বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বিখ্যাত ভরত মল্লিক বলেছেন, নারায়ণদাস "অন্তরঙ্গ" পদবী অর্জন করেছিলেন। আগেকার দিনে গৌড়েশ্বরের চিকিৎসকরাই "অন্তরঙ্গ" উপাধি পেতেন। চৈতন্যচরিতকার চূড়ামণিদাস নারায়ণ দাসকে "রাজবৈদ্য" বলেছেন। নারায়ণ দাস যে বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। কৃত্তিবাস তাঁকে গৌড়েশ্বরের সভায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। সুতরাং তিনি বারবক শাহেরই "অন্তরঙ্গ" ছিলেন।

এখানে একটা কথা আছে। অনন্ত সেনও বারবক শাহের "অন্তরঙ্গ" ছিলেন। সেইজন্য নারায়ণ ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না, এমন কথা

কেউ কেউ বলতে পারেন। কিন্তু বারবক শাহের মত একজন প্রবল-প্রতাপান্বিত গৌড়েশ্বরের দুজন "অন্তরঙ্গ" বা খাস চিকিৎসক থাকা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাছাড়া প্রথমে একজন এবং পরে আর একজন ঐ পদে নিযুক্ত হতে পারেন।

(৭)-(১৪) জগদানন্দ রায়, সুনন্দ, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব রায়, তরণী, সুন্দর, শ্রীবৎস্য ও মুকুন্দ

এই নামগুলি কেবলমাত্র কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়। এঁদের সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত কেদার রায় ও নারায়ণের নামও রয়েছে। এইসব সভাসদেরা সকলেই হিন্দু বলে রাজা নিজেও হিন্দু, এই ধারণা অনেক গবেষক করেছিলেন। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই রাজা বারবক শাহ ভিন্ন আর কেউ নন। বারবক শাহ যে হিন্দুদের প্রতি কতখানি অনুকূল মনোভাব-সম্পন্ন ছিলেন, তার পরিচয় এতক্ষণ আলোচনার পরে সকলেই পেয়েছেন। কেদার রায় ও ভান্দসী রায়কে তিনি ত রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর চিকিৎসার ভারও তিনি হিন্দুদের উপরেই অর্পণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর সভা যে হিন্দু সভাসদে পরিপূর্ণ হবে, তাতে বিস্ময়ের কারণ কিছু নেই। অবশ্য কৃত্তিবাস যাঁদের নাম করেছেন, মাত্র সেই কজনই যে গৌড়েশ্বরের সভায় ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। আরও লোক যে ছিল, তাও তিনি বলেছেন। তাদের মধ্য থেকে তিনি বাছা বাছা মাত্র আট নয় জনের নাম করেছেন। এঁদের মধ্যে "কেদার খাঁ" হিন্দু না মুসলমান, তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। কেদার খাঁ= Qadar khan হতে কোন বাধা নেই। বারবক শাহের পিতা নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের ময়মনসিংহের কিওয়াজোরে প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরার জিল্কদ মাসের এক শিলালিপিতে কাদার খান নামে তাঁর এক পদস্থ রাজ কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। তিনিই ইনি হতে পারেন।

কৃত্তিবাসের উক্তি থেকে জানা যায়—এই সব সভাসদের মধ্যে জগদানন্দ রায় রাজার মহাপাত্র ছিলেন। রূপ গোস্বামী তাঁর 'পদ্যাবলী'তে এক জগদানন্দ রায়ের একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। 'পদ্যাবলী'তে গৌড়রাজ সভার বহু অমাত্য ও কর্মচারীর লেখা পদ আছে। এই কারণে মনে হয়, এই জগদানন্দ রায়ই 'পদ্যাবলী'তে ধৃত ঐ পদটির লেখক। মুকুন্দ জগদানন্দ রায়ের পুত্র, তিনি

ছিলেন রাজার পণ্ডিত। 'পদ্যাবলী'তে মুকুন্দ ভট্টাচার্যের তিনটি পদ মেলে, ইনিই বোধ হয় তিনি। মুসলমান রাজা বারবক শাহেরও যে সভাপণ্ডিত ছিল, তাতে এখন আর কারো নিশ্চয়ই বিস্ময় লাগবে না, কারণ বারবক শাহের পাণ্ডিত্য, বিদ্যোৎসাহিতা এবং সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগের বহু নিদর্শন আমরা এপর্যন্ত পেয়েছি। বারবকের পৃষ্ঠপোষিত বৃহস্পতি মিশ্রেরও অন্যতম উপাধি ছিল "রাজপণ্ডিত"। সুনন্দ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর পদ কি ছিল তা কৃত্তিবাস বলেন নি। তরণীর পদ সম্বন্ধেও তিনি নীরব। গন্ধর্ব রায় সম্ভবত কুলগ্রন্থে বর্ণিত "গৌড়েশ্বরের ধনাধ্যক্ষ" বলে অভিহিত গন্ধর্ব খানের সঙ্গে অভিন্ন। গন্ধর্ব রায়কে কৃত্তিবাস "গন্ধর্ব অবতার" বলেছেন, এর থেকে মনে হয়—গন্ধর্ব রায় অত্যন্ত সুপুরুষ ও সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। সুন্দর ও শ্রীবৎস্য ছিলেন ধর্মাধিকারিণী অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় কর্মচারী। কেদার খাঁ কী পদ অধিকার করেছিলেন তা জানা যায় না, তবে গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসের শ্লোক শুনে প্রীত হলে তিনিই কবির মাথায় চন্দনের ছড়া ঢেলেছিলেন।

বারবক শাহের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে তাঁর এইসব মুসলমান কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়ঃ—

(১) **ইকরার খান**—এঁর নাম প্রথম পাওয়া যাচ্ছে ত্রিবেণী শিলালিপিতে; তাতে এঁকে বলা হয়েছে "জমাদার ঘৈর মহলী, সর-এ-লস্কর ওয়া ওয়াজির অর্‌শহ্‌ সজলা মংখবাদ ওয়া শহর লাওবলা। অতঃপর এঁর নাম পাই প্রথম মহীসন্তোষ শিলালিপিতে। তৃতীয়বার এঁর নাম পাচ্ছি দ্বিতীয় মহীসন্তোষ শিলালিপিতে। চতুর্থবার নাম নয়, শুধু উপাধিটুকু তৃতীয় মহীসন্তোষ শিলালিপিতে পাওয়া যায়।

(২) **আজম্মল খান**—ত্রিবেণী শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায় পূর্বোক্ত ইকরার খানের "সর-এ-খৈল" হিসাবে।

(৩) **নসরৎ খান**—দ্বিতীয় মহীসন্তোষ শিলালিপিতে এঁর নাম মেলে। এঁর পরিচয়স্বরূপ তাতে বলা হয়েছে "জঙ্গদার ওয়া শিকদার মুআমলাৎ জোর বরোর ওয়া মুহল্লা-এ দীগার"।

এছাড়া বিভিন্ন শিলালিপিতে এঁদেরও নাম পাওয়া যায়।

(৪) **মরাবৎ খান**।

(৫) **খান জহান**।

গৌড় শহরের এক শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়। এর থেকে জানা যে, এই খান জহান ৮৭০ হিজরা বা ১৪৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি ফটক তৈরী করিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা তিনজন খান জহানের উল্লেখ পাই, এঁরা তিনজনে একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। প্রথম খান জহানের নাম পাওয়া যায় বাগেরহাটে প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরার এক শিলা-লিপিতে, এতে তাঁর মৃত্যুর উল্লেখ আছে। বারবক শাহের সমসাময়িক এই খান জহান দ্বিতীয় খান জহান। তৃতীয় খান জহানের নাম তারিখ-ই-ফিরিশতা ও রিয়াজ-উস্-সলাতীনে পাওয়া যায়। এই দুই বইয়ের মতে এই খান জহান ছিলেন জলালুদ্দীন ফতে শাহের উজীর। ফিরিশ্তার মতে এই খান জহান নপুংসক ছিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খান জহান এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

(৬) রাস্তি খান

চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত জোবরা গ্রামের এক মসজিদের শিলালিপিতে এঁর নাম আছে। এর থেকে জানা যায় যে, সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে ৮৭৮ হিজরার ২৫শে রমজান তারিখে "মজলিস আলা" রাস্তি খান এই মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নানা জায়গায় এই রাস্তি খানের নাম পাওয়া যায়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে তাঁর পৃষ্ঠপোষক পরাগল সম্বন্ধে বলেছেন, "রাস্তি খান তনয় বহুল গুণনিধি"। পরাগল খান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম অঞ্চলের "লস্কর" বা শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং তাঁর পিতা রাস্তি খান বারবক শাহের আমলে চট্টগ্রামে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে মনে হয়। রাস্তি খান কী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা জানা যায় তাঁর অধস্তন অষ্টম পুরুষ মুহম্মদ খানের লেখা "মক্তুল হোসেন' কাব্য থেকে। এই কাব্যে মুহম্মদ খান তাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দিয়েছেন এবং লিখেছেন যে রাস্তি খান "চাটিগ্রাম দেশপতি" ছিলেন। সুতরাং রাস্তি খান ও তাঁর পুত্র পরাগল খান উভয়েই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বা লস্কর ছিলেন। তাঁর পৌত্র ছুটি খানও বাংলার সুলতানের লস্কর ছিলেন। তিনি সম্ভবত ত্রিপুরার অধিকৃত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।

(৭) অজলকা (?) খান

এঁর নাম মেলে বারা শিলালিপিতে। তাতে এঁর পিতার নাম পাওয়া যায় বখ্‌শিশ্‌ খান এবং তাঁকে "চাখা খাস"এর "সর-ই-গুমাশ্‌তাহ্‌" বলা হয়েছে। এই "চাখা খাস" সম্ভবত ঢাকা শহরের সঙ্গে অভিন্ন।

(৮) আশরফ খান
(৯) খুর্শীদ খান
(১০) উজ্জ্বল (র) খান
(১১) মজলিস আজম
(১২) খান মজলিস আলী

শেষের দুটি নাম সম্ভবত উপাধিমাত্র।

এছাড়া 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'য় লেখা রয়েছে, বারবক শাহ এদেশে ৮০,০০০ হাব্‌শী আমদানী করেছিলেন এবং তাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা, মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারাও এই ব্যাপারে বারবক শাহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সমালোচকেরা ফিরিশ্‌তার উক্তির উপর নির্ভর করে বারবক শাহের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, "ওমরাহদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য সুলতান রুকন্‌-উদ্দীন্‌ বারবক্‌ শাহ, আফ্রিকা হইতে হাব্‌শী খোজা আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে প্রাসাদ রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।" কিন্তু বারবক শাহ যে তাঁর অমাত্যদের ক্ষমতা খর্ব করবার জন্য হাব্‌শী ক্রীতদাসদের আনিয়েছিলেন, একথা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। বরঞ্চ বারবক শাহের যে বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান অমাত্য ছিলেন, এবং রাজসভায় তাঁদের যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, সে কথা আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পারি। এসম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বারবক শাহ যে কিছু হাব্‌শীকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন, তাতে সন্দেহের কারণ নেই। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর নবম দশকে হাব্‌শীরা এত প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন যে তাঁরা বাংলার সিংহাসন অবধি দখল করেছিলেন; সুতরাং আর অন্তত দুই দশক আগে তাঁদের ক্ষমতা লাভের সূচনা হয়েছিল, এতে আশ্চর্যের কারণ নেই। বারবক শাহ হাব্‌শীদের শারীরিক পটুতার জন্য তাদেরকে উপযুক্ত বিভিন্ন পদে তাদের নিয়োগ করেছিলেন বলে মনে হয়, হিন্দু ও মুসলমান অমাত্যদের প্রাধান্য কমানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই সব হাব্‌শীরা যে ক্রমশ সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছিল, এর জন্য বারবক শাহের পরবর্তী [illegible] দায়ী। তাছাড়া সমস্ত হাব্‌শীই যে দুরাত্মা ছিল, তাও নয়। এদের মধ্যে মালিক আন্দিলের (ইনি পরবর্তীকালে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ নামে বাংলার সুলতান হয়েছিলেন) মত সৎ ও প্রভুভক্ত লোকও ছিলেন। সুতরাং হাব্‌শীদের নিয়োগকে বারবক

শাহের অদূরদর্শিতার দৃষ্টান্ত বলে যে মনে করা হয়ে থাকে, তা ঠিক নয়। বারবক শাহের রাজ্যাবসানের ১১।১২ বছর বাদে যা ঘটেছিল, তার জন্যে সেই সময়ের সুলতানই দায়ী। বারবক শাহ আসলে জাতিধর্মনির্বিশেষে বিভিন্ন কাজে দক্ষ লোক নিযুক্ত করতেন। হিন্দুরা তাঁর মন্ত্রী, অমাত্য, সভাপণ্ডিত, চিকিৎসক প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হতেন। মুল্লা তকিয়ার বয়াজ থেকে জানা যায়, ত্রিহুত অভিযানের সময় তিনি বহু আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। এই রকম তিনি যোগ্য হাব্‌শীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছিলেন।

বারবক শাহের সমস্ত মুদ্রাই "দার-উজ্‌-জরব" (টাকশাল) এবং "খজানা" (কোষাগার) থেকে বেরিয়েছিল, কোন স্থানের নাম তাদের মধ্যে লেখা নেই। তাঁর বহু শিলালিপি এপর্যন্ত পাওয়া গেছে। এগুলি এই সমস্ত স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে :—

ত্রিবেণী (হুগলী), বারা (বীরভূম), গৌড়, মহীসন্তোষ (দিনাজপুর), হাটখোলা (শ্রীহট্ট), দেওতলা (মালদহ), পেরিল (ঢাকা), মির্জাগঞ্জ (বাখরগঞ্জ), গুরাই (ময়মনসিংহ), বসিরহাট (২৪ পরগণা), জোবরা (চট্টগ্রাম)। মহীসন্তোষের একটি শিলা-লিপিতে জোর ও বারোর-এর শিকদার নসরৎ খানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বারোর বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত, এর আধুনিক নাম বারুর।

এর থেকে বোঝা যাবে, বারবক শাহের রাজ্যের আয়তন কত বিশাল ছিল। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এবং বিহারের কতকাংশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুল্লা তকিয়ার বয়াজে লেখা আছে বারবক শাহ ত্রিহুতের বুড়িগণ্ডক নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। তার মধ্যে হাজীপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি তাঁর খাস শাসনে এসেছিল, বাকী অংশ ত্রিহুতের জমিদারকে শাসন করতে দেওয়া হয়, কর দেবার সর্তে। এই ত্রিহুত অধিকার থেকে মনে হয়, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ কর্তৃক অধিকৃত ভাগলপুর অঞ্চলে বারবক শাহের অধিকার অটুটই ছিল। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা'র উক্তি বিশ্বাস করলে (এক্ষেত্রে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই) বলতে হবে, বারবক শাহের রাজত্বের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ছিল ঘোড়াঘাট। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। রিসালৎ-ই-শুহাদায়' যে "রাজা কামেশ্বরে"র উল্লেখ আছে, তিনি সত্যিই কামরূপের রাজা কিনা, সে সম্বন্ধে আমি পৃঃ ৯৫-এ সন্দেহ প্রকাশ

করেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ইনি কামরূপেরই (এবং কামতারও) রাজা ছিলেন এবং "কাম্বেশ্বর" "কামতেশ্বর" (অর্থাৎ কামতার অধিপতি) শব্দের বিকৃতি।

আরাকান দেশের ইতিহাসে লেখা আছে যে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আরাকানের রাজারা বাংলাদেশের কিছু অংশ জয় করেছিলেন। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ মেং-সোআ-মৃউন যখন বাংলার সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সাহায্যে নিজের রাজ্য ফিরে পান, তখন তিনি বাংলার রাজার সামন্তে পরিণত হন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা ও পরবর্তী রাজা মেং-খরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) শুধু যে বাংলার রাজার অধীনতা স্বীকার করেননি, তাই নয়,—তিনি রামু পর্যন্ত বাংলার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন। এই 'রামু' সম্ভবত বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত 'রামু' গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন। সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন যে রাম্বু (রামু) একটি বন্দর ; চট্টগ্রাম থেকে সেখানে যেতে চারদিন লাগে এবং এই বন্দরটি চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যপথে অবস্থিত (Studies in Mughal India, Sarkar, p. 150 দ্রষ্টব্য)। মেং-খরির পুত্র ও পরবর্তী রাজা বসোআহ্পু্য (১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) বারবক শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম শহর অধিকার করেন বলে আরাকানের ইতিহাসে লেখা আছে (Phayre, History of Burma, p. 78 এবং J. A. S. B., 1945, p. 35 দ্রষ্টব্য ।)

কিন্তু যদি এই সমস্ত কথা সত্যও হয়, তাহলেও বারবক শাহ ৮৭৮ হিজরা বা ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে চট্টগ্রাম অঞ্চল পুনরধিকার করে নিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ রাস্তি খান কর্তৃক নির্মিত চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামের মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ৮৭৮ হিজরার ২৫শে রমজান তারিখে রুকনুদ্দীন বারবক শাহই ঐ অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন।

এখন রুকনুদ্দীন বারবক শাহের চরিত্রের কয়েকটি বিশিষ্ট দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করব।

বারবক শাহের অসম্প্রদায়িক মনোভাবের কয়েকটি নিদর্শন আমরা ইতি-পূর্বেই দিয়েছি। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের আর একটি প্রমাণ এই যে অপরাধীকে শাস্তি দেবার সময় তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাত দেখাননি। এমন কি মুসলমান সাধু ও ধর্মগুরুরাও কোন অন্যায় আচরণ করলে তিনি তাঁদের কঠোর শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। আমরা আগেই দেখে এসেছি দরবেশ সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।

আরও একজন দরবেশ তাঁর হাতে অনুরূপ শাস্তি লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত সুফী দরবেশদের জীবনীগ্রন্থ 'অখ্‌বার অল-অখিয়ার'এ (রচয়িতা শেখ আবদুল হক দেহ্‌লবী) এই কাহিনীটি পাওয়া যায়।

শেখ পিয়ারার শিষ্য শাহ জলাল দকীনী একজন মস্তবড় দরবেশ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে আসেন। এখানে এসে তিনি রাজার মত সিংহাসনে উপবেশন করতেন। জনসাধারণের উপর তিনি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে গৌড়ের সুলতানের সন্দেহ হল এবং তিনি তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সুলতানের আদেশে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী গিয়ে শাহ জলাল দকীনী এবং তাঁর অনুগামীদের মাথা কেটে ফেলল।

এর পরে কিছু অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত 'খজীনৎ অল-আশফিয়া' (রচয়িতা গোলাম সারোয়ার) নামে আর একটি সুফী গ্রন্থেও এই কাহিনী পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে শাহ জলাল দকীনী ৮৮১ হিজরায় নিহত হয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ সুলতান শাহ জলাল দকীনীকে বধ করেছিলেন (অবশ্য যদি এই দুই বইয়ের বিবরণ সত্য হয়)? মুদ্রার সাক্ষ্য অনুযায়ী ৮৮১ হিজরায় শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। কিন্তু রুকনুদ্দীন বারবক শাহও যে ৮৮১ হিজরা বা ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। য়ুসুফ শাহ ধর্মগতপ্রাণ নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন বলে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য। সুতরাং য়ুসুফ শাহ শাহ জলালের মত একজন প্রতিপত্তিশালী ও মুসলমানদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন দরবেশের প্রাণবধ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা যায় না। এই কারণে মনে হয়, তাঁর পিতা বারবক শাহই শাহ জলালকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। বারবক শাহ কর্তৃক আর একজন দরবেশ ইসমাইল গাজীর প্রাণদণ্ড বিধানের উদাহরণ যখন রয়েছে, তখন এ কাজও তাঁরই বলে মনে হয়।

দরবেশদের এই প্রাণদণ্ড বিধান থেকে বারবক শাহের শুধু অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁর দৃঢ়তা ও শাসনদক্ষতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আগে অনেক ধর্মপ্রাণ সুলতানের রাজত্বকালে দরবেশরা অত্যধিক প্রাধান্য লাভ করেছিলেন, এমন কি তাঁরা দেশের শাসন ব্যাপারেও

প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বারবক শাহ তাঁদের কর্তৃত্ব করতে দেননি, উপরন্তু তাঁরা দণ্ডার্হ হলে দণ্ড দিতে ইতস্তত করেননি।

বারবক শাহ একজন প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক ছিলেন। তাঁর এমন অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির গঠন অত্যন্ত সুন্দর ও শিল্পোচিত। গৌড় নগরে যে রাজপ্রাসাদে বারবক শাহ বাস করতেন, সেটি তাঁর সৌন্দর্যরসিকতার আর একটি নিদর্শন। এই প্রাসাদটি এখন আর বর্তমান নেই, কিন্তু এর একটি শিলালিপি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালিপিটি আরবী কবিতায় লেখা। এটি বর্তমানে পেন্‌সিল্‌ভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে আছে। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ১৯৪০ সালের Ars Islamica নামক পত্রিকায় (pp. 141-147) এর পূর্ণ বিবরণ বার হয়েছিল। এই শিলালিপিতে বারবক শাহের প্রাসাদের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়, সেটি আমরা বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম।

তাঁর (বারবক শাহের) আবাস বাগানের মত, শান্ত এবং আনন্দদায়ক,
তা আনন্দ সঞ্চয় করে এবং দুঃখ বিদূরিত করে।
এর নীচ দিয়ে একটি জলধারা বয়ে যায়,
স্বর্গের নির্ঝরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে,
এর বুদ্‌বুদগুলি মুক্তোর মত, তারা ভুলিয়ে দেয় দারিদ্র্য ও বেদনা।
তার তোরণ আশ্রয় দান করে, আত্মাকে সুগন্ধ ওষধির মত (অর্থাৎ আত্মাকে সুগন্ধ ওষধির সুবাস দান করার মত)
বন্ধুদের। শত্রুদের কাছে এ (প্রাসাদ) নিষিদ্ধ এবং সুদূর।
একটি অনির্বচনীয় তোরণ, তৃপ্তিদায়ক ও স্ফূর্তিজনক। যাকে বলা হয় মধ্য তোরণ, বিশেষ প্রবেশপথ হিসাবে এটি নির্মিত
আটশো একাত্তর সালে (হিজরায়)।
জীবন, আশা এবং বিশ্রামের আবাস।

সুতরাং শিলালিপিটি ৮৭১ হিজরায় প্রাসাদটির মাঝের তোরণ নির্মাণের সময় উৎকীর্ণ হয়েছিল। Ars Islamia পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায়, শিলালিপিটির শিলা এবং লিপি দুই-ই অত্যন্ত সুন্দর ("magnificent")। এর থেকেও বারবক শাহের সৌন্দর্যরসিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' নামে পরিচিত বিরাট ও সুন্দর তোরণটি বারবক শাহই নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বারবক শাহ অন্তত ৮৬০ হিজরা বা ১৪৫৫-৫৬ খ্রীঃ থেকে তাঁর পিতার সঙ্গে যৌথ-ভাবে রাজত্ব করতে সুরু করেন এবং ৮৬৪ হিঃ বা ১৪৫৯-৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যৌথ রাজত্ব চলে। এতদিন এসম্বন্ধে বারবক শাহের ৮৬০ হিঃর ত্রিবেণী শিলালিপিই একমাত্র প্রমাণ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি রুকনুদ্দীন বারবক শাহের চারটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি ৮৬২ হিঃ বা ১৪৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত (Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol. IV, 1959, pp. 169-172 দ্রঃ)। বলা বাহুল্য ৮৬২ হিজরায় যে নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ জীবিত ছিলেন ও রাজত্ব করেছিলেন, তার অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং বারবক শাহ যে অন্তত ৮৬০-৮৬৪ হিঃ পর্যন্ত পিতার সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। পিতার অধীনে সপ্তগ্রাম অঞ্চলের শাসন কর্তার পদে নিযুক্ত থাকার সময় বারবক শাহ ত্রিবেণী শিলালিপিটি খোদাই করিয়েছিলেন বলে আগে অনেকে মত প্রকাশ করেছিলেন। এই মত যে ভ্রমাত্মক, তা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

রুকনুদ্দীন বারবক শাহ কোন্ সময়ে পরলোক গমন করেছিলেন তা বলা কঠিন। এর আগে (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ৯১) স্মার্ত গ্রন্থকার বিশারদের যে বচন উদ্ধৃত করেছি, তার থেকে জানা যায় যে তিনি ১৩৯৭ শকাব্দের মীন সংক্রান্তি অর্থাৎ ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সম্ভবত এর কিছুদিন পরে তিনি পরলোক গমন করেন।

বাংলাদেশের এই অসাধারণ নরপতি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম। বারবক শাহ—যাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল সুবিশাল, যিনি নানা রাজ্য জয় করেছিলেন, যিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন, বিদ্বান ও সাহিত্যিকদের যিনি পৃষ্ঠপোষণ করতেন, যাঁর মনোভাব ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক এবং যিনি ছিলেন একজন সত্যকার সৌন্দর্যরসিক—তাঁর সম্বন্ধে যে আমরা বিশেষ কিছু জানিনা, এ অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। বারবক শাহের মত একাধারে এতগুলি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ বাংলার আর কোন রাজার মধ্যেই দেখা যায়নি। পেন্সিল্ভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত বারবক শাহের পূর্বোক্ত শিলালিপিতে আরবী কবিতায় তাঁর যে প্রশস্তি রয়েছে (Ars Islamica, 1940, pp. 142-143 দ্রষ্টব্য), তার মধ্যে বিশেষ অতিরঞ্জন নেই। প্রশস্তিটি আমরা নীচে বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম। আশা করি, আমাদের এই দীর্ঘ

আলোচনার পরে এই প্রশস্তি সুলতানের প্রসাদপুষ্ট একজন কর্মচারীর চাটুবাক্য বলে বোধ হবে না।

শাহ সুলতান রুক্‌ন্ অল-দুনিয়া ওয়াল-দীন
আমাদের সুলতান বারবক শাহ, জ্ঞানী এবং মহীয়ান,
তাঁর পুত্র, যাঁর খ্যাতি দেশে দেশে বিস্তৃত হয়েছে
সুলতান মাহ্‌মুদ শাহ, ন্যায়পরায়ণ এবং ভদ্র।
দুই ইরাকে কি এমন মহান্‌হৃদয় সুলতান আছেন
বারবক শাহের মত? সিরিয়া এবং অল-ইয়েমেনেও কি আছেন?
না। বিধাতার সমগ্র রাজ্যে আর কেউই নেই
যিনি মহত্ত্বে তাঁর সমান। তাঁর সময়ে তিনি অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়।

শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ

পরবর্তী রাজার নাম শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ। ইনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পুত্র। আমরা আগেই দেখে এসেছি, ৮৭৮ বা ৮৮০ হিজরা থেকে অন্তত ৮৮১ হিজরা পর্যন্ত য়ুসুফ শাহ বারবক শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেছিলেন। য়ুসুফ শাহের ৮৮৫ হিঃ পর্যন্ত মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়। ৮৮৬ হিঃ থেকে সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি সুরু হয়েছে। সুতরাং য়ুসুফ শাহ যে ৮৮৫ বা ৮৮৬ হিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বুকাননের বিবরণীতে য়ুসুফ শাহকে "a very learned prince" বলা হয়েছে। ফার্সী ভাষায় লেখা ইতিহাস-গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটিতে য়ুসুফ শাহকে উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ এবং শাসনদক্ষ বলে প্রশংসা করা হয়েছে। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র ভাষায় "তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, প্রজাহিতৈষী এবং ধর্মনিষ্ঠ বাদশাহ।" কিন্তু কোন বইয়েই তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় কয়েকটি কথা পাওয়া যায়। ফিরিশ্‌তা লিখেছেন, "তিনি ছিলেন বিদ্বান, ধার্মিক এবং কৌশলী নরপতি। তিনি ভাল কাজ করতে আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ নিষিদ্ধ করতেন। তাঁর আমলে কেউ প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে বা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহস পেত না। মাঝে মাঝে তিনি প্রধান প্রধান আলিমদের তাঁর সভায় ডেকে বলতেন, 'তোমরা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে কারও পক্ষ অবলম্বন

করবে না ; করলে তোমাদের সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক থাকবে না এবং আমি তোমাদের শাস্তি দেব।' তিনি নিজে বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাই যে সমস্ত মামলায় কাজীরা ব্যর্থ হত, তাদের অধিকাংশেরই তিনি নিজে নিষ্পত্তি করতেন।"

ফিরিশ্‌তার বিবৃতি সত্য হলে বলতে হবে য়ুসুফ শাহ ছিলেন সচ্চরিত্র, আদর্শবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ ও সুদক্ষ নরপতি। উপরন্তু তিনি ছিলেন ধর্মগতপ্রাণ মুসলমান। এই শেষোক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের আদেশে তাঁর রাজত্বকালে কয়েকটি বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছিল ; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালদহের সাকোমোহন মসজিদ এবং গৌড়ের 'কদমরসুল' মসজিদ, দরাসবাড়ী জামী মসজিদ ও তাঁতীপাড়া মসজিদ। ক্রেটন ও কানিংহামের মতে গৌড়ের লোটন মসজিদ নামে চমৎকার মসজিদটি এবং চামকাটি মসজিদ শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহই নির্মাণ করিয়েছিলেন। তারপর য়ুসুফ শাহের পিতা বারবক শাহ তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের ব্যবহৃত 'খলীফৎ আল্লাহ্' উপাধিকে প্রায় বর্জনই করেছিলেন ; তাঁর কিছু মুদ্রা ভিন্ন আর কোথাও এ উপাধির কোন উল্লেখ দেখি না, তাঁর কোন শিলালিপিতেই এ উপাধি নেই। কিন্তু য়ুসুফ শাহের প্রায় সমস্ত মুদ্রা ও শিলালিপিতেই "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধিটি পুরোপুরি উল্লিখিত হয়েছে দেখতে পাই। উপরন্তু "জিল্‌-আল্লাহ্ ফি অল্‌-আলামিন্‌" প্রভৃতি প্রাচীনতর এবং বহুদিন অব্যবহৃত উপাধিও য়ুসুফ শাহ আবার ধারণ করেছেন দেখতে পাই (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 87 দ্রষ্টব্য) এই সমস্ত বিষয় থেকে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে য়ুসুফ শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন তো ছিলেনই না, উপরন্তু সে যুগের অনেক নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত পরধর্ম-বিদ্বেষী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ায় তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুর মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। সূর্য ও নারায়ণের মন্দিরকে মসজিদ ও মিনারে পরিণত করা হয়েছিল। একটি ব্রহ্মশিলা নির্মিত বিরাট সূর্যমূর্তির পিছন দিকে শিলালিপি খোদাই করা রয়েছে যে, 'খলীফৎ আল্লাহ্' সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে ৮৮২ হিজরার ১লা মহরম (১৫ই এপ্রিল, ১৪৭৭ খ্রীঃ) তারিখে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এই মসজিদই সম্ভবত বর্তমানে 'বাইশ দরওয়াজা'

নামে পরিচিত। এই মসজিদে হিন্দু মন্দিরের বহু শিলাস্তম্ভ ও অন্যান্য ধ্বংসা-বশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

জৈনুদ্দীন নামে একজন মুসলমান কবির লেখা 'রসুলবিজয়' নামে একখানি বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়েছে। এর ভণিতায় কবি জনৈক রাজা "ইছপ খান" বা "য়ুসুফ খান"-এর উল্লেখ করেছেন এবং লিখেছেন,

দানে ধর্ম হরিশ্চন্দ্র মান্য গুরু সম ইন্দ্র রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছপ খান আরতি কারণ জান বিরচিলুম পাঞ্চালি সন্ধান॥

কেউ কেউ মনে করেন এই "য়ুসুফ খান" সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ। আপাতদৃষ্টিতে এই মত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সমসাময়িক ও তাঁর পৃষ্ঠপোষণধন্য মুসলিম পণ্ডিত ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী তাঁর 'শরফ্‌নামা'তে আমীর জৈনুদ্দীন হরউয়ি নামে তাঁর সমসাময়িক একজন কবির নাম করেছেন এবং তাঁকে "মালেকুশ শোয়ারা" অর্থাৎ "রাজকবি" বলেছেন। এই "রাজকবি" উপাধি থেকে মনে হয়, আমীর জৈনুদ্দীন হরউয়ি বারবক শাহের সভাকবি ছিলেন। এঁকে এবং 'রসুল বিজয়'-রচয়িতা জৈনুদ্দীনকে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে; এমনও অনুমান করা যেতে পারে যে যখন বারবক শাহ সুলতান এবং য়ুসুফ যুবরাজ ছিলেন, সেই সময়েই বারবক শাহের সভাকবি জৈনুদ্দীন এই 'রসুলবিজয়' লিখেছিলেন, তাই তিনি "য়ুসুফ শাহ" না লিখে "য়ুসুফ খান" লিখেছেন। কিন্তু 'রসুলবিজয়' কাব্যের ভাষা এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার না করে শুধুমাত্র নাম-সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে এই কাব্যকে পঞ্চদশ শতাব্দীর রচনা বলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না। এর যেটুকু অংশের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তার ভাষা আধুনিক। উপরন্তু ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী তাঁর ফার্সী ভাষায় লেখা বইয়ে একটি সাধারণ বাংলা কাব্যের রচয়িতাকে "রাজকবি" আখ্যায় অভিহিত করতে পারেন কিনা, তাও বিবেচনার বিষয়। মোটের উপর 'রসুলবিজয়' কাব্য যত দিন না প্রকাশিত হচ্ছে, তত দিন এ সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করার উপায় নেই।

য়ুসুফ শাহের একটি ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রায় কোন স্থানের নাম পাওয়া যায় না, এগুলি সবই "খজানা" (কোষাগার) থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। একটি মুদ্রা সম্ভবত সোনারগাঁও-য়ের টাকশালে তৈরী হয়েছিল—এতে স্থানের নামটি খুব অস্পষ্টভাবে লেখা আছে। এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে—গৌড়, জাহানাবাদ (রাজশাহী), শ্রীহট্ট, ছোট পাণ্ডুয়া (হুগলী), হজরৎ পাণ্ডুয়া

(মালদহ), ঢাকা। এর মধ্যে ছোট পাণ্ডুয়ার শিলালিপিটি থেকে মনে হয়, তাঁর আমলে পশ্চিম বঙ্গে মুসলিম অধিকার আর একটু প্রসারিত হয়েছিল। অন্যান্য শিলালিপি থেকে বোঝা যায়, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের এক বৃহৎ অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে য়ুসুফ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া গেছে :—

(১) মির্শাদ খান
(২) সুফী খান
(৩) মজলিস আলা
(৪) মজলিস আজম
(৫) বহ্‌লূভী অল-অশ্‌র্‌ ওয়াল-জমান

শেষোক্ত তিনজনের নাম পাওয়া যায় না, কেবল উপাধিটুকু উল্লিখিত হয়েছে। মজলিস আলা পূর্বোল্লিখিত বারবক শাহের কর্মচারী মজলিস আলা রাস্তি খানের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন।

জলালুদ্দীন ফতে শাহ

তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা, রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন এবং স্টুয়ার্টের History of Bengal-এর মতে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের মৃত্যুর পর সিকন্দর শাহ নামে একজন রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তিনি সিংহাসনচ্যুত হন এবং ফতে শাহ নামে আর একজন রাজপুত্র রাজা হন। সিকন্দর শাহের সিংহাসনচ্যুতির কারণ সম্বন্ধে কোন কোন বই নীরব; রিয়াজের মতে সিকন্দরের মস্তিষ্ক বিকৃতির দরুণ এবং তবকাৎ, ফিরিশ্‌তা ও স্টুয়ার্টের মতে সিকন্দর শাহ রাজা হবার পক্ষে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল। কিন্তু সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। ফিরিশ্‌তার মতে সিকন্দর শাহ যেদিন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সেই দিনই সিংহাসনচ্যুত হন। 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে, "তিনি কিঞ্চিৎ উন্মাদ রোগগ্রস্ত ছিলেন। একজন্য অমাত্যেরা তাঁকে রাজ্যের গুরুভার বহনে অক্ষম বিবেচনা করে সেই দিনই (অর্থাৎ সিংহাসনে আরোহণের দিন) তাঁকে পদচ্যুত করে…ফতে শাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।" কিন্তু একথা অবিশ্বাস্য

বলে মনে হয়। কারণ অমাত্যেরা নিশ্চয়ই সিকন্দরকে আগে থেকে জানতেন। সুতরাং আগে তার পাগলামির কোন খবর পেলেন না, সিংহাসনে অভিষেকের পরমুহূর্তেই সে কথা জানলেন, এ ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হয়? তবকাৎ-ই-আকবরীর মতে সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল আধ দিন, তবকাৎ-ই-আকবরীর মতে আড়াই দিন এবং স্টুয়ার্টের মতে দু' মাস। স্টুয়ার্টের উক্তিই এক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়। কারণ যে যুবককে সুস্থ এবং শাসনক্ষম জেনে অমাত্যেরা সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, তার অক্ষমতা আবিষ্কৃত হতে কিছু সময় অন্তত অতিবাহিত হয়েছিল বলেই ধরতে হয়।

স্টুয়ার্টের উক্তিকে সত্য ধরার আর একটি কারণ, সিকন্দর শাহের সঙ্গে পরবর্তী সুলতান ফতে শাহের সম্পর্ক সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই কতকটা খাঁটি খবর দিয়েছেন। কয়েকটি গ্রন্থের মতে ফতে শাহ শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের পুত্র। কিন্তু একথা ভুল। ফতে শাহের বহু মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার থেকে জানা যায় ফতে শাহ নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের পুত্র। সিকন্দর শাহের সঙ্গে য়ুসুফ শাহের সম্পর্ক সম্বন্ধে অধিকাংশ বিবরণীতে কিছু লেখা নেই, স্টুয়ার্ট সিকন্দরকে "a youth of the royal family" বলেছেন; 'রিয়াজ'-এর মতে তিনি য়ুসুফ শাহের পুত্র এবং এই কথাই যথার্থ বলে মনে হয়। স্টুয়ার্ট ফতে শাহকে সিকন্দর শাহের "uncle" বলেছেন। সুতরাং স্টুয়ার্টের উক্তিই এক্ষেত্রে সত্যের কাছ ঘেঁসে গিয়েছে। অবশ্য ফতে শাহ য়ুসুফ শাহের খুল্লতাত। সিকন্দর য়ুসুফের পুত্র হলে ফতে শাহ সিকন্দরের খুল্লপিতামহ বা "great uncle" হন। কিন্তু ইংরেজরা অনেক সময় বাপের "uncle" কেও "uncle" বলেই অভিহিত করে। ডিকেন্সের David Copperfield উপন্যাসের নায়ক ডেভিড তার বাপের মাসী বেট্সি ট্রটউডকে সব সময় aunt বলেই উল্লেখ ও সম্বোধন করেছে।

যাহোক্, এই সিকন্দর শাহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থগুলির উক্তি ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। তাঁর কোন মুদ্রা বা শিলালিপি বা এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি, যার থেকে বলা যেতে পারে যে তিনি কিছু সময়ের জন্য রাজত্ব করেছিলেন। বুকাননের বিবরণীতে সিকন্দরের নামই নেই, সেখানে ফতে শাহকেই য়ুসুফ শাহের পরবর্তী সুলতান বলা হয়েছে। এ অবস্থায় সিকন্দর শাহ বলে একজন লোক সত্যিই য়ুসুফ শাহ ও ফতে শাহের মাঝখানে সিংহাসনে বসেছিলেন, এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় না।

সিকন্দর শাহের প্রসঙ্গের এই খানেই ইতি করে এখন তাঁর পরবর্তী সুলতান বলে অভিহিত ফতে শাহের সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক। এঁর বহু মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গেছে, তাদের থেকে দেখা যায় এঁর পুরো নাম জলালুদ্দীন আবুল মুজঃফর ফতে শাহ। এঁর মুদ্রা ও শিলালিপির আরম্ভ ৮৮৬ হিজরায় ও শেষ ৮৯২ হিজরায়। এঁর অধিকাংশ মুদ্রাতেই এঁর রাজকীয় নামের পরে "হোসেন শাহী" কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, এঁর দ্বিতীয় নাম বা জনপ্রিয় নাম ছিল 'হোসেন শাহ'। এ সম্বন্ধে ডঃ হবিবুল্লাহ্ বলেন, "Most of his coins bear, after the regnal titles, the words 'Husain Shāhī', which like the 'Badr Shāhī' of Ghiyasuddin Mahmud Shah of the Husainī dynasty, must refer to his popular name."

'তবকাৎ-ই-আকবরী' তে লেখা আছে যে ফতে শাহ বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। প্রাচীন রাজা ও সম্রাটদের প্রথা বিচক্ষণভাবে অনুসরণ করে তিনি প্রত্যেক লোককে তার অবস্থা ও মর্যাদার অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দিতেন। তাঁর সময়ে বাংলার লোকদের সামনে সুখ ও ভোগের দরজা খোলা ছিল। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'ও এই কথা আছে। 'রিয়াজ'-এ অধিকন্তু লেখা আছে, "প্রজাদের সম্পর্কে তিনি উদার নীতি অনুসরণ করে চলতেন।"

আগে যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী রচিত 'শরফ্‌নামা'র উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে একটি কবিতায় জনৈক জলালুদ্দীনের প্রশস্তি করা হয়েছে দেখতে পাই। ডঃ আবদুল করিমের Social History of the Muslims in Bengal বইয়ের ১২১ পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে, নীচে তার বাংলা অনুবাদ দিলাম। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রের সাহায্যে এই অনুবাদ করা হয়েছে।

"কী চমৎকার! স্বর্গলোকই তোমার অত্যুচ্চ প্রাসাদের চূড়া। এর ফটককে যথার্থ ই বলা যায়, 'জন্নৎ অল-মাওয়া' (চিরন্তন স্বর্গ)। বাকেলের হাত থেকে যেমন হরিণ পালিয়ে গিয়েছিল,* তেমনি তোমার শত্রুর হাত থেকে সৌভাগ্য

---

*শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র আমায় বলেছেন যে, এখানে একটি প্রচলিত গল্পের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। গল্পটি এই। বাকেল নামে একটা বোকা লোক একটা হরিণ কিনে দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছিল। রাস্তায়

চলে যাচ্ছে। ওয়ামক যেমন আজরার অঞ্চল ধারণ করেছিলেন, তেমনি তোমার উচ্চ মর্যাদা স্বর্গকে স্পর্শ করেছে। স্বর্গের দেবদূতেরা এবং আমি—আমরা প্রতি মুহূর্তে বলছি যে তুমি মহিমময় (your majesty) জলাল অল্-দীন ওয়াল্-দুনিয়া (ধর্মের ও বিশ্বের গৌরব)।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই জলাল অল্-দীন বা জলালুদ্দীন কে? ডঃ এম বি বলোথের মতে ইনি দরবেশ শাহ জলাল দকীনী। কিন্তু শাহ জলাল দকীনী গৌড়ের সুলতানদের অপ্রীতিভাজন ছিলেন, এবং সুলতানের আদেশে তাঁর মাথা কাটা যায়, সুতরাং গৌড়ের সুলতানের প্রসাদপুষ্ট ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী তাঁর প্রশস্তি কীর্তন করতে ও "তোমার শত্রুর হাত থেকে সৌভাগ্য চলে যাচ্ছে" বলতে পারেন বলে মনে হয় না। প্রশস্তিটি পড়লে বোধ হয়, এটি কোন রাজার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এই কারণে মনে হয়, এর মধ্যে উল্লিখিত জলালুদ্দীন সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহ ভিন্ন আর কেউ নন। কিন্তু 'শরফ্‌নামা'র একটি কবিতায় সমসাময়িক সুলতান হিসাবে বারবক শাহের প্রশস্তি আছে (বর্তমান গ্রন্থ, পৃঃ ১০৫ দ্রষ্টব্য) বলে তাঁর পরবর্তী আর একজন সুলতানের প্রশস্তি তার মধ্যে থাকা সম্ভব নয় বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। কিন্তু 'শরফ্‌নামা'র মত শব্দকোষ-গ্রন্থ সংকলন করতে অনেক সময় লাগবার কথা। এর অন্তর্ভুক্ত বারবক শাহের নামাঙ্কিত কবিতাটি নিশ্চয়ই তাঁর রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত বইখানাই যে বারবক শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। এটাই বেশী সম্ভব যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহের রাজত্ব কালে তাঁর নামে কবিতা লিখেছেন এবং জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে তাঁর নামেও কবিতা লিখেছেন ; 'শরফ্‌নামা' তার পরে সম্পূর্ণ হয় এবং দুটি কবিতাই তার মধ্যে স্থান পায়। সুতরাং ফারুকী যে জলালুদ্দীন ফতে শাহেরই প্রশস্তি কীর্তন করেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলা চলে।

একজন লোক জিজ্ঞাসা করল, "কত টাকায় কিনলে?" সে এক হাতের পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে জানাল পাঁচ টাকায়। তখন ঐ লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, "কত টাকায় বিক্রী করবে?" বাকেল দু হাতের দশটা আঙুল দেখিয়ে জানাল দশ টাকায়। এদিকে তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে হরিণটা ছুটে পালিয়ে গেল।

কয়েকটি বাংলা গ্রন্থে জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। এখন সে কথায় আসছি।

ফতেহাবাদ "মুলুকে"র অন্তর্ভুক্ত ফুল্লশ্রী গ্রাম (বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত) নিবাসী বিজয় গুপ্তের বিখ্যাত মনসামঙ্গল কাব্য জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালেই রচিত হয়েছিল। এই কাব্যের অধিকাংশ পুঁথিতেই এই রচনাকালসূচক শ্লোকটি পাওয়া যায়,

ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক॥

"ঋতু শূন্য বেদ শশী" অর্থাৎ ১৪০৬ শক অর্থাৎ ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য লেখা হয়েছিল। এই শ্লোকের দ্বিতীয় ছত্রের "সুলতান হোসেন সাহা" বলতে সকলেই আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে বোঝেন। কিন্তু আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ। এই কারণে কেউ কেউ এই রচনাকাল-সূচক শ্লোকটিকে জাল বলেন আবার কেউ কেউ "ঋতু শূন্য বেদ শশী"র জায়গায় "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ কল্পনা করে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালের সঙ্গে কোনরকমে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ কোন পুঁথিতেই আমরা পাইনি। অনেকে বলেন, একটি পুঁথিতে নাকি এই পাঠ পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু কেউ সে পুঁথির দর্শন পাননি। যাহোক্, "ঋতু শূন্য বেদ শশী"র জায়গায় "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ ধরার কোন প্রয়োজন নেই, শ্লোকটিকে জাল বলারও কোন কারণ নেই। "ঋতু শূন্য বেদ শশী"ই প্রকৃত পাঠ এবং এই শকে বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গল রচিত হয়েছিল। ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জলালুদ্দীন ফতে শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন; তাঁর নামান্তর বা জনপ্রিয় নাম যে হোসেন শাহ ছিল তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। অতএব "সুলতান হোসেন সাহা" বলতে বিজয়গুপ্ত তাঁকেই বুঝিয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

"ঋতু শূন্য বেদ শশী"র জায়গায় "ঋতু শশী বেদ শশী" পাঠ ধরা যে কতখানি অসার্থক, তা অন্য দিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যায়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩ খ্রীঃর নভেম্বর থেকে ১৪৯৪ খ্রীঃর জুলাইয়ের মধ্যে কোন এক সময়ে সিংহাসনে বসেন। "ঋতু শশী বেদ শশী" অর্থাৎ ১৪১৬ শক বা ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়গুপ্ত কাব্যরচনা করেছিলেন বললে স্বীকার করতে হয় যে বিজয়গুপ্ত আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের

মধ্যেই কাব্য রচনা করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যেই সুদূর বরিশাল অঞ্চলের কবির রচনায় "নৃপতি-তিলক" আখ্যায় উল্লিখিত হতে পারেন বলে বিশ্বাস করা যায় না।

"সুলতান হোসেন সাহা"র নাম উল্লেখের পরে বিজয়গুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে এই প্রশংসোক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন,

সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।

সন্ত-সিংহাসনে-অধিষ্ঠিত রাজার সম্বন্ধে কেউ এই জাতীয় প্রশংসা করতে পারেন বলে মনে হয় না, অন্তত কয়েক বছর ধরে যিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধেই এই রকম প্রশংসা করা চলে।

অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে বিজয়গুপ্ত ১৪৮৪-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন এবং তিনি যে "সুলতান হোসেন সাহা -নৃপতি-তিলক"-এর উল্লেখ করেছেন, তিনি জলালুদ্দীন ফতে শাহ।

বিজয়গুপ্ত জলালুদ্দীন ফতে শাহ সম্বন্ধে বলেছেন, "রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।" 'তবকাত-ই-আকবরী'তেও ঠিক এই কথা লেখা আছে। তাতে আছে, "তাঁর (জলালুদ্দীন ফতে শাহের) সময়ে লোকেদের সামনে ভোগ ও সুখের দরজা খোলা ছিল।" 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'ও এই কথা আছে। সুতরাং জলালুদ্দীন ফতে শাহ যে সুশাসক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলেরই হাসন-হোসেন পালায় হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের যে বর্ণনা পাই, তার থেকে মনে হয় জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে এই পালাটি এখন যেভাবে পাওয়া যাচ্ছে তা বিজয়গুপ্তের নিজের লেখা কিনা এবং এর মধ্যে যে অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তাকে বিজয়গুপ্তের সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রতিফলন বলে গ্রহণ করা যায় কিনা। কিন্তু সমগ্র পালাটির বর্ণনা এত সরল ও জীবন্ত যে এটি বিজয়গুপ্তের নিজের লেখা বলেই মনে হয় এবং তিনি এর মধ্যে নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাই লিপিবদ্ধ করেছেন বলে বোধ হয়। যা হোক্, বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে যা লেখা আছে, তা উদ্ধৃত করছি,

দক্ষিণে হোসেনহাটী গ্রামের নিকট।
তথায় যবন বসে দুই বেটা শঠ॥
হাসন হোসেন তারা দুই ভাইর নাম।
দুইজনে করে তারা বিপরীত কাম॥
কাজিয়ালী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাহি হিন্দুয়ালি রীত॥
এক বেটা হালদার তার নাম দুলা।
বড় অহঙ্কারে করে হোসেনের শালা॥
সর্বক্ষণ হোসেনের আগে আগে আসে।
তার ভয়ে হিন্দু সব পলায় তরাসে॥
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপড় চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা॥
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে॥
ব্রাহ্মণ সুজন তথায় বসে অতিশয়।
গৃহঘর তোলায় না দুর্জনের ভয়॥

এই রাজ্যের তকাই নামে একজন মোল্লা একদিন বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় প্রবল ঝড়বৃষ্টি এল। তকাই একটি কুটির দেখতে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকল। ঢুকে দেখল একদল রাখাল বালক সেখানে ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ বাজিয়ে মনসার ঘট পূজা করছে। তাই দেখে ঐ মোল্লা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে "খোদা খোদা বলি যায় ঘট ভাঙ্গিবার।" কিন্তু তা সে পারল না, তার বদলে মার খেয়ে ও অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করে অবশেষে নাকে খৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসতে হল। মোল্লা হাসন-হোসেনের কাছে কিছু বলবে না বলে শপথ করেছিল। কিন্তু শপথ ভঙ্গ করে সে তাদের সমস্ত ব্যাপার জানাল। এই খবর

শুনিয়া কুপিল কাজি চারিদিকে চায় ॥
হারামজাদা হিন্দুর হয় এতবড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান ॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটী খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা ॥
ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান (আপনজন ?) হয়।
তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয় ॥
সাজ সাজ বলিয়া কটকে পড়ে সাড়া।
ছোট বড় সাজিয়া আসিল হোসেন পাড়া ॥
যতেক যবন আছে হোসেনের পাড়া।
নগর হইতে পুরুষ আসিল মাথা মুড়া ॥

দুই ভাই অনেক সশস্ত্র মুসলমানকে একসঙ্গে জড়ো করে রাখালদের কুঁড়ে-ঘরের উপর চড়াও হল। কাজীদের মা ছিল হিন্দুর মেয়ে, ভূতপূর্ব কাজী তাকে জোর করে বিয়ে করেছিল। সে তার ছেলেদের বারণ করল, কিন্তু তারা শুনল না। কাজীদের আদেশে সৈয়দেরা "ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে সমুদ্রের জলে" এবং "কোদালে কাটিয়া ফেলে ঘর ভিটার মাটি"। তাছাড়া "মাটির গঠন ঘট কনকের চুড়া। দারুণ যবনে ঘট করিলেক গুঁড়া ॥"

রাখালরা ভয় পেয়ে বনের মধ্যে লুকিয়েছিল। কিন্তু কাজীর লোকেরা বন তোলপাড় করে তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করল। তাদের "কাজি বলে আরে বেটা ভূতের গোলাম। পীর থাকিতে কেন ভূতেরে সেলাম ॥"

এর আগে কয়েকজন গবেষক বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ঘটনাকে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্ব-কালে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচারের একটি নিদর্শন বলে গ্রহণ করে-ছিলেন। কিন্তু বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল যখন জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্ব-কালেই রচিত হয়েছিল, তখন এই ঘটনাকে তাঁরই রাজত্বকালে হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের দুর্ব্যবহারের একটি চিত্র বলে গ্রহণ করা উচিত। জলালুদ্দীন ফতে শাহের আমলে মুসলমান কাজীদের উৎকট ধর্মোন্মত্ততা ও হিন্দু-বিদ্বেষের নিদর্শন অন্য সূত্র থেকেও পাওয়া যায়। একটু বাদেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করব।

জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালের একটি বিশিষ্ট ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম। অবশ্য বলা বাহুল্য, এই ঘটনার অসামান্যত্ব কেউই তখন উপলব্ধি করতে

পারেননি। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত যবন হরিদাস তাঁর অনেক আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান হয়েও তিনি কৃষ্ণ নাম করতেন, এই "অপরাধে" তাঁকে মুসলিম রাজশক্তির হাতে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায় থেকে এই ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করছি,

ফুলিয়ারে রহিলেন প্রভু হরিদাস ॥
গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করিয়া লইয়া বুলেন সর্বস্থান ॥
কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে ॥
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার" ॥
পাপীর বচন শুনি সেই পাপমতি।
ধরি আনাইল তারে অতি শীঘ্রগতি ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালেরো নাহি ভয় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে চলিলা সেইক্ষণে।
মুলুক-পতির দ্বারে দিলা দরশনে ॥

অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম-গৌরবে দিল বসিবারে স্থান ॥
আপনে জিজ্ঞাসে তানে মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই! তোমার বিরূপ দেখি মতি ॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন ॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥
জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার ॥

না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার॥"
শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস।
"অহো বিষ্ণু-মায়া" বলি কৈল মহাহাস॥
বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর॥

শুনিঞা সন্তোষ হৈল সকল যবন।
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য-বচন॥
সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা "শাস্তি করহ ইহারে॥
এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিব অনেক।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক॥
এতেক উহার শাস্তি কর ভালমতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥"
পুন বোলে মুলুকের পতি "আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বোল তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিবা শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিবাও পাছে আর লঘু হইবা কেনে॥"
হরিদাস বোলেন "যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বই আর কেহো করিতে না পারে॥
অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ সকল॥
খণ্ড খণ্ড করি দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"
শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল "এবে কি করিবা ইহা প্রতি?"
কাজী বোলে "বাইশ বাজারে নিঞা মারি।
প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি॥

বাইশ বাজারে মারিলেই যদি জীয়ে।
তবে জানি জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে

বাজারে বাজারে সব বেঢ়ি দুষ্টগণে।
মারয়ে নির্জীব করি মহা-ক্রোধ মনে॥

কিন্তু বাইশ বাজারে প্রহার করা সত্ত্বেও হরিদাসের প্রাণ বার হল না, অবশেষে যবনদের অনুনয়ে তিনি মৃতের মত হয়ে পড়ে রইলেন। মুলুক-পতি তাঁকে কবর দিতে বললেন, কিন্তু কাজী তাঁর পরলোকের পথ রুদ্ধ করার জন্যে গঙ্গায় ফেলে দিতে বললেন। হরিদাস প্রথমে যোগবলে অনড় অটল হয়ে রইলেন, পরে যোগবল সংবরণ করে নিয়ে মুসলমানদের কাঁধে উঠলেন। তাঁকে গঙ্গায় ফেলে দেবার পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে তীরে উঠে এসে কৃষ্ণনাম করলেন। তাই দেখে মুলুকপতি এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে বললেন আর তাঁর কৃষ্ণনামে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। এই সব ব্যাপার কতখানি সত্য তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেকখানি অতিরঞ্জন আছে বলেই মনে হয়। তবে যোগবিদ্যার বলে আধুনিক কালেও কোন কোন যোগী হরিদাসের অনুরূপ কার্য অনুষ্ঠান করে দেখিয়েছেন বলে শোনা যায়।

যাহোক্, হরিদাস ঠাকুরের নির্যাতনের এই কাহিনী সকলেই জানেন। কিন্তু এই ঘটনা কোন্ সময়ে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে বোধহয় কারোই সঠিক ধারণা নেই। সকলেই মনে করেন, এই সময়ে বাংলার সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কিন্তু চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত আগে হরিদাস নির্যাতিত হয়েছিলেন। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের দশম অধ্যায়ে দেখি চৈতন্যদেব হরিদাসকে বলছেন,

পাপিষ্ঠ যবনে তোমা বড় দিল দুঃখ।
তাহা স্মঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে।
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নাম্বিলুঁ বৈকুণ্ঠ হইতে সভা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে সকল।
তুমি মনে চিন্ত তাহা সভার কুশল॥

আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনেহ তা সভারে মনে ভাল দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলেঁ না করেঁ। মুঞি বল।
তোলেঁ। চক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল॥
কাটিতে না পারেঁ। তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ। তোর মারণ দেখিয়া॥
তোহোর মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ্।
এই তার চিহ্ন আছে মিছা নাহি কঙ্॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারেঁ। সহিতে॥

এই ছত্রগুলির মধ্যে চৈতন্যদেবকে দিয়ে যে সমস্ত কথা বলানো হয়েছে, তাকে ভক্তেরা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে মনে করলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐতিহাসিক এর মধ্য থেকে এই সত্যই আবিষ্কার করবেন যে মুসলমানদের হাতে হরিদাসের নির্মম নির্যাতনের সময় চৈতন্যদেবের জন্ম হয়নি, তার সামান্য পরেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাহার পার্ষদগণ' বইয়ের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "তখন (হরিদাসের নির্যাতনের) সময় তিনি (চৈতন্যদেব) বৈকুণ্ঠে ছিলেন না। নবদ্বীপে টোলে ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াইতে-ছিলেন।" গিরিজাবাবুর এরকম ধারণার কারণ, চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায় অর্থাৎ 'শ্রীহরিদাসমহিমাবর্ণন' শীর্ষক অধ্যায়ের গোড়ার দিকে আছে, "হেন মতে বৈকুণ্ঠনায়ক নবদ্বীপে। গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন বিপ্ররূপে॥" কিন্তু বৃন্দাবনদাস স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন, "হেনকালে তথাই আইলা হরিদাস। শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥" এই বলে বৃন্দাবনদাস হরিদাসের পূর্ব-প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ হরিদাস যখন নবদ্বীপে প্রথম এসেছিলেন, সেই সময়েই চৈতন্যদেব নবদ্বীপের টোলে ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন। মুসলমানদের হাতে হরিদাসের নির্যাতন অনেক আগেকার কথা। তখন যে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়নি, তা উপরে দেখানো হয়েছে।

সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের সময়ে এবং তারও ৫।৬ বছর আগে থেকে যিনি বাংলার সুলতান ছিলেন, সেই জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালেই এই ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চৈতন্যভাগবতে হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে বারবার যে 'মুলুক-পতি'র উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি কে ? প্রথমে আমাদের দেখা দরকার 'মুলুক' শব্দের অর্থ কী? সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, "মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম।" 'মুলুক' শব্দের দ্বারা সেযুগে সমগ্র দেশ বোঝাত না, দেশের একটা বিশেষ অঞ্চল বোঝাত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখেছেন, "হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী। সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥ হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকত্তা করিয়া।" ইত্যাদি। সুতরাং বৃন্দাবনদাস 'মুলুক-পতি' অর্থে আঞ্চলিক শাসন-কর্তা বুঝিয়েছেন সন্দেহ নেই। হরিদাসের ব্যাপারে এই মুলুক-পতির ভূমিকাটি একটু বিচিত্র ধরণের। হরিদাসকে হিন্দুর আচার বর্জন করতে ও কলিমা, উচ্চারণ করতে উপদেশ দিয়ে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন, তাতে তাঁর হিন্দু-বিদ্বেষ ও ইসলামধর্ম-নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাতেই তাঁকে কাজীদের তুলনায় অনেকখানি উদার মনোভাব অবলম্বন করতে দেখতে পাই। শেষ পর্যন্ত তিনি হরিদাসের অপার্থিব মহিমা স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে ইচ্ছামত ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও দিয়েছেন।

আসল কথা—কাজীরা সচরাচর যেমন হত, জলালুদ্দীন ফতে শাহের কাজীরাও ছিল সেই প্রকৃতির। তারা ইসলাম ধর্মের আইনকানুন বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত এবং ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা দেখাত। হরি-দাস মুসলমান হয়েও হিন্দুর মত আচরণ ও হরিনাম করেন, এ ব্যাপারকে তারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলেই মনে করেছিল। (অথচ হরিদাস মুসলমান ছিলেন কিনা, তাই বিতর্কের বিষয়। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লেখা আছে যে হরিদাস আসলে হিন্দুর সন্তান এবং তাঁর পিতামাতার নাম যথাক্রমে মনোহর ও উজ্জ্বলা। অবশ্য প্রাচীনতম চৈতন্যচরিতকার মুরারি গুপ্ত তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' গ্রন্থে লিখেছেন যে হরিদাস "যবনকুলে" জন্মগ্রহণ করেছিলেন।)

কিন্তু 'মুলুক-পতি' এইসব কাজীদের মত উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন না। যদিও তিনি কাজীর নির্বন্ধে হরিদাসের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন এবং সেই চেষ্টা করতে গিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধেও কয়েকটি কথা বলেছেন, কিন্তু হরিদাসের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি ভদ্রতা রক্ষা করেছেন ও উদার মনোভাব দেখিয়েছেন। হরিদাসকে যে নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া হল, তা কাজীদেরই কথায়, তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়। হরিদাস যখন মৃতবৎ প্রতীয়মান হলেন, তখন মুলুক-

পতি তাঁকে কোন অসম্মান দেখাননি, ইসলামের রীতি অনুযায়ী কবর দিতেই বলেছেন, কাজীরাই তার বিরুদ্ধাচরণ করল। 'মুলুক-পতি'র উদার মনোভাবের চরম দৃষ্টান্ত দেখা যায় হরিদাসের মহিমা স্বীকার ও ধর্মাচরণের সুযোগ দানের মধ্যে।

কোন কোন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে চৈতন্যদেবের জন্মের উল্লেখ প্রসঙ্গে তৎকালীন গৌড়েশ্বর সম্বন্ধে দু' একটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে লেখা আছে চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত আগে নবদ্বীপে এই ঘটনা ঘটেছিল,

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥
দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥
গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ।
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিল প্রমাদ॥
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে॥
নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ধর প্রজা॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥

বিশারদ সুত সার্বভৌম ভট্টাচার্য।
স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য।
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধনুর্দ্ধর রাজা।
রত্ন সিংহাসনে সার্বভৌমে কৈল পূজা॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥
বিদ্যাবিরিঞ্চি বিদ্যারণ্য নবদ্বীপে।
ভট্টাচার্যশিরোমণি সভার সমীপে॥
নদীয়া উচ্ছন্ন হেন শুনি গৌড়েশ্বর।
রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখে মহা ঘোরতর॥
কালী খড়্গ খর্পরধারিণী দিগম্বরী।
মুণ্ডমালা গলে কাট কাট শব্দ করি॥
ধরিয়া রাজার কেশে বুকে মারে শেল।
কর্ণরন্ধ্রে নাসারন্ধ্রে ঢালে তপ্ত তেল॥
আজি তোর গঙ্গায় পেলিমু গৌড়পাট।
সবংশে কাটিমু তোর হস্তী ঘোড়া ঠাট॥
গৌড়েন্দ্র বলিল মাতা মোর দেহে থাক।
নবদ্বীপে বসাইব আজি প্রাণ রাখ॥
নাকে খত দিল রাজা তবে কালী ছাড়ে।
মূর্ছা গেল গৌড়েন্দ্র ধরণী তলে পড়ে॥
প্রভাতে কহিল স্বপ্ন রাজবিশ্বাসে।
শুনিয়া আশ্চর্য স্বপ্ন সর্বলোক ত্রাসে॥
গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু।
রাজকর নাহি সর্বলোক চাষ চষু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে।
রাজকর দণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াহ তাকে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ জত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥

নাট গীত বাস্ত বাজু প্রতি ঘরে ঘরে।
কলসে পতাকা উড়ু মন্দির উপরে॥
পুষ্পের বাজার পড়ু গন্ধের উভার।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজুক যন্ত্র জয় জয়কার॥
পূর্বে জেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী।
তার শতগুণ অধিক জেন শুনি॥
নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ।
আপন ইৎসাএ মার প্রাণে পাছে রাখ॥
দেবপূজা কর সুখে যজ্ঞ হোম দান।
হাট ঘাট মানা নাহি কর গঙ্গাস্নান॥
নবদ্বীপের প্রজাএ কি মোর অধিকার।
সত্য সত্য বলি আমি সংসারের সার॥
রাজার আজ্ঞাএ নবদ্বীপ পুন সৃষ্টি।
শরৎকালে রাত্রি শেষে হৈল পুষ্পবৃষ্টি॥
মহা মহাজন যে ছাড়িঞা ছিল গ্রাম।
নবদ্বীপে আইলা সভে পূর্ণ হৈল কাম॥

জয়ানন্দের এই বিবরণের প্রত্যক্ষ সমর্থন অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না বটে, তবে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে এর পরোক্ষ সমর্থন মেলে। চৈতন্য-ভাগবত আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু আগে

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে "হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহা তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥"

শেষ দুই ছত্র থেকে হয় হিন্দু ধর্মের প্রতি ও নবদ্বীপের হিন্দুদের প্রতি তৎকালীন সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহের পূর্ব ব্যবহার সুবিধাজনক ছিল না এবং তার কথা মনে রেখেই "পাষণ্ডী" রা এই কথা বলেছে। এই জন্য মনে

হয়, জয়ানন্দের বিবরণ মূলত সত্য এবং জয়ানন্দ-বর্ণিত ঘটনার কথা মনে করেই "পাষণ্ডী"রা এই উক্তি করেছিল।

জয়ানন্দ লিখেছেন যে পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা গৌড়েশ্বরের কাছে বলেছিল,

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব' হেন আছে।

অর্থাৎ গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে বলে প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ যে তখন সত্যিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল, তা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের একাধিক অংশ থেকে জানতে পারি। চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে সদ্যোজাত চৈতন্যদেবের রূপ এবং লগ্নে "মহারাজ লক্ষণ" দেখে তাঁর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী বলেছিলেন,

'বিপ্ররাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বোলে 'সেই বা জানিব তা পাছে'॥

আবার বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে লিখেছেন যে, যুবক অধ্যাপক চৈতন্যদেব যখন শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে বসেছিলেন, সেই সময় তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর মূর্তি দেখে

কেহো বোলে 'বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই, হেন বুঝি কখনো না নড়ে॥'

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আর একটি অংশ থেকে জয়ানন্দের বিবরণের স্পষ্টতর সমর্থন পাওয়া যায় বলে আমরা মনে করি। এখন সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু এবং নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের অন্যতম। চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের নবম অধ্যায়ে লেখা আছে যে গঙ্গাদাস পণ্ডিত একবার রাজভয়ে দেশ (সম্ভবত নবদ্বীপ) ছেড়ে পালিয়েছিলেন। চৈতন্যভাগবতের মতে নবদ্বীপলীলার সময় মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ঐশ্বর্য ভাব প্রকাশ করেছিলেন, সেই সময়েই তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে এই অতীত কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র উক্তি আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি,

গঙ্গাদাসে দেখি বোলে, তোর মনে জাগে।
রাজ-ভয়ে পলাইস্ যবে নিশাভাগে॥

সর্ব-পরিকর সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথায় নাহিক নৌকা পড়িলা সঙ্কটে॥
রাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
মোর আগে যবনে স্পর্শবে পরিবার।
গাঙ্গে প্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
তবে নৌকা দেখি তুমি সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা॥
আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার।
জাতি প্রাণ ধন দেহ সকলি তোমার॥
রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা এক যোড় বস্ত্র সে তোমার॥
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাও আরবার॥

উদ্ধৃত অংশে বলা হয়েছে যে চৈতন্যদেব সে সময় বৈকুণ্ঠে ছিলেন এবং গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বিপদের সময় তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এসে মাঝির মূর্তি ধরে গঙ্গাদাসকে নির্বিঘ্নে গঙ্গা পার করিয়ে দিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে গিয়েছিলেন। সুতরাং গঙ্গাদাসের রাজভয়ে দেশত্যাগ চৈতন্যদেবের জন্মের আগে ঘটেছিল সন্দেহ নেই (বলা বাহুল্য আসলে সাধারণ একজন মাঝিই গঙ্গাদাসকে গঙ্গা পার করিয়ে দিয়েছিল)। যে সময় জলালুদ্দীন ফতে শাহের আদেশে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর ব্যাপকভাবে এই ধরণের অত্যাচার করা হয়েছিল বলে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লেখা আছে, তার সঙ্গে এই ঘটনার সময় প্রায় মিলে যায়। জয়ানন্দ গৌড়েশ্বরের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন, বৃন্দাবনদাস তারই একটি অংশ উপরে উদ্ধৃত বিবরণের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন বলে মনে হয়।

সুতরাং জয়ানন্দের উল্লিখিত বিবরণ মোটামুটিভাবে সত্য বলেই মনে হয়। অবশ্য বলা বাহুল্য, ঐ বর্ণনা আক্ষরিকভাবে সত্য হতে পারে না। কারণ কোন মুসলমান গৌড়েশ্বর নবদ্বীপের হিন্দুদের ঢালাও হুকুম দিতে পারেন না যে,

নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ।
আপন ইংসাএ (ইচ্ছায়) মার প্রাণে পাছে রাখ॥

এর মধ্যে উল্লিখিত আরও কোন কোন বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। এতে বলা হয়েছে এই সঙ্কটের সময়েই (বাসুদেব) সার্বভৌম বাংলাদেশ ছেড়ে উৎকলে চলে যান এবং উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র তাঁকে বরণ করে নেন। কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছিল চৈতন্যদেবের জন্মের আগে আর উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের জন্মের ১১ বছর পরে, ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অবশ্য সার্বভৌমের উৎকলে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপরুদ্রের কাছে সংবর্ধনা লাভ ঘটেছিল, একথা বলা জয়ানন্দের অভিপ্রেত নাও হতে পারে। এছাড়া কোন কোন পণ্ডিত প্রশ্ন তুলেছেন যে, সার্বভৌমের উপর যদি রাজরোষ গিয়ে পড়ল, তাহলে তাঁর ভাই তার থেকে অব্যাহতি পেলেন কেমন করে ? সার্বভৌম উড়িষ্যায় চলে যাবার পরেও তাঁর ভাই বিদ্যাবাচস্পতি বাংলাদেশেই থেকে গিয়েছিলেন। জয়ানন্দ নিজেই লিখেছেন, "তাঁর ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়ে বসি"। এ সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং আলোচ্য বিবরণে উল্লিখিত সার্বভৌমের রাজভয়ে দেশত্যাগের প্রসঙ্গটির ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত নয়। গৌড়েশ্বরকে কালী দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে ভয় দেখিয়েছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ভীত হয়ে অত্যাচার বন্ধ করেছিলেন— এই কথা কবিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ সমস্ত বিষয় বাদ দিলে যেটুকু থাকে, তা বাস্তব ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর মুসলমানদের যে ধরণের অত্যাচারের কথা জয়ানন্দ লিখেছেন, জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে রচিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালাতেও সেই ধরণের অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়। গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে বলে লোকে বলাবলি করছে, এ খবর গৌড়ের সুলতানের কানে নিশ্চয়ই উঠেছিল। চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু আগেই নবদ্বীপ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে গড়ে ওঠে এবং এখানকার ব্রাহ্মণেরা সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধি অর্জন করেন। বাইরের থেকেও অনেক ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে আসতে থাকেন। এই সব ব্যাপার দেখে গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি ঐশ্বর্যবান ব্রাহ্মণ এক জায়গায় মিলে হয়তো গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রবাদ সার্থক করে তোলার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ভাবা খুব স্বাভাবিক। এর কয়েক দশক আগে বাংলাদেশে রাজা গণেশের অভ্যুত্থান

হয়েছিল। দ্বিতীয় কোন হিন্দু অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় পরবর্তী গৌড়েশ্বররা নিশ্চয়ই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। সুতরাং এক শ্রেণীর মুসলমানের উস্কানিতে তৎকালীন গৌড়েশ্বর জলালুদ্দীন ফতে শাহ নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অত্যাচার বন্ধ করে নবদ্বীপের ক্ষতিপূরণ করেছিলেন, একথা সত্য বলেই আমি মনে করি।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (সাহিত্য-পরিষদ-সংস্করণ, নদীয়া খণ্ড, পৃঃ ১৯) লেখা আছে যে চৈতন্যদেব যখন শিশু, তখন একবার ছেলেধরা রাজার দূতেরা তাঁকে ধরতে এসেছিল, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপরন্তু সর্পাঘাতে এইসব রাজদূতের মৃত্যু হয়। জয়ানন্দ লিখেছেন,

রাত্রি দিনে গৌরচন্দ্র নদীয়া নগরে।
বালক্রীড়া করি বুলে সভার মন্দিরে॥
ছালিআ ধরা রাজার দূত দেখি আচম্বিতে।
পথে দিশা না পাইঞা কান্দিতে কান্দিতে॥
অন্ধকূপে পড়িঞা রহিলা দূতের ডরে।
চাহিঞা বুলে দূত সব প্রতি ঘরে ঘরে॥
উদ্দেশ পাইঞা দূত ধরিয়া আনিল।
কূপে হৈতে মহাসর্প দূতেরে খাইল॥
সর্পাঘাতে রাজদূত মইল রাজপথে।
ঘরে আসি হাসে নাচে গৌর জগন্নাথে॥

এই ঘটনা যদি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে চৈতন্যদেবের দেড় থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে অর্থাৎ ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঘটেছিল। ঐ কয় বছরের মধ্যে অনেকজন রাজা পর পর সিংহাসনে বসেছিলেন, সুতরাং কোন্ রাজার দূত শিশু গৌরাঙ্গকে চুরি করতে এসেছিল, তা বলার বর্তমানে কোন উপায় নেই। কিন্তু রাজদূতেরা একটি অবোধ শিশুকে কেন হরণ করতে আসবে, তার কোন ব্যাখ্যা জয়ানন্দ দেননি। কোন ধর্মোন্মাদ সুলতান কি তখন হিন্দু বালকদের অপহরণ করিয়ে মুসলমান করছিলেন? অবশ্য এই শিশু হরণের পিছনে আরও একটি কারণ থাকতে পারে। পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, সে সময় একদল লোক "হীদেন" (হিন্দু) বালকদের অপহরণ করে "মুরিশ" (মুসলমান) বণিকদের কাছে বিক্রয় করত, তারপর সেইসব হতভাগ্য বালকদের

খোজা করা হত। জয়ানন্দের এই বিবরণ পড়ে মনে হয়, সে সময় কোন কোন সুলতানও হিন্দু বালকদের অপহরণ করিয়ে খোজা বানাতেন, ভবিষ্যতে নিজের কাজে তাদের লাগাবার জন্যে। অবশ্য জয়ানন্দের উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। অন্যত্র (উত্তর খণ্ড, পৃঃ ১৪৭) জয়ানন্দ লিখেছেন,

রাজার মানুষ আসি ধরি লৈঞা জাএ।
হরি বোলাইঞা প্রভু তাহারে কান্দাএ॥

এখানে আবার তিনি একটু ভিন্ন রকমের কথা বললেন ; শিশু নিমাই শুধু ছেলেধরা রাজদূতদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেননি, তাদের হরি বলিয়ে কাঁদিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই উক্তি আরো অবিশ্বাস্য।

ইতিপূর্বে আমরা 'চৈতন্যভাগবতে'র কয়েকটি বিবরণের উল্লেখ করেছি। এগুলি থেকে জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে দেশের, বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের কীরকম অবস্থা ছিল, সে সম্বন্ধে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত থেকে জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালের আরও কয়েকটি ঘটনার কথা জানা যায়। আদিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবন-দাস গৌরাঙ্গের নামকরণের এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন,

বোলেন বিপ্রাব সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥
অতএব ইহার শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।

এখানে গৌরাঙ্গের 'বিশ্বম্ভর' নাম হওয়ার যে কারণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যে জালালুদ্দীন ফতে শাহের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেই তথ্য এখানে পাচ্ছি।

হরিদাস ঠাকুর মুসলমান রাজকর্মচারীদের হাতে নির্যাতিত হবার পর যখন ফুলিয়ায় ফিরে গিয়ে সংকীর্তন সুরু করেছিলেন, তখন সেখানকার ব্রাহ্মণেরাও

তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তাই দেখে "পাষণ্ড" লোকেরা এই কথা বলেছিল বলে বৃন্দাবনদাস আদিখণ্ড ১১শ অধ্যায়ে লিখেছেন,

এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা হৈতে হইব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥

কেহো বোলে যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥

এর থেকে বোঝা যায়, সে সময় লোকে সর্বদা দুর্ভিক্ষের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষই সম্ভবত তাদের মনে এই আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল।

চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ডের একাদশ অধ্যায়েই বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে 'মুলুক-পতি'র আদেশে যখন হরিদাসকে বন্দিশালায় প্রেরণ করা হয়, তখন অনেক বড় বড় লোক কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন এবং হরিদাস তাদের মধ্যে আসছেন শুনে তাঁরা খুব খুশী হয়েছিলেন,

বড় বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিয়া অন্তরে॥

এইসব "বড় বড় লোক"রা যে রাজা-জমিদারের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন, তা এর অব্যবহিত পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায়। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন যে হরিদাস এই সমস্ত বন্দীদের আশীর্বাদ করার সময় বললেন,

এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সভে মিলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি—নাহি প্রজার পীড়ন।
কৃষ্ণ বলি কাকুর্বাদে করহ চিন্তন॥
আর বার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্তিলে।
সভে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট মেলে॥

এর থেকে বোঝা যায়, জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে অনেক ধনী হিন্দু ভূস্বামীকে কোন কোন সময় কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হত। কিন্তু কেন? অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদকুলী খাঁ হিন্দু জমিদারদের খাজনা বাকী পড়লে তাঁদের কারাগারে আবদ্ধ করতেন এবং নানারকম দুর্ব্যবহার করতেন। জলালুদ্দীন

ফতে শাহের এই আচরণের পিছনেও কি অনুরূপ কারণ বর্তমান ছিল? না এটা নিছক হিন্দু-বিদ্বেষের ফল? বর্তমানে এইসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যাবে না।

জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালের যে সমস্ত ঘটনার কথা জানা যায়, সেগুলি আমরা উল্লেখ করলাম। এদের থেকে রাজা হিসাবে তিনি কীরকম ছিলেন, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। হিন্দু প্রজাদের উপর তিনি অন্তত কয়েকবার অত্যাচার করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের মত তিনিও হিন্দু-বিদ্বেষ হতে মুক্ত হতে পারেননি। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ যে উদার অসাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা এই দুজন সুলতান অনুসরণ করেননি। সেই হিসাবে জলালুদ্দীন ফতে শাহকে প্রশংসা করা যায় না। তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, এটাও তাঁর পক্ষে অগৌরবের বিষয়। কিন্তু মোটের উপর জলালুদ্দীন ফতে শাহ সুশাসক ছিলেন এবং শাসন দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ও নানা জনহিতকর কাজ করে জনসাধারণের মনে রেখাপাত করেছিলেন, সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্তের উক্তি এবং 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র বিবরণ পড়ে এই কথাই মনে হয়। জলালুদ্দীন ফতে শাহের অধীনস্থ কর্মচারী এবং আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের মধ্যে যে উৎকট সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রাধান্য লাভ করেছিল, বিজয়গুপ্ত, বৃন্দাবনদাস এবং জয়ানন্দের বিবরণ পড়লে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য এঁদের মধ্যেও যে ভদ্র এবং উদার প্রকৃতির লোকের অভাব ছিল না, হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গে উল্লিখিত 'মুলুক-পতি'ই তার দৃষ্টান্ত।

যাহোক, এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, জলালুদ্দীন ফতে শাহ জবরদস্ত প্রকৃতির রাজা ছিলেন। বৃন্দাবনদাস যে তাঁকে "মহা তীব্র নরপতি" বলেছেন, তা অযথার্থ নয়। কেউ অন্যায় করলেই তিনি কঠোর হাতে তাকে শাস্তি দিতেন এবং এই কঠোর আচরণের ফলেই তাঁকে অকালে রাজ্য ও প্রাণ দুইই হারাতে হয়। নীচে তাঁর সেই করুণ পরিণতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হল। এই বিবরণ পড়লে মনে হয়, জলালুদ্দীন ফতে শাহের চরিত্রে বলিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু তিনি কৌশলী ছিলেন না। তাই দুর্বিনীত কর্মচারীদের তিনি বশে রাখতে পারেন নি।

এই সময়ে হাব্‌শীদের প্রতিপত্তি খুবই বেড়েছিল। রাজধানী, রাজপ্রাসাদ সর্বত্রই তারা মারাত্মক রকমের প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল। তারা অনেক সময়

রাজার আদেশও মানত না। ফিরিশতা লিখেছেন, ফতে শাহ খোজা ও হাব্‌শী ক্রীতদাসদের সংশোধন করেছিলেন। তাদের মধ্যে যারা সুলতানের আদেশ অমান্য করত, ফতে শাহ তাদের উপরে কঠোর হাতে "ন্যায়ের চাবুক" প্রয়োগ করতেন। এইভাবে তিনি বারবক শাহ ও য়ুসুফ শাহের আমলে হাব্‌শীরা যে প্রতিপত্তি লাভ করেছিল, তা খানিকটা কমালেন। যাদের তিনি শাস্তি দিতেন, তারা প্রাসাদের প্রধান খোজা এবং প্রাসাদরক্ষী পাইকদের সর্দার সুলতান শাহজাদার (নামান্তর খওয়াজা সেরা বা বারবক) সঙ্গে মিলে রাজার বিরুদ্ধে দল পাকাত। এই ব্যক্তির হাতে সমস্ত রাজপ্রাসাদের সব চাবি ছিল।

এর পরের ঘটনা সম্বন্ধে তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশতা, রিয়াজ-উস্-সলাতীন—সব গ্রন্থই একমত। নীচে 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র বর্ণনা উদ্ধৃত হল।

"বাংলাদেশে একটি প্রথা ছিল এই যে প্রতি রাত্রিতে পাঁচ হাজার পাইক (রাজাকে) পাহারা দিত। অতি প্রত্যূষে বাদশাহ বেরিয়ে এসে মুহূর্তকাল সিংহাসনে বসে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করতেন এবং চলে যাবার অনুমতি দিতেন। তখন আর একদল পাইক হাজিরা দিতে আসত। একদিন ফতে শাহের প্রধান খোজা পাইকদের টাকা দিয়ে লুব্ধ করল এবং (তার ফলে) তারা সুলতানকে হত্যা করল। পরের দিন প্রত্যূষে ঐ খোজা নিজেই সিংহাসনে বসে পাইকদের অভিবাদন গ্রহণ করল।"

অন্যান্য বইগুলিতেও এই কথাই লেখা আছে। পূর্বোক্ত খওয়াজা সেরা ওরফে বারবক ওরফে সুলতান শাহজাদাই জলালুদ্দীন ফতে শাহকে হত্যা করে রাজা হয়ে বসে। ফিরিশ্‌তা লিখেছেন যে এই সময় ফতে শাহের উজীর খোজা খান জহান এবং আমীর-উল-উমারা (প্রধান অমাত্য) মালিক আন্দিল রাজধানীতে ছিলেন না, তাঁরা সীমান্ত অঞ্চলের রায়দের (হিন্দু জমিদারদের) শাস্তি দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন; তার ফলে খওয়াজা সেরা সুলতানকে হত্যা করতে পেরেছিল।

জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজ্যের আয়তন বেশ বিশাল ছিল। শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর দক্ষতা এর থেকে খানিকটা বোঝা যায়। তাঁর যে সমস্ত মুদ্রা এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের অধিকাংশের মধ্যে "কোষাগার" ও "টাকশাল" ভিন্ন আর কোন নির্মাণস্থানের উল্লেখ নেই, কেবল কয়েকটি মুদ্রায় ফতেহাবাদ

এবং একটি মুদ্রায় মুহম্মদাবাদের নাম পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে :—

খোন্দকারতলা (ঢাকা), ধামরাই (ঢাকা), দেবীকোট (দিনাজপুর), রামপাল (ঢাকা), মগরাপাড়া (ঢাকা), গৌড়, মেহদীপুর (মালদহ), সাতগাঁও (হুগলী)।

জলালুদ্দীন ফতে শাহের সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর দেশের চতুঃসীমার এই বর্ণনা দিয়েছেন,

মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর ॥

এই অঞ্চল জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজ্যভুক্ত ছিল। ফতেহাবাদের টাকশালে জলালুদ্দীন ফতে শাহের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল, এ কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সুতরাং উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জলালুদ্দীন ফতে শাহের এইসব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় :—

(১) সৈয়দ দস্তুর
(২) দৌলৎ খান
(৩) মজলিস নুর
(৪) মালিক কাফুর
(৫) আখন্দ শের

জলালুদ্দীন ফতে শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে মাহমুদ শাহী বংশের রাজত্ব শেষ হল। অনেকের মতে পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহও এই বংশের লোক, কিন্তু তিনি শুধু নামেই রাজা ছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে মাহমুদ শাহী বংশের নাম উজ্জ্বল অক্ষরেই লেখা থাকবে। এই বংশের রাজারা ইলিয়াস শাহী বংশোদ্ভব কিনা জানি না, তবে পূর্ববর্তী ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সঙ্গে এঁদের সব বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। আগেকার ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা বাংলাদেশকে মনে-প্রাণে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই বংশের রাজারা এদেশের সন্তান বলেই গণ্য হবেন। কারণ যে সময় রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরেরা ইলিয়াস শাহী বংশকে ক্ষমতাচ্যুত

করে বাংলাদেশ শাসন করছিলেন, সে সময় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ বাংলার জনসাধারণের মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একটি কিংবদন্তীর মতে বাংলার নিভৃত পল্লীতে কৃষিকার্য করে জীবিকানির্বাহ করছিলেন। সিংহাসন অধিকার করে এই বংশের রাজারা শাসনকার্যে সহযোগিতা করার জন্য এই দেশেরই লোকদের আহ্বান করলেন—সম্প্রদায়-নির্বিশেষে। এই বংশেরই একজন রাজা বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণের আদর্শ স্থাপন করলেন—বিধর্মী পণ্ডিতেরাও তাঁর আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হল না। এই বংশের চারজন রাজাই (সিকন্দর শাহকে হিসাবের মধ্যে ধরছি না)—নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ ও জলালুদ্দীন ফতে শাহ—অত্যন্ত সুযোগ্য রাজা ছিলেন। শেষ দুজন রাজা সময় সময় হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিলেন, কিন্তু মোটের উপর এঁরা সুশাসক হিসাবেই সুনাম অর্জন করেছিলেন। আমার বিশ্বাস, যদি কোনদিন এই রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহলে অনেক গৌরবময় ও মনোহর ঘটনা বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করবে

চতুর্থ অধ্যায়

হাব্‌শী রাজত্ব

অবতরণিকা

বাংলার হাব্‌শী সুলতানদের রাজত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই মনে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা আছে। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট তথ্য হয় তো অনেকেরই জানা নেই, কিন্তু হাব্‌শী আমল যে অরাজকতা ও নৃশংসতায় পরিপূর্ণ এবং হাব্‌শী রাজারা যে নিতান্ত অযোগ্য, স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলেন, সে সম্বন্ধে কি পেশাদার ঐতিহাসিক, কি অন্যান্য শিক্ষিত লোক, কারও মধ্যে দ্বিমত দেখা যায় না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ইলিয়াস শাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা বিলুপ্ত হইবার পূর্বেই হাব্‌শী খোজার দল অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। ইলিয়াসশাহী ধারা অদৃশ্য হইবার সময়েই এই সমস্ত অর্ধ-বর্বর খোজার দল প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাইয়াছিল।"

অসিতবাবুর পক্ষে এরকম লেখা অসঙ্গত হয় নি। পেশাদার ঐতিহাসিকদের লেখা পড়ে তাঁর মনে যে ধারণা হয়েছে তাই তিনি লিখেছেন। আমি দোষ দেব সেই সব পেশাদার ঐতিহাসিকদের, যাঁরা সমস্ত তথ্য প্রমাণ খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ না করে নিতান্ত কতকগুলি গাল-গল্পের উপর নির্ভর করে হাব্‌শীদের রাজত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়টি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার উপরে নিজেদের উত্তপ্ত ধিক্কারবাণী বর্ষণ করে সাধারণ পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছেন।

প্রথমে কুশাসনের প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা "হাব্‌শী রাজা" হিসাবে চারজন রাজার নাম উল্লেখ করেন। এঁরা সকলে মিলে মোট ছয় বছর রাজত্ব করেছিলেন। এর মধ্যে তিন বছর রাজত্ব করেন সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ—যিনি বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম, ঐতিহাসিকেরা তাঁর মহত্ব, যোগ্যতা, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এক বছর রাজত্ব করেন নাসিরুদ্দীন মাহমূদ শাহ। ইনি হাব্‌শী ছিলেন কিনা তা বিতর্কের বিষয় এবং এঁর রাজত্বকালেও কোন কুশাসন হয়েছিল বলে কোথাও লেখা নেই। কুশাসনের যা কিছু অভিযোগ তা অপর দুজন রাজার সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ—এঁরা হলেন চারজনের মধ্যে প্রথম রাজা "সুলতান শাহজাদা"

এবং শেষ রাজা শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহ। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে পরবর্তীকালের বইগুলিতে যা লেখা আছে, তা যে সবটা সত্য নয়, তা পরে দেখাচ্ছি। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই দুজন "কুশাসক" সুলতানের মিলিত রাজত্বকাল দু'বছরও নয়। আর এদের মধ্যে প্রথমজন যে হাব্‌শী ছিলেন, তা বলার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আধুনিক যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক হাব্‌শী সুলতানদের সমালোচনা করতে গিয়ে এমন কতকগুলি কথা লিখেছেন, যা নিতান্তই বিদ্বেষ-প্রণোদিত উক্তি এবং যুক্তি বিচারের ধোপে টেঁকে না। যেমন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আহ্‌মদ্ শাহ্‌কে হত্যা করিয়া ক্রীতদাস নাসির্ খাঁ যখন তাহার কলুষিত পাদ-স্পর্শে পবিত্র গৌড়-সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিল, তখন গৌড়রাষ্ট্রের আভিজাত্যাভিমানী ওম্‌রাহ্‌গণ ও আহ্‌মদ্ শাহের প্রভুভক্ত সেনানিগণ, সেই দিবসই তাহার রক্তে গৌড়-সিংহাসনের কলঙ্ককালিমা ধৌত করিয়াছিলেন। কিন্তু আহ্‌মদ্ শাহের হত্যার অর্ধশতাব্দী পরে ইলিয়াস শাহের বংশের শেষ সুলতান্ জলাল-উদ্দীন ফতে শাহ্ অপর একজন ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হইলে, গৌড়রাজ্যে কেহ তাহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে ভরসা করেন নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে, হিন্দু ও মুসলমান ওম্‌রাহ্ এবং সেনাপতিগণ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং রাজানুগ্রহাভাবে তাঁহারা ক্রমশঃ রাজপ্রাসাদ অথবা রাজধানী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" রাখালদাসের এই উক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আছে—(১) আহ্‌মদ্ শাহের হত্যাকারী নাসির খাঁ ওম্‌রাহদের হাতে (রাখালদাসবাবুর "সেই দিবসই" কথাটি একেবারে ভুল) প্রাণ হারিয়েছিলেন না নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ নাম নিয়ে ২৪।২৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। (২) জলালুদ্দীন ফতে শাহের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কেউ হাত তুলতে সাহস পায় নি, এ কথা মোটেই সত্য নয়; ফতে শাহের অমাত্য মালিক আন্দিল কয়েকমাসের মধ্যেই এই [illegible]কে বধ করেছিলেন। (৩) রাখালদাসবাবু বারবার "ক্রীতদাস" শব্দটির উপরে এত জোর দিচ্ছেন কেন? অতীতে যে ক্রীতদাস ছিল, সেও একদিন সুলতান হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতে পারে, তা কুৎবুদ্দীন আইবক, ইলতুৎমিশ এবং বলবনের দৃষ্টান্ত থেকেই তো দেখতে পাওয়া যায়। জৌনপুরের শর্কী বংশের প্রতিষ্ঠাতারাও সম্ভবত প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। (৪) এই নতুন নবাবিকারীরা

হাব্‌শী বলেই যে অযোগ্য হবেন, তা মনে করার কী কারণ আছে? হাব্‌শীদের মধ্যেও তো মালিক আন্দিলের মত মহানুভব লোক এবং আরও অনেক প্রভুভক্ত লোক ছিলেন।

যা হোক্, এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাব্‌শী সুলতান বলতে কাদের বুঝব? জলালুদ্দীন ফতে শাহের পরে এই চারজন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলে ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে :—

(১) **বারবক বা খওয়াজা সেরা বা "সুলতান শাহজাদা"।**

(২) **ফিরোজ শাহ।**

(৩) **মাহ্‌মুদ শাহ।**

(৪) **মুজঃফর শাহ।**

আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই চারজন সুলতানকেই "বাংলার হাব্‌শী সুলতান" আখ্যায় অভিহিত করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সুলতান নিঃসন্দেহে হাব্‌শী ছিলেন। প্রথম ও তৃতীয় জন যে হাব্‌শী ছিলেন, তা জোর করে বলা যায় না। এই চারজন সুলতানের মধ্যে শেষ তিনজনের অনেক মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়, প্রথম জনের কিছুই পাওয়া যায় না। যাহোক্, এখন এঁদের সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক্।

বারবক বা সুলতান শাহজাদা

বারবক সম্বন্ধে তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা এবং রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন-এ অনেকখানি বিবরণ পাওয়া যায়। মাসির-এর বিবরণ সংক্ষিপ্ত, নীচে আমরা তা উদ্ধৃত করলাম।

"খওয়াজা সেরা বারবক শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রভুকে হত্যা করে রাজা হয়। যেখানেই সে নপুংসক দেখত, তাদের দলভুক্ত করত। নিম্নস্তরের এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকদের উপর সে দাক্ষিণ্যবর্ষণ করত। তার শক্তি দিন দিন বাড়তে লাগল। অবশেষে সমস্ত আমীরেরা একত্র মিলিত হলেন এবং নায়েকদের ('মাসির'-এ 'পাইক' অর্থে 'নায়েক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) ঘুস দিয়ে তাকে (বারবককে) হত্যা করলেন।"

তবকাৎ-ই-আকবরীতেও এই কথা আছে, কেবল আমীররা নায়েক বা পাইকদের ঘুস দিয়ে বারবককে হত্যা করে ছিলেন, একথা লেখা নেই, সেখানে

শুধু বলা হয়েছে অমাত্যেরা একত্র হয়ে বারবককে বধ করেছিলেন। সুতরাং জলালুদ্দীন ফতে শাহের অমাত্যেরা তাঁর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে আঙুল তোলেননি, রাখালদাসবাবুর এই অভিযোগ অমূলক।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় সুলতান শাহজাদা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়। তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল,

রাজাকে বধ করে খোজা (বারবক) সুলতান শাহজাদা উপাধি নিল এবং চারিদিক থেকে খোজাদের, নীচ প্রকৃতির লোকদের এবং বেপরোয়া ভাগ্যান্বেষী-দের এনে জড়ো করল। রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও রাজপুরুষেরা কিন্তু এই অভদ্র নীচ লোকটাকে বিতাড়িত করতে মনস্থ করলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রধান অমাত্য হাবশী মালিক আন্দিল, ইনি এই সময়ে সীমান্তে ছিলেন। ইনি সুলতান শাহজাদাকে শাস্তি দেবার এবং নিরাপদে রাজধানীতে পৌঁছোবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় খোজা তাঁকে ডেকে পাঠালো; তার উদ্দেশ্য, মালিক আন্দিলকে বন্দী করে বধ করা। মালিক আন্দিল কিন্তু একে সৌভাগ্য বলেই মনে করলেন, কারণ এতে নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখা যাবে। তিনি রাজধানীর দিকে অগ্রসর হলেন। রাজধানীতে পৌঁছে তিনি দেখলেন তাঁর নিজের পক্ষের লোকরাই দলে ভারী। তার ফলে খোজা মালিক আন্দিলের প্রাণবধের চেষ্টা করতে সাহস পেল না।

একদিন সে দরবার আহ্বান করল। তার ডাইনে ও বাঁয়ে ১২,০০০ সৈন্য তাকে ঘিরে ছিল। তার প্রশস্ত দরবার কক্ষ সুসজ্জিত ছিল এবং সেখানে চূড়ান্ত জাঁকজমক ও পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। সে প্রথমে মালিক আন্দিলকে তার কাছে ডেকে বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করে বলল, "আমি ভূতপূর্ব রাজা ও তাঁর সঙ্গীদের নিহত করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেছি। এ সম্বন্ধে তোমার মত কী?" মালিক আন্দিল একটি শ্লোক বললেন, "রাজা যা করেন, তাই খুব মনোরম।" সুলতান একথা শুনে খুব খুশী হয়ে তাঁকে সম্মান-পরিচ্ছদ দান করল এবং রত্নখচিত একটি তরবারি, অনেকগুলি ঘোড়া ও একটি হাতী উপহার দিল। তারপর মালিক আন্দিলের সামনে কোরাণ রেখে তাঁকে এই শপথ করতে বলল যে তিনি তাকে বধ করবেন না। মালিক আন্দিল শপথ করলেন যে সুলতান শাহজাদা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তখন যতক্ষণ তিনি এই আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন, তিনি তার ক্ষতি করবেন না। সুলতান শাহজাদা যাদের বধ করেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে ছিল তাঁর আত্মীয়। এই কারণে মালিক

আন্দিল প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে খোজার ব্যক্তিগত ভৃত্যদের হস্তগত করে তাদের আস্থা অর্জন করলেন। একদিন রাত্রিতে মালিক আন্দিল খোজার হারেমে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন সে মদ্যপানের পর ঘুমোচ্ছে। সে তখন সিংহাসনের উপরেই শুয়েছিল, তাই মালিক আন্দিল নিজের শপথের কথা স্মরণ করে তাকে আঘাত করতে পারলেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তেই খোজা পাশ ফিরতে গিয়ে সিংহাসন থেকে পড়ে গেল। মালিক আন্দিল এখন শপথ থেকে মুক্ত হয়ে তলোয়ার বার করলেন এবং সুলতান শাহজাদাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। সেই আঘাতে তার খুব সামান্য লাগল, কিন্তু সে জেগে উঠল। জেগে সে তার সামনে একটা খোলা তলোয়ার দেখে নিরস্ত্র অবস্থাতেই মালিক আন্দিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে বেশী বলবান ছিল, তাই মালিক আন্দিলকে মাটিতে ফেলে দিতে পারল। এদিকে ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে ঘরের আলো নিভে গিয়েছিল। খোজা মালিক আন্দিলের গলা টিপে ধরেছিল এবং তিনি নীচে থেকে তার চুল টেনে ধরেছিলেন। মালিক আন্দিল তাঁর দলের লোকদের সাহায্যের জন্যে ডাকতে লাগলেন। তুর্কী য়ুগ্রাশ খান বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ভেতরে ঢুকে দেখলেন দুজনেই একসঙ্গে মাটিতে রয়েছে, এ অবস্থায় কী করা উচিত ভেবে তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। মালিক আন্দিল তাঁকে বললেন, "আমি ওর চুল ধরে রয়েছি। ওর শরীর এত চওড়া আর ভারী যে আমার উপরে ও ঢালের মত রয়েছে। ওর শরীরে তলোয়ার চালালে আমার লাগবে না।"

য়ুগ্রাশ তখন খোজাকে তিন চারবার আঘাত করলেন, খোজা তখন মৃতের ভাণ করে পড়ে রইল। তাকে মৃত মনে করে মালিক আন্দিল ও য়ুগ্রাশ খান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তওয়াচী বাশী অর্থাৎ প্রাসাদের বাতিদারদের সর্দার তাঁদের জিজ্ঞাসা করল কী হয়েছে। তাঁরা উত্তর দিলেন নিমকহারাম নিহত হয়েছে। হাব্শী তওয়াচী বাশী বারবকের (সুলতান শাহজাদা) শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। বারবক মালিক আন্দিল ঢুকেছেন ভেবে আত্মগোপন করল। তওয়াচী বাশী এমন ভাণ করতে লাগল যেন সে নিজে আহত হয়েছে এবং চেঁচামেচি করে সে বলতে লাগল যে ষড়যন্ত্রকারীর দল তার প্রভুকে বধ করেছে। বারবক তাকে নিজের বন্ধু ও শুভার্থী মনে করে বলল, "শান্ত হও। আমি বেঁচে আছি।" তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আন্দিল কোথায়?" এই বলে সে তওয়াচী বাশীকে বলল মালিক আন্দিলকে মেরে তাঁর মাথা পাঠিয়ে,

দিচ্ছে। তওয়াচী বাশী তখন অস্ত্র নিয়ে বলল, "আমি তাকে বধ করতে যাচ্ছি।" এই বলে সে মালিক আন্দিলের কাছে গিয়ে সব কথা জানিয়ে দিল। মালিক আন্দিল তখন তওয়াচী বাশীর সঙ্গে আবার সেই ঘরে ফিরে এলেন এবং ছোরা দিয়ে বারবককে শেষ করলেন। তারপর তার মৃতদেহ সেইখানে ফেলে রেখে তিনি সেই ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'ও এই কাহিনীটিই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'রিয়াজ'-এর সুলতান শাহজাদা, হাব্‌শী সুলতানগণ এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলির অধিকাংশ উপকরণই ফিরিশ্‌তা থেকে নেওয়া। যাহোক্, 'রিয়াজ'-এ সুলতান শাহজাদার কাহিনী যেভাবে পাওয়া যায়, তার মধ্যে দু-একটি অতিরিক্ত খুঁটিনাটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 'রিয়াজে'র বিবরণের অনুবাদ নীচে দেওয়া হল।

"নপুংসক বারবক 'সুলতান শাহজাদা' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসে সব জায়গা থেকে খোজাদের জড়ো করতে লাগল এবং নিকৃষ্ট লোকদের উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করে তাদের দলে টানতে লাগল। এইভাবে সে নিজের শক্তি ও মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টা করছিল। কেবলমাত্র নিজের লোক দিয়ে শাসনকার্য চালাবার উদ্দেশ্যে সে উচ্চপদস্থ এবং প্রতিপত্তিশালী অমাত্যদের উচ্ছেদ করার মতলব করল। এঁদের মধ্যে প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল হাব্‌শী অন্যতম। মালিক আন্দিল এই সময় রাজ্যের সীমান্তে ছিলেন। এই নপুংসকের মৎলব বুঝতে পেরে তিনি তাকে বধ করার এবং নিজের সুযোগ্য পুত্রকে* সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা ফাঁদলেন। এই সময়ে হতভাগ্য নপুংসক মালিক আন্দিলকে ফাঁদে ফেলে কারারুদ্ধ করার জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠাল। এই আহ্বানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মালিক আন্দিল অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে নপুংসকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি দরবারে প্রবেশ ও নির্গমের সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করলেন, ফলে নপুংসকের তাঁকে খতম করার আশা সফল হল না। অবশেষে একদিন নপুংসক এক প্রমোদ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। সেখানে সে মালিক আন্দিলের প্রতি খুব অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে তাঁকে কোরাণ দিয়ে বলল,

*এই "সুযোগ্য পুত্র" সম্বন্ধে 'রিয়াজ'এ আর কিছু লেখা নেই, অন্য কোন সূত্রেও এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বারবককে বধ করে মালিক আন্দিল তাঁর কোন পুত্রকে সিংহাসনে বসাননি, নিজেই সিংহাসনে বসেছিলেন।

"কোরাণ ছুঁয়ে শপথ কর তুমি আমার ক্ষতি করবে না।" মালিক আন্দিল কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করলেন, "যতক্ষণ আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।" সব লোকেই ঐ দুরাত্মা নপুংসককে বধ করার মতলব করছিল, মালিক আন্দিলও তাই করছিলেন। তিনি প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভৃত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন ও সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন। এক রাত্রিতে ঐ দুর্বৃত্ত অত্যধিক পরিমাণে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সিংহাসনের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মালিক আন্দিল তখন তাকে বধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভৃত্যদের সাহায্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন সে সিংহাসনের উপরেই ঘুমিয়ে রয়েছে, তখন নিজের শপথের কথা মনে করে তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন। এমন সময় অকস্মাৎ ভাগ্যচক্রে নপুংসক মদের ঝোঁকে সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। মালিক আন্দিল এই ব্যাপারে আনন্দিত হয়ে তাকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেন। কিন্তু এই আঘাতে তার প্রাণবধ সম্ভব হল না। সুলতান শাহজাদা জেগে উঠে নিজেকে একটা খাপ-খোলা তলোয়ারের সম্মুখীন দেখে মালিক আন্দিলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গায়ে বেশী জোর থাকার জন্যে সে ধস্তাধস্তিতে জয়ী হয়ে মালিক আন্দিলকে চিৎ করে ফেলে তাঁর বুকের উপরে চড়ে বসল। মালিক আন্দিল নপুংসকের চুল খুব শক্ত করে ধরেছিলেন, কিছুতেই ছাড়েননি। তিনি চিৎকার করে (তাঁর সহকারী) য়ুগ্রাশ খানকে ডাকতে লাগলেন—তাড়াতাড়ি আসবার জন্য। তুর্কী য়ুগ্রাশ খান ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি একদল হাব্‌শীকে নিয়ে তক্ষণি ভিতরে ঢুকলেন এবং মালিক আন্দিল নপুংসকের দেহের নীচে চাপা পড়ে আছেন দেখে তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করতে ইতস্তত করতে লাগলেন। এদিকে এই দুজনের ধস্তা-ধস্তির ফলে ঘরের সব বাতিগুলি এদিক-সেদিকে ছিটকে পড়ে নিভে গিয়েছিল, ফলে সারা ঘরই অন্ধকার। মালিক আন্দিল য়ুগ্রাশ খানকে চেঁচিয়ে বললেন, "আমি খোজাটার চুল ধরে আছি। ওর বিরাট শরীর আমাকে ঢালের মত আড়াল করে আছে। তলোয়ার দিয়ে ওকে মারতে ইতস্তত কোরো না। ও তলোয়ার আমার শরীরে লাগবে না। আর যদি লাগেই, তা হলেও কোন ক্ষতি নেই। প্রভুর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার মত শত সহস্র লোক প্রাণ দিতে পারে।" য়ুগ্রাশ খান তখন আস্তে আস্তে সুলতান শাহজাদার পিঠে এবং কাঁধে তলোয়ার দিয়ে কয়েকটি আঘাত করলেন, সে তখন মরার ভাণ করে পড়ে

রইল। তখন মালিক আন্দিল উঠে মুগ্রাশ খান এবং হাবশীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন এবং তওয়াচী (বাতিদার) বাশী সুলতান শাহজাদার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। সুলতান শাহজাদা তাকে মালিক আন্দিল ভেবে আলো জ্বালার আগেই একটা কুঠরীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তওয়াচী বাশীও সেই কুঠরীতে ঢোকাতে সুলতান শাহজাদা আবার মরার ভাণ করে পড়ে রইল। তখন তওয়াচী বাশী চেঁচিয়ে বলল, "হায় কী দুর্ভাগ্য। বিদ্রোহীরা আমার প্রভুকে মেরে ফেলে রাজ্য ধ্বংস করেছে।" সুলতান শাহজাদা তখন তাকে তার বিশ্বস্ত ভৃত্য মনে করে চেঁচিয়ে বলল, "দেখ। আমি বেঁচে আছি। শান্ত হও।" তারপর জিজ্ঞাসা করল মালিক আন্দিল কোথায়। তওয়াচী বলল, "সে রাজাকে বধ করেছে ভেবে শান্তমনে বাড়ী ফিরে গেছে।" সুলতান শাহজাদা তাকে বলল, "যাও, অমাত্যদের ডাক। তাদের বল মালিক আন্দিলকে মেরে তার মাথা কেটে নিয়ে আসতে। ফটকে পাহারা বসাও, পাহারাদারদের সশস্ত্র হয়ে সাবধানে থাকতে বল।" হাবশী তওয়াচী বলল, "আচ্ছা, আমি সব গোলমাল চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।" এই বলে সে বেরিয়ে এসে তক্ষণি সব কথা মালিক আন্দিলকে জানাল। মালিক আন্দিল তখন আবার ভিতরে ঢুকে ছোরা দিয়ে মেরে নপুংসকের জীবন শেষ করলেন এবং তার মৃতদেহ সেই কুঠরীতে ফেলে রেখে তালা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।"

এই কাহিনীর সঙ্গে তবকাৎ-ই-আকবরী ও মাসির-ই-রহিমীতে প্রদত্ত কাহিনীর মিল আছে। তবে সেখানে কাহিনী সংক্ষিপ্ত আর এখানে পল্লবিত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ হবিবুল্লাহ এই কাহিনীকে সত্য বলেই গ্রহণ করেছেন। কাহিনীটি খুবই চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে বেশ খানিকটা অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। "সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা"—এই কথাটির মারপ্যাচের উপরেই কাহিনীটি প্রতিষ্ঠিত। মালিক আন্দিলের পক্ষে এই রকম দ্ব্যর্থমূলক শপথ গ্রহণ করা বিচিত্র নয়, কিন্তু সুলতান শাহজাদা যদি সত্যিই তাতে বিশ্বাস করে থাকে, তাহলে বলতে হবে তার মত নির্বোধ খুব কমই জন্মায়।

যাহোক, সুলতান শাহজাদার প্রসঙ্গে দুটি বিষয় খুব সাবধানে লক্ষ্য করতে হবে। প্রথমত আলোচ্য সময়ের অনেক পরে রচিত তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা, রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন, বুকাননের বিবরণী প্রভৃতি সূত্রের উক্তি ভিন্ন সুলতান শাহজাদার ঐতিহাসিকতার কোন প্রমাণ

এখনও পাওয়া যায়নি। এ পর্যন্ত তার রাজত্বকালের কোন মুদ্রা বা শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক ঐতিহাসিকরা সকলেই লিখেছেন যে সুলতান শাহজাদা জাতিতে হাব্‌শী ছিল। কিন্তু এই মতের কোনই ভিত্তি নেই। তবকাৎ-ই-আকবরী থেকে সুরু করে রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন পর্যন্ত কোন বইয়েই একথা লেখা নেই যে সুলতান শাহজাদা হাব্‌শী ছিল। বুকাননের বিবরণী বা স্টুয়ার্টের History of Bengal-এও এরকম কোন কথা লেখা নেই। উপরন্তু ফিরিশ্‌তার মতে সুলতান শাহজাদা ছিল বাঙালী। 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'য় তাকে "সুলতান শাহজাদা বঙ্গালী" বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দ্বিতীয় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুলতান শাহজাদাকে হাব্‌শী বলে ধরে নিয়েই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে হাব্‌শীরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের বংশকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে রাজা হয়ে বসেছিল। কিন্তু মধ্যযুগে রচিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলির সাক্ষ্য এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে যায়। তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে স্পষ্টই লেখা আছে যে হাব্‌শীরা ফতে শাহের হত্যাকারীর বিরুদ্ধেই দলবদ্ধ হয়েছিল এবং মালিক আন্দিল তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন। তওয়াচী (বাতিদার) বাশীও হাব্‌শী ছিল, সেও এই দলেই যোগদান করেছিল। সুতরাং ফতে শাহের হাব্‌শী কর্মচারী ও ভৃত্যেরা প্রভুদ্রোহী বা প্রভুহন্তা নয়, বরং তারাই আদর্শ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছিল বলতে হয়। 'রিয়াজ'-এর মতে মালিক আন্দিল যুগ্রাশ খানকে বলেছিলেন, "প্রভুর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার মত শত সহস্র লোক প্রাণ দিতে পারে।"

"সুলতান শাহজাদা"র রাজত্বকাল সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' তিনটি মত উল্লিখিত হয়েছে—একটি মতে সে ছয় মাস রাজত্ব করেছিল, একটি মতে আট মাস, আর একটি মতে আড়াই মাস। "তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'তে দুটি মত উল্লিখিত হয়েছে—আট মাস এবং আড়াই মাস। 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'মাসির-ই-রহিমী'তে বলা হয়েছে যে সে আড়াই মাস রাজত্ব করেছিল। এই কথাই ঠিক বলে মনে হয়। "সুলতান শাহজাদা"র উপর গোড়া থেকেই সকলে অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং ছয় মাস বা আট মাস রাজত্ব করা তার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। ৮৯২ হিজরার ৪ঠা মহরম তারিখে উৎকীর্ণ জলালুদ্দীন ফতে শাহের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে; সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহেরও ৮৯২

হিজরার মুদ্রা পাওয়া গেছে। সুতরাং ঐ বছরে খুব সামান্য সময় "সুলতান শাহজাদা"র পক্ষে রাজত্ব করা সম্ভব এবং সে সময় ছ'মাস বা আট মাস ধরা মুস্কিল। এতদিন সে রাজত্ব করলে তার কিছু মুদ্রা না পাওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। অতএব "সুলতান শাহজাদা"র রাজত্বকাল আড়াই মাস স্থায়ী হয়েছিল মনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজে লেখা আছে, "সুলতান শাহজাদা"র প্রভুহত্যা করে রাজ্যলাভের পরে কয়েক বছর বাংলাদেশে এই প্রথা চালু হল যে, যে-ই রাজাকে হত্যা করবে, সেই সিংহাসনে আরোহণ করবে।" বাবরের আত্মকাহিনীতেও অনেকটা এই ধরণের কথা আছে। বাবর লিখেছেন, "বাংলা রাজ্যে একটি বিস্ময়কর প্রথা এই যে উত্তরাধিকার প্রথা অনুসারে সিংহাসন লাভ সেখানে বিরল। রাজার পদ স্থায়ী।...যে কোন লোক যদি রাজাকে হত্যা করে নিজে সিংহাসনে বসে, তাহলে সে-ই রাজা হয়। আমীর, উজীর, সৈন্য এবং কৃষকেরা তক্ষণি তার কাছে নত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকে পূর্ববর্তী রাজার স্থলাভিষিক্ত আইনসঙ্গত রাজা বলে স্বীকার করে। বাঙালীরা বলে, 'আমরা সিংহাসনের প্রতি অনুগত ; যে কেউ সিংহাসন অধিকার করে, তাকেই আমরা মানি।"

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ

তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনের মতে মালিক আন্দিল "সুলতান শাহজাদা"কে বধ করে ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে রাজা হন। অন্যান্য বইতে ফিরোজ শাহের পূর্ব-পরিচয় সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই। ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-এ ফিরোজ শাহের সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে একই কথা লেখা হয়েছে। এই দুই বইয়ের মতে মালিক আন্দিল "সুলতান শাহাজাদা"কে বধ করে বাইরে এসে জলালুদ্দীন ফতে শাহের উজীর খান জহানকে ডেকে পাঠালেন। খান জহান এলে তাঁকে তিনি সমস্ত খুলে বললেন। অতঃপর রাজা নির্বাচনের জন্য অমাত্যদের পরিষৎ আহ্বান করা হল। ফতে শাহের পুত্রের বয়স মাত্র দু'বছর, সুতরাং তাঁকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা সম্বন্ধে অমাত্যদের দ্বিধা দেখা দিল। তার ফলে সমস্ত অমাত্যেরা একমত হয়ে পরদিন সকালে ফতে শাহের বিধবা রাণীর কাছে গেলেন। গিয়ে তাঁর কাছে আগের রাত্রির ঘটনা বর্ণনা

করে বললেন, "রাজপুত্র শিশু ; সুতরাং যতদিন না তাঁর বয়স হচ্ছে, ততদিন শাসনকার্য চালাবার জন্যে কাউকে আপনি নিযুক্ত করুন।" রাণী তাঁদের উদ্বেগ অনুভব করে কী বলতে হবে বুঝলেন। তিনি বললেন, "ঈশ্বরের কাছে আমি শপথ করেছিলাম যিনি ফতে শাহের হত্যাকারীকে বধ করবেন, তাঁকেই রাজত্ব ছেড়ে দেব।" মালিক আন্দিল প্রথমে রাজত্বের ভার গ্রহণ করতে রাজী হননি, কিন্তু যখন দরবারে সমবেত সমস্ত অমাত্যেরাই তাঁকে চাইল, তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

এই কাহিনী যদি সত্য হয়, তাহলে মালিক আন্দিল যে কত মহানুভব ও স্বার্থত্যাগী ছিলেন, তা বোঝা যায়। কিন্তু দিনাজপুর জেলার বিরল গ্রামে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। এই শিলালিপির তারিখ সম্বন্ধে কোন কোন পণ্ডিতের মত গ্রহণ করলে বলতে হয় ইনি সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ বা জলালুদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে রাজ্যের উত্তরাংশে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে উপরের কাহিনী মিথ্যা বলতে হয়। কিন্তু বিরল গ্রামের শিলালিপির তারিখ সঠিক ভাবে পড়া যায়নি। মৌলবী সরফুদ্দীনের মতে এর তারিখ ৮৮০ হিজরা ; তখন শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ বাংলার সুলতান। ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই শিলালিপির তারিখ ৮৮৯ হিজরা, যে সময় জলালুদ্দীন ফতে শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। কিন্তু এই বিতর্কমূলক পাঠের উপর নির্ভর করে ফিরোজ য়ুসুফ শাহ বা ফতে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন বলা ঠিক হবে না। সম্ভবত শিলালিপিটি ফিরোজ শাহের নিজস্ব রাজত্বকালেই (অর্থাৎ ৮৯২-৮৯৫ হিজরার মধ্যেই) উৎকীর্ণ হয়েছিল, খোদাইয়ের দোষে তারিখটি অস্পষ্ট থেকে গেছে এবং গবেষকদের বিভ্রান্ত করছে।

ফিরোজ শাহ সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী' এবং 'মাসির-ই-রহিমী'তে লেখা আছে, "তিনি দয়ালু এবং মহৎ প্রকৃতির রাজা ছিলেন।" 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা'তেও তাঁর সম্বন্ধে প্রশংসা আছে। এ সম্বন্ধে রিয়াজ-উস্-সলাতীনে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বিবরণ আমরা অনুবাদ করে দিচ্ছি।

হাবশী মালিক আন্দিল সৌভাগ্যক্রমে বাংলার সার্বভৌম নৃপতি হয়ে ফিরোজ শাহ উপাধি ধারণ করলেন এবং রাজধানী গৌড়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও উদার, এবং তাঁর কাজগুলি ছিল মহৎ। তিনি প্রজাদের শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেছিলেন। যখন তিনি অমাত্য ছিলেন,

সেই সময় থেকেই তিনি মহৎ এবং বীরত্বপূর্ণ অনেক কাজ করেছিলেন। তাঁর তাঁর সৈন্যেরা ও প্রজারা তাঁকে ভয় করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে যেত না। উদারতা এবং মহত্ত্বের দিক দিয়ে তাঁর তুলনা হয় না। তাঁর আগের রাজারা অনেক কষ্ট করে যেসব ধনদৌলত সঞ্চয় করেছিলেন, সেগুলি তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই গরীবদের দান করে দিলেন। কথিত আছে একবার তিনি এক দিনেই গরীবদের এক লাখ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর সচিবেরা এই মুক্তহস্ত দান পছন্দ করে নি। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, "এই হাব্‌শী বিনা কষ্টে বিনা পরিশ্রমে যে টাকার মালিক হয়েছেন তার মূল্য বুঝতে পারছেন না। যাতে পারেন, সেরকম কোন উপায় আমাদের বার করতে হবে। তাহলে ইনি আর এরকম যথেচ্ছভাবে মুক্ত হস্তে দান করতে পারবেন না।" এই ঠিক করে তারা এক লাখ টাকা একটা ঘরের মেঝেতে রেখে দিল, যাতে রাজা নিজের চোখে তা দেখে তার মূল্য বুঝে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন (অর্থাৎ রাজা বুঝতে পারবেন এক লাখ টাকার পরিমাণ কত বিরাট, ফলে কথায় কথায় তিনি লাখ টাকা দান করতে পারবেন না)। রাজা যখন এই টাকা দেখলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "টাকাগুলো এখানে পড়ে আছে কেন?" সচিবেরা বলল, "এত টাকাই আপনি গরীবদের দিতে বলেছেন।" রাজা বললেন, "এত কম টাকায় কী করে কুলোবে? এর সঙ্গে আর এক লাখ টাকা যোগ কর।" সচিবেরা এতে অপ্রস্তুত হয়ে সব টাকা ভিখারীদের বণ্টন করে দিলেন।

এই গল্পটি কতদূর সত্য তা জানি না, তবে অত্যন্ত মধুর। গল্পটি সত্য হলে বলতে হবে দানের দিক দিয়ে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। গল্পটি যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্য নাও হয়, তাহলেও ফিরোজ শাহ যে মহৎ ও দানবীর ছিলেন, তা এর থেকে বোঝা যায়। কারণ সম্পূর্ণ বিনা কারণে কারও নামে এরকম গল্প রটে না।

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে, "তিনি গৌড় শহরে একটি মসজিদ, একটি মিনার এবং একটি উদকাধার (reservoir) তৈরী করিয়েছিলেন।" এর মধ্যে মিনারটি এখনও বর্তমান এবং এটিই গৌড়ের একমাত্র মিনার। এটি "ফিরোজ মিনার" নামে পরিচিত। এই মিনারে অবশ্য নির্মাতার নাম লেখা নেই, কিন্তু আগে এর একটি শিলালিপিতে তা লেখা ছিল। মেজর ফ্রাঙ্কলিন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এই শিলালিপির এক টুকরো

পেয়েছিলেন, তাতে রাজা "সৈফুদ্দীন"-এর নাম লেখা আছে। কানিংহাম এটি ফিরোজ মিনারের মূল শিলালিপি বলে স্বীকার করে নিয়েও মনে করেছিলেন শিলালিপিতে উল্লিখিত "সৈফুদ্দীন" আসলে সৈফুদ্দীন হমজা শাহ (৮১৩-৮১৫ হিঃ) এবং ইনিই মিনারটি তৈরী করিয়েছিলেন। এদিকে "ফিরোজ মিনার" নাম থেকে ফার্গুসন অনুমান করেছিলেন এই মিনারের নির্মাতা শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ (৭০১-৭২২ হিঃ)। বলা বাহুল্য, দুই মতই ভ্রান্ত। "সৈফুদ্দীন" এবং "ফিরোজ" এই দুই নাম একটি মাত্র সুলতানেরই ছিল, তিনি আমাদের আলোচ্য সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ। সুতরাং তিনিই এই মিনারটি তৈরী করিয়েছিলেন। জনৈক গবেষক এসম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে লিখেছেন, "...the precarious Nature of his position and the short tenure of his power are strong arguments against this view." কিন্তু 'রিয়াজ'-এ স্পষ্টই লেখা আছে গৌড়ের মিনার ফিরোজ শাহের তৈরী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মুন্সী শ্যামপ্রসাদ লিখেছিলেন যে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই এই মিনারের নির্মাতা। ফিরোজ শাহ তিন বছরেরও বেশী রাজত্ব করেছিলেন, এই ধরণের মিনারের নির্মাণ এক বছরের মধ্যেই শেষ হওয়া সম্ভব। ফিরোজ শাহ যে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন, একথা কোথাও লেখা নেই। বরং ইতিহাস -গ্রন্থগুলিতে একথাই লেখা আছে যে অমাত্যদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি রাজা হয়েছিলেন।„

ফিরোজ মিনার কীভাবে তৈরী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সেটি এই,

প্রথমে একজন রাজমিস্ত্রী এই মিনারটি তৈরী করে। তৈরী শেষ হয়েছে শুনে সুলতান এটি দেখতে গেলেন এবং চূড়ার উপরে উঠলেন। রাজমিস্ত্রী তখন তাঁর সামনে এসে গর্ব করে বলল, "এর চেয়েও অনেক উঁচু মিনার আমি তৈরী করতে পারতাম।

রাজা—"তাহলে তা'ই করলে না কেন?"

রাজমিস্ত্রী—"আমার কাছে অত মালমশলা ছিল না।"

রাজা—"ছিল না তো আমার কাছে চাইলে না কেন?"

রাজমিস্ত্রী এর কোন উত্তরই দিতে পারল না। রাজা তখন ক্রোধে আগুন হয়ে আদেশ দিলেন রাজমিস্ত্রীকে মিনারের চূড়া থেকে ফেলে দিতে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর আদেশ পালিত হল। এইভাবে রাজমিস্ত্রী তার প্রাণ হারাল।

এদিকে সুলতান চূড়া থেকে নেমে এসে তাঁর প্রিয় ভৃত্য হিঙ্গাকে আদেশ দিলেন তক্ষণি মোরগাঁওয়ে যেতে। হিঙ্গা তক্ষণি মোরগাঁওয়ের দিকে রওনা হল, কিন্তু কেন যেতে হবে তা সে কিছুই বুঝতে পারল না। রাজা তখন এত রেগে রয়েছেন যে রাজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও তার সাহস হল না। মোরগাঁওয়ে পৌঁছে হিঙ্গা গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল কী কাজের জন্যে তাকে এখানে পাঠানো হতে পারে। কিন্তু অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা না পেয়ে সে বিরক্ত হয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে তার সঙ্গে সনাতন নামে একজন ব্রাহ্মণ যুবকের দেখা হয়ে গেল। হিঙ্গা তখন ভাবল এর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে দেখা যাক্ যদি কোন সুরাহা হয়। এই ভেবে সে সনাতনকে তার সমস্যার কথা খুলে বলল। সনাতন তখন হিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করল মিনার থেকে তার রওনা হবার অব্যবহিত আগে কী কী ঘটনা ঘটেছিল। হিঙ্গা সবই গোড়া থেকে বলল। সব শুনে সনাতন বলল, "তাহলে সুলতান তোমাকে নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন মোরগাঁও থেকে ভাল ভাল রাজমিস্ত্রী নিয়ে যেতে।" মোরগাঁওয়ে এই সময় অনেক সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী বাস করত। হিঙ্গা সনাতনের কথা শুনে ভাবল এ'ই বোধ হয় ঠিক বলছে। এই ভেবে সে মোরগাঁও থেকে কয়েকজন খুব ভাল রাজমিস্ত্রী সংগ্রহ করে তাদের সুলতানের কাছে নিয়ে গেল। এদিকে সুলতানের মেজাজ ততক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তিনি তখন ভাবছিলেন "তাই তো, হিঙ্গাকে কী করতে হবে তা না বলেই মোরগাঁওয়ে পাঠালাম।" এমন সময়ে হিঙ্গা তাঁর সামনে মোরগাঁওয়ের রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে এসে হাজির। সুলতান তো অবাক! হিঙ্গা তাঁর মনের কথা কী করে জানল? হিঙ্গাকে তিনি জিজ্ঞাসা করাতে হিঙ্গা তাঁকে সমস্ত খুলে বলল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সনাতনের পরামর্শে যে তার পক্ষে একাজ করা সম্ভব হয়েছে, তাও জানাল। সুলতান একথা শুনে সনাতনের খুব প্রশংসা করলেন এবং সনাতনকে ডাকিয়ে এনে তাকে রাজদরবারে একটি খুব উঁচু পদে নিয়োগ করলেন। হিঙ্গা যেসব রাজমিস্ত্রীদের এনেছিল, তাদের সাহায্যে সুলতান ফিরোজ মিনারের উচ্চতা আরও অনেকখানি বাড়ালেন।

এই গল্পটি মালদহ জেলা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের লোকদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত। এখনও পর্য্যন্ত ভাল করে না বুঝিয়ে কেউ কোন হুকুম করলে ঐ অঞ্চলের লোকে বলে, "এ যে দেখছি হিঙ্গা তুই মোরগাঁয়ে যা।"

ঐ কিংবদন্তীটির প্রথমাংশ (রাজমিস্ত্রীকে মিনারের চূড়া থেকে ফেলে

দেওয়া অবধি) আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদ লিপিবদ্ধ করেছিলেন (JASB, 1902, P. 44 দ্রঃ)। তাঁর মতে ঐ রাজমিস্ত্রীর নাম "পীরীর"। সম্পূর্ণ কিংবদন্তীটি প্রথমে রজনীকান্ত চক্রবর্তী প্রকাশ করেন তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' ২য় খণ্ডে (১৯০৯)। পরে এটি আবিদ আলী লিপিবদ্ধ করেছেন Memoirs of Gaur and Pandua বইয়ে।

এই কিংবদন্তীর সবটা না হোক্ কতকটা সত্য বলেই মনে হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন 'সাকর মল্লিক' সনাতন। ফিরোজ শাহের রাজ্যাবসানের মাত্র চার বছর বাদে হোসেন শাহের রাজত্ব সুরু হয়। এটা খুবই সম্ভব যে সনাতন হোসেন শাহের সিংহাসনেরও কয়েক বছর আগে থেকে গৌড় দরবারে চাকরী করতেন। সুতরাং সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের ভৃত্যের সঙ্গে সনাতনের মোরগাঁওয়ে সাক্ষাৎ এবং সৈফুদ্দীন কর্তৃক সনাতনকে উচ্চপদে নিয়োগ খুবই সম্ভাব্য ব্যাপার এবং বলা বাহুল্য মোরগাঁও গ্রামের সনাতন এবং রূপের অগ্রজ সনাতন অভিন্ন হবার শতকরা ৯৯ ভাগ সম্ভাবনা।

উপরে উল্লিখিত কিংবদন্তী থেকেও সুলতান ফিরোজ শাহের চরিত্রের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। নিজের রচিত শিল্প-কীর্তির উন্নতিবিধানে তাঁর আগ্রহ, ক্রোধে দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হওয়া এবং ক্রোধ শান্ত হলে স্বাভাবিক হওয়া —এগুলি তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতার পরিচায়ক। অবশ্য রাজমিস্ত্রীকে মিনারের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে বধ করা নিষ্ঠুরতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু রাজমিস্ত্রী যে বাচালতা ও বেয়াদবীর পরিচয় দিয়েছিল, তা মধ্যযুগের কোন সার্বভৌম নৃপতিই বরদাস্ত করতেন না। সেদিক দিয়ে ফিরোজ শাহের কাজ অন্যায় হলেও অস্বাভাবিক হয়নি, অবশ্য যদি এই রাজমিস্ত্রী-বধ ব্যাপারটা আদৌ ঐতিহাসিক হয়।

আজ অবধি এই সব জায়গায় সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের শিলালিপি পাওয়া গেছে :—

বিরল (দিনাজপুর), গুয়ামালতী (মালদহ), কালনা (বর্ধমান), কাটরা (মালদহ), গড় জরীপা (ময়মনসিংহ), গৌড়। তাঁর মুদ্রাগুলির অধিকাংশের মধ্যেই "কোষাগার" ভিন্ন কোন স্থানের নাম নেই, কতকগুলি ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) টাকশালে তৈরী হয়েছিল বলে লেখা আছে। সুতরাং ফিরোজ শাহ উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত গড় জরীপা নামক স্থানে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের

যে শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার তারিখ এবং শিলালিপিস্থাপনের উদ্দেশ্য অক্ষর অস্পষ্ট থাকায় পড়া যায়নি। কেদারনাথ মজুমদার তাঁর ময়মনসিংহের ইতিহাসে (পৃঃ ৩৬-৩৭) লিখেছেন যে ঐ শিলালিপি মজলিস খাঁ হুমায়ুন নামে জনৈক বীরের সমাধি-স্তম্ভের শিলালিপি এবং ঐ মজলিস খাঁ হুমায়ুন ফিরোজ শাহের সেনাপতি ছিলেন। তাঁর মতে 'গড় জরীপা'র পূর্ব নাম 'গড় দলীপা', ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে এখানে দলীপ সামন্ত নামে জনৈক স্বাধীন রাজা রাজত্ব করতেন। মজলিস খাঁ হুমায়ুন তাঁকে পরাজিত করে এই অঞ্চল অধিকার করেন। এই সমস্ত উক্তির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেদার নাথ মজুমদার লিখেছেন, "ইহাই ময়মনসিংহে মুসলমান প্রবেশের প্রথম সূত্রপাত।" এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল। কয়েক বছর আগে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গুরাই গ্রামে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের এক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। তার তারিখ ২৯শে রমজান, ৮৭১ হিজরা। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেও ময়মনসিংহে মুসলমানদের অধিকার ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়,

(১) **কীরা (কিরাৎ) খান**
(২) **মুখলিশ খান**
(৩) **জাফর খান**
(৪) **সাঈদ**

ফিরোজ শাহের মৃত্যু সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' দুটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে লেখা আছে, "তিন বছর রাজত্ব করে মালিক আন্দিল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর ঝটিকায় তাঁর জীবনের দীপ নির্বাপিত হয়। কিন্তু অধিকতর সত্য বিবরণ এই যে ফিরোজ শাহও পাইকদের হাতে নিহত হন।" মাসির-ই-রহিমী'তে লেখা আছে, "কোন কোন লোকের মতে তিনি নায়েক (পাইক) দের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন।" তবকাৎ-ই-আকবরীতেও এই কথা আছে।

ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে লেখা আছে ফিরোজ শাহ তিন বছর রাজত্ব করেন। সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের ৮৯২ ও ৮৯৩ হিজরার মুদ্রা এবং ৮৯৪ ও ৮৯৫ হিজরার শিলালিপি (ঝিরল গ্রামের শিলালিপি বাদ দিলে) পাওয়া গেছে। সুতরাং তাঁর

রাজত্বকাল ৮৯২-৮৯৫ হিজরা। তিন বছরেরও বেশী তাঁর রাজত্ব স্থায়ী হয়েছিল। "সুলতান শাহজাদা"কে রাজা হিসাবে ঠিক ধরা যায় না, তাছাড়া "সুলতান শাহজাদা"কে হাবশী বলার কোন কারণ নেই, এমন কি তার ঐতিহাসিকতাও সন্দেহের অতীত নয়। সুতরাং সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহই বাংলার প্রথম হাব্‌শী সুলতান। দানের দিক দিয়ে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর শিল্পকীর্তি ফিরোজ মিনার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজ্যের আয়তন ছিল সুবিশাল। সুতরাং তিনি যে বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে হাব্‌শী রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে এদেশে সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় নি, তা এখন বোধ হয় সকলেই বুঝতে পারবেন। বাংলার প্রথম হাব্‌শী রাজা যোগ্যতার সঙ্গে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করে গিয়েছেন। হাব্‌শীদের মোট রাজত্বকালের অর্ধেকেরও বেশী সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকাল। সুতরাং ফিরোজ শাহের পরবর্তী রাজারা যাই করে থাকুক না কেন, বাংলার হাবশী রাজত্বের অধিকাংশই বেশ ভালভাবে কেটেছিল বলে স্বীকার করতে হয়।

আর একটা কথা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের নাম উল্লেখের সময় তাঁকে প্রায়ই "ফতে শাহের ক্রীতদাস" বলেছেন। কিন্তু ফিরোজ যে জলালুদ্দীন ফতে শাহের ক্রীতদাস ছিলেন, তার কোন প্রমাণই নেই।

নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (২য়)

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পরবর্তী সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ। সমস্ত ইতিহাস-গ্রন্থে এঁর নাম পাওয়া যায়। এই নামে ইতিপূর্বে আর একজন সুলতান ছিলেন বলে এঁকে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ বলা উচিত। এঁর অনেক মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া গেছে। তবকাৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনের মতে ইনি সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে আবার এও লেখা হয়েছে যে হাজী মুহম্মদ কন্দাহারী নামে একজন ঐতিহাসিকের মতে এই মাহ্‌মুদ শাহ জলালুদ্দীন ফতে শাহের পুত্র, ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরে এঁকে সিংহাসনে বসানো হয়।

সুতরাং এই নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে একটা রহস্য রয়েছে। রহস্য আরও ঘনীভূত হয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের শিলালিপি থেকে। বর্ধমান জেলার কালনার কাছে এক মসজিদে এঁর একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে; এর তারিখ ৮৯৫ হিজিরা; এতে সুলতানের নাম এইভাবে লেখা রয়েছে,

"অল-সুলতান ইব্‌ন্ অল-সুলতান্ নাসির অল্-দুনিয়া ওয়াল্-দীন আবু (ল মুজাহিদ) মাহ্‌মুদ শাহ বাদশাহ গাজী।"

এতে বলা হয়েছে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ সুলতানের পুত্র, কিন্তু তাঁর পিতার নাম বলা হল না। জলালুদ্দীন ফতে শাহ ও সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ উভয়েই পুত্র নিজেকে "সুলতানের পুত্র" বলে পরিচয় দিতে পারেন। সুতরাং আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছিলেন মুহম্মদ কান্দাহারীর উক্তিই ঠিক এবং এই মাহ্‌মুদ শাহ জলালুদ্দীন ফতে শাহেরই পুত্র। অপর মতকে তিনি এই বলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন,

"রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্ অনুসারে নাসির-উদ্দীন্ মহ্‌মুদ শাহ, সৈফ্-উদ্দীন্ ফিরোজ্ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যে সকল হাব্‌শী ক্রীতদাস ভারতবর্ষে আনীত হইত, তাহারা সকলেই নপুংসক। মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন্ কি জন্য নপুংসকের পুত্রপ্রাপ্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।"

কিন্তু রাখালদাস লক্ষ্য করেননি যে শুধু গোলাম হোসেন মাহ্‌মুদ শাহকে ফিরোজ শাহের পুত্র বলেন, বখ্‌শী নিজামুদ্দীনও এই কথা বলেছেন তাঁর তবকাৎ-ই-আকবরীতে। বখ্‌শী নিজামুদ্দীন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। মুহম্মদ কন্দাহারীও তাই। সুতরাং কান্দাহারীর উক্তির তুলনায় নিজামুদ্দীনের উক্তির মূল্য কোন অংশে কম নয়, বরং একদিক দিয়ে বেশী; কারণ কান্দাহারীর বই পাওয়া যায় না, তাঁর বই পাওয়া যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, রাখালদাস মনে করেছেন যে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ নপুংসক ছিলেন। এদেশে যে সব হাব্‌শী আসত, তাদের সম্বন্ধে রাখালদাসের তুলনায় 'তবকাৎ-ই-আকবরী'-লেখকের ধারণা নিশ্চয়ই অনেক পরিষ্কার ছিল; কারণ তিনি আলোচ্য সময়ের মাত্র একশো বছর পরে (১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে) এই বই লিখেছেন এবং তাঁর সময়েও এদেশে অনেক হাব্‌শী ছিল; এদেশে আগত সব

হাব্‌শীই যদি নপুংসক হত, তাহলে তিনি ফিরোজ শাহের পুত্রপ্রাপ্তির মত অসম্ভব কথা লিপিবদ্ধ করতেন না। সুতরাং ফিরোজ শাহকে নপুংসক মনে করার অনুকূলে কোন যুক্তি নেই। রাখালদাস ফিরোজ শাহকে যে "ক্রীতদাস" বলছেন, এরও অনুকূলে যে কোন প্রমাণ নেই, তা আগেই বলা হয়েছে।

আর একটি বিষয় দেখতে হবে। তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্-সলাতীনে "সুলতান শাহজাদা"র সঙ্গে মালিক আন্দিল বা ফিরোজ শাহের দ্বন্দ্বযুদ্ধের যে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে, তাতে কেবলমাত্র "সুলতান শাহজাদা"কেই বারবার নপুংসক বলা হয়েছে, মালিক আন্দিলও যে নপুংসক, সে কথা ঘুণাক্ষরেও বলা হয়নি। বরং তিনি যে নপুংসককে বধ করে খুব বড় একটা কাজ করছেন, সেই কথাটাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তায় লেখা আছে যে জলালুদ্দীন ফতে শাহ নিহত হবার সময়ে তাঁর উজীর খোজা খান জহান এবং প্রধান অমাত্য মালিক আন্দিল হাব্‌শী রাজ্যের সীমান্তে ছিলেন। মালিক আন্দিল যে খোজা ছিলেন, তা ফিরিশ্‌তা বলেননি, কেবল খান জহানকেই তিনি খোজা বলেছেন। সুতরাং সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ যে নপুংসক ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান, ফিরোজ মিনারের নির্মাতা, দানবীর ফিরোজ শাহকে নপুংসক মনে করা নিতান্তই অসঙ্গত কল্পনা।

কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নের আলোচনা এখনও বাকী রয়েছে; অর্থাৎ দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ কার ছেলে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে মনে হয় যে এসম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র উক্তিই ঠিক্ এবং নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র।

(১) মুহম্মদ কন্দাহারীর উক্তি অনুসারে নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ জলালুদ্দীন ফতে শাহের পুত্র। জলালুদ্দীন ফতে শাহের পিতার নামও নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ। তাহলে পিতামহ ও পৌত্রের অবিকল একই নাম হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সুলতানদের মধ্যে এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না, যেখানে পিতামহ ও পৌত্রের নাম একেবারে অভিন্ন।

(২) এই দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহের শিলালিপিতে তাঁকে "সুলতানের পুত্র সুলতান" (অল-সুলতান ইব্‌ন্ অল-সুলতান) বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর পিতামহও যে সুলতান, তা বলা হয়নি। তিনি জলালুদ্দীন ফতে শাহের পুত্র ও প্রথম মুনাসিরুদ্দীন মাহ্‌দ শাহের পৌত্র হলে তাঁর শিলালিপিতে

"অল্-সুলতান্ ইব্ন্ অল-সুলতান ইব্ন্ অল-সুলতান" (অর্থাৎ সুলতানের পুত্র সুলতান, তস্য পুত্র সুলতান) লেখা থাকত। তা না থাকাতে মনে হয়, তাঁর পিতামহ সুলতান ছিলেন না, কেবল পিতাই সুলতান ছিলেন এবং তিনি সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের পুত্র।

(৩) দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ জলালুদ্দীন ফতে শাহের পুত্র হলে ফতে শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন না কেন? অপর পক্ষ ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজের উক্তি উদ্ধৃত করে বলবেন যে সে সময় তিনি শিশু ছিলেন বলে সিংহাসন পাননি। ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন লিখেছেন, ফতে শাহের মৃত্যুর সময় তাঁর পুত্রের বয়স মাত্র দু' বছর ছিল বলে অমাত্যেরা তাকে রাজা না করে ফিরোজ শাহকে রাজা করেন। এই কথা ঠিক হলে বলতে হবে ফিরোজ শাহের মৃত্যুর সময়েও ফতে শাহের পুত্র শিশুই ছিলেন, কারণ ফিরোজ শাহ ৩।৪ বছর রাজত্ব করেন এবং তাঁর মৃত্যুকালে ফতে শাহের পুত্রের বয়স ৫।৬ বছরের বেশী হয় না। সুতরাং অমাত্যেরা যদি আগে শিশুকে সিংহাসনে বসাতে রাজী না হয়ে থাকেন, তবে এখনও তাঁদের রাজী হবার কোন কারণ দেখা যায় না।

দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের মুদ্রায় কোন তারিখ দেওয়া নেই; এঁর তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, একটি ৮৯৫ হিজরায় ও দুটি ৮৯৬ হিজরায় উৎকীর্ণ। সুতরাং এক বছর বা তার কিছু বেশী সময় ইনি রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে হয়। এই সমস্ত জায়গায় এঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে :—

কালনা (বর্ধমান), পাণ্ডুয়া (মালদহ) এবং চুনাখালি (মুর্শিদাবাদ)। সুতরাং উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এঁর রাজত্ব ছিল দেখা যাচ্ছে। ইনি হাবশী হোন্ বা না হোন্, এঁর পরামর্শদাতারা সকলেই হাবশী ছিলেন। বাংলাদেশে হাবশী-কর্তৃত্ব যে এঁর রাজত্বকালেও সুদৃঢ় ছিল, এঁর রাজ্যের এই বিস্তৃত আয়তনই তার প্রমাণ।

ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ'এর মতে এঁর রাজত্বকালে হাবশ্ খান নামে একজন হাবশী ক্রীতদাস রাজকোষ এবং শাসনব্যবস্থার সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে। মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে (ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন কর্তৃক উল্লিখিত) সুলতান ফিরোজ শাহের জীবদ্দশায় তাঁর আদেশে হাবশ্ খান মাহ্মুদ শাহকে শিক্ষা দেবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যাহোক্, এই তিনজন লেখকই বলেন, ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পরে মাহ্মুদ শাহ রাজা হন বটে, কিন্তু হাবশ্ খানই রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, ফলে মাহ্মুদ শাহ তাঁর হাতের পুতুলে পরিণত হন।

এইভাবে কিছুদিন কাটবার পর (কন্দাহারীর মতে হাবশ্ খান তখন নিজে রাজা হবার মতলব আঁটছিলেন) সিদি বদ্র্ নামে আর একজন হাব্শী বেপরোয়া হয়ে উঠে হাবশ্ খানকে হত্যা করে এবং নিজেই শাসনব্যবস্থার কর্তা হয়ে বসে। কিছুদিন বাদে পাইকদের সর্দারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সে একদিন রাত্রে মাহ্মুদ শাহকে হত্যা করে এবং পরদিন সকালে অমাত্যদের সম্মতি ক্রমে সে মুজঃফর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসে।

এই বিবরণের প্রথমাংশ কোন সমসাময়িক বিবরণ দ্বারা সমর্থিত না হলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বিশ্বাস্য। শেষাংশ সম্পূর্ণ সত্য, কারণ বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "নসরৎ শাহের পিতার (অর্থাৎ হোসেন শাহের) রাজ্যলাভের আগে একজন হাব্শী রাজাকে হত্যা করে কিছুদিন বাংলাদেশ শাসন করেছিল।"

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের এই সমস্ত কর্মচারীর নাম পাওয়া গেছে :—

(১) দৌলৎ খান

(২) মজলিস খান

শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহ

শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহ সম্বন্ধে তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশতা ও রিয়াজ-উস্-সলাতীনের বিবরণ প্রায় একই রকম। চারটি বইয়েই মোটামুটিভাবে এই সব কথা লেখা রয়েছে—

গায়ের জোরে মুজঃফর শাহ রাজা হবার পরে পৃথিবীতে অন্ধকার নেমে এল। মুজঃফর শাহ ছিলেন উদ্ধত, নৃশংস ও রক্তপিপাসু প্রকৃতির। রাজা হয়ে তিনি বহু শিক্ষিত, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করেন এবং হিন্দু রাজাদের যমালয়ে প্রেরণ করেন। অবশেষে তাঁর অত্যাচার যখন চরমে পৌছোলো, তখন সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তাঁর মন্ত্রী সৈয়দ হোসেন [illegible] নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং মুজঃফর শাহকে বধ করে নিজে রাজা হলেন।

বাবরের আত্মকাহিনী থেকে মুজঃফর শাহ সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায়,

(১) মুজঃফর শাহ জাতিতে হাব্শী ছিলেন।

(২) তিনি পূর্ববর্তী রাজাকে হত্যা করে রাজা হয়েছিলেন।

(৩) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ মুজঃফর শাহকে হত্যা করে রাজ্যলাভ করেছিলেন।

মুজঃফর শাহের নৃশংসতা, অত্যাচার ও কুশাসন সম্বন্ধে বাবর কিছু লেখেননি। এসম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত চারখানি বইতে যা লেখা আছে, তা সম্পূর্ণ সত্য কিনা তা বলা যায় না। তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনের মতে মুজঃফর শাহ তাঁর উজীর সৈয়দ হোসেনের পরামর্শেই সৈন্যদের বেতন হ্রাস করেন। এই ব্যাপার এবং মুজঃফর শাহের দুর্ব্যবহার ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রজাদের উপর নৃশংস অত্যাচার অমাত্যদের অধিকাংশকেই বিরক্ত করে তোলে। তাঁরা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সৈয়দ হোসেনই তখন তাঁদের নেতৃত্ব করেন। এসব কথা সত্য কিনা বলা শক্ত, তবে মুজঃফর শাহ যে জনপ্রিয় রাজা ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার প্রমাণ, তিনি বাংলাদেশের একটা বড় অঞ্চলে নিজের অধিকার হারিয়েছিলেন। আজ অবধি এইসব জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে :—

গঙ্গারামপুর (দিনাজপুর), নবাবগঞ্জ (মালদহ), হজরৎ পাণ্ডুয়া (মালদহ), চম্পানগর (ভাগলপুর)।

তাঁর মুদ্রায় "কোষাগার" ও "টাকশাল" ছাড়া একটি মাত্র নির্মাণস্থানের উল্লেখ পাই—বারবকাবাদ। বারবকাবাদও উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। মোগল সম্রাটদের আমলে বর্তমান মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়ার কিয়দংশ নিয়ে সরকার বারবকাবাদ গঠিত হয়েছিল।

এর থেকে দেখা যাবে, প্রায় সমগ্র উত্তরবঙ্গে মুজঃফর শাহের অধিকার ছিল, উপরন্তু উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন বিহারের কিছু অঞ্চল তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে যে তাঁর কোন অধিকার ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাই না। সম্ভবত এই সব অঞ্চল তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করেনি।

তবে যে অঞ্চলে মুজঃফর শাহের রাজত্ব ছিল বলে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায়, তার আয়তনও খুব কম নয়। মুজঃফর শাহের ৮৯৬ থেকে ৮৯৮ হিজরায় মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া যায়। তিনি যতখানি অত্যাচারী ছিলেন বলে চিত্রিত হয়েছেন, সত্যিই যদি তিনি ততদূর অত্যাচারী হতেন, তাহলে এতবড় অঞ্চলে এতদিন ধরে নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারতেন বলে মনে হয় না। এই কারণে মনে হয়, মুজঃফর শাহ সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থগুলির বিবরণে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। মুজঃফর শাহকে উচ্ছেদ করে যিনি রাজা হয়ে

ছিলেন, সেই হোসেন শাহের প্রচারের ফলেই সম্ভবত মুজঃফর শাহের চরিত্র অত্যধিক পরিমাণে কালিমালিপ্ত হয়েছে।

বিভিন্ন শিলালিপি থেকে শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় :—

(১) **মুতাবর খান কার কর্মান**

(২) **মজলিস উলুঘ খুর্শীদ**

পূর্বোল্লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলির মতে মুজঃফর শাহ সৈয়দ হোসেনকে তাঁর উজীরের পদে নিয়োগ করেছিলেন। এই নিয়োগের ফলে রাজ্যের ভাল হয়েছিল, কিন্তু মুজঃফর শাহের সর্বনাশ হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

কীভাবে মুজঃফর শাহ নিহত হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর দু'জন লেখকের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। হাজী মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে (তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে উল্লিখিত) মুজঃফর শাহের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। ১,২০,০০০ লোক এই যুদ্ধে নিহত হবার পরে মুজঃফর শাহ পরাস্ত ও নিহত হন এবং বিরুদ্ধবাদীদের নেতা সৈয়দ হোসেন রাজা হন। সম্ভবত কন্দাহারীর বর্ণনা অবলম্বনেই ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন এই যুদ্ধের অনতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এটি বিশ্লেষণ করব। ফিরিশ্‌তা ও 'রিয়াজ'এ লেখা আছে এই যুদ্ধে যে সমস্ত লোক বন্দী হত, তাদের মুজঃফর শাহের সামনে নিয়ে আসা হত এবং মুজঃফর নাকি স্বহস্তে তাদের বধ করতেন।

বখ্‌শী নিজামুদ্দীন কিন্তু 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে অন্য কথা লিখেছেন। তাঁর মতে জনসাধারণ যখন মুজঃফর শাহের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, তখন সৈয়দ হোসেন তাদের মনোভাব বুঝতে পারলেন এবং ঘুষ দিয়ে পাইকদের সর্দারকে হাত করে ১৩ জন লোক সঙ্গে নিয়ে মুজঃফর শাহের অন্তঃপুরে ঢুকে তাকে হত্যা করলেন। মাসির-ই-রহিমীতেও এই কথা লেখা আছে, তবে তাতে বলা হয়েছে হোসেন ১৫ জন লোক সঙ্গে নিয়ে মুজঃফরের অন্তঃপুরে ঢুকেছিলেন।

সম্ভবত এই বইগুলির কথাই সত্য, কারণ বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন, "সুলতান আলাউদ্দীন সেই হাব্‌শীকে (মুজঃফর শাহকে) হত্যা করে রাজ্যলাভ করেছিলেন।" আলাউদ্দীন হোসেন মুজঃফর শাহকে যুদ্ধে নিহত করলে বাবর তাকে "হত্যা করা" বলতেন কিনা সন্দেহ।

মুজঃফর শাহ সম্ভবত ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে ও সম্ভবত তাঁরই যত্নে পাণ্ডুয়ায় নূর কুৎব আলমের সমাধি-ভবনটি পুনর্নির্মিত হয়। গৌড়ের কাছে গঙ্গারামপুরে মৌলানা আতার দরগায় তিনি একটি মসজিদ তৈরী করান। নূর কুৎব্ আলমের সমাধি-ভবনের শিলালিপিতে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। অথচ সব ইতিহাস-গ্রন্থেই লেখা আছে তিনি ধার্মিক লোকদের হত্যা করতেন!

৮৯২ হিজরায় বাংলা দেশে হাব্‌শী-রাজত্ব সুরু হয়। ৮৯৮ হিজরায় মুজঃফর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা শেষ হল। পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে হাব্‌শীদের বাংলা দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে যারা এদেশের প্রথম শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায়, ত্রিশ বছরের মধ্যেই তাদের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ ও তার ঠিক পরেই সদলবলে বিদায়গ্রহণ—দুইই নাটকীয় ব্যাপার। এই হাব্‌শীদের মধ্যে সকলেই যে খারাপ লোক ছিল না, তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করে দেখিয়েছি। এখানে তার পুনরুক্তি না করে আর একটি বিষয়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। অনেকেই লিখেছেন যে হাব্‌শীদের দৌরাত্ম্যের ফলে ১৪৮৭ থেকে ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে পরপর অনেকগুলি রাজা নিতান্ত অল্প সময় রাজত্ব করার পরে নিহত হন। কিন্তু আসলে এই ব্যাপারের জন্যে হাব্‌শীদের চেয়ে পাইকরাই বেশী দায়ী। বিভিন্ন রাজার আততায়ীরা (তারা সকলেই হাব্‌শী নয়) এই পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই রাজাদের হত্যা করেছে। বলা বাহুল্য, পাইকেরা হাব্‌শী নয়, তারা এদেশেরই লোক। জলালুদ্দীন ফতে শাহকে হত্যা করে যে দুরাত্মা গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে, সেই সুলতান শাহজাদা ফিরিশ্‌তার মতে পাইকদের সর্দার ছিল।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে বাংলার হাব্‌শীদের মধ্যে এই কজন প্রধান ছিলেন :—

কাফুর, কোয়ারানকুল, ফিরুজ, ফিরুজা, আল্‌মাস, ইয়াকুৎ, হাব্‌স্ খাঁ, আন্দিল এবং সিদ্দিবদর।

এঁদের মধ্যে কাফুর, হাব্‌স্ খান, আন্দিল এবং সিদ্দি বদরের নাম অন্যান্য সূত্রে পাওয়া যায়। কাফুর ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কারণ ঢাকা জেলার রামপালের এক মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহের

রাজত্বকালে ৮৮৮ হিজরার রজব মাসে মালিক কাফুর ঐ মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। হাব্‌স্‌ খানের নাম 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'এ পাওয়া যায়, এই দুই বইয়ের মতে ইনি দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকে রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন। মালিক আন্দিল ও সিদ্দিবদর যথাক্রমে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ ও শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহ নাম নিয়ে বাংলার সুলতান হন বলে বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে লেখা আছে। রজনীকান্ত চক্রবর্তী অন্য যে সমস্ত হাব্‌শীর নাম করেছেন, তাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

অবতরণিকা

মোগল-পূর্ববর্তী যুগে বাংলাদেশে যে সমস্ত স্বাধীন সুলতানের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহই সবচেয়ে বিখ্যাত। এঁদের ভিতর একমাত্র তাঁর নামই জনতার স্মৃতিতে আজও অম্লান। অন্য সুলতানদের নাম বেঁচে আছে শুধু ইতিহাসের পাতায়, ইতিহাসরসিক ভিন্ন তাঁদের খবর বিশেষ কেউ রাখেন না। কিন্তু হোসেন শাহের নাম সাধারণ লোকের কাছেও পরিচিত। বাংলাদেশ ও তার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে হোসেন শাহ সম্বন্ধে যে কত কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সীমা নেই। ব্লকম্যান লিখেছেন, "The name of Husain Shah, the good, is still remembered from the frontier of Orissa to the Brahmaputra."

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের এই খ্যাতির প্রধান কারণ তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। এ ছাড়া এর আরও কয়েকটি কারণ আছে। সেগুলি এই,

(ক) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যের আয়তন ছিল অত্যন্ত বিরাট, পূর্ববর্তী সুলতানদের রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। এই কারণে তাঁর খ্যাতির প্রসার-ক্ষেত্র স্বভাবতই বিস্তীর্ণ হয়েছে।

(খ) আলাউদ্দীন হোসেন শাহের যত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন আছে, এত বাংলার আর কোন সুলতানের নেই। এ পর্যন্ত তাঁর অজস্র শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সমসাময়িক বা ঈষৎ পরবর্তী যুগে রচিত বহু গ্রন্থেই তাঁর নাম পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণও তাদের মধ্যে মেলে।

(গ) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বঙ্গাধিপ। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলা তার রাজত্বকালেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইজন্য চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গের সঙ্গে তার নামটিও যুক্ত হয়ে বাঙালীর স্মৃতিতে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশের কৃপণা ইতিহাস-লক্ষ্মী এত বিখ্যাত একজন নরপতিকেও তাঁর প্রসাদ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অন্য সুলতানদের

মত আলাউদ্দীন হোসেন শাহেরও প্রামাণিক আনুপূর্বিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।
তার ফল হয়েছে এই যে আগেকার লোকে যেমন হোসেন শাহের ইতিহাস বলতে জানত কয়েকটি গালগল্প, তেম্নি এখনকার যুগের লোকেদের, এমন কি গবেষকদের মনেও হোসেন শাহ সম্বন্ধে নিতান্ত অস্পষ্ট একটা ধারণা রয়েছে, যার মধ্যে সত্যের চাইতে কল্পনার পরিমাণই বেশী। মধ্যযুগের বাংলার সংস্কৃতি,: সাহিত্য, ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনায় আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রসঙ্গ প্রায়ই এসে পড়ে। সেক্ষেত্রে এঁরা এই সব অস্পষ্ট ধারণারই বারবার পুনরাবৃত্তি করেন।

সেইজন্যে আজ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা ও সর্বসাধারণের সামনে তাকে তুলে ধর্‌বার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী হয়ে পড়েছে। নানা ভেজালের মধ্য থেকে আসল তথ্যকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও আমাদের সেই চেষ্টাই করতে হবে।

আরবী, ফার্সী, বাংলা, সংস্কৃত, উড়িয়া, অসমীয়া, অবধী, পর্তুগীজ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় লেখা নানা সূত্রে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন সংবাদ পাওয়া যায়। হোসেন শাহের শিলালিপিগুলি সবই আরবী ভাষায় লেখা। ফার্সী গ্রন্থগুলির মধ্যে তবকাৎ-ই- আকবরী, আইন-ই আকবরী, তারিখ-ই ফিরিশ্‌তা, এবং রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন উল্লেখযোগ্য। এদের ভিতরে একমাত্র রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনেই হোসেন শাহ সম্বন্ধে কতকটা বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। অর্বাচীন হলেও এই বিবরণীর একটা গুরুত্ব আছে, কারণ এর কতকাংশ নির্ভরযোগ্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত, সুতরাং অন্যান্য অংশকেও বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দু'একটি সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থে ও ফার্সী পুঁথির পুষ্পিকায় হোসেন শাহের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা বইগুলির মধ্যে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী রচিত মহাভারতে হোসেন শাহ সম্বন্ধে অল্পস্বল্প তথ্য মেলে, অন্য কয়েকখানি গ্রন্থে হোসেন শাহের নাম মাত্র পাওয়া যায়। কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে খুব সামান্য সংবাদ পাওয়া যায়। উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জী, আসামের বুরঞ্জী এবং ত্রিপুরার রাজমালায় হোসেন শাহের সঙ্গে ঐসব দেশের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়, এইসব সূত্র খুব মূল্যবান হলেও এদের মধ্যে দুটি ত্রুটি রয়েছে; এগুলি সমসাময়িক নয় এবং এদের বর্ণনা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট। অবধী ভাষায় লেখা কুতবনের

'মৃগাবতী'তে হোসেন শাহের নাম মেলে, কিন্তু তিনি কোন্ হোসেন শাহ, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। এই সময়ের কয়েকজন পর্তুগীজ ভাগ্যান্বেষী বা পর্যটকের লেখা ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং জোআঁ দে বারোস প্রভৃতি পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের লেখা গ্রন্থে বাংলার রাজা সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ আছে। মোটামুটিভাবে এই সমস্ত সূত্রের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই আমরা এই বিশ্রুত নরপতির ইতিহাস পুনর্গঠন করার চেষ্টা করব।

এখন আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাক্।

পূর্ব-ইতিহাস

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সৈয়দবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একথা তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপিতে এবং সমস্ত প্রামাণিক সূত্রে পাওয়া যায়। তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে জানা যায়, তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আশরফ অল-হোসেনী। কিন্তু তাঁর সিংহাসন লাভের আগেকার ইতিহাস সম্বন্ধে খুব বেশী সংবাদ পাওয়া যায় না। স্টুয়ার্টের মতে হোসেন আরবের মরুভূমি থেকে বাংলায় এসেছিলেন। রিয়াজ-রচয়িতা কোন এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পেয়েছিলেন—হোসেন শাহ তাঁর পিতা আশ্-রফ অল-হোসেনী ও ভ্রাতা য়ুসুফের সঙ্গে সুদূর তুর্কিস্থানের তারমুজ শহর থেকে বাংলায় এসে রাঢ়ের চাঁদপুর মৌজায় বসতি স্থাপন করেন; সেখানকার কাজী তাঁদের দুই ভাইকে শিক্ষা দেন এবং তাঁর উচ্চ বংশমর্যাদার কথা জেনে তাঁর সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেন। রাঢ়ের চাঁদপুর এবং তার আশ-পাশের বিভিন্ন গ্রামে হোসেন শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকের বহু শিলালিপি পাওয়া যায়। চাঁদপুর অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে ব্যাপক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একটি বহুপ্রচলিত কিংবদন্তী এই। বাল্যকালে সৈয়দ হোসেন চাঁদপুরের এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাখালের কাজ করতেন। বাংলার সুলতান হয়ে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে মাত্র এক আনা খাজনায় চাঁদপুর গ্রামখানি ভোগ করার অধিকার দেন। তার ফলে গ্রামটি আজও পর্যন্ত একানী চাঁদপুর নামে পরিচিত। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁর বেগম ঐ ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট করার জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তার ফলে ব্রাহ্মণ গরুর মাংস খেতে ও মুসলমান হতে বাধ্য হন। রিয়াজ-উস্-সলাতীনে উল্লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকার

বিবরণ, বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসানের প্রথম জীবন সংক্রান্ত একটি সুপ্রচলিত কাহিনী এবং নীচে উল্লিখিত সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনীকে জোড়াতালি দিয়ে মিলিয়ে এই কিংবদন্তীর সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জাতীয় কিংবদন্তী কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু চাঁদপুর অঞ্চলের সঙ্গে হোসেন শাহের যে প্রথম জীবনে সম্পর্ক ছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' মধ্যলীলা ২৫শ পরিচ্ছেদে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পূর্বজীবন সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি এই। রাজা হবার অনেক আগে সৈয়দ হোসেন "গৌড়-অধিকারী" (বাংলার রাজধানী গৌড়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা—District magistrate জাতীয়) সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে চাকরী করতেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে এক দীঘি কাটানোর কাজে নিয়োগ করেন এবং তাঁর কাজে ত্রুটি হওয়ায় তাঁকে চাবুক মারেন। পরে সৈয়দ হোসেন সুলতান হয়ে সুবুদ্ধি রায়ের পদমর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী একদিন তাঁর দেহে চাবুকের দাগ আবিষ্কার করে সুবুদ্ধি রায়ের চাবুক মারার কথা জানতে পারেন এবং সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণবধ করার জন্য হোসেন শাহকে অনুরোধ করেন। সুলতান তাতে সম্মত না হওয়ায় তাঁর স্ত্রী সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করতে বলেন। হোসেন শাহ তাতেও প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে করোয়ার (বদনার) জল মুখে ঢেলে দিয়ে তিনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করছি,

পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী।
হুসন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী॥
দীঘি খোদাইতে তারে মনসার কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল।
পাছে যবে হুসন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাঢ়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়ে মারিবারে কহে রাজস্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥

স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইহো নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, প্রায় ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে যান এবং ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত এই বিবরণ মূল্যবান, কারণ কৃষ্ণদাস দীর্ঘকাল সনাতন ও রূপের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। সনাতন ও রূপ দুজনেই হোসেন শাহের অমাত্য ছিলেন, সুলতানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গেও তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। কৃষ্ণদাস তাঁদেরই কাছে শুনে হোসেন শাহের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করেছেন বলে মনে হয়। তাই তাঁর প্রদত্ত বিবরণের গুরুত্ব অবিসংবাদিত। তাছাড়া যে সুবুদ্ধি রায় এই কাহিনীর নায়ক, তিনিও শেষ জীবনে বৃন্দাবনেই বাস করতেন। কৃষ্ণদাসের পক্ষে বৃন্দাবনে প্রথম এসে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা ও তাঁরই কাছে এই কাহিনী শোনা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আর স্বয়ং সুবুদ্ধি রায়ের সাক্ষাৎ যদি তিনি নাও পেয়ে থাকেন, তাহলেও সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বহু লোকের সাক্ষাৎ তিনি বৃন্দাবনে পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বিবরণ যথার্থ বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

ফিরিশ্‌তার মতে আলাউদ্দীন অর্থাৎ হোসেন শাহের পূর্ব-নাম ছিল "সৈয়দ শরীফ মক্কী"। এর থেকে 'রিয়াজ'-রচয়িতা গোলাম হোসেন অনুমান করেছিলেন যে হোসেন শাহের পিতা মক্কার শরীফ ছিলেন। কিন্তু ফিরিশ্‌তার উক্তি বা গোলাম হোসেনের অনুমানের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্টই লিখেছেন যে হোসেন শাহের পূর্ব নাম ছিল "হুসন খাঁ সৈয়দ"।

এখন এই প্রসঙ্গে আর একটি বিবরণীর বিচার করা দরকার। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ দে বারোস তাঁর 'দা এশিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন যে পর্তুগীজদের চট্টগ্রামে আগমনের একশ' বছর আগে কোন এক সম্ভ্রান্তবংশীয় আরব বণিক অদন (এডেন) থেকে ২০০ জন লোক সঙ্গে নিয়ে বাংলায় আসেন। রাজ্যের অবস্থা দেখে তিনি এই রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা করতে থাকেন। নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে তিনি ব্যবসায়ী বলে নিজের পরিচয় দেন এবং এই অছিলায় দেশ

থেকে আরও ৩০০ জন আরবকে আনিয়ে নিজের দল ভারী করেন। তখন মন্দারিজরা (?) ঐ স্থানের শাসনকর্তা ছিল। তাদের প্রভাবে তিনি বাংলার রাজার সঙ্গে পরিচিত হতে সমর্থ হন। ঐ সময়ে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। ঐ আরব বণিক বাংলার রাজাকে তাঁর বংশগত শত্রু উড়িষ্যার রাজাকে দমন করতে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের জন্য তিনি রাজার দেহরক্ষি-দলের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। কিছুদিন পরেই বাংলার রাজাকে বধ করে তিনি নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (J. A. S. B., 1873, Pt. I, p. 287 দ্রষ্টব্য)

অনেকের মতে এই কাহিনীতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কথাই বলা হয়েছে, অর্থাৎ ঐ আরব বণিক হোসেন শাহ। কিন্তু এই মত স্বীকার করা যায় না। কারণ প্রথমত, জোআঁ-দে-বারোস লিখেছেন যে এই ঘটনা পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আসার একশ বছর আগে ঘটেছিল, আর হোসেন শাহ চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের প্রথম আসার সময়েই (১৫১৭ খ্রীঃ) সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা চট্টগ্রামে কুঠি ও শুল্কগৃহ স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত, হোসেন শাহের পূর্ববর্তী রাজা মুজঃফর শাহের রাজত্বকাল মাত্র দুই বছরের মত। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উড়িষ্যার রাজাকে দমন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। উড়িষ্যারাজ তাঁর বংশগত শত্রুও নন। তৃতীয়ত, জোআঁ-দে-বারোসের বিবরণী হোসেন শাহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করলে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে। হোসেন শাহের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি বেশী প্রামাণিক, কারণ কৃষ্ণদাস হোসেন শাহের কয়েকজন বিশিষ্ট অমাত্যের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন; তাছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যৌবনকাল অবধি তিনি এদেশেই ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের আগে সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং গৌড় শহরের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে তিনি সামান্য চাকরী করতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সিংহাসনে আরোহণের বহুদিন আগে থাকতেই হোসেন বাংলাদেশে ছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় আরব বণিক হোসেন শাহের লোকজন নিয়ে এদেশে আসা,

ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিয়ে রাজ্যজয়ের চেষ্টা করা, মল্লারিজ(?)-এর সাহায্যে বাংলাদেশের রাজার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার সিংহাসন অধিকার করা—প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তির কোন সামঞ্জস্যই করা যায় না। অথচ কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষ্যকে উড়িয়ে দেবার কোন উপায়ই নেই।

জোআঁ-দে-বারোস যে আরব বণিকের কথা বলেছেন, তাঁর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। জোআঁ-দে-বারোস হোসেন শাহের পূর্ববর্তী কোন গৌড়-সুলতানের সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে একটি (সম্ভবত কাল্পনিক) জনশ্রুতি শুনে সেটিকে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। জোআঁ-দে-বারোস কোনদিন বাংলাদেশে আসেননি, সুতরাং তাঁর সংগ্রহ করা এই জনশ্রুতির বিশেষ কোন মূল্য নেই এবং হোসেন শাহের সঙ্গে এই জনশ্রুতির কোনই সম্পর্ক নেই।

সুতরাং হোসেন শাহ যে আসলে কোথাকার লোক ছিলেন, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত করার উপায় দেখা যাচ্ছে না। তবে তিনি যে বাইরে থেকেই এসেছিলেন, একথা বলার স্বপক্ষে কোনই প্রমাণ নেই। এমনও হতে পারে, তিনি বাংলাদেশেরই লোক ছিলেন। ফ্রান্সিস বুকানন রংপুর জেলার যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে তিনি লিখেছেন যে হোসেন রংপুরের বোদা বিভাগের দেবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (Martin's Eastern India, Vol. III, p. 448 দ্রষ্টব্য)। রামপ্রাণ গুপ্ত লিখেছেন, "তাঁহার (হোসেনের) মাতা হিন্দু ছিলেন, এরূপ জনপ্রবাদও বিরল নহে।" (রিয়াজ-উস্-সলাতীন, বাংলা অনুবাদ, পৃঃ ১২৩, পাদটীকা)

হোসেন শাহ আরব বা তুর্কিস্তান থেকে বাংলায় এসেছিলেন বলে আমার মনে হয় না। তাঁর গাত্রবর্ণ সম্বন্ধে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য থেকে যে আভাস পাই, তাতে তাঁকে ঐসব অঞ্চলের লোক বলে মনে হয় না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে একদিন "ম্লেচ্ছ রাজা" হোসেন শাহের চিকিৎসক মুকুন্দ যখন তাঁর চিকিৎসা করছিলেন, তখন রাজার মাথার উপরে একজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধরলে মুকুন্দ কৃষ্ণকে স্মরণ করে প্রেমাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এর থেকে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন, "হোসেন শাহার রঙ খুব কালো ছিল। তাই মাথার উপরে ময়ূরপুচ্ছের পাখা ধরিতেই মুকুন্দের কৃষ্ণস্মৃতিজনিত

ভাববিহ্বলতা আসিয়াছিল কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে হোসেন শাহ সম্বন্ধে লিখেছেন,

নৃপতি হোসেন শাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েত যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈব (হৈল ?) যেন কৃষ্ণ অবতার॥

এই প্রশস্তিতে কবি হোসেন শাহকে কৃষ্ণ অবতারের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এর থেকেও মনে হয়, হোসেন শাহের গায়ের রং কালো ছিল। কিন্তু আরব বা তুর্কিস্থানের লোকেরা কালো হয় না, ফরশা হয়।

এই সমস্ত বিষয় থেকে আমাদের মনে হয়, হোসেন শাহ আরব বা তুর্কিস্থান বা বাইরের অন্য কোন অঞ্চল থেকে এদেশে আসেন নি। তিনি আসলে ছিলেন বাংলাদেশেরই সন্তান এবং অন্য বহু বাঙালীর মত তাঁরও গাত্রচর্ম ছিল কৃষ্ণবর্ণ। অবশ্য এটা আমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু এর বিপক্ষেও কোন প্রমাণ নেই। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে তাঁর সমসাময়িক বাংলার রাজা এবং হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহকে "নসরৎ শাহ বঙ্গালী" নামে অভিহিত করেছেন। এতদিন পর্যন্ত গবেষকেরা হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহ অবাঙালী ছিলেন এই বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে বাবর "বঙ্গালী" অর্থে 'বাংলাদেশের রাজা' বুঝিয়েছেন বলে মনে করেছেন। কিন্তু এখন পূর্বোল্লিখিত বিষয়গুলি থেকে মনে হয় বাবরের উক্তিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহ সত্যিসত্যিই "বঙ্গালী" ছিলেন না, একথা মনে করবার কোন কারণ নেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে হোসেন শাহ যদি বাঙালীই ছিলেন, তাহলে তিনি আরব বা তুর্কিস্থান বা বাইরের আর কোন অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, এরকম প্রবাদ রটল কেন? তার কারণ সম্বন্ধে আমার যা মনে হয়, তা সংক্ষেপে বলছি। হোসেন শাহ সৈয়দবংশীয় ছিলেন। সৈয়দরা হজরৎ মুহম্মদের বংশধর বলে পরিচিত। সুতরাং যিনিই সৈয়দ হবেন, তিনিই আরব বা আশপাশের কোন অঞ্চল থেকে আসবেন, পরবর্তী কালের লোকের মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সৈয়দ বংশের লোকরা অন্তত পক্ষে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় আসা সুরু করেছিলেন। তাঁরা এদেশের মেয়ে বিয়ে করতেন এবং নিজেদের ছেলে-মেয়েদের এদেশের মেয়ে ও ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিতেন। তাঁদের বংশধররা

দুই শতাব্দীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এদেশেরই লোক হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল ও বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালা পড়লে বোঝা যায়, ঐ সময়ে বাংলা দেশে বহু সৈয়দ বাস করতেন। হোসেন শাহও বোধহয় এই রকমই একজন সৈয়দ। তাঁর পূর্বজীবন-সংক্রান্ত তথ্য এই ধারণারই অনুকূল। যে সমস্ত সৈয়দ দু' এক পুরুষের মধ্যে বাইরে থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তাঁদের খাতির এদেশে স্বতন্ত্র ধরণের ছিল বলে মনে হয়। হোসেন এই শ্রেণীভুক্ত হলে তাঁকে "কাফের" সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে সামান্য চাকরী করা, দীঘি কাটা এবং সুবুদ্ধি রায়ের কাছে চাবুক খাওয়ার হীনতা স্বীকার করতে হত বলে বোধ হয় না। সেই জন্যে আমার মনে হয়, হোসেন শাহ বাইরে থেকে বাংলায় আসেন নি, তিনি বাঙালীই ছিলেন। এদেশের লোক হওয়ার ফলেই বোধহয় তাঁর পক্ষে হাব্‌শী মুজঃফর শাহের বিরুদ্ধে দল গঠন করা এবং তাঁকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছিল।

যাহোক্, হোসেন শাহের পূর্ব-পরিচয় ও প্রথম জীবন সম্বন্ধে এই তিনটি তথ্য নিশ্চিতভাবে জানা যায়,

(১) তিনি সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আশরফ অল-হোসেনী।

(২) রাঢ়ের চাঁদপুর অঞ্চলে তাঁর প্রথম জীবনের কিছু সময় কেটেছিল।

(৩) তিনি গৌড়ের শাসনকর্তা বা "অধিকারী" সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কিছু-দিন চাকরী করেছিলেন। সুবুদ্ধি রায় তাঁকে দীঘি কাটাবার ভার দিয়েছিলেন এবং তাঁর কাজে গাফিলতি হওয়ায় সুবুদ্ধি রায় তাঁকে চাবুক মেরেছিলেন।

হোসেন শাহের পিতা ভিন্ন আর কোন পূর্বপুরুষের নাম এ পর্যন্ত জানা যায় নি। ফ্রান্সিস বুকাননের মতে হোসেন শাহের পিতামহের নাম ছিল সুলতান ইব্রাহিম; তিনি বাংলার সুলতান ছিলেন, গণেশের পুত্র জলালুদ্দীন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নেন। অতঃপর ইব্রাহিমের পরিবার কামতাপুর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর ৭৬ বছর পরে তাঁর পৌত্র হোসেন আবার পূর্বপুরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু এই সব কথা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রথমত যে সুলতান ইব্রাহিমের সঙ্গে জলালুদ্দীনের সংঘর্ষ ঘটেছিল, তিনি বাংলার সুলতান নন, জৌনপুরের সুলতান এবং তিনি সৈয়দবংশীয় নন। দ্বিতীয়ত এই সুলতান ইব্রাহিম জলালুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন নি, তিনি জলালুদ্দীনের সঙ্গে সংঘর্ষের, এমন কি জলালুদ্দীনের মৃত্যুর পরেও জীবিত ও

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয়ত বাংলার সুলতানদের মধ্যে কারও নামই ইব্রাহিম ছিল বলে জানা যায় না। অতএব সুলতান ইব্রাহিম নামক কোন ব্যক্তি হোসেন শাহের পিতামহ ছিলেন না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সিংহাসন লাভের আগে

সিংহাসন অধিকারের আগে যে সৈয়দ হোসেন শেষ হাব্‌শী সুলতান মুজঃফর শাহের উজীর ছিলেন, একথা বিভিন্ন ফার্সী বিবরণীতে পাওয়া যায়। এই উক্তিকে সত্য বলেই মেনে নেওয়া যেতে পারে, কারণ যার তার পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার সিংহাসন অধিকার করা এবং সর্বসাধারণের কাছে, বিশেষত শক্তিশালী অমাত্যদের কাছে রাজা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব নয়। 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে সৈয়দ হোসেনের পরামর্শেই মুজঃফর শাহ সৈন্যদের বেতন কমিয়ে দিয়ে রাজকোষে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করতে সমর্থ হন। এইভাবে হোসেন অর্থলোভী মুজঃফরের সন্তোষ ও আস্থা অর্জন করেন। এই দুই বইয়ে এও লেখা হয়েছে যে, রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুজঃফর শাহ প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করেন। এ কাজও তিনি সৈয়দ হোসেনের পরামর্শে করেছিলেন কিনা, তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। মুজঃফর শাহকে সকলের বিরাগভাজন করে নিজের ক্ষমতা-লাভের পথ প্রশস্ত করবার জন্যে এরকম পরামর্শ দেওয়া হোসেনের পক্ষে অসম্ভব নয়। হোসেন ছিলেন কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক আর মুজঃফর শাহ সম্ভবত ছিলেন স্বল্পবুদ্ধি ও অনভিজ্ঞ প্রকৃতির লোক।

তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন-এ মুজঃফর শাহকে ঘোরতর অত্যাচারী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর অত্যাচারের যে বিবরণ এই সমস্ত বইয়ে দেওয়া হয়েছে, তার সবটাই সত্য কিনা বলা শক্ত। এইসব বইতে মুজঃফর শাহকে যে এই রকম একজন ঘৃণিত চরিত্রের অত্যাচারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এর মূলে হয় তো রয়েছে হোসেন শাহ ও তাঁর পক্ষের লোকদের প্রচার। সর্বদেশ ও সর্বকালের ইতিহাসে দেখা যায়, যিনি কোন রাজাকে উচ্ছেদ করে সিংহাসন জবরদখল করেন, তিনিই পূর্ববর্তী রাজার বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটান এবং কালক্রমে তাই ইতিহাসে স্থান পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে তৃতীয় রিচার্ডের বেলায় এরকম হয়েছে। অবশ্য মুজঃফর শাহও তাঁর প্রভুকে বধ করে রাজা হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যে মহাপুরুষ

প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁকে যতটা অত্যাচারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সবটাই বোধহয় সত্য নয়। তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনের মতে হোসেন যে সময় মুজঃফর শাহের উজীর ছিলেন, তখনই সকলের মনে মুজঃফর শাহ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য প্রচার চালাতেন। এই দুই বইয়ের মতে উজীর থাকার সময় হোসেন জনসাধারণের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন এবং তাঁদের কাছে নিজেকে খুব ভাল লোক বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন। তিনি নাকি তাদের বলতেন (ফিরিশ্‌তার ভাষায়) "মুজঃফর শাহ অত্যন্ত নীচ ও কৃপণ প্রকৃতির লোক। যদিও আমি তাঁকে সৈন্যদের প্রতি উদার ব্যবহার করতে পরামর্শ দিই, তাতে ফল হয় না। সব সময়ে তিনি ধন সঞ্চয়ে ব্যস্ত।" অথবা (রিয়াজের ভাষায়) "মুজঃফর শাহ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাঁর ব্যবহার কর্কশ। যদিও আমি তাঁকে সৈন্য ও অমাত্যদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিই, তাতে কোনই ফল হয় না। তাঁর ঝোঁক খালি অর্থসংগ্রহের দিকে।" এই জাতীয় কথা যদি তিনি সত্যিই বলে থাকেন, তাহলে তাঁর সততা ও সরলতা সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ জাগতে বাধ্য। একদিকে সৈন্যদের বেতন কমাবার জন্যে মুজঃফর শাহকে পরামর্শ দেওয়া, অপরদিকে বিশেষভাবে সৈন্য ও অমাত্যদের কথা উল্লেখ করে সাধারণের কাছে এই সব উক্তি করা—এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে হোসেন কতবড় কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। এই সব বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য হোক্ বা না হোক্, মন্ত্রী থাকার সময় হোসেন যে তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাঁকে সকলের বিরাগভাজন করে তোলার জন্যে সব সময় প্রচার করতেন এবং সৈন্য ও অমাত্যদের দলে টানবার চেষ্টা করতেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। বলা বাহুল্য, তাঁর এই আচরণ বিশেষ প্রশংসনীয় নয়। অবশ্য প্রভুহন্তা মুজঃফর শাহের বিরুদ্ধে হোসেনের এই ষড়যন্ত্র "শঠে শাঠ্যং সমাচরয়েৎ" নীতির অনুসরণ বলেই ক্ষমার্হ। ফিরিশ্‌তার মতে আমীরেরা তাঁকে সদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন বলে মনে করে নিজেদের নেতৃত্বে বরণ করেন। ফিরিশ্‌তা ও গোলাম হোসেন প্রধানত মুহম্মদ কন্দাহারীর উক্তির উপর নির্ভর করে লিখেছেন যে মুজঃফর শাহের অত্যাচারের ফলে পরিণামে অধিকাংশ অমাত্যই তাঁকে পরিত্যাগ করেন এবং হোসেনের নেতৃত্বে তাঁরা মুজঃফর শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু 'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ'-এই লেখা আছে যে দীর্ঘ চার মাস ধরে দুই পক্ষের মধ্যে

যুদ্ধ চলেছিল এবং বহু লোক হতাহত হয়েছিল, শেষ যুদ্ধে এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক নিহত হয়েছিল। সুতরাং মুজঃফর শাহের পক্ষেও যে বিরাট সংখ্যক লোক ছিল তা বোঝা যায়।

তবকাৎ-ই-আকবরীতে হোসেনের প্রভুহত্যা ব্যাপারটিকে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে গৌরবজনক কিছু নেই। এতে বলা হয়েছে হোসেন পাইকদের সর্দারকে ঘুষ দিয়ে হাত করে কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে মুজঃফর শাহের অন্তঃপুরে ঢুকে তাঁকে হত্যা করেন। 'মাসির-ই-রহিমী'তেও এই কথা লেখা আছে।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে যে মুজঃফর শাহের মৃত্যুর পরে প্রধান অমাত্যেরা নতুন রাজা নির্বাচনের জন্য পরিষৎ আহ্বান করেন। সেখানে সকলে সমবেত হন। তাঁরা হোসেনকেই রাজা হিসাবে নির্বাচন করেন। একথায় অবিশ্বাস করার কিছু নেই। বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন যুগে রাজবংশের সন্তান না হয়েও অমাত্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে সিংহাসন লাভ করেছিলেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব। মধ্যযুগে এই সম্মান লাভ করেছিলেন সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কিন্তু ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় অমাত্যেরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হোসেনকে রাজা হিসাবে নিবাচন করেন নি, তিনি তাঁদের গৌড় নগরীর মাটির উপরের সমস্ত ধনৈশ্বর্য দেবার লোভ দেখালে তবেই তাঁরা তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে রাজী হয়েছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের সময় যে হোসেন শাহ প্রবীণ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এর মাত্র দু' বছর পরে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সিকন্দর লোদী হোসেন শাহের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, তখন হোসেন শাহের যে সৈন্যবাহিনী তাঁকে বাধা দেবার জন্য প্রেরিত হয়েছিল, তার নেতৃত্ব করেছিলেন হোসেন শাহের অন্যতম পুত্র দানিয়েল। দানিয়েল ঐ সময়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মত বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, এর থেকে তাঁর পিতা হোসেন শাহের বয়সও সহজেই অনুমান করা যায়।

সিংহাসনে আরোহণের তারিখ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে ৮৯৯ হিজরায় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ৮৯৯ হিঃ থেকে তাঁর মুদ্রা ও শিলালিপি পাওয়া

যায়। ৮৯৯ হিজরা ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর থেকে সুরু হয়েছিল। কিন্তু আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পূর্ববর্তী সুলতান মুজঃফর শাহের পাণ্ডুয়া শিলালিপির তারিখ ১৭ই রমজান, ৮৯৮ হিজরা বা ২রা জুলাই, ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। মুজঃফর শাহের ৮৯৯ হিজরার মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং মুজঃফর শাহ যে ১৪৯৩ খ্রীঃর ১২ই অক্টোবরের পরেও কিছু সময় রাজত্ব করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হোসেন শাহের প্রথম শিলালিপির তারিখ ১০ই জিল্কদ, ৮৯৯ হিজরা বা ১৩ই আগস্ট, ১৪৯৪ খ্রীঃ। ঐ তারিখের অন্তত একমাস আগে হোসেন শাহ সিংহাসনে বসেছিলেন সন্দেহ নেই। সুতরাং ১৪৯৩ খ্রীঃর নভেম্বর থেকে সুরু করে ১৪৯৪ খ্রীঃর জুলাই—এই নয় মাসের মধ্যে কোন এক সময়ে হোসেন শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহকে বধ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে রচিত সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থে এই নৃপতি শুধুমাত্র 'আলাউদ্দীন' নামে উল্লিখিত হয়েছেন, পক্ষান্তরে বাংলা সাহিত্য ও বাংলা দেশের বিভিন্ন কিংবদন্তীতে ইনি কেবলমাত্র 'হোসেন শাহ' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত শিহাবুদ্দীন তালিশের 'ফতিয়াহ-ই-ইব্রিয়াহ' বই এবং তার কিছু পরে রচিত মির্জা মুহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা' বইয়ে 'হোসেন শাহ' নাম পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র লেখক শিলালিপির সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেন যে এই রাজার 'হোসেন শাহ' নাম ছিল। মুদ্রা ও শিলালিপিতে দেখা যায়, এই রাজার পূর্ণ রাজকীয় নাম 'আলা-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল মুজঃফর হোসেন শাহ'।

সিংহাসন লাভের পরে

সিংহাসন লাভের পর হোসেন শাহের প্রথম লক্ষ্য হল নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, প্রজাদের আস্থা অর্জন করা, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন করা এবং ভালভাবে দেশ শাসন করা। এ কাজ কঠিন হলেও তাঁর মত প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং রাজনীতিকুশল নরপতির পক্ষে অসাধ্য নয়। মুজঃফর শাহের উজীর থাকবার সময়েই তিনি শাসনদক্ষতার জন্যে যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রাজ্যের যা কিছু ভালো তার জন্যে কৃতিত্ব তাঁরই এবং যা কিছু খারাপ, তার জন্যে দায়ী মুজঃফর শাহ—সকলের মনে তিনি এরকম ধারণা জন্মিয়ে দিতে সমর্থ

হয়েছিলেন—'ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ'-এর বর্ণনা পড়ে এই কথাই মনে হয়। সুতরাং তাঁর উপর প্রথম থেকেই প্রজাদের আস্থা ছিল। সুলতান হিসাবে তিনি অধিকতর শাসনদক্ষতা দেখাবেন এই বিশ্বাসে দেশের জনসাধারণ তাঁকে সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিল বলে মনে হয়।

'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা' ও 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণ ও তার অব্যবহিত পরবর্তী কার্যকলাপের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তার সারমর্ম নীচে দেওয়া হল।

যেদিন মুজঃফর শাহ নিহত হলেন, সেদিন অমাত্যেরা রাজা নির্বাচনের জন্যে একটি পরিষৎ আহ্বান করলেন এবং সৈয়দ হোসেনের নির্বাচন সম্বন্ধে অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করে বললেন, "আমরা যদি আপনাকে রাজা হিসাবে নির্বাচন করি, তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করবেন?" হোসেন বললেন, "আপনাদের সব ইচ্ছা আমি পূরণ করব। এই শহরে মাটির উপরে যা কিছু পাওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে তা আমি আপনাদের দেব, কিন্তু মাটির নীচে যা আছে সব আমি নিজে নেব।" তখন সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোক এই প্রলোভনজনক প্রস্তাবে রাজী হয়ে ধনের লোভে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে যা এই সময় কায়রোকেও অতিক্রম করেছিল, সেই গৌড় নগরী লুঠ করতে লাগলেন। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার কয়েক দিন পরে হোসেন শাহ তাঁদের লুঠ বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু তাঁরা বন্ধ না করাতে তিনি বারো হাজার লুণ্ঠনকারীকে বধ করলেন। তখন অন্যেরা লুঠ বন্ধ করল। কিন্তু গৌড়ের মাটির নীচের সম্পত্তি নিজে লুঠ করে নিতে তিনি ছাড়লেন না। তিনি অনুসন্ধান করে তের শো সোনার থালা সমেত বহু গুপ্তধন পেলেন। তখনকার দিনে বাংলার ধনী লোকেরা সোনার থালায় খেতেন এবং উৎসবের দিনে যিনি যত বেশী সোনার থালা বার করতেন, তিনিই বেশী মর্যাদা লাভ করতেন। গৌড়ের এই জাতীয় বহু ধনী ব্যক্তির এতগুলি সোনার থালা এখন হোসেন শাহ হস্তগত করলেন।

এই সব বিবরণ পড়লে মনে হয় হোসেন শাহ নানা রকম ক্রূর কূটনীতি, হীন চাতুরী এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের মধ্য দিয়ে রাজা হয়েছিলেন ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

'তবকাৎ-ই-আকবরী', 'তারিখ-ই-ফিরিশতা' এবং 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' লেখা আছে যে হোসেন রাজা হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে পরিপূর্ণ শান্তি ও

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। পাইকরা বহু রাজাকে হত্যা করেছিল। পাইকদের উপরে প্রাসাদ-রক্ষার ভার না রেখে তিনি অন্য রক্ষি-দল নিযুক্ত করলেন এবং পাইকদের দল একেবারে ভেঙে দিলেন। এর আগে হাবশীদের মধ্যে অনেকেই নানারকম দুর্বৃত্ততার পরিচয় দিয়েছিল এবং রাজদ্রোহ ও রাজহত্যা করার জন্যে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজের মতে হোসেন শাহ সমস্ত হাব্‌শীকে চাকরী থেকে বরখাস্ত এবং তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন। তারা জোনপুর রাজ্যে বা উত্তর ভারতের কোথাও স্থান না পেয়ে গুজরাট ও দক্ষিণভারতে চলে গেল। তাদের বদলে হোসেন শাহ সৈয়দ, মোগল ও আফগানদের উচ্চপদে নিয়োগ করলেন।

এই সব বিবরণের খুঁটিনাটিগুলি সত্য হওয়াই সম্ভব। মূল বিষয়টি অর্থাৎ হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের অল্প কালের মধ্যেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কথাটি যে সর্বাংশে সত্য, সে সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। তার কথা একটু পরেই বলছি। তার আগে একটি মতের বিচার করা দরকার। জনৈক গবেষক লিখেছেন, "Even the earliest part of Husain Shah's reign seems to have made an impression upon the minds of his subjects and captured their imagination to a great extent. Bijay Gupta, a contemporary of Alauddin Husain Shah, who composed in 1494-95 the epic of snake-cult popularly known as Manasā-Mangal, has spoken very much highly of the achievements of the Sultan. (I. H. Q., Vol. XXXII, pp. 58-59)। এই প্রসঙ্গে তিনি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল থেকে এই কটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন,

স্থলতান হোসেন সাহা নৃপতি-তিলক ॥
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী ॥
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসিম ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে খণ্ডেশ্বর (ঘণ্টেশ্বর)।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈগুজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল॥
কায়স্থজাতি বসে তথা লিখনের সুর।
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর॥
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥

এই বর্ণনায় হোসেন শাহের সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি এবং বিজয়গুপ্তের মাতৃভূমির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র পাওয়া যায়; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পূর্বোক্ত গবেষক লিখেছেন, "This brief description of the Hindu society tells us much about the peace and prosperity enjoyed by the Hindus under Husain Shah whose reign was marked by a spirit of tolerance and liberalism." তাছাড়া আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এই হোসেন শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নন, জলালুদ্দীন ফতে শাহ। সুতরাং বিজয়গুপ্তের এই উক্তি আলোচ্য প্রসঙ্গে আমাদের কোন কাজেই লাগবে না।

যা হোক্, হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে প্রমাণ আছে, তার উল্লেখ করছি। ১৪১৬ শকাব্দের বৈশাখ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চৈতন্যদেবের অন্যতম বাল্য-গুরু বিষ্ণু পণ্ডিতের পুত্র মহাদেব আচার্যসিংহ ভবভূতির মালতীমাধব নাটকের এক টীকা রচনা করেন। এই টীকার শেষে দুটি শ্লোক আছে। শ্লোক দুটি নীচে উদ্ধৃত হল।

অস্তি শ্রীমাজলীশবার্ব্বক ইতি খ্যাতো গুণানাং নিধি-
র্জাতো রাম ইব ক্ষিতৌ কলিযুগে সত্যাবতারেচ্ছয়া।
তস্মিন্ গৌড়মহীমহেন্দ্রসচিবশ্রেণীশিরোভূষণে
যোগক্ষেম (ম) সুক্ষণং কৃতধিয়াং নির্ব্যাজমাতন্বতি॥
শাকে ষোড়শসাগরেন্দুগণিতে গীর্বাণকল্লোলিনী-
তীরে বীরগণাস্পদে পুরি নবদ্বীপাভিধায়াং ব্যধাৎ।
বৈশাখে ভবভূতিবীরভণিতৌ গূঢ়ার্থসন্দীপনীম্
আচার্যো মতিমানিমামিহ মহাদেবঃ কৃতী টিপ্পনীম্॥
(বাঙালীর সারস্বত অবদান, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০০)

[শ্রীমজিলীশ বার্বক নামে খ্যাত গুণের নিধি আছেন, কলিযুগে সত্যাবতারের ইচ্ছায় রামের মত তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন ; সেই গৌড়রাজের সচিবদের শিরোভূষণ অকপটে অনুক্ষণ কৃতধী ব্যক্তিদের যোগক্ষেম নির্বাহ করছেন। ১৪১৬ শাকে গীর্বাণকল্লোলিনীতীরে (অর্থাৎ গঙ্গাতীরে) ধীরগণের আবাসস্থল নবদ্বীপ নামক পুরে বৈশাখ মাসে ধীর ভবভূতির কথা অনুসারে এই আচার্য মতিমান মহাদেব কৃত শুদ্ধার্থসন্দীপনী টিপ্পনী এখানে সমাপ্ত হল।]

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ হোসেন শাহের সিংহাসনারোহণের মাস কয়েক পরে নবদ্বীপের পণ্ডিত মহাদেব আচার্যসিংহ গৌড়মহীমহেন্দ্র অর্থাৎ হোসেন শাহের 'সচিবশ্রেণীশিরোভূষণ' মজিলীশ বার্বকের এই প্রশস্তি রচনা করেছেন। এই মজিলীশ বার্বক সম্ভবত নবদ্বীপ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। মহাদেব মজিলীশ বার্বককে রাম ও কলিযুগাবতার বলে প্রশস্তি করেছেন এবং বলেছেন তিনি অকপটে কৃতধী ব্যক্তিদের যোগক্ষেম সর্বদা নির্বাহ করছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, ঐ সময় নবদ্বীপ অঞ্চলে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল। না হলে নবদ্বীপের একজন পণ্ডিতের লেখায় এরকম পরিপূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ পেত না। এর থেকে হোসেন শাহের কৃতিত্বের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সিকন্দর লোদীর সঙ্গে হোসেন শাহের সংঘর্ষ

সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর রাজত্বের মধ্যে হোসেন শাহ বহু বহিঃশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন—কতকগুলির উদ্দেশ্য রাজ্যজয়, আবার কতকগুলি আত্মরক্ষামূলক। কয়েকটি ক্ষেত্রে আবার যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি সত্বেও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হয় নি। হোসেন শাহের রাজ্যাভিষেকের দু'বছর বাদে দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের সঙ্গে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহের যুদ্ধের প্রায় ১৩৭ বছর পরে এই প্রথম আবার দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে বাংলার সুলতানের সংঘর্ষ হল। মখ্‌জন্‌-উৎ-তওয়ারিখ, তবকাৎ-ই-আকবরী এবং লোদী-বংশ সংক্রান্ত সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থে এই সংঘর্ষের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এই :—

জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী ৮৮৪ হিজরা বা ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বহলোল লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও হৃতরাজ্য হয়ে বিহারে আশ্রয় নিয়ে-

ছিলেন। বহ্‌লোলের মৃত্যুর পর সিকন্দর লোদী যখন দিল্লীর সুলতান, তখন পাটনার শাসনকর্তা দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ৯০০ হিজরা বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ দমন করতে সিকন্দর লোদী পাটনায় আসেন, এই অভিযানে তাঁর বহু ঘোড়া মারা পড়ে। এই খবর পেয়ে হোসেন শাহ শর্কী সিকন্দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং কাশী পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করেন। কাশীতে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং তাতে পরাজিত হয়ে হোসেন শাহ শর্কী পালিয়ে আসেন, সিকন্দরও তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে আসেন। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তখন হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় দেন এবং ভাগলপুরের কাছে কহলগাওতে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। হোসেন শাহ শর্কী আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আত্মীয় ছিলেন, আলাউদ্দীনের পৌত্রী ও নসরৎ শাহের কন্যার সঙ্গে হোসেন শাহ শর্কীর পুত্র জলালুদ্দীন শর্কীর বিবাহ হয়েছিল। হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যে সিকন্দর লোদী বাংলার সুলতানের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ৯০১ হিজরা বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর শাহের সৈন্যদল কুৎলুঘপুর থেকে মাহ্‌মূদ খান লোদী ও মুবারক খান নুহানির নেতৃত্বে যাত্রা করল। হোসেন শাহও তাকে বাধা দেবার জন্যে তাঁর পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। বিহারের বাঢ় নামক জায়গায় দুই পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এইভাবে কিছুদিন কাটবার পরে সিকন্দর লোদী হোসেন শাহের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে স্বস্থানে ফিরে যান। সন্ধির সময় হোসেন শাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে সিকন্দর শাহের শত্রুদের তিনি ভবিষ্যতে আর তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেবেন না। এছাড়া এই সন্ধি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। এসম্বন্ধে বদাওনী মন্তখব-উৎ-তওয়ারিখে লিখেছেন যে "দুই পক্ষ নিজের নিজের রাজ্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন।" এই সন্ধির পরেও যে বিহার ও ত্রিহুতে হোসেন শাহের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল, তার প্রমাণ আছে। এইভাবে দিল্লীর পরাক্রান্ত সম্রাট সিকন্দর লোদী হোসেন শাহকে দমন করতে এসে সন্ধিস্থাপন করে ফিরে গেলেন, হোসেন শাহের প্রাধান্যও বিন্দুমাত্র খর্ব হল না। এই ব্যাপার যে হোসেন শাহের পক্ষে বিশেষ গৌরবের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই সন্ধির পরেও যে সিকন্দর শাহের সঙ্গে তাঁর পরিপূর্ণ মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, তার প্রমাণ আছে। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ অভিযান

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই রাজ্য-বিস্তারে মন দেন এবং এজন্য তাঁকে বহু যুদ্ধ করতে হয়। এখন এইসব যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। সিংহাসনে আরোহণের এক বছরের মধ্যেই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ উত্তরবঙ্গের কামতাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অভিযানের কথা নানা সূত্রে লেখা আছে। হোসেন শাহ যে এই অভিযানে সাফল্য লাভ করেন, এ সম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। কামতাপুর রাজ্য আধুনিক কুচবিহার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'বহারিস্তান-ই-গায়বী'তে লেখা আছে যে এই রাজ্যের পূর্ব-সীমা ছিল বনস (মনসা) নদী এবং অপর সীমা করতোয়া নদী। হোসেন শাহের সময়ে এই রাজ্যের রাজা খুব প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। উত্তরবঙ্গের এক বিরাট অঞ্চল এবং আসামের কামরূপ অঞ্চলের তিনি একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। হোসেন শাহ তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য নিজের অধিকারে আনেন।

হোসেন শাহ যে তাঁর রাজত্বের প্রথম বছরেই কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ ঐ বছর অর্থাৎ ৮৯৯ হিজরায় (১৪৯৩ ৯৪ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ তাঁর অনেকগুলি মুদ্রাতে তাঁর নামের সঙ্গে "কামরু-কামতা-জাজনগর-উড়িশা-বিজয়ী" উপাধি যুক্ত দেখা যায় (Catalogue of Coins, Indian Museum, Calcutta, Vol II, p. 173, Coin no. 175 : Supplement to the Catalogue of the Provincial Coin Cabinet, Shillong, p. 150, Coin no $\frac{6}{7}$, p. 152, Coin no. $\frac{6}{7}$: Catalogue of Indian coins, British Museum, p. 148, Coin no. 123 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী বছরগুলিতে উৎকীর্ণ তাঁর বহু মুদ্রাতেও এই উপাধি উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর বহু শিলালিপিতেও এই উপাধির উল্লেখ দেখা যায়, তার মধ্যে সর্বপ্রাচীন শিলালিপিটির তারিখ ১লা রমজান, ৯০৭ হিজরা (১০ই মার্চ, ১৫০২ খ্রীঃ)।

যদিও হোসেন শাহের ৮৯৯ হিঃ বা ১৪৯৩-৯৪ খ্রীঃর মুদ্রাতেই তাঁকে "কামরু (কামরূপ)-কামতা বিজয়ী" বলা হয়েছে, তাহলেও ঐ বছরেই তাঁর কামরূপ-কামতা বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আগেকার দিনে রাজারা কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশ জয় করার

দাবী জানাতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ৮৯৯ হিজরাতেই হোসেন শাহ উড়িষ্যা বিজয়ের দাবী জানিয়েছেন, কিন্তু অন্তত ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে উড়িষ্যার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ চলেছিল, তার প্রমাণ আছে এবং এই যুদ্ধে তিনি উড়িষ্যা জয় করা দূরে থাক্, কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্যই অর্জন করতে পারেন নি। সুতরাং হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা বিজয় কবে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তা বর্তমানে বলার কোন উপায় নেই। স্থানীয় কিংবদন্তীর মতে ১৪২০ শকাব্দ বা ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কামরূপ-কামতা রাজ্য জয় করেছিলেন এবং ঐ রাজ্যের রাজধানী কামতাপুর শহর বারো বছর ধরে হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার পর আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এই সব কিংবদন্তী একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মাত্র ৫ বছর আগে হোসেন শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সুতরাং বারো বছর ধরে কামতাপুর অবরোধ করে ঐ শহর অধিকার করার পরে ১৪৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে কামরূপ-কামতা রাজ্য অধিকার করতে তিনি পারেন না।

বিভিন্ন সূত্রে হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা জয়ের বিভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "তিনি কামরূপ, কামতা ও অন্যান্য অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র দেশ জয় করলেন। ঐ সব অঞ্চল আগে রূপনারায়ণ, মল কুনওয়ার, গস লখন, লছমী নারায়ণ এবং অন্যান্য শক্তিশালী রাজার অধীনে ছিল। বিজিত দেশগুলি থেকে তিনি অনেক ধন সংগ্রহ করলেন।" কিন্তু কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদগুলি বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, হোসেন শাহ বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে কামতা রাজ্য জয় করেছিলেন। এগুলিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এই। ঐ সময় কামতাপুরের রাজা ছিলেন খেন বংশীয় নীলাম্বর। তাঁর এক মন্ত্রীর পুত্র রাণীর প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রকাশ করায় রাজা তাঁকে বধ করেন এবং ঐ মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর পুত্রের মাংস খাওয়ান। মন্ত্রী তখন পাপমুক্ত হবার জন্য গঙ্গাস্নানের অছিলা করে গৌড়ে এসে হোসেন শাহের আশ্রয় নেন এবং তাঁকে কামতাপুর রাজ্য সংক্রান্ত সব খবর জানিয়ে দেন। হোসেন শাহ তখন কামতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু নীলাম্বর তাঁর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করেন। অবশেষে হোসেন শাহ মিথ্যা করে নীলাম্বরকে বলে পাঠান যে তিনি চলে যেতে চান, কিন্তু যাবার আগে তাঁর বেগম নীলাম্বরের রাণীর সঙ্গে দেখা করতে চান। নীলাম্বর তাতে রাজী হলে হোসেন শাহের শিবির থেকে তাঁর রাজধানীর ভিতরে পাল্কী যায়, তাতে স্ত্রীর

ছদ্মবেশে সৈন্য ছিল; তারা কামতাপুর নগর অধিকার করে। বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, "He (Hussain Shah) is said to have Conquered Kamrup, that is the country to the east of the upper part of the Korotoya, and to have killed its king, Harap Narayan, son of Malkongyar, son of Sada Lokymon."

উপরে উল্লিখিত তিনটি বিবরণীর কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। তিনটি বিবরণে কামরূপের রাজার নাম সম্বন্ধেই ঐক্য নেই। 'রিয়াজে' যে সব রাজার নাম উল্লিখিত হয়েছে, কামরূপ-কামতায় এইসব নামের কোন রাজা ছিলেন বলে জানা যায় না। অবশ্য 'রিয়াজে' হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা ভিন্ন অন্যান্য অঞ্চল জয় করারও উল্লেখ আছে। ত্রিহুতে হোসেন শাহের সময়ে 'রূপনারায়ণ ও 'লক্ষ্মীনারায়ণ' বিরুদ ধারী রাজারা ছিলেন বলে জানা যায়। হোসেন শাহ ত্রিহুতের অন্তত কিছু অংশ অধিকার করেছিলেন বলেই মনে হয়, কারণ ত্রিহুতের সন্নিহিত ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা ও সারণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে। ত্রিহুতের হাজিপুর যে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়। সুতারাং 'রিয়াজে'র উক্তিতে কিছু সত্য আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু হোসেন শাহের কামরূপ-কামতা বিজয় সম্বন্ধে 'রিয়াজে' কোন আলোক পাওয়া যায় না এবং মল কুনওয়ার ও গস লখন প্রভৃতি রাজাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ মেলে না। কোচবিহার অঞ্চলের প্রবাদে বর্ণিত হোসেন শাহের নীলাম্বরকে প্রতারিত করার কাহিনী সত্য হলে নীলাম্বরের নির্বুদ্ধিতা সম্ভবের সীমা অতিক্রম করে যায়। বুকাননের বিবরণীতে কামরূপের রাজা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের যে সব নাম দেওয়া হয়েছে, সেরকম অর্থহীন নাম কারও থাকতে পারে বলে ভাবা যায় না। যাহোক্, হোসেন শাহ যে কামতা-কামরূপ জয় করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। সুতরাং সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কীভাবে তিনি জয় করেছিলেন, তা আরও ভাল সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানবার কোন উপায় নেই। 'আসাম বুরঞ্জী'র কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে কোচ রাজা বিশ্বসিংহ হোসেন শাহের কাছ থেকে কামতা রাজ্য জয় করে নেন। 'বুরঞ্জী'র মতে আটগাঁওয়ের মুসলমান শাসনকর্তা "তুরকা কোতয়াল" বিশ্বসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। আমানতউল্লা আহমদের মতে ১৫১৩ খ্রীঃর পরে কামতা রাজ্য থেকে মুসলমানরা বিতাড়িত হয় (কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম

খণ্ড, পৃঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই সব মত কতদূর সত্য তা বলা যায় না, কারণ হোসেন শাহের ৯২৪ হিজরা বা ১৫১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রাতেও তাঁর "কামরূপ ও কামতা বিজয়ী" উপাধি উল্লিখিত হয়েছে।

হোসেন শাহের আসাম-অভিযান

ঐ সময়ে কামরূপের পূর্ব ও দক্ষিণে প্রাচীন আসাম বা অহোম রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্য নিতান্ত দুর্ভেদ্য ছিল। এখনকার লোকেরা বাইরের কোন লোককে তাদের দেশে প্রবেশ করতে দিত না। নিজেরা আসামে উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে বাইরের জিনিস সংগ্রহ করে আনবার জন্যে এক আধবার মাত্র বাইরে যেত। রাজ্যটি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এবং এখানে বর্ষার প্রকোপ খুব বেশী হওয়ার জন্য এখানকার রাজাদের দেশরক্ষার জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হত না। হোসেন শাহ এই অজেয় অহোম রাজ্য জয় করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়। এসম্বন্ধে সব সূত্রই একমত। গোলাম হোসেন 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লিখেছেন, "আসামের রাজা তাঁকে বাধা দিতে না পেরে দেশ (সমতল অঞ্চল) ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়ে যান। রাজা (হোসেন শাহ) তখন এক বিরাট সৈন্য বাহিনী সমেত তাঁর পুত্রকে বিজিত দেশ সম্বন্ধে করণীয় ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করবার জন্য রেখে বিজয়গৌরবে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজার প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁরা বিজিত দেশে শান্তি সংস্থাপন ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে ব্রতী হন। কিন্তু বর্ষাকাল সমাগত হলে জলপ্লাবনে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। (আসামের) রাজা তখন অনুচরবর্গ সমেত পাহাড় থেকে নেমে বিপক্ষ সৈন্যকে বেষ্টন করে যুদ্ধ করতে লাগলেন এবং তাদের রসদ সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকলকেই তিনি বধ করলেন।"

অসমীয়া বুরঞ্জীগুলিতে এ সম্বন্ধে যা লেখা আছে তার সারমর্ম এই। সুহুঙ মুঙের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম মুসলমানরা আসামে অভিযান করে। এই সময়ে বাংলার রাজা "খুনরুং" বা "খুরুং" (হুসন) আসাম আক্রমণ করেন। ২০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং অসংখ্য রণতরী এই অভিযানে যোগদান করে। বাংলার সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেন জনৈক "বড় উজীর" এবং জনৈক "বিৎ মালিক" বা "মিৎ মাণিক"। প্রথম প্রথম মুসলমানরা সহজেই

বিজয়ী হয়। তারা প্রায় বিনা বাধায় ব্রহ্মপুত্র নদ ধরে বর্তমান দরং জেলার পূর্ব সীমা পর্যন্ত উপস্থিত হয় এবং অনতিবিলম্বে বুড়াই নদীর তীর অবধি পৌছোয়। তখন আসামের রাজা মুসলমানদের প্রচণ্ড বাধা দেন। তেমেনি (ত্রিমোহণী ?)-তে দুই পক্ষের মধ্যে নৌযুদ্ধ হয়। তাতে মুসলমানরা প্রথম প্রথম জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের শোচনীয় পরাজয় হয়। "বড় উজীর" কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান।

এরপর কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকে। আসাম-রাজ দেশরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করেন এবং সিংরী, সালা ও ভৈরালী নদীর মোহনায় প্রধান প্রধান অসমীয়া সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে সৈন্যদের ঘাঁটি বসানো হয়।

এরপর আবার "বিৎ মালিক" বা "মিৎ মাণিক" এবং "বড় উজীরের" নেতৃত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসাম আক্রমণ করে। স্থলপথে এবং জলপথে অগ্রসর হয়ে তারা সিংরী পর্যন্ত পৌছোয় এবং সেখানকার ঘাঁটি আক্রমণ করে। এই ঘাঁটি বরপাত্র গোহাইনের রক্ষণাধীন ছিল। অনেকক্ষণ ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে অসমীয়া বাহিনীর সেনাপতি শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেন। "বিৎ মালিক" বা "মিৎ মাণিক" ও বাংলার বহু সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেকে বন্দী হয়। "বড় উজীর" অল্প সংখ্যক অনুচর সমেত পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। বিজয়ী অসমীয়া বাহিনী পলাতকদের বর্তমান নওগাঁ জেলার অন্তর্গত খগরিজন পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে অনেক লুঠের মাল নিয়ে জয়গৌরবে ফিরে আসেন। (Ahom Buranji from Khunlung and Khunlai : Purani Assam Buranji, p. 57 দ্রষ্টব্য)।

গেটের মতে বাংলার সৈন্যবাহিনীর এই আসাম অভিযান ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল (History of Assam, pp. 90-91, f. n. দ্রষ্টব্য) কিন্তু তা হতে পারে না, কারণ হোসেন শাহ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন না। গেটের এই অনুমানের যে কোন ভিত্তি নেই, তা সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন (Mughal North-Fast Frontier Policy, pp. 85-86, f.n. দ্রষ্টব্য)।

অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির উক্তি বিশ্লেষণ করে আমাদের ধারণা হয়েছে যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা সম্বন্ধে এদের খুঁটিনাটি বিবরণ সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। বহু অমূলক কথা এদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন, একটি অসমীয়া বুরঞ্জীতে (Assam Buranji, edited by S. K. Bhuyan, 1945) লেখা আছে যে কামতার রাজার সঙ্গে গৌড়েশ্বরের (শ্রীহট্টের একটি

অঞ্চলকে আগে 'গৌড়' বলা হত, ইনি সেখানকার রাজা হলে এই কাহিনী অংশত সত্য হতে পারে) কন্যা সুশুদ্ধি গরম কুমারীর বিবাহ হয়েছিল, পুরোহিতপুত্রের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের জন্য কামতারাজ রাণীকে প্রাসাদ থেকে বহিষ্কৃত করেন। রাণী তখন তাঁর পিতা গৌড়েশ্বরকে জানান এবং গৌড়েশ্বর কামতারাজ্য আক্রমণ করেন। কামতারাজ অহোমরাজ স্বর্গদেও সুহুমফা ডিহিঙ্গিয়া রাজা (১৪৯৭-১৫৩৯ খ্রীঃ)-র শরণাপন্ন হন। দীর্ঘকাল কামতারাজ ও অহোমরাজের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের সেনাপতি তুরবকের যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত তুরবক পরাজিত হয়ে অহোমরাজের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন।

১৬৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন্ মুহম্মদ ওয়ালী বা শিহাবুদ্দীন তালিশ নামে মোগল সরকারের একজন কর্মচারী ফতিয়াহ্-ই-ইব্রিয়াহ্ বা তারিখ-ফতে-ই-আশাম নামে একখানি বই লেখেন। বইটিতে মীরজুমলার আসাম অভিযানের বিস্তৃত ও ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়; এই বইএর এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে হোসেন শাহের আসাম অভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে। তার সারমর্ম এই। বাংলার রাজা হোসেন শাহ ২৪,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং অসংখ্য জাহাজ নিয়ে আসাম আক্রমণ করেন। আসামের রাজা তখন পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। হোসেন তখন দেশ (সমতল অঞ্চল) অধিকার করে তাঁর পুত্রকে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সঙ্গে দিয়ে সেখানে রেখে ফিরে গেলেন। কিন্তু যখন বর্ষা নামল, আসামের রাজা তখন পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতলভূমিতে নেমে এলেন এবং নিজের প্রজাদের সহায়তায় হোসেন শাহের পুত্রকে বধ করলেন ও তাঁর সৈন্য-বাহিনীকে অনাহারে রেখে দিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তাদের সবাইকে বধ বা বন্দী করলেন (J. A. S. B., 1872, pt. I, p. 79 দ্রষ্টব্য)। 'আলমগীর-নামা'তেও হুবহু এই বিবরণ আছে। এই বিবরণ 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র বিবরণকেই সমর্থন করছে।

সুতরাং হোসেন শাহের আসাম অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই আর নেই। আসাম অভিযানে হোসেন শাহের যে পুত্র নিহত হয়েছিলেন, ঐ অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তীগুলিতে তিনি "দুলাল গাজী" নামে উল্লিখিত হন। "দুলাল" সম্ভবতঃ "দানিয়েল" নামের বিকৃতি। হোসেন শাহের যে দানিয়েল নামে এক পুত্র ছিল, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মতে দুলাল গাজী হোসেন শাহের জামাতা।

আসামের "হোসেন শাহী পরগণা" নামে পরিচিত একটি অঞ্চল এখনও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের স্মৃতি বহন করছে।

উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ

হোসেন শাহ যে সমস্ত দেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে উড়িষ্যাও অন্যতম। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "আশপাশের সমস্ত রাজাকে বশীভূত করে এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত জয় করে তিনি কর আদায় করেছিলেন।" এখন হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজার যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা যাক্।

'রিয়াজ'-এর মতে হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। হোসেন শাহের মুদ্রা এবং শিলালিপিতেও দাবী করা হয়েছে যে তিনি উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি যে হোসেন শাহের অনেকগুলি মুদ্রায় তাঁর নামের সঙ্গে "কামরু-কামতা-জাজনগর-উড়িশা বিজয়ী" উপাধি যুক্ত হয়েছে এবং এই জাতীয় মুদ্রাগুলির মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে প্রাচীন, সেগুলি ৮৯৯ হিজরা বা ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল।

এই মুদ্রাগুলি ছাড়া হোসেন শাহের রাজত্ব কালের একটি শিলালিপিতেও এই কথা দেখতে পাওয়া যায়। ৯১৮ হিজরা বা ১৫১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শ্রীহট্টের শাহ জলাল দরগার এই শিলালিপিতে লেখা আছে,

"আটটি 'কাম্হার' বিজয়ী রুক্ন্ খান, যিনি নগরসমূহের উজীর এবং সেনাধ্যক্ষ [illegible]লান কামরু, কামতা, জাজনগর ও উড়িশা বিজয়ের সময়ে বাদশার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ করেছেন।" (J. A. S. B., 1922, p. 413 দ্রষ্টব্য)

শিলালিপিটিতে হোসেন শাহের নাম নেই, কিন্তু এর তারিখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এতে যে বাদশার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ভিন্ন আর কেউই নন।

এই সমস্ত মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, হোসেন শাহ উড়িষ্যা জয় করেছিলেন; ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ রাজত্বের প্রথম বছরে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং ঐ বছরেই এই বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সূত্রের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে এই ধারণা দূরীভূত হয়। ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ সুরু হয় বটে, কিন্তু ঐ বছরেই তা শেষ হয়নি,

তারও পরে দীর্ঘকাল ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলিতে উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমে এদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করব।

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস হোসেন শাহের উড়িষ্যা-অভিযানের কথা এইভাবে উল্লেখ করেছেন,

যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥
... ...
স্বভাবেই রাজা মহা কালযবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনেঘন॥
ওড্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥

চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পর বাংলা থেকে নীলাচলে যান, (জানুয়ারী, ১৫১০খ্রীঃ), তখন বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ চলছিল এবং ছত্রভোগে দুই রাজ্যের সীমানা পার হবার সময় বাংলার সীমান্তরক্ষী রামচন্দ্র খান চৈতন্যদেবকে সাহায্য করেছিলেন বলে বৃন্দাবনদাস জানিয়েছেন। চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাপ্রভুর প্রতি রামচন্দ্র খানের উক্তি এইভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে,

সভে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে॥
কোন দিক দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে লস্কর এথা মোর সব ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিও যেতে কেনে প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥

এর দু'বছর বাদে (১৫১২ খ্রীঃ) যখন মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের অষ্টম অঙ্কে দেখি,

দক্ষিণ ভারত থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করে চৈতন্যদেব মুকুন্দকে প্রশ্ন করলেন নিত্যানন্দ কোথায়। মুকুন্দ বললেন যে তিনি বাংলায় গেছেন এবং বলে গেছেন মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এলে অদ্বৈতপ্রমুখ সমস্ত ভক্তকে নিয়ে আবার নীলাচলে আসবেন। তাই শুনে গোপীনাথ আচার্য বললেন, "সম্প্রতি দ্বৈরাজ্যাদিকমপি নাস্তি। পন্থাশ্চ সুগমঃ। গুণ্ডিচাযাত্রা চ নেদীয়সী। তদাগমনসামগ্রী সর্বৈবাস্তি।" (সম্প্রতি দুই রাজার রাজ্য নিয়ে বিবাদ নেই। পথও সুগম। গুণ্ডিচাযাত্রাও নিকট। তাঁদের আগমনের সমস্ত কারণই বর্তমান।)

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে বাংলায় যান। কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর উৎকল-গৌড় সীমান্ত অতিক্রমের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে দেখা যায় যে ঐ সময়ে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ কার্যত হচ্ছিল না এবং সন্ধিও আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উড়িষ্যা থেকে বাংলায় প্রবেশের কোন কোন পথ তখনও বন্ধ ছিল। কোন কোন পথ খোলা ছিল বটে; কিন্তু সেসব পথ দিয়ে যারা বাংলায় যেত, তাদের অনেক সময় বাংলার সীমান্তরক্ষীদের হাতে অত্যাচার সহ্য করতে হত। এজন্যে মহাপ্রভুকে উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের নবম অঙ্কে দেখি, একজন লোক উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে মহাপ্রভুর উৎকল-গৌড় সীমান্ত অতিক্রমের এই বর্ণনা দিচ্ছে,

"ইতো দেবাধিকারং যাবৎ তাবত্তব প্রভাবেনৈব নির্বাহিতবর্ত্ম সৌকর্যা অচংক্রমণেনৈব সর্বে গতবন্তঃ। গৌড়সীম্নি প্রবেষ্টুং ত্রয়ঃ পন্থানঃ। দ্বয়ং রুদ্ধং একস্তু জলদুর্গঃ তমেবোদ্দিশ্য চলিতে সতি তৎসীমাধিকারী তুরুষ্কোঽরুষ্কোষকারঃ ইব সর্বেষাং মর্মহা মহামণ্ডপো দুর্বৃত্তচক্রচূড়ামণিঃ। ইতো দেশাদ্ যে গচ্ছন্তি তেষাং দুর্গতিঃ ক্রিয়তে ইতি শ্রুত্বা সর্বেষামেব ভয়মুৎপন্নং মহাপ্রভবে কোঽপি ন শ্রাবয়তি। অস্মৎ সীমাধিকারিণোক্তম্। অত্র কিয়ান্ বিলম্বঃ ক্রিয়তাং যাবন্ময়াঽনেন সহ সন্ধিঃ সন্ধীয়তে।"

[এখান থেকে মহারাজের অধিকার যে পর্যন্ত, আপনার অসীম প্রভাবেই পথের সমস্ত বিঘ্ন নিবৃত্ত হওয়াতে সকলে অনায়াসেই বিনা ভ্রমণে গিয়েছিল। গৌড়দেশের সীমায় প্রবেশ করবার তিনটি পথ ছিল, তাদের মধ্যে দুটি রুদ্ধ। একটি জলপথ, কিন্তু সেই জলপথেই (চৈতন্যদেব) প্রস্থান করছিলেন। সেই সীমার অধিকারী মহামণ্ডপ এবং হৃদয়জাত ব্রণের মত সকলের মর্মপীড়ক দুর্বৃত্তদের

চূড়ামণি এক তুরুষ্ক (মুসলমান) ব্যক্তি আছে, সে এই দেশ থেকে যারা যায় সকলের দুর্গতি করে থাকে। একথা শুনে সকলেই ভয় পেলেন, কিন্তু মহাপ্রভুকে কিছুই শোনালেন না। আমাদের সীমাধিকারী বললেন, "যে পর্যন্ত এর সঙ্গে সন্ধি না হয় সে পর্যন্ত (মহাপ্রভু) এখানেই থাকুন।"]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ষোড়শ অধ্যায়ে কবিকর্ণপূরেরই অনুরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাপ্রভু উৎকল-গৌড় সীমান্তে উপনীত হবার পরে তাঁর প্রতি উড়িষ্যার সীমাধিকারীর উক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন,

মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কথো রহ সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥

এই নদী যে মন্ত্রেশ্বর নদ, তা কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ দুজনেই বলেছেন। বাংলার "যবন" সীমাধিকারী হঠাৎ চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তিভাব প্রদর্শন করল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় চৈতন্যদেবকে

মন্ত্রেশ্বর দুষ্টনদ পার করাইল।
পিছলদা পর্যন্ত সেই যবন আইল॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলার মুসলমান সীমাধিকারীকেই "মদ্যপ যবন রাজা" বলেছেন, হোসেন শাহকে নয়। মন্ত্রেশ্বর নদ থেকে সুরু করে পিছলদা পর্যন্ত এই মুসলমান সীমাধিকারীর কর্তৃত্বাধীন ছিল।

কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের এইসব উক্তি থেকে বোঝা যায়, অন্তত ১৫১২ খ্রীঃ থেকে ১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ ছিল এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি আসন্ন হয়ে উঠেছিল। ঐ সময়ে সত্যিই যে দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল না, তা সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসার ভ্রমণ-বিবরণী থেকে জানা যায়। বারবোসা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও উড়িষ্যায় ভ্রমণ করেন। তিনি উড়িষ্যার বর্ণনা দেবার সময় লিখেছেন, উড়িষ্যার রাজার এলাকার পরেই, "...commences the kingdom of Bengal, with which he (the king of Orissa) is sometimes

at war." বারবোসার ভাষা থেকে বোঝা যায়, ঠিক ঐ সময়ে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছিল না।

কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার নতুন করে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। আগেই বলা হয়েছে, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহাপ্রভু বাংলায় আসেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত তিনি বাংলায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই এক সময় তিনি গৌড়ের কাছে রামকেলি গ্রামে যান। রামকেলি গ্রামে হোসেন শাহের মন্ত্রী সনাতন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং সেই থেকেই তিনি তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে পড়লেন। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯শ অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, বাংলা থেকে চলে যাবার কিছুদিন পরে হোসেন শাহ নিজেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে উড়িষ্যায় যুদ্ধ করতে যান,

> হেন কালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
> সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে॥
> তেহোঁ কহে যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
> মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। সুতরাং সনাতন যে ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত, সে সম্বন্ধে তাঁর উক্তির প্রামাণিকতা অবিসংবাদিত। তাঁর উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের কিছু পরে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ আবার নতুন করে বাধল, যে যুদ্ধ ইতিপূর্বে শেষ হয়ে এসেছিল।

আর একটি চৈতন্যচরিতগ্রন্থ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে এবিষয়ে কিছু নতুন সংবাদ পাওয়া যায়। এই বইয়ের মতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র বাংলাদেশ আক্রমণের সঙ্কল্প করেছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব বাংলার সুলতানের প্রচণ্ড শক্তির কথা বলে তাঁকে নিরস্ত করেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বিজয়খণ্ডে হরিদাস ঠাকুরের নীলাচল গমন বর্ণনার ঠিক পরেই এই প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে। আমরা এই বইয়ের একটি প্রাচীন পুঁথি থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করছি।

> (চৈতন্যদেব) এইমতে আছেন বৎসর দুই চারি।
> গৌড়ে উৎকলে পড়িল মহা সারি॥
> প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশা।
> শুনিঞা গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাসা॥

চৈতন্যদেবেরে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলে প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল॥
কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর।
সিংহশার্দ্দুলে দেখ কতেক অন্তর॥
উড়্রদেশ উচ্ছন্ন ক(ি)রবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবেন এতদিনে॥
লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন ভোজন পাছে কর॥
কাঞ্চ(ী)দেশ বিজয়া জিনিলেক নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখী সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিবে নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে প্রলয় হইব উৎকলে॥
প্রভু নিবারেন শুনিঞা প্রতাপরুদ্র।
বিজয়ানগর গেল করিবারে যুদ্ধ॥

(এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398-6-c.4নং পুঁথি, ১৩৬ক পত্র)

জয়ানন্দের এই বিবরণে অবিশ্বাস্য কিছুই নেই। কারণ যদিও চৈতন্যদেব নীলাচলে বাস করবার সময় সংসারধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও বিচক্ষণতা কোন সময়েই তিনি বিসর্জন দেননি। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁর নীলাচল-বাসের যে বর্ণনা পাই, তাতে দেখি ভক্তদের সঙ্গে কথা বলা থেকে সুরু করে নানা বিষয়েই তিনি সব সময় পরিণত বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। হোসেন শাহের ব্যক্তিত্ব ও শক্তি সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদে দেখি চৈতন্যদেব হোসেন শাহকে "মহাবিদগ্ধ রাজা" বলছেন। সুতরাং প্রতাপরুদ্র হোসেন শাহের রাজ্য আক্রমণ করতে চাইলে চৈতন্যদেব তাঁর পরম ভক্ত প্রতাপরুদ্রকে হোসেন শাহের পরাক্রমের কথা বলে সতর্ক করে দেবেন, এ ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক। প্রতাপরুদ্রের মঙ্গল-চিন্তার চেয়ে জগন্নাথ-মন্দিরের নিরাপত্তার ভাবনা চৈতন্যদেবের মনে আরও বেশী করে জাগা স্বাভাবিক এবং তা যে জেগেছিল, উপরে উদ্ধৃত অংশে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং জয়ানন্দের এই বিবরণ যথার্থ বলেই মনে হয়। উদ্ধৃত অংশের শেষ ছত্রে বলা হয়েছে বাংলাদেশ আক্রমণে বিরত হয়ে প্রতাপরুদ্র "বিজয়ানগর গেল করিবারে যুদ্ধ"। চৈতন্যদেবের নীলাচলে আগমনের

পরে অন্তত ১৫১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে (The Gajapati Kings of Orissa by Prabhat Mukherjee, p. 81-82 দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত বিষয় থেকে মনে হয়, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের পূর্বোদ্ধৃত বিবরণ মূলত সত্য।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য যে প্রতাপরুদ্রের বিজয়নগরে যুদ্ধ করতে যাবার পিছনে চৈতন্যদেবের কোন হাত ছিল না, তিনি যে প্রতাপরুদ্রকে বিজয়নগর আক্রমণ করতে বলেছিলেন, এমন কোন কথা উদ্ধৃত অংশে নেই। অথচ নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় (পৃঃ ।৶৹) এই অংশটি যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন*, তার থেকে মনে হয় চৈতন্যদেবই প্রতাপরুদ্রকে বিজয়-নগরে অভিযান করতে বলেছিলেন ; কারণ নগেন্দ্রনাথের উদ্ধৃত অংশে চৈতন্য-দেবের উক্তির অন্তর্গত একটি চরণের এই পাঠ দেখা যায়,

কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।

এই চরণটিকে অবলম্বন করে এপর্যন্ত বহু আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। চৈতন্য-দেব প্রতাপরুদ্রকে বাংলাদেশ আক্রমণ করতে না বলে হিন্দুরাজ্য কাঞ্চী আক্রমণ করতে বলেছিলেন, একথা যাঁরা বিশ্বাস করেছেন তাঁরা চৈতন্যদেবের উপর দোষারোপ করেছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেননি, তাঁরা একথা লেখার জন্য জয়ানন্দের উপর দোষারোপ করেছেন। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত প্রাচীন পুঁথিতে চরণটির এই পাঠ পাওয়া যায় না। তাতে আছে,

কাঞ্চ(ী)দেশ বিজয়া জিনিলেক নানা রাজ্য।

সুতরাং নগেন্দ্রনাথের দেওয়া পাঠ একেবারেই ভ্রান্ত। অথচ এরই উপর নির্ভর করে চৈতন্যদেব বা জয়ানন্দের উপর এতদিন দোষারোপ করা হয়েছে। চৈতন্য-দেবের পক্ষে প্রতাপরুদ্রকে "কাঞ্চীদেশ বিজয়া জিনিলেক নানা রাজ্য" বলা মোটেই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়।

*নগেন্দ্রনাথ বসু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ভূমিকায় যদিও বিজয়খণ্ড থেকে আলোচ্য অংশটি উদ্ধৃত করেছেন, বইয়ের মধ্যে কিন্তু এই অংশটি ছাপা হয়নি। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, পৃঃ ২৪৮-এ) লিখেছেন, "মুদ্রিত গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিজয়খণ্ডের মধ্যে এই পংক্তিগুলি পাওয়া গেল-না। কুলজীশাস্ত্রের অনেক জালপুঁথি দেখিয়া বসু মহাশয় যেমন ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের বেলাতেও কি তাহার পুনরা-

চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির সাক্ষ্য আমরা বিশ্লেষণ করলাম। এখন এসম্বন্ধে উড়িষ্যায় যে সমস্ত সূত্র পাওয়া গিয়েছে, তাদের সাক্ষ্য বিচার করব।

এদের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য জগন্নাথমন্দিরের 'মাদলা পাঞ্জী'। মনোমোহন চক্রবর্তী প্রথম আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 'মাদলা পাঞ্জী'র সাক্ষ্যের উল্লেখ করেন (J. A. S. B. 1900, Pt. I, p. 186 দ্রষ্টব্য)। তিনি কিন্তু একটি ভুল করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে 'মাদলা পাঞ্জী'তে উল্লিখিত উড়িষ্যা-অভিযানে বাংলার সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন ইসমাইল গাজী। কিন্তু 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' নামক ফার্সী গ্রন্থে পরিষ্কার লেখা আছে যে ইসমাইল গাজী বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে (৮)৭৮ হিজরায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে যে ইসমাইল গাজী জীবিত ছিলেন না, তার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, হুগলী জেলার মান্দারণ ও রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারে ইসমাইল গাজীর যে দুটি সমাধি আছে, দুটিতেই আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া যায়; মান্দারণের শিলালিপির তারিখ ৯০০ হিজরা বা ১৪৯৪-৯৫ খ্রীঃ—হোসেন শাহের রাজত্বের দ্বিতীয় বছর। এই সব প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে 'মাদলা পাঞ্জী'তে বর্ণিত হোসেন শাহের ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের উড়িষ্যা-আক্রমণে ইসমাইল গাজীর নেতৃত্ব করার কথা মনোমোহন চক্রবর্তীর কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'মাদলা পাঞ্জী'তে ইসমাইল গাজীর নামগন্ধও নেই। তাতে স্বয়ং হোসেন শাহের উড়িষ্যা-অভিযানে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করার কথা আছে। 'মাদলা পাঞ্জী'র প্রতাপরুদ্র সংক্রান্ত বিবরণে ('মাদলা পাঞ্জী', প্রাচী সংস্করণ, পৃঃ ৫২-৫৩ দ্রষ্টব্য) গৌড়ের সুলতানের উড়িষ্যা-আক্রমণ সম্বন্ধে এই লেখা আছে,

"এ রাজাঙ্ক ১৭ অঙ্কে গউড়নগরু মুগল বাহিলে। কটক নিকটে সে টারা পকাইলে। কটক রখিআ হোইথিলে ভোই বিদ্যাধর। সে যাইং থইলে সারঙ্গগড় (পাঠান্তর—এ সম্ভালি ন পারি শারঙ্গগড় রহিলে)। পরমেশ্বরঙ্কু চকা ছড়াই চাপরে বসাই চড়াইগুহা পর্বতে বিজে করাইলে।

বৃত্তি ঘটিয়াছিল?" কিন্তু এই পংক্তিগুলি নগেন্দ্রবাবুর স্বকপোলকল্পিত নয়, কারণ এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিতে এগুলি বিজয়খণ্ডে যথাযথভাবেই পাওয়া যায়। সম্ভবত নগেন্দ্রনাথের অসাবধানতার দরুণ জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল ছাপবার সময় এই অংশটি বাদ পড়ে গিয়েছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমে আসি গৌড় পাতিশা অমুরা সুরথান প্রবেশ হোইলে।* বড় দেউলে যেতে পিতুলামান থিলে সবুকুহিং খুণ কলে। দখিণ কটকাইরে যে রজা যাইথিলে সেঠারে রজা বারতা পাইলে। বড় ক্রোধ করি মাসক বাট দশ দিনে অইলে। বারতা পাই অলাপতি সুরথান শ্রীপুরুষোত্তমরু ভাজিলা। রজা তাহাঙ্ক পছে লাগি কটকে ন রহি গঙ্গা পরিযন্তে অলাপতি সুরথানকু গোড়াই চউমুহিঁঠারে রহি বহুত যুঝ কলে। এঠারু ভাজি সুরথান মন্দারুণী রহিলে। মন্দারুণী ছড়াই রজাএ আবোরি রহিলে। গোবিন্দ বিদ্যাধর যাই সুরথানকু যাই পেখিলে। রজাঙ্কু সে দোরেহা হোইলে। সুরথানকু ঘেনি বাহুড়ি অইলে। মন্দারুণী গড়-ঠাইং বহুত যুঝ রহি কলে। রাজা বারু লাগি হোইং হাথী দণ্ড ঘেনি বহুত গোল যুঝ কলে। গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর যুঝরে রজাঙ্কু ভঙ্গাইলে। হাথীদণ্ড ঘেনি রাজা ভাজি অইলে। সেঠারে তাঙ্কু লোক পঠিআইলে। আস্ত উত্তারু কাহাকু করিচ পচার বোইলে, এহা শুণি গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর রাজাঙ্কু আসি দরশন কলে। বহুত সুকৃত তাহাঙ্কু রাজা কলে। কনক স্নাহান করাইলে, বিদ্যাধর পদরে রাজা তাহাঙ্কু শাঢ়ি দেলে, পাত্র কলে। তাহাঙ্কু মুলে রাজা রাজ্যভার দেলে। সেহিঠারে সুরথান তাঙ্ক রাজ্যরে রহিলে (পাঠান্তর—সেঠারু সুরথান তাঙ্ক রাজ্যকু গলে)।*

[এই রাজার (প্রতাপরুদ্রের) সতের অঙ্কে গৌড়নগর থেকে মোগল আক্রমণ করে। কটকের কাছে তারা তাঁবু গাড়ল। কটক রক্ষা করছিল ভোই বিদ্যাধর। সে সারঙ্গগড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল (পাঠান্তর অনুসারে—সে আটকাতে না পেরে শারঙ্গগড়ে আশ্রয় নিল)। সে পরমেশ্বরকে (জগন্নাথকে) আস্তানা থেকে (পুরীর মন্দির থেকে) নিয়ে দোলায় বসিয়ে চড়াইগুহা পর্বতে রাখল। গৌড়ের পাৎশা আমীর সুলতান শ্রীপুরুষোত্তমে এসে প্রবেশ করল। বড় মন্দিরে যত মূর্তি ছিল, সবগুলিই সে নষ্ট করল। রাজা দক্ষিণে অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখানে রাজা খবর পেলেন। বড় ক্রোধ করে তিনি এক মাসের পথ দশ দিনে এলেন। খবর পেয়ে অলাপতি (আলাউদ্দীন) সুলতান শ্রীপুরুষোত্তম থেকে পালাল। রাজা তখন পিছু পিছু ধাওয়া করে কটকে না থেকে গঙ্গা পর্যন্ত অলাপতি সুলতানকে তাড়া করে চউমুহিঁর কাছে অনেক যুদ্ধ করলেন। এখান থেকে পালিয়ে সুলতান মান্দারণে রইল। রাজা

(তাকে) মান্দারণ থেকে তাড়িয়ে (মান্দারণ দুর্গ) অবরোধ করে রইলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর গিয়ে সুলতানের সঙ্গে যোগ দিল। রাজার প্রতি সে বিশ্বাস-ঘাতক হল। সুলতানকে নিয়ে ফিরে এল। মান্দারণ দুর্গে (তারা) বহু যুদ্ধ করল। রাজা জয়লাভের জন্য হাতী এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে খুব দারুণ যুদ্ধ করলেন। গোবিন্দ বিদ্যাধর যুদ্ধে রাজাকে তাড়াল। হাতী এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজা পালিয়ে এলেন। সেখানে তাকে (গোবিন্দ বিদ্যাধরকে) লোক পাঠালেন। "আমাকে সরিয়ে কাকে (রাজা) করছ" প্রশ্ন করলেন। তা শুনে গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর রাজাকে এসে দর্শন দিল। রাজা তাঁকে অনেক সমাদর করলেন, কনক স্নান করালেন। রাজা তাঁকে বিদ্যাধর পদে অধিষ্ঠিত করলেন, পাত্র করলেন। তারই উপর রাজা রাজ্যভার দিলেন। সেইখানে সুলতান তার রাজ্যে রইল (পাঠান্তর অনুসারে—সেখান থেকে সুলতান তার রাজ্যে গেল)।]

প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের ১৭শ অঙ্ক* ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুরু হয় এবং ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে চৈতন্যদেব নীলাচলে যান। ঐ সময়ে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত এবং কলকাতার ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছত্রভোগ ছিল বাংলা-উড়িষ্যার সীমানায় বাংলার শেষ ঘাঁটি। ১৫০৯ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর থেকে ১৫১০ খ্রীঃর জানুয়ারী—মাত্র এই কয় মাসের মধ্যে বাংলার সুলতানের পুরী অবধি অধিকার, সেখান থেকে উড়িষ্যার রাজার কাছে তাড়া খেয়ে মান্দারণ অবধি পশ্চাদপসরণ এবং আবার মান্দারণ থেকে ছত্রভোগ অবধি অধিকার নিশ্চয়ই ঘটেনি। ১৫১০ খ্রীঃর জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেও ঘটেনি, কারণ চৈতন্যদেব ঐ সময়ে নীলাচলে ছিলেন, এর মধ্যে নীলাচল মুসলমানদের হাতে যাওয়ার মত এত বিরাট একটা ঘটনা ঘটে গেলে চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলিতে নিশ্চয়ই তার উল্লেখ থাকত। ১৫১০ খ্রীঃর এপ্রিল মাসে চৈতন্যদেব দক্ষিণ-ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তার দু'বছর বাদে নীলাচলে ফেরেন। সুতরাং 'মাদলাপঞ্জী'র বিবরণে

*১৭শ অঙ্ক মানে ১৭শ বর্ষ নয়। বর্ষ-গণনার সঙ্গে অঙ্ক-গণনার পার্থক্য এই যে অঙ্ক-গণনার সময় কতকগুলি সংখ্যাকে "অশুভ" বলে বাদ দেওয়া হয়। এই সংখ্যাগুলি হচ্ছে—১, যে সব সংখ্যার শেষে ৬ আছে এবং ১০ ছাড়া অন্য যে সব সংখ্যা শূন্য দিয়ে শেষ হয়। "অঙ্কে"র বছর ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি থেকে সুরু হয়।

বাংলার সুলতানের যে উড়িষ্যা-অভিযানের কথা আছে, তা যদি সত্যই ঘটে থাকে, তাহলে ১৫১০ খ্রীঃর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঘটেছিল সন্দেহ নেই।

কিন্তু 'মাদলাপঞ্জী'র উল্লিখিত বিবরণকে হুবহু সত্য বলে গ্রহণ করতে অসুবিধা আছে। আলোচ্য যুগের ঘটনা সম্পর্কে মাদলাপঞ্জী'র উক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "...the dates of the events of this period are wrongly given in the Madla Panji in most cases···There are indications that the Madla Panji was compiled shortly after the Mughal conquest of Orissa....The temple priests depended on traditional accounts, true stories and stray records of temple administration when they compiled the Madla Panji. (The Gajapati kings of Orissa, pp.7-8) সুতরাং আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে 'মাদলাপঞ্জী'র বিবরণকে সর্বাংশে সত্য বলে গ্রহণ করা দুরূহ।

যাহোক্ 'মাদলাপঞ্জী' তে খুব স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে, "গৌড় পাতিসা অমুরা সুরথান" অর্থাৎ "গৌড় পাৎশা আমীর সুলতান" স্বয়ং গৌড় বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন। সুলতানের নাম বলা হয়েছে "অলাপতি" অর্থাৎ আলাউদ্দীন।* এখানেও 'মাদলাপঞ্জী' নির্ভুল। কিন্তু এই সুলতানকে "মোগল" বলা 'মাদলাপঞ্জী'র একটি প্রকাণ্ড ভুল এবং তার আধুনিকতা ও নাতি-প্রামাণিকতার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু এই যুদ্ধ সম্বন্ধে 'মাদলাপঞ্জী'র সাক্ষ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রতাপরুদ্রের বেলিচের্লা তাম্রশাসন এবং 'কটকরাজবংশাবলী' থেকে 'মাদলাপঞ্জী'র বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়।

'মাদলাপঞ্জী'র বিবরণের আর একটি নতুন বিষয় হল গোবিন্দ বিদ্যাধরের প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে হোসেন শাহের দলে যোগদানের প্রসঙ্গ। গোবিন্দ বিদ্যাধর ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ষোড়শ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে তিনি উড়িষ্যার রাজা হয়েছিলেন। এরকম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই প্রতাপরুদ্রের প্রথমে পরাজয় ঘটেছিল এবং তাঁকে ফিরে পেয়ে তিনি পরে জয়যুক্ত হলেন, একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।

মোটের উপর, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে 'মাদলপঞ্জী'র উক্তি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য

---

* কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে "অল্লাপদীন" বলা হয়েছে।

না হলেও তার মধ্যে যে কিছু কিছু সত্যের উপাদান' রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক্, নাতিপ্রামাণিক 'মাদলাপঞ্জী' ছাড়া উড়িষ্যায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অন্য কিছু কিছু সূত্রও পাওয়া যায়। প্রতাপরুদ্রের কয়েকটি শিলালিপি ও শাসনে এসম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত গুণ্টুর জেলার ইড়ুপুলপড়ু গ্রামের চেন্না কেশব মন্দিরে প্রতাপরুদ্রের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। (South Indian Inscriptions, Vol. X, No. 732 দ্রষ্টব্য।) এটি ১৪২২ শকাব্দের কার্তিক মাসে চন্দ্রগ্রহণের দিন অর্থাৎ ৫ই নভেম্বর, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এতে লেখা আছে,

> সমুদ্ভদ্ গৌড়েন্দ্র ক্রন্দন কথিতা-
> শেষবিজয় প্রতাপশ্রীরুদ্রো জয়তি
> সমরে শত্রু নিকরান্॥

এর অর্থ:—সমুদ্ভত গৌড়রাজের ক্রন্দনের দ্বারা যাঁর শেষ বিজয় কথিত হয়েছিল সেই প্রতাপশ্রীরুদ্র সমরে শত্রুবর্গকে জয় করেন। এখানে প্রতাপরুদ্রের কাছে গৌড়ের রাজা পরাজিত হয়েছিলেন বলে দাবী করা হয়েছে।

[ঐ একই তারিখে অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীঃর ৫ই নভেম্বরে উৎকীর্ণ প্রতাপরুদ্রের অনন্তবরম্ শাসনে (Andhra Patrika Annual, 1929, pp. 175-176 দ্রষ্টব্য) লেখা আছে যে প্রতাপরুদ্র অঙ্গরাজকে বিতাড়িত করে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিলেন। অঙ্গরাজ্য বলতে আগেকার দিনে ভাগলপুর সমেত পূর্ব বিহারের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বোঝাত। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলের অনেকাংশ হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু অনন্তবরম্ শাসনে অঙ্গরাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ আছে, সেইজন্যে মনে হয়, এখানে 'অঙ্গরাজ' অর্থে হোসেন শাহকে বোঝানো হয়নি, অন্য কোন রাজাকে বোঝানো হয়েছে, সম্ভবত ইনি ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের রাজা।]

নেল্লোর জেলার বেলিচের্লা গ্রামে প্রতাপরুদ্রের তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে ; এগুলি আসলে একই শাসনের তিনটি অংশ ; প্রতাপরুদ্র এক ব্রাহ্মণকে বেরিচের্লা গ্রাম দান করেছিলেন, এদের মধ্যে সেই কথাই বলা হয়েছে (Epigraphica Indica, January, 1950, pp. 206-208 দ্রষ্টব্য)। এদের তারিখ শুদি কার্তিক ৩ শুক্রবার "কর-রাম-অব্ধি-শীতাংশু" (১৪৩২) শকাব্দ, "প্রমোদূত" বর্ষ। এই তারিখ ইংরেজী কোন্ তারিখের সমান, তা নিয়ে কিছু

মতভেদ আছে, তবে ১৫১০ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর থেকে ১৫১১ খ্রীঃর অক্টোবরের মধ্যে কোন এক সময়ে এই তারিখ পড়বে। এই তাম্রশাসনগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টিতে প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে লেখা আছে,

রৌদ্রঃ স গৌড়-রাজস্য বলানি জিত্বা
প্রত্যগ্রহীদ্ রাজ্যম-অধিজ্য ধন্বা মত্তেভ
কুম্ভৌ সমরেষু যস্য
দৃষ্ট্বা পলায্য স্বপুরং প্রবেশ্য ভয়াকুলো গৌড়-
পতিঃ কদাপি বিব্বী কুচৌ নেক্ষিতুম্ ঈহতে স্ম
স ভূপতির্মহারাজো রাজেন্দ্র-পর-
মেশ্বরঃ শ্রীমদ্‌রাজাধিরাজেন্দ্র-পঞ্চগৌড়-অধিনায়কঃ।

এই শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে প্রতাপরুদ্র গৌড়ের রাজাকে বলপূর্বক পরাজিত করে নিজের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন, তার ফলে ভয়াকুল গৌড়পতি নিজের পুরে (দুর্গে) প্রবেশ করে আত্মরক্ষা করেন। এই শিলালিপির উক্তি 'মাদলাপঞ্জী'র উক্তিকে সমর্থন করছে। এই শিলালিপির আর একটি বৈশিষ্ট্য, প্রতাপরুদ্র এতে নিজেকে "পঞ্চগৌড়-অধিনায়ক" বলেছেন।

এইসব শিলালিপির শাসনের সাক্ষ্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ১৫০০ খ্রীঃর নভেম্বর মাসের আগেই হোসেন শাহের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল এবং ১৫০০ থেকে ১৫১০-১১ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রতাপরুদ্র গৌড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের দাবী করেছেন।

সমসাময়িক উড়িয়া লেখকদের রচিত কয়েকটি গ্রন্থ থেকেও এসম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। স্বয়ং প্রতাপরুদ্র 'সরস্বতীবিলাসম্' নামে একটি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার অন্যতম পুষ্পিকায় তিনি "শরণাগত-জবুনাপুরাধীশ্বর-হুসনশাহ-সুরত্রাণ-শরণরক্ষণ" বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রতাপরুদ্র এখানে শুধুমাত্র হোসেন শাহকে পরাজিত করার গৌরব দাবী করেন নি, নিজেকে হোসেন শাহের রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করেছেন!

কিন্তু প্রতাপরুদ্রের এই অদ্ভুত ঘোষণা করার অর্থ কী? এক অর্থ এই হতে পারে যে হোসেন শাহ কোন এক সময়ে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে সন্ধি করতে বাধ্য হন, তাই প্রতাপরুদ্র নিজেকে হোসেন শাহের রক্ষাকর্তা বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছেন। কিন্তু এই জাতীয় সন্ধি যদি

হয়েও থাকে, তা প্রতাপরুদ্র ও হোসেন শাহের যুদ্ধের শেষ ফলাফল নয়। 'সরস্বতী-বিলাসমে'র রচনাকালের দিকে লক্ষ্য রাখলেই একথা বোঝা যাবে। কোণ্ডবীড়ুর ব্রাহ্মণ লোল্ল লক্ষ্মীধর প্রতাপরুদ্রের সভাকবি ছিলেন। বিজয়-নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় প্রতাপরুদ্রের কাছ থেকে কোণ্ডবীড়ু জয় করার পরে লোল্ল লক্ষ্মীধর প্রতাপরুদ্রকে ত্যাগ করে কৃষ্ণদেব রায়ের সভাকবি হন। কৃষ্ণদেব রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে লোল্ল লক্ষ্মীধর শঙ্করের সৌন্দর্যলহরীর যে টীকা রচনা করেন, তার শেষে লিখেছেন যে তিনিই প্রতাপরুদ্রদেবের ("বীররুদ্র গজপতি") আজ্ঞায় 'সরস্বতী-বিলাসম্' রচনা করেন। এই দাবী সত্য হোক্ বা না হোক্, 'সরস্বতী-বিলাসম্' যে কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক কোণ্ডবীড়ু জয় করার আগে রচিত, তা এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কৃষ্ণদেব রায়ের মঙ্গলগিরি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে তিনি কোণ্ডবীড়ু জয় করেন (The Gajapati Kings of Orissa, by Prabhat Mukherjee, p. 79)। তাহলে 'সরস্বতী-বিলাসম্' নিশ্চয়ই তার আগে রচিত। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের পরেও যে হোসেন শাহ উড়িষ্যার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তা আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র উক্তি উদ্ধৃত করে আগেই দেখিয়েছি।

প্রতাপরুদ্রের দীক্ষা-গুরু জীবদেবাচার্য কবিডিণ্ডিম রচিত "ভক্তিভাগবত মহাকাব্যম্" থেকেও প্রতাপরুদ্র ও হোসেন শাহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। ৩২ সর্গে বিভক্ত এই মহাকাব্যটির শেষে এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি রয়েছে, তার মধ্যে কবি নিজের ও উড়িষ্যার রাজাদের বংশপরিচয় দিয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Report on the Search for Sanskrit Manuscripts, 1901-02 to 05-06, pp. 14-16এ প্রশস্তিটির পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন। আমরা নীচে তার থেকে ২৬শ থেকে ৩২শ সংখ্যক শ্লোকের অনুবাদ উদ্ধৃত করছি,

(26) Purusottama at the end being addicted to the enjoyments in Heaven, his son Rudra became a Kalpataru. He was then seventeen years of age, his beauty was like that of the god of love, and he became the worthy husband of the earth.

(27) While his hair was still wet with the bath of coronation he defeated the Sultan of Gauḍa, a conqueror in

many battles, and at the end of the sixth' week of his father's death, he offered handfuls of Ganges water for the benefit of his father.

(28) The king with long arms weakened his enemies and increased his dominions, purified his inner souls by the theroy of non-duality, but spread the dual doctrine at the incarnation of Krsṇa (Caitanya).

(29) His spiritual guide was Jīvadevakaviḍinḍima, the son of Ratnāvatī by Trilocana.........

(30) The king, whose gold coins bearing the image of Gopāla, with inscriptions of the letters of his name have currency in all directions, and whose good sayings like pearls roll on the necks of learned men.

(31) When that king engaged in the conquest o Karṇāṭa was living at Venkaṭādri, the ready poet Jīvadeva composed this poem full of devotion to the 'hero of the world'.

(32) In the seventeenth year of the king's reign, when the poet was just entering his 35th year, living on the banks of Godāvarī, he composed this great poem in the month of Māgha.

প্রতাপরুদ্রের দীক্ষাগুরু এবং প্রায় সমবয়সী জীবদেবাচার্য কবিডিণ্ডিম প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে অর্থাৎ ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে (Seventeenth year of the king's reign অর্থে সপ্তদশ অঙ্ক ধরলে ১৫০৯-১০ খ্রীঃ হয়) এই কথাগুলি লিখেছিলেন। সুতরাং এদের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। জীবদেবাচার্যের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রতাপরুদ্র তাঁর অভিষেকের অব্যবহিত পরেই বাংলার সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জীবদেবাচার্য এই যুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের জয়লাভের এবং পিতার মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের মধ্যেই গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অধিকারের দাবী করেছেন। এই দাবী কতদূর সত্য তা বলা যায় না, কিন্তু প্রতাপরুদ্র ও হোসেন শাহের প্রথম সংঘর্ষের সময় সম্বন্ধে এই প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের সাক্ষ্য যে সম্পূর্ণ প্রামাণিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রতাপরুদ্রের ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন (The

Gajapati Kings of Orissa, Prabhat Mukherjee, pp. 58-59 দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হোসেন শাহ ও প্রতাপরুদ্রের প্রথম সংঘর্ষ যে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হোসেন শাহের ৮৯৯ হিজরা বা ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের "কামরু-কামতা-জাজনগর-উড়িশা বিজয়ী" উপাধিযুক্ত মুদ্রা থেকে বোঝা যায় যে, তারও আগে অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্তমের রাজত্বকালে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল। তবে ১৪৯৩-৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৪৯৭ খ্রীঃ, এই কয় বছরের যুদ্ধের বিবরণ বা ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংবাদ কোথাও পাওয়া যায় না।

এরপর আমরা উড়িষ্যার আর মাত্র একটি সূত্রের উল্লেখ করব। এটি হচ্ছে অর্বাচীন 'কটকরাজবংশাবলী' (Further Sources of Vijaynagar History, no. 94)। এতে লেখা আছে যে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের "সপ্তমবর্ষে মুগল নামক ম্লেচ্ছা আগত্য কটকনিকটে স্থিতাঃ। কটকরক্ষকেনানন্তসামন্তরায়াভিধেন কটকদুর্গ ত্যক্ত্বা সারঙ্গগড়নামকদুর্গে স্থিতম্। শ্রীজগন্নাথপ্রতিমাচতুষ্টয়ম্ নৌকায়াং স্থাপয়িত্বা চিলকাভিধজলমধ্যে চড়ায়ি (চড়ায়ি) গুহানামকপর্বতে স্থাপিতবান্। মুগলাভিধযবনমুখ্যেন অমুরা (অমুরা) সুরস্থাম্নুনামকেন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র আগত্য মন্দিরমধ্যে প্রতিমাদিকং ভগ্নং কৃতম্। অনন্তরং দক্ষিণদিগ্বিজয়ার্থম্ গতেন রাজ্ঞা শ্রুত্বা যবনাদিকং গঙ্গোন্মুখীকৃত্বা গঙ্গাতীরপর্যন্তম্ নীতঃ।" 'মাদলাপঞ্জী'র বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের মিল আছে। সম্ভবত 'মাদলাপঞ্জী' থেকে এই বিবরণ নেওয়া। তবে 'মাদলাপঞ্জী'তে লেখা আছে যে প্রতাপরুদ্রের সপ্তদশ অঙ্কে গৌড়ের সুলতান উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন আর এতে বলা হয়েছে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে এই ঘটনা ঘটেছিল। এই 'কটকরাজবংশাবলী'তেও বাংলার সুলতানকে ভুল করে মোগল বলা হয়েছে।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজার যুদ্ধ সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুলি উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করলাম। এই যুদ্ধ যে ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্তত ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাঝে অন্তত ১৫১২ খ্রীঃ থেকে ১৫১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল। ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল এবং সন্ধি আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার অব্যবহিত পরেই আবার হোসেন শাহ নতুন করে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তিনি স্বয়ং এই অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর আর হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার কোন যুদ্ধ হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে হোসেন শাহ এবং উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র—দুজনেই জয়ের দাবী করেছেন। কিন্তু কেউই চূড়ান্ত জয় লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। এঁদের মধ্যে কেউ অপরের রাজ্যের কোন অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করতে পেরেছিলেন বলেও জানা যায় না। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতাপরুদ্রের বা উড়িষ্যায় হোসেন শাহের কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে ১৫১০ থেকে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হোসেন শাহ যে উড়িষ্যার দিকে তাঁর রাজ্যের সীমা খানিকদূর প্রসারিত করতে পেরেছিলেন, তাঁর প্রমাণ আছে। 'চৈতন্যভাগবতে'র সাক্ষ্য থেকে দেখি, ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজ্যের শেষ সীমা ছত্রভোগ, তারপর উড়িষ্যার এলাকা সুরু হচ্ছে। কিন্তু কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে দেখি, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রভোগের কিঞ্চিদধিক ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত মন্ত্রেশ্বর নদ বাংলা ও উড়িষ্যার সীমারেখা। তবে এই সীমানা-প্রসারণ নতুন রাজ্য জয় না হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার, তা বলা যেমন কঠিন, তেমনি শেষ পর্যন্ত উভয় রাজ্যের মধ্যে কী সীমারেখা দাঁড়িয়েছিল, তাও বলা শক্ত। যতদূর মনে হয়, উভয় রাজার এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরার 'রাজমালা'য় হোসেন শাহের মুখে এই উক্তি দেওয়া হয়েছে,

উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।

ত্রিপুর না জিনি মোর মন দুঃখ হইল॥

এর থেকে বোঝা যায়, ত্রিপুরার লোকেরা মনে করতেন যে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধে হোসেন শাহ জয়লাভ করেছিলেন। হোসেন শাহের লোকদের প্রচারের ফলেই হয়তো ত্রিপুরাবাসীর মনে এই ধারণা জন্মেছিল।

হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যারাজের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে বাংলা থেকে উড়িষ্যায় যাওয়া যে কত বিপদসঙ্কুল হয়েছিল, তা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাবগত থেকে জানা যায়। চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি ভক্তেরা মহাপ্রভুকে উড়িষ্যা অভিমুখে অবিলম্বে রওনা হতে নিষেধ করে বলছে,

তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।

সে রাজ্যে এখন কেহো পথ নাহি বয়॥

দুই রাজার হইয়াছে অনন্ত বিবাদ।

মহাযুদ্ধ স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ॥

এবং রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে বলছে,

রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে 'জাশু' বলি লয় প্রাণে॥

এই যুদ্ধের সময় বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চল যে কতখানি অরাজক হয়ে উঠেছিল, চৈতন্যভাগবত থেকে তারও পরিচয় পাই। এর অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে যে চৈতন্যদেব ও তাঁর দলবল যখন নৌকায় করে সীমান্তবর্তী নদী পার হচ্ছিলেন, তখন নাবিক তাঁদের বলেছিল,

নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥

কবিকর্ণপুরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে ঠিক এই সময়ের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে "ইদানীং গৌড়াধিপতে র্যবনভূপালস্ত' গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ততে।"

কিন্তু মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করার পরে বাংলার ভক্তেরা প্রতি বছর রথযাত্রার সময় তাঁকে দর্শন করবার জন্য নীলাচলে যেতেন। ১৫১৩ থেকে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি অধিকাংশ বছরই ভক্তেরা গিয়েছেন। তাঁদের পথে কোন বিপদ হয়েছিল বলে কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে ১৫১২ থেকে ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা-উড়িষ্যার যুদ্ধ বন্ধ ছিল। এই কারণেই প্রথম দু' বছর অর্থাৎ ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভক্তদের উড়িষ্যায় যাওয়ার অসুবিধা হয় নি। কবিকর্ণপূরও তাঁর নাটকের অষ্টম অঙ্কে সেকথা বলেছেন। কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ নতুন করে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ঐ বছরে যে মহাপ্রভুর বাঙালী ভক্তদের নীলাচলে যাওয়া বন্ধ ছিল, তা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৬শ অধ্যায় থেকে জানা যায়। ঐ অধ্যায়ে দেখি, মহাপ্রভু বাংলাদেশ থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সময় বাংলার ভক্তদের বলছেন,

সভা সহিত ইহাঁ মোর হইল মিলন।
এ বৎসর নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥

আমাদের মনে হয় ঐ বছরে নতুন করে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যার যুদ্ধ বাধার দরুণই মহাপ্রভু ভক্তদের নীলাচলে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরের বছর থেকে বাংলার ভক্তেরা আবার রথযাত্রার সময় নীলাচলে যেতে সুরু করেন এবং

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধান হওয়া পর্যন্ত তাঁরা মাত্র একবছর ছাড়া আর সব কয় বছরই গিয়েছেন। (একবছর বন্ধ ছিল—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ, ৩৯-৪১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এর থেকে মনে হয়, ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধই উড়িষ্যার সঙ্গে হোসেন শাহের শেষ যুদ্ধ; এর পর দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং অন্তত ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

('মাদলাপঞ্জী'তে এক "মলিকা পাতিসা"র সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ ও সন্ধির কথা লেখা আছে। 'কটকরাজবংশাবলী'তেও এই কথা আছে, তাতে ঐ রাজাকে "মল্লিকাস্থিতাধিপ" বলা হয়েছে। ইনি কিন্তু হোসেন শাহ নন, ইনি গোলকুণ্ডার সুলতান কুৎব্-উল্-মুল্ক, তেলেগু শিলালিপিতে ইনি 'কুতমন মলিক' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের দক্ষিণদিকের অনেকখানি অংশ জয় করেন এবং মল্কপুরমে অন্যতম ঘাঁটি স্থাপন করেন। 'মাদলাপঞ্জী'তেও লেখা আছে রাজমহেন্দ্রীতে এই রাজার সঙ্গে প্রতাপ-রুদ্রের যুদ্ধ হয়েছিল।)

ত্রিপুরার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ

হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্যেরও সংঘর্ষ হয়েছিল। ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'র মতে ধন্যমাণিক্যই প্রথম গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করেন এবং সাফল্যলাভ করেন; তাঁর বারবার সাফল্যের কথা শুনেই ১৪৩৬ শকাব্দ বা ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ বলেন,

উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।
ত্রিপুর না জিনি মোর মন দুঃখ হইল॥

সম্ভবত আসাম অভিযানে হোসেন শাহের প্রাথমিক জয়টুকুই এর আগে ঘটেছিল, পরবর্তী পরাজয় তখনও ঘটেনি। 'রাজমালা'তে হোসেন শাহ ও ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। তবে এখানে একটি কথা বলা দরকার। মুদ্রিত 'রাজমালা'র সবটাই প্রাচীন বা অকৃত্রিম নয়। মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্যের (১৮২৬-৩০ খ্রীঃ) রাজত্বকালে দুর্গামণি উজীর প্রাচীন রাজমালাকে নিজের ইচ্ছামত "সংশোধন" করে যে রূপ দিয়েছিলেন, সেইটিই মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ। প্রাচীন রাজমালার প্রথম খণ্ড ত্রিপুরারাজ ধর্মমাণিক্যের সময়ে (১৪৫৮-৯০ খ্রীঃ), দ্বিতীয় খণ্ড অমর মাণিক্যের সময়ে (১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ),

তৃতীয় খণ্ড গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে (১৬৩৭-৭৫ খ্রীঃ) এবং চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে (১৭৬০-৮৩ খ্রীঃ) রচিত হয়েছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'রাজমালা'র একটি পুরোনো পুঁথি (নং ২২৫৯) আছে। দুর্গামণি উজীরের 'রাজমালা' সংশোধনের আগেই এটি লিপিকৃত হয়েছিল। সুতরাং এই পুঁথির পাঠ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই পুঁথিতে যে পাঠ পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মুদ্রিত রাজমালার পাঠের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য দেখা যায়। 'রাজমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে ধন্যমাণিক্যের বঙ্গাভিযান ও বাংলার সৈন্যবাহিনীর ত্রিপুরা-অভিযান সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তা এই পুঁথির ১৮-২২শ পত্র থেকে উদ্ধৃত করছি,

কালক্রম মহারাজা বলবন্ত হৈল।
বঙ্গ অধিপতি হৈব মনে ইহা কৈল॥
গঙ্গামণ্ডল পাটীকারা মেহেরকুল নাম।
কৈলাসহর বেজোরা আদি ভানুগাছ গ্রাম॥
বিষ্ণুজুড়ি লাঙ্গলা জিনিল অনুক্রমে।
জিনিল ইসব দেশ আপনা বিক্রমে॥
বরদাখাত আছিল গৌড়ের অধিকারে।
নিজ বাহুবলে রাজা জিনিল তাহারে॥
প্রতাপরায় নামে তার জমিদার ছিল।
গৌড়েতে নামিলে সেই আইসে নিজদল॥
এহিরূপে নানা দেশ জিনিল সকল।
নিজ ছত্র তলে তাতে নামিলে খণ্ডল॥
তবে রাজা সৈন্য দিয়া বৈসাইল থানা।
লস্কর করিল রাজা নিজ একজনা॥
আমল করিয়া যদি সর্ব্বসৈন্য আইল।
খণ্ডলের লোকে তবে লস্কর ধরিল॥
গৌড়রাজ্যে লৈয়া চলে বান্দিয়া তাহারে।
কতদিনে দিল নিয়া গৌড় অধিকারে॥
হস্তিতে মারিতে আজ্ঞা করে গৌড়েশ্বরে।
তাহাকে মারিতে নিছে বান্দিয়া জিঞ্জিরে॥
লস্করে জানিল তবে মরণ নিশ্চয়।
একজনের হাত হস্তে খড়্গ কাড়ি লয়॥

মারেন বিংশতি জন বিক্রম করিয়া ।
মাহুতে টুয়াইল হস্তী অঙ্কুশ মারিয়া ॥
হস্তি হস্ত খড়্গে কাটে মারে তরয়ার ।
ভঙ্গ দিল সেই গজে করিয়া চিৎকার ॥
তবে মহা মত্ত গজ দিল টুয়াইয়া ।
দন্তেতে মারিল চোট বিক্রম করিয়া ॥
ধন্য ধন্য বলি তাকে কহে সর্ব্বলোকে ।
এমত বিক্রম লোক পর্ব্বতেত থাকে ॥
আর চোট মারিতে খড়্গ ভাঙ্গি গেল ।
পড়িয়া হস্তীর হাতে পরাণ তেজিল ॥
ই কথা শুনিয়া পরে বলে গৌড়েশ্বর ।
আপনার কর্ম্ম দোষে সেখানে মরিল ॥
শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা ই কথা শুনিল ।
অগ্নিসম হইয়া ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল ॥
রাইকছাগ সেনাপতি পাঠাইয়া দিল ।
খণ্ডলের লোকে তবে আসিয়া মিলিল ॥
খণ্ডল দেশেতে ছিল দ্বাদশ বসিক ।
রাজার সাক্ষাতে নিল করিয়া রসিক ॥
একদিন বলে রাজা বসিকের স্থানে ।
কালি তোমি সব আইস আমা বিগুমানে ।
সংকেত শিখাইল রাজা সব ত্রিপুরাকে ।
মারিতে কহিল রাজা সবে একে একে ॥
মিত্রতা করিতে আমি বলিব জখনে ।
তোমরা তারার শির কাটীবা তখনে ॥
আমিহ কাটীব তবে প্রধান বসিক ।
আগে বসাইব মাস্ত করিয়া অধিক ॥
ইসব মন্ত্রণা শুনি রাজসৈন্যগণে ।
সুসজ্জ হইয়া আইল আপনার মনে॥
বসিক সকল আইল রাজা ভেটীবারে ।
সঙ্গে দুই হাজার সেনা লৈয়া ধনুঃশরে ॥

বসিয়াছে মহারাজা সিংহাসনপরে ।
বসিক সকল নিয়া বৈসাইল উপরে ॥
এক এক ত্রিপুরেত এক বঙ্গজন ।
পংক্তিক্রমে দাঁড়াইল বন্ধুতা কারণ ॥
রাজআজ্ঞা অনুসারে দাঁড়াইল গিয়া ।
ইসারাতে কৈল সেলামবাজি দিয়া ॥
প্রণাম করিতে বসিক মস্তক নামায় ।
সেইকালে মারণের সময় যে পাএ ॥
প্রধানকে নরপতি আগে দিল কাটা ।
পরেতে ত্রিপুরে কাটে যার যেই বাঁটা ॥
এহি মতে নাশ কৈল খণ্ডলের প্রজা ।
সসৈন্য খণ্ডল দেশে গেল মহারাজা ॥
লুটীয়া কাড়িয়া সব নির্দ্ধন করিল ।
তবে সে খণ্ডল দেশ আপনা হইল ॥
দেশে আইসে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মে করে নিষ্ঠা ।
মঠ দিয়া ধন্যসাগর করিল প্রতিষ্ঠা ॥

* * * *

শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা চাটীগ্রাম চলে ।
চৌদ্দস পাচত্রিস শকে নিজ বাহুবলে ॥
চাটীগ্রাম বিজই বলি মোহর মারিল ।
গৌড়েশ্বরের সৈন্য সব ভঙ্গ দিয়া গেল ॥
হোসন শাহা গৌড়পতি ই কথা শুনিয়া ।
গৌরাই মল্লিক ভেজে বহু সৈন্য দিয়া ॥
দ্বাদশ বাঙ্গলা দিল মল্লিকের সাতে ।
বহুল কটক দিল নিজে ছিল জতে ॥
বহু তর তরি বর গোমতি কারণ ।
গজ বাজী বহু সাজ করিবারে রণ ॥
সাহেক মেহের কুল আসিলেক বল ।
গজ কাছে বড় নাচে পাইয়া রঙ্গস্থল ॥

কোটফাটে চোট মারে হইল আনন্দ।
রাজার প্রজার মাঝে হৈল নিরানন্দ॥
শরে মারে ধারে কারে পড়ে রাজসেনা।
চলে বলে দলে করে চণ্ডীগড় থানা।
পাছে পাছে কাছে কাছে গেল গৌড় সেনা।
গোড়াই ভোড়াই হৈল না মারিয়া থানা॥
ছিলে খোজা দিলে বোজা বান্দিতে গোমতী।
কাটে মাটী পরিপাটী যত্ন পাইতে অতি॥
মনে করে চাকু ধরে যুক্তি কৈলে সারা।
ছলে যদি দিলে বিধি মরিবে ত্রিপুরা॥
তিনদিন মতিহীন রাখিল গোমতী।
চারিদিনে ভাঙ্গিয়া চলয়ে বেগবতী॥
পাঠান সুঠান নহে চাবুক লইয়া।
বারে বারে মারে ধরে কর্কশ বলিয়া॥
গুরু রোষে ভয় সোষে পাঠান বর্ব্বর।
রঙ্গে নদী ভাঙ্গে বিধি কাঁপে থরথর॥
এত শুনি নৃপমণি হইয়া বিস্ময়।
মারে ধরে মনে করে শরীরে না সয়॥
রাখে প্রজা ডাকে রাজা গুরু পুরোহিত।
অরি তরে অবিচারে (অভিচারে) কার্য্য কর হিত।
পরে তরে অবিচারে করিতে লাগিল।
গুরু সুতে বিধিমতে কর্ম্ম আরম্ভিল॥
সপ্তদিবা গুপ্ত কিবা মণ্ডপে রহিল।
যজ্ঞশেষে কুণ্ডদেশে চণ্ডাল কাটীল॥
রায় ধরে করে করে চণ্ডালের মাথা।
মলিক হলিক যথা গাড়ে নিয়া তথা॥
শর্ব্বরীতে বর্ব্বরে যে পাহে মহাভয়।
নাশিল আসিল রাজসৈন্য এহি কয়॥
রব উঠে সব লুটে গোরাই ভাঙ্গিল।
ছাড়ি কাজ বড় লাজ দূরে তলাসিল॥

কাপুরুষ না পৌরুষ তারে কেহ করে।
শুনিয়া শুনিয়া গৌড়পতি নিলে তারে॥
কহিল সরিয় জেন (?) কেন তিরস্কার।
হইল কহিল তার চন্দ্রের খাঁথার॥

* * * *

পুনরপি ধন্যমাণিক্য মহারাজা।
চাটীগ্রাম লইবারে পাঠাইলে প্রজা॥
মারণে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাংমর্দন নারায়ণকে বৈসাইল থানা॥
রাঙ্গু আদি ছত্রসীক মারিয়া লইল।
রসাঙ্গ নিকটে জাইয়া পুষ্করণি দিল॥
রসাঙ্গ মারিতে গীয়াছিল সেনাপতি।
সেই হতে রসাঙ্গমর্দন নাম খ্যাতি॥
রাইকছাগ রাইকছম দুই সেনাপতি।
তাহাকে ভেজিলে তথা ত্রিপুরের পতি॥
চৌদ্দস ছত্তিস শকে চাটীগ্রামে গেল।
শুনিয়া হোসন শাহা বড় ক্রোধ হৈল॥
উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।
ত্রিপুর না জিনি মোর মন দুঃখ হইল।
ই বলিয়া হৈতন খাঁরে তৈনাথ (?) করিল।
কররে খাঁন পাঠানেরে তার সঙ্গে দিল॥
রাঙ্গামাটী জিনিবারে হৈতন খাঁ চলিল।
গৌড়পতি বহু সৈন্য তার সঙ্গে দিল॥
একশত হস্তী পঞ্চসহস্র ঘোটক।
লৈক্ষ পদাতি চলে অসংখ্য কটক॥
দ্বাদশ বাঙ্গলা চলে হৈতন খাঁর সাতে।
বিদায় করিল দিব্য সিরপারা (শিরস্ত্রাণ ?) মাথে॥
চলিলেক হৈতন খাঁ মহী কম্পমান।
কতদিনে উত্তরিল দেশ সন্নিধান॥

সরালি দেশেতে সে বাঙ্গলা পথ পাইল।
কৈলাগড়ে উত্তরিয়া বিশালগড়ে আইল॥
জামির খাঁনি গড়েতে ত্রিপুরা রহে যবে।
প্রভাতে পাঠান গেলা সেই গড়ে তবে॥
খড়্গারায় আদি করি আছিল ত্রিপুর।
করিয়া অনেক যুদ্ধ মারিল প্রচুর॥
মারিলেক সেই গড় হৈতন খাঁ পাঠান।
ছয়কড়িয়া গড়ে গেল রাজা বিগুমান॥
গগন খাঁ নামে ছিল রাজ সেনাপতি।
মহা ঘোরতর যুদ্ধ কৈল মহামতি॥
আপ্তপরভেদ কিছু না করে বিচার।
এহিমতে ঘোর যুদ্ধ হৈল অপার॥
তিনপ্রহর পরে যুদ্ধে গগন খাঁ ভাগীল।
হৈতন খাঁর সৈন্য মধ্যে জয়শব্দ হৈল॥
যশপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটী আইল।
হৈতন খাঁ সেই পথে তথাতে আসিল॥
গঙ্গানগরেত গিয়া ডোমঘাটীর পথে।
গড় ধরি হৈতন খান রহিল তথাতে॥
এক মহা দিঘি দিল আপনার কাছে।
না খাইল গোমতীর জল বিষ মাখি দিছে॥
সেই হেতু তুড়ুক দিঘি দেশেতে প্রচার।
শ্রীদেবমাণিক্যে তাহা করিলে প্রচার॥
তবে মহারাজা রহে ছনগঙ্গার পারে।
আর জত সেনাপতি রহে থরে থরে॥
ছনগঙ্গাত্রিবেগেতে দেবঘার নাম।
তার কত বাঁক নামাএ মাছিছা উপাম॥
রাজা আইল গড়পরে চাইতে শত্রুবল।
দেখিলেক মহরস (মহারাজ ?) উচ্চ এক স্থল॥
নিচের বাঁকেতে গৌড়কটক রহিছে।
উচ্চেতে ত্রিপুরার গড় নির্ম্মাণ করিছে॥

বসিলেক নরপতি বৃক্ষ ছায়াতলে।
ক্রোধ হইয়া বলে রাজা ডাইন সকলে ॥
আমার দেশের লোক খাইতে ভাল পার।
হৈতন খাঁরে এবে কেনে তোমরা না মার ॥
নৃপতির বাক্য শুনি বলাংস (বলাংশ ?) তে খণে।
প্রণাম করিয়া কহে রাজা বিগ্যমানে ॥
মঙ্গল বারেতে আমি শুষিব গোমতী।
সপ্তদিন এহিমতে রাখিব সম্প্রতি ॥
বলাংস কথাতে নৃপতি তুষ্ট হৈল।
দুইকুলা বাহুযুগে বান্দিয়া উডিল ॥
দুইশত উচ্চ হৈল পথের কিনারা।
উড়িয়া পড়িল মধ্যে নদী হৈল চরা।
উজানে চলিল ভাটী ভাটী হইল চর।
দেখিয়া গৌড়ের সৈন্য তুষ্ট হৈল বড় ॥
হোসন সাহার ভাগ্যে নদী হইল চর।
চরে জাইয়া মরা (মোরা) সবে করি বাস ঘর ॥
নদীতীরে পাথরের প্রতিমা করিয়া।
হিন্দু সবে পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ॥
মাছিছা বলি সেই স্থান কহে সর্ব্বলোকে।
রাগে রঙ্গে গৌড় সেনা নিদ্রা যায়ে সুখে ॥
সাড় বান্দি আজ্ঞীতে সাড় বান্দিল বিস্তর।
তিন তিন পুতলা দিল সাড়ের উপর ॥
দুই দুই লুকা (উল্কা) দিল পুতলার হাতে।
হাজারে হাজারে লুকা পুতলার হাতে ॥
জল হতে বলাংস উঠিল তখনে।
মহাশব্দ করি স্রোত উঠিল গগনে ॥
হাজারে হাজারে সাড় আসিতে লাগিল।
সহস্রে সহস্রে লোক তখনে দেখীল ॥
গৌড়পতির সৈন্য সব সুখে নিদ্রা যায়ে।
সেইকালে নদী বেগে সকল ডুবায়ে ॥

হস্তি ঘোড়া উট আদি ভাসিল বেগেতে।
নির্ব্বল মনুষ্যে পারে তাতে কি করিতে॥
জলিছে আলোকা সব পুতলা হস্তেতে।
তা দেখি বলিল ত্রিপুর আসিল মারিতে॥
গৌড়সেনা নিকটে আছিল এক বন।
সেই কালে তাতে অগ্নি দিল একজন॥
নানামতে শব্দ তথা বনেরে করিল।
ত্রিপুর আসিল বলি ভয় ভঙ্গ দিল॥
সর্ব্বসৈন্য প্রলয় করিল নদীস্রোতে।
পিতাএ পুত্র না জিজ্ঞাসে ভাঙ্গে এহি মতে॥
হৈতন খাঁ করবে খাঁ সহিতে না পারে।
তবেহ বাজিল শেষে ঘোটক উপরে॥
কাটীতে কাটীতে চলে ত্রিপুরার সেনা।
এক রাত্রি মধ্যে তবে লৈল চারি থানা॥
বহু অশ্ব গজ পরে পাইল সেইখানে।
হৈতন খাঁ কটক সঙ্গে ছিল সেই স্থানে॥
ছয়কড়িয়ার ঘাটে যাইয়া সত্য করি কয়।
এত সৈন্য আসি আমি হৈল পরাজয়।
এহার অধিক সৈন্য যে জনে পাইবা।
সেজন নির্ভয়রূপ এদেশে আসিবা॥
এহা হতে অল্পসৈন্য যাহার নিকটে।
সত্য সত্য বলি আসি না পড় সঙ্কটে॥
যে সব পাঠান জাতি যে মোর বান্ধব।
সৈন্য হীনে যেই আইসে সে প্রাণী গর্দ্দভ॥
ই বলিয়া হৈতন খাঁ গৌড়ে চলি গেল।
গৌড়েশ্বরে নিষ্ঠুর বহু তাহারে বলিল॥

এই দীর্ঘ বিবরণ থেকে ত্রিপুরার রাজা ও বাংলার রাজার সংঘর্ষের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় ত্রিপুরা-রাজ ধন্যমাণিক্যের বাংলা অভিযানের মধ্য দিয়ে। ধন্যমাণিক্য বাংলার সুলতানের অধীন গঙ্গামণ্ডল, পাটীকারা, মেহেরকুল,

কৈলাসহর, বেজোরা, ভানুগাছ, বিষ্ণুজুড়ি, লাঙ্গলা প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং বরদাখাতের জমিদার প্রতাপ রায় বাংলার সুলতানের পক্ষ ছেড়ে ত্রিপুরা-রাজের পক্ষে যোগদান করেন। ধন্যমাণিক্য খণ্ডল পর্যন্ত জয় করেন এবং অধিকৃত অঞ্চলে একজন লস্কর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু খণ্ডলের লোকে সেই লস্করকে বন্দী করে গৌড়ে পাঠায়। গৌড়েশ্বর তাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে বধ করতে আদেশ দেন। লস্কর একা অশেষ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে হাতীর পায়ের তলায় প্রাণ দেয়। ধন্যমাণিক্য তখন তাঁর সেনাপতি রাইকছাগকে খণ্ডলে পাঠান। খণ্ডলে বারোজন বসিক ছিল, তাদের সঙ্গে কপট বন্ধুত্ব দেখিয়ে তাদের ত্রিপুরারাজের সামনে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়। তাদের কবলের মধ্যে পেয়ে ত্রিপুরারাজ বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং তাঁর লোকদের সাহায্যে তাদের সবাইকে বধ করেন। বসিকরা নিহত হলে ত্রিপুরারাজ নিষ্কণ্টক হয়ে খণ্ডল দেশ অধিকার করেন এবং যথেচ্ছভাবে ঐ দেশ লুণ্ঠন করেন।

দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয় ১৪৩৫ শকে (১৫১৩-১৪ খ্রীঃ) ত্রিপুরারাজের চট্টগ্রাম আক্রমণ ও অধিকারের মধ্য দিয়ে। ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করে বিজয়ের স্মারক-স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা বার করেন। বাংলার সুলতান হোসেন শাহ একথা শুনে গৌরাই মল্লিক নামক একজন সেনাপতিকে বাংলার বারোটি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিপুল সৈন্যবাহিনী সঙ্গে দিয়ে পাঠান। গৌরাই মল্লিক (স্পষ্টত বাংলার হৃত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করে) ত্রিপুরার মেহেরকুল অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেন। ত্রিপুরারাজের সৈন্যেরা তখন চণ্ডীগড় দুর্গে আশ্রয় নেয়। গৌরাই মল্লিক এই দুর্গ জয় করতে অসমর্থ হন। অবশেষে ছিলে নামক একজন খোজার বুদ্ধিতে গৌরাই মল্লিক বাঁধ দিয়ে গোমতী নদীর জল অবরুদ্ধ করেন এবং তিনদিন বাদে সেই জল ছেড়ে দেন। তার ফলে জল নদীর পাড় ভেঙে দেশ ভাসিয়ে ফেলে ত্রিপুরার বিপর্যয় ঘটায়। ত্রিপুরা-রাজ এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পুরোহিতকে দিয়ে অভিচার অনুষ্ঠান করান। এই অভিচার অনুষ্ঠানে এক চণ্ডালকে বলি দিয়ে তার মাথা গৌরাই মল্লিকের ঘাঁটিতে পুঁতে আসা হল। তার ফলে সেই রাত্রে গৌরাই মল্লিকের বাহিনী অযথা ত্রিপুরার সৈন্যেরা আসছে মনে করে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল এবং সেনাপতি-সমেত সমস্ত বাহিনী সেই অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে গেল। হোসেন শাহ গৌরাই মল্লিককে ডাকিয়ে এনে তিরস্কার করলেন।

তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় ধন্যমাণিক্যের চট্টগ্রাম পুনরধিকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। তাঁর সেনাপতি "রসাঙ্গমর্দন" নারায়ণ বাংলার রামু প্রভৃতি অঞ্চল জয় করলেন এবং ঘাঁটি আগলাতে লাগলেন। ১৪৩৬ শকে (১৫১৪-১৫ খ্রীঃ) ধন্যমাণিক্যের রাইকছাগ এবং রাইকছম নামে দুজন সেনাপতি চট্টগ্রাম জয় করলেন। এ খবর শুনে হোসেন শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে হৈতন খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে বিপুল সৈন্যবাহিনী দিয়ে ও করবে খাঁ নামে একজন পাঠানকে তাঁর সঙ্গে সহকারীরূপে দিয়ে পাঠালেন। হৈতন খাঁ সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলেন। ত্রিপুরার সরালি, কৈলাগড়, বিশালগড় প্রভৃতি হৈতন খাঁ জয় করলেন। ত্রিপুরার সৈন্যেরা জামির খাঁনি গড়ে ছিল, তার অধ্যক্ষ খড়্গা রায় অনেক যুদ্ধ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৈতন খাঁ গড় জয় করলেন। তারপরে তিনি ছয়-কড়িয়া গড় আক্রমণ করলেন। এই গড়ে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। এই গড়ের সেনাপতি গগন খাঁ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনপ্রহর পরে রণে ভঙ্গ দিলেন। এই গড়ও হৈতন খাঁ জয় করাতে রাজা যশপুর ছেড়ে রাঙ্গামাটি চলে গেলেন। হৈতন খাঁ তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে গঙ্গানগরে গেলেন এবং ডোমঘাটীর পথে এক দুর্গ জয় করে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। গোমতীর জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে হৈতন খাঁ নিজেদের ব্যবহারের জন্য একটি নতুন দিঘি কাটালেন, সেটি "তুড়ুক দিঘি" নামে পরিচিত হল। ধন্যমাণিক্য তাঁর সেনাপতিদের নিয়ে ছনগঙ্গা নদীর ওপারে অবস্থান করছিলেন। ঐ নদীর অনেকগুলি বাঁক। উপরের দিকের বেবথার বাঁকে ত্রিপুরার দুর্গ এবং তার কিছু দূরে নীচের মাছিছা বাঁকে বাংলার সৈন্যেরা ছিল। ধন্যমাণিক্য শত্রুবল পর্যবেক্ষণ করে ডাইনীদের ডেকে বললেন কেন তারা শত্রুদের ধ্বংস করছে না। ডাইনীরা বলল তারা মঙ্গলবার গোমতী শোষণ করবে এবং সাতদিন এইভাবে রাখবে। অতঃপর ডাইনীরা নদীর জল শোষণ করে তাতে চড়া বার করে দিল। এখানে 'রাজমালা'র বর্ণনায় নানা অলৌকিক উপাদান প্রবেশ করেছে। যতদূর মনে হয়, ত্রিপুরা-রাজের লোকেরা স্বাভাবিকভাবে গোমতীর জল বাঁধ দিয়ে আটকে রেখে-ছিল। অতঃপর ত্রিপুরার লোকেরা গোমতীতে বহু ভেলা ভাসাল, প্রতি ভেলায় তিনটি করে পুতুল এবং প্রতি পুতুলের হাতে দুটি করে উল্কা বা জলন্ত মশাল ছিল। গোমতীর জলও ছেড়ে দেওয়া হল। তখন সমস্ত ভেলা বাংলার সৈন্যেরা যেখানে ছিল, সেইদিকে আসতে লাগল, ভেলার উপরে পুতুলগুলির হাতে আগুন জলছিল, তাই দেখে বাংলার সৈন্যেরা ভাবল ত্রিপুরার সৈন্যেরা আসছে। এদিকে নদীর

অর্গলমুক্ত জলধারা তাদের হাতী ঘোড়া উট সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাছাড়া বাংলার সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটির কাছে একটি বন ছিল, ত্রিপুরা-রাজের একজন লোক তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত বিপদের ফলে বাংলার সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে গেল। হৈতন খাঁ ও করবে খাঁ এই বিপর্যয় রোধ করতে না পেরে ঘোড়ায় চড়ে পালালেন। ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী তাঁদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করে তাঁদের বহু সৈন্যকে বধ করল এবং এক রাত্রেই তাঁদের চারটি ঘাঁটি জয় করে বহু হাতী ঘোড়া অধিকার করল। অবশেষে ছয়কড়িয়ার ঘাঁটিতে পৌঁছে হৈতন খাঁ কম সৈন্য নিয়ে আসার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। হৈতন খাঁ গৌড়ে ফিরে গেলে গৌড়েশ্বর তাঁকে অনেক নিষ্ঠুর বাক্য বললেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, 'রাজমালা'র এই বিবরণ কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? এর মধ্যে এই খবর পাওয়া যায় যে প্রথম পর্যায়ে ধন্যমাণিক্যই জয়যুক্ত হন এবং তিনি খণ্ডল পর্যন্ত বাংলাদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে নেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত জয় করেন, কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণে তাঁকে পূর্বাধিকৃত সমস্ত অঞ্চল হারাতে হয় এবং গৌড়েশ্বরের সেনাপতি গৌরাই মল্লিক গোমতী নদীর তীরবর্তী চণ্ডীগড় দুর্গ পর্যন্ত উপনীত হয়। অবশেষে অভিচার অনুষ্ঠানের দ্বারা ত্রিপুরারাজ বাংলার সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে ধন্যমাণিক্য আবার পূর্বাধিকৃত অঞ্চলগুলি অধিকার করেন। কিন্তু এইবারও গৌড়েশ্বরের সেনাপতি হৈতন খাঁ তাঁকে বিতাড়িত করে পিছু পিছু তাড়া করে যান এবং গোমতী নদীর তীরবর্তী মাছিছা পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। এইবার ডাইনীদের সাহায্য নিয়ে এবং বাংলার সৈন্যদের বোকা বানিয়ে ধন্যমাণিক্য তাদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে ত্রিপুরারাজ এই সময় মাত্র ছয়-কড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চল পুনরধিকার করতে পেরেছিলেন।

ধন্যমাণিক্য অভিচারের দ্বারা গৌরাই মল্লিককে এবং ডাইনীদের সাহায্যে হৈতন খাঁকে বিতাড়িত করেছিলেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। এসমস্ত অলৌকিক কাণ্ড ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গ্রাহ্য হতে পারে না। এগুলিকে অবিশ্বাস করে উল্লিখিত বিবরণের বাকী অংশকে সত্য বলে গ্রহণ করলে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে গৌরাই মল্লিক ধন্যমাণিক্যের কাছে পরাজয় বরণ করেন নি; তিনি গোমতী নদীর তীর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন এবং গোমতী নদীর জল প্রথমে রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করে [illegible] ভাগ্যবিপর্যয় ঘটান।

হৈতন খাঁও সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করেননি, কিন্তু এইবার ত্রিপুরা-রাজ প্রথমে গোমতীর জল রুদ্ধ ও পরে মুক্ত করে তাঁকে খানিকটা বিপদে ফেলেছিলেন।

গোমতী নদীকে দুই পক্ষ এইভাবে শত্রুদের অসুবিধায় ফেলার জন্য ব্যবহার করেছে—এতে অস্বাভাবিক বা অবিশ্বাস্য কিছু নেই। প্রথমবার গোমতী গৌড়েশ্বরের সেনাপতির আয়ত্তে ছিল, দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা-রাজের। এরও কারণ খুব সুস্পষ্ট। প্রথমবার গৌরাই মল্লিক মেহেরকুলের পথে অগ্রসর হয়ে গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেছিলেন, ত্রিপুরা রাজের সৈন্যেরা নীচের দিকে থাকায় নদীতে বাঁধ দিয়ে পরে বাঁধ খুলে তাদের ডোবাতে অসুবিধা হয় নি। দ্বিতীয়বার কিন্তু হৈতন খাঁ কৈলাগড়, বিশালগড়, জামিরখাঁনি গড়, ছয়কড়িয়া গড় ও গঙ্গানগরের পথ দিয়ে গিয়ে গোমতী নদীর নীচের দিক দখল করেছিলেন, উপরের অংশ ছিল ধন্যমাণিক্যের দখলে। তাই এবার ধন্যমাণিক্যের পক্ষে হৈতন খাঁর বিপর্যয় সাধনের জন্যে গোমতী নদীকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল।

আর একটা কথা। 'রাজমালা'র মুদ্রিত সংস্করণে ধন্যমাণিক্য-হোসেন শাহের সংঘর্ষের বিবরণ যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার থেকে ধারণা জন্মায় যে গৌরাই মল্লিক ও হৈতন খাঁ দুজনেরই আক্রমণের সময় ত্রিপুরা-রাজ গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়ে ও বাঁধ খুলে শত্রুপক্ষের বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তা যে ঠিক্ নয়, উপরের উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যাবে। ঐ ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন গবেষক যে সমস্ত জল্পনা কল্পনা করেছেন, সেগুলি সম্বন্ধেও আলোচনার স্বতই কোন প্রয়োজন নেই।

অলৌকিক অংশ বাদ দিলে রাজমালা-বর্ণিত হোসেন শাহ-ধন্যমাণিক্য সংঘর্ষের বিবরণ মূলত সত্য বলেই মনে হয়। সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে ধন্যমাণিক্য একবার বাংলার চট্টগ্রাম পর্যন্ত দখল করলেন, কিন্তু তারপরেই বাংলার সেনাপতি তাঁকে বিতাড়িত করে তাঁরই রাজ্যের গোমতী-তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত জয় করে নিলেন। এর কিছুদিন পরে আবার ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অবধি জয় করলেন, কিন্তু এবারও বাংলার সেনাপতি তাঁকে ঠেলে নিয়ে গোমতী নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করলেন এবং তার পরে খানিকটা পিছু হটে ছয়কড়িয়ায় এসে ঘাঁটি গাড়লেন। সুতরাং ত্রিপুরার ছয়কড়িয়া পর্যন্ত অঞ্চল যে শেষ অবধি হোসেন শাহেরই অধিকারে ছিল, সে সম্বন্ধে 'রাজমালা'র মধ্যেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যাচ্ছে। ধন্যমাণিক্য ১৪৩৫ শকাব্দে চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন, 'রাজমালা'র এই উক্তি সত্য; কারণ ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকাব্দে উৎকীর্ণ এবং "চাটিগ্রামজয়ি"

উপাধি সংবলিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে (সা. প. প, ১৩৫৪, পৃঃ ২৬ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু 'রাজমালা'য় হোসেন শাহ-ধন্যমাণিক্যের সংঘর্ষের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়নি। অন্যান্য সূত্রের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যাবে।

প্রথমত, 'রাজমালা'র বিবরণ অনুযায়ী ১৪৩৫ শকাব্দ বা ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে ধন্যমাণিক্য বাংলাদেশে অভিযান করে খণ্ডল পর্যন্ত অধিকার করে নেন। এর আগে বাংলার সুলতানের সঙ্গে ত্রিপুরা-রাজের কোন বিরোধ ছিল বলে 'রাজমালা'য় লেখা নেই। এরপর 'রাজমালা'য় লেখা হয়েছে, ১৪৩৫ শক বা ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করার পরে হোসেন শাহ প্রথম ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। কিন্তু হোসেন শাহ যে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ত্রিপুরার অন্ততঃ একাংশ অধিকার করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। সোনার গাঁও অঞ্চলের একটি মসজিদে ৯১৯ হিজিরার ২রা রবী উস্-সানি বা ৭ই জুন, ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, এতে তৎকালীন রাজা হিসাবে হোসেন শাহের নাম আছে এবং এর নির্মাতা খওয়াস খান ত্রিপুরা রাজ্যের "সর-এ-লস্কর" (আঞ্চলিক শাসনকর্তা) ও মুয়াজ্জমাবাদের "উজীর" বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায়, ঐ তারিখের বেশ কিছুদিন আগেই হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরায় অভিযান করে তার খানিকটা অংশ অধিকার করে। সম্ভবত ধন্যমাণিক্যের ১৪৩৫ শকের আগে খণ্ডল অবধি জয় এবং ১৪৩৫ শকে চট্টগ্রাম অধিকার—এর মাঝখানে হোসেন শাহের এই ত্রিপুরা আক্রমণ ও তার অংশবিশেষ অধিকার ঘটেছিল। হোসেন শাহের অধীনস্থ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান এবং তাঁর পুত্র ছুটি খান (প্রকৃত নাম নসরৎ খান) যে দুটি মহাভারত লিখিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে যে হোসেন শাহের কাছে ত্রিপুরা-রাজ পরাস্ত হয়েছিলেন। পরাগল খানের আজ্ঞায় লিখিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে লেখা রয়েছে,

সুলতান হোসেন সাহা পঞ্চ গৌড় নাথ।
ত্রিপুরার ঘার সমর্পিল যার হাথ ॥

আর ছুটি খাঁর আজ্ঞায় লেখানো শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে রয়েছে,

তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরা গড়েত গিয়া করিল সন্নিধান ॥

ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজবাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি অভয় না দিল মহামতি।
তথাপি (অদ্যাপি ?) আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥

এই দুই কবির বিবরণ, বিশেষ ভাবে শ্রীকর নন্দীর বিবরণে বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে ছুটি খানের নেতৃত্বে হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরা-রাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে রাজ্যের এক বৃহদংশ অধিকার করেছিল। কিন্তু 'রাজমালা'য় ত্রিপুরা-রাজের এত শোচনীয় কোন পরাজয়ের উল্লেখ নেই এবং তাতে ছুটি খাঁর নামও নেই। 'রাজমালা'র মতে হোসেন শাহের সঙ্গে ধন্যমাণিক্যের শেষ সংঘর্ষ ১৪৩৬ শকাব্দ বা ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত নিঃসন্দেহে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত। ছুটি খাঁর ত্রিপুরা-অভিযান সম্বন্ধে শ্রীকর নন্দীর বিবরণ সত্য হলে বলতে হবে যে 'রাজমালা'য় বর্ণিত যুদ্ধগুলির পরে ছুটি খাঁর সেনাপতিত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরায় আর একবার অভিযান করেছিল এবং ধন্যমাণিক্যকে পরাজিত করে ঐ রাজ্যের বৃহদংশ অধিকার করেছিল।

অবশ্য এখানে একটা কথা আছে। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত হোসেন শাহের আমলে রচিত হয়েছিল, না তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে তৎকালীন রাজার নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

নসরৎ শাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন শাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

আবার কোন কোন পুঁথিতে আছে,

নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল প্রজা॥
নৃপতি হুসেন শাহ তনয় সুমতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী॥

আমার মনে হয়, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত রচনার সময় হোসেন শাহই বাংলার সুলতান ছিলেন, তখন শ্রীকর নন্দী প্রথম রাজ-প্রশস্তিটি লিখেছিলেন। পরে হোসেন শাহ যখন পরলোকগমন করেন এবং নসরৎ শাহ রাজা হন, তখন তিনি সেটি পরিবর্তিত করে দ্বিতীয় প্রশস্তিতে দাঁড় করান। কিন্তু এই অনুমান যদি সত্য না হয় এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারত নসরৎ শাহের রাজত্বকালেই রচিত হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে—ছুটি খাঁ কার রাজত্বকালে ত্রিপুরা-জয় করেছিলেন, হোসেন শাহ না নসরৎ শাহ? হোসেন শাহের রাজত্বকালেই করার সম্ভাবনা অবশ্য বেশী। কিন্তু নসরৎ শাহের রাজত্বকালেও যে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরার যুদ্ধ চলেছিল, তার প্রমাণ আছে। সে সম্বন্ধে আমরা পরে যথাস্থানে আলোচনা করব।

আরাকানের সঙ্গে হোসেন শাহের সংঘর্ষ

'রাজমালা'য় লেখা আছে, ত্রিপুরা-রাজ ধন্যমাণিক্য দু'বার চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন—একবার ১৫১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে, আর একবার ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু দুবারই চট্টগ্রামে ত্রিপুরা-রাজের অধিকার খুব স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। পর্তুগীজ বণিক জোআঁ-দে-সিলভেরা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে দেখেছিলেন ঐ শহর বাংলার রাজার অধিকারভুক্ত। একথা জোআঁ-দে-বারোস-এর Da Asia গ্রন্থ থেকে জানা যায়। স্থানীয় প্রবাদ, আরাকান দেশের ইতিহাস এবং 'রাজমালা'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকানের রাজাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই মর্মে প্রবাদ প্রচলিত আছে যে মগেরা হোসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রাম অধিকার করেছিল। ঐ সময় হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নেতৃত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী মগদের বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অধিকার করে। মৌলভী হামিদুল্লাহ্ খান তাঁর 'তারিখ-ই-হামিদী' (১৮৭১) বইয়ে এই কথা লিখেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চট্টগ্রামবাসী সমসাময়িক কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতে এবিষয়ে কোন কিছু লেখা নেই। এতে পরাগল খান সম্বন্ধে এই কথাগুলি লেখা আছে,

> নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
> তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥

লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি আইল হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি ॥

এতে শুধুমাত্র বলা হয়েছে, বাংলার সুলতান পরাগল খানকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন ; তিনি যে শত্রুর কাছ থেকে চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন, এরকম কথার কোন ইঙ্গিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দী কোথাও দেন নি। তাছাড়া ১৩৯৭ থেকে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চট্টগ্রাম যে অধিকাংশ সময় বাংলার রাজারই অধিকারে ছিল, এ কথা সমসাময়িক শিলালিপি, সাহিত্য ও বিদেশীদের ভ্রমণ-বিবরণী থেকে জানা যায়। ৮০০ হিজরা বা ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের দরবেশ মুজঃফর শাম্‌স্ বল্‌খি যখন চট্টগ্রাম বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে মক্কা অভিমুখে রওনা হন, তখন চট্টগ্রাম বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, একথা গিয়াসুদ্দীনকে লেখা শাম্‌স্‌ বল্‌খির চিঠি থেকে জানা যায়। ১৪০৯, ১৪১২ ও ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন থেকে তিন দল রাজপ্রতিনিধি বাংলার তৎকালীন রাজধানী পাণ্ডুয়ায় এসেছিলেন। প্রথম দুই দলের সফরের বর্ণনা দিয়েছেন এই দুই দলের সদস্য মা-হুয়ান তাঁর 'য়িং-য়াই-শেং-লান'এ এবং তৃতীয় দলের সফরের বর্ণনা দিয়েছেন ফে-সিন তাঁর 'সিং-চা-শেং-লান'এ। দুজনেরই লেখা থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রাম ঐ সময় বাংলার রাজার অধিকারে ছিল এবং চীনা রাজপ্রতিনিধিরা এই বন্দরেই প্রথম অবতরণ করেছিলেন। ১৪১৭ ও ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দেও চট্টগ্রাম গৌড়ের রাজার অধিকারে ছিল, কারণ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে দনুজমর্দন দেব ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা 'চাটিগ্রামের' টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল। সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩৩ খ্রীঃ) অনেক মুদ্রাও চট্টগ্রামের টাকশালে তৈরী। অবশ্য আরাকানী কিংবদন্তী অনুসারে আরাকানরাজ মেং-খরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) চট্টগ্রামের 'রামু' নামক অঞ্চল জয় করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র ও পরবর্তী রাজা বসোআহ্‌প্যু (১৪৫৯-৮২ খ্রীঃ) চট্টগ্রাম শহর জয় করেছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে চট্টগ্রামে আরাকান-রাজের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কারণ রাস্তি খান কর্তৃক নির্মিত চট্টগ্রামের

একটি মসজিদের ৮৭৮ হিজরার ২৫শে রমজান তারিখের শিলালিপি থেকে জানা যায়, চট্টগ্রাম ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের শাসনাধীন ছিল। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে বাংলার রাজার অধিকার সম্বন্ধে তো জোর্আ-দে-সিল্‌ভেরার সাক্ষ্য আছে।

ডঃ হবিবুল্লাহ্‌ লিখেছেন," According to Rajmala,…the Arakanese king took advantage of Husain's pre-occupation with Tipperah and occupied Chittagong." (History of Bengal, D. U., Vol. II, pp. 149-50) কিন্তু 'রাজমালা'র ধন্যমাণিক্যখণ্ডে ঠিক এই কথা পাওয়া যায় না, তাতে লেখা আছে,

পুনরপি ধন্যমাণিক্য মহারাজা।
চাটীগ্রাম লইবারে পাঠাইলে প্রজা॥
মারণে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাংমর্দন নারায়ণকে বৈসাইল থানা॥
রাম্বু আদি ছত্রসীক মারিয়া লইল।
রসাঙ্গ নিকটে জাইয়া পুষ্করণি দিল॥
রসাঙ্গ মারিতে গীয়াছিল সেনাপতি।
সেই হতে রসাঙ্গমর্দন নাম খ্যাতি॥

উপরে উদ্ধৃত পাঠ সাহিত্য-পরিষদের পুঁথির। মুদ্রিত গ্রন্থে অংশটির পাঠ এই,

গৌড়াই মল্লিক ভঙ্গ দিল যুদ্ধ হৈতে।
শ্রীধন্যমাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে॥
চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাঙ্গমর্দন নারায়ণকে বসাইল থানা॥
রাম্বু ছত্রসিক রাজা আমল করিল।
রসাঙ্গ জিনিয়া কিল্লা পুষ্কর্ণী খনিল॥
নিজ রসাঙ্গ লৈতে নারে সেনাপতি।
রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি॥

কোন পাঠেই আরাকান বা রসাঙ্গের রাজার চট্টগ্রাম অধিকারের কথা পাওয়া যায় না। আলোচ্য অংশে শুধু বলা হয়েছে, ত্রিপুরা-রাজের জনৈক সেনাপতি রসাঙ্গ আক্রমণ করে রসাঙ্গমর্দন উপাধি পেয়েছিলেন। যাহোক্‌, উদ্ধৃত অংশে ত্রিপুরা-রাজের সেনাপতি কর্তৃক রামু (রাম্বু) অধিকারের কথা আছে। ইতি-

পূর্বে আমরা দেখে এসেছি যে আরাকানী কিংবদন্তীর মতে আরাকানরাজ মেং-খরি (১৪৩৪-৫৯ খ্রীঃ) বাংলার রাজার অধিকারভুক্ত রাম্‌ অঞ্চল জয় করেছিলেন। এখন 'রাজমালা'র মতে ত্রিপুরার রাজা এই অঞ্চল জয় করলেন। আসলে এই অঞ্চলটি ছিল তিন রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত, তাই এটি এক এক সময় এক এক রাজ্যের অধিকারভুক্ত হত। হোসেন শাহের আক্রমণে ধন্য-মাণিক্যের পশ্চাদপসরণের সময় আরাকান-রাজ চট্টগ্রাম অধিকার করুন বা না করুন, এই জাতীয় সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল অধিকার করেছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত (পৃঃ ১৬-৩২) এক প্রবন্ধে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে "রামের অভিষেক" রচয়িতা কবি ভবানীনাথের পৃষ্ঠপোষক রাজা জয়চন্দ (১) চক্রশালা নামক স্থানের রাজা ছিলেন ও (২) তিনি জাতিতে মগ ছিলেন এবং ১৪৮২ থেকে ১৫১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত চট্টগ্রাম তাঁর অধিকারে ছিল। দীনেশবাবুর প্রথম সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থাকলেও দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন ভিত্তি নেই। জয়চন্দ যে জাতিতে মগ ছিলেন, স্বাধীন রাজা ছিলেন, এবং ঠিক ঐ সময়েই বর্তমান ছিলেন, তা জোর করে বলবার মত কোন কারণ নেই।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু না থাকলেও, আরাকানের মগদের সাময়িকভাবে চট্টগ্রাম অধিকারের প্রবাদ সত্য বলে মনে হয়। কারণ জোআঁ-দে-বারোস-এর Da Asia গ্রন্থে লেখা আছে যে, ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন পর্তুগীজ বণিক জোআঁ-দে-সিলভেরা চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করতে না পেরে আরাকান অভিমুখে রওনা হন, তখন আরাকানের রাজা বাংলার রাজার প্রজা ছিলেন। এই মূল্যবান তথ্যটি পূর্বোক্ত প্রবাদের সমর্থন জোগাচ্ছে। ইতিপূর্বে আরাকানরাজ মেং-সোআ-মৃউন ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের অধীনতা স্বীকার করে তাঁর সামন্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী রাজারা বাংলার অধীনতা অস্বীকার করেন, উপরন্তু বাংলাদেশে অভিযান চালিয়ে তার অংশবিশেষ অধিকার পর্যন্ত করেন। এ অবস্থায় ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন আরাকানরাজ আবার বাংলার সুলতানের সামন্তে পরিণত হয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তখন মাঝে কোন এক সময় যে বাংলার রাজার সঙ্গে যুদ্ধে আরাকানরাজের পরাজয় ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে মনে হয় এইভাবে ঘটনাগুলি যথাক্রমে সংঘটিত হয়েছিল—আরাকানরাজের চট্টগ্রাম অধিকার, তাঁকে উচ্ছেদের

জন্য হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ, তাদের হাতে আরাকানরাজের উচ্ছেদ এবং যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে তাঁর বাংলার রাজার সামন্তে পরিণত হওয়া। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগেই ঐই ব্যাপারগুলি ঘটেছিল।

ত্রিহুত ও বিহারে হোসেন শাহের অভিযান

ইতিপূর্বে আমরা হোসেন শাহের কামতাপুর-কামরূপ অভিযান সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে হোসেন শাহ ত্রিহুতের অন্তত কতকাংশ জয় করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে এবং কবে জয় করেছিলেন, বর্তমানে তা বলবার কোন উপায় নেই।

বিহারে হোসেন শাহের রাজ্য অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অবশ্য বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায় তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের মধ্যে কারও কারও শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু হোসেন শাহের শিলালিপি পাটনা জেলায়, এমন কি বিহারের পশ্চিম প্রান্তের সারণ জেলাতেও পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান বিহার প্রদেশের অধিকাংশই হোসেন শাহের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কেমন করে হোসেন শাহ বিহারের এই সমস্ত অঞ্চল জয় করলেন, তার কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

৯০১ হিজরা বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর শাহের সঙ্গে হোসেন শাহের সন্ধি স্থাপিত হয়। সিকন্দর শাহের দলের লোকদের মতে ঐ বছরের মধ্যেই সিকন্দর শাহের বিহার জয় সম্পূর্ণ হয়েছিল, কারণ বিহারের দায়রা মহল্লায় ফজলুল্লার কবরের উত্তর দিকের দেওয়ালের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সিকন্দরের বিহার জয়ের পর ও তাঁর অধীনস্থ শাসনকর্তা দরিয়া খান নুহানির শাসনকালে হাজী খান ৯০১ হিজরায় পূর্বদিকের ফটক নির্মাণ করান (JBRS, 1955, p. 363)। সম্ভবত এখানে বিহার বলতে 'বিহার শরীফ'কে বোঝানো হয়েছে, সমগ্র বিহার অঞ্চলকে বোঝানো হয়নি। সিকন্দর যদি সমগ্র বিহার জয় করে থাকেন, তাহলেও হোসেন শাহ আবার তার অনেকখানি অধিকার করে নিয়েছিলেন। হোসেন শাহের মুঙ্গেরে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তার তারিখ ৯০৩ হিঃ। পাটনা জেলার বোনহরা, নওয়াদা ও মচ্ছিহাটায় হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তাদের তারিখ যথাক্রমে ৯০৮, ৯১৬ ও ৯১৬

হিজরা। সারণ জেলার চেরান্দ ও নরহন গ্রামেও হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, চেরান্দের শিলালিপির তারিখ ৯০৯ হিজরা।

সিকন্দর শাহের সঙ্গে হোসেন শাহের সন্ধি স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে যে পরিপূর্ণ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি, তার প্রমাণ আছে। সৈয়দ হাসান আস্‌কারি লিখেছেন যে সন্ধির সময় "The Bengal ruler gave an understanding not to harbour the enemies of the empire" (JBRS, 1955, p. 363)। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। সিকন্দর শাহ তাঁর অন্যতম অমাত্য "সারণের নায়েব (প্রতিনিধি)" হোসেন খান ফর্মুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে দেখে এবং তাঁকে বাংলার সুলতানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ৯১৫ হিজরায় অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে হাজী সারং-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। হোসেন খান ফর্মুলি বিপদ বুঝে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। (JBRS, 1955, pp. 365-366)। ৯১৫ হিঃ অবধি হোসেন খান ফর্মুলি সারণে সিকন্দর শাহের প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু ৯০৯ হিজরাতে সারণের চেরান্দে হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে সারণের এক অংশে হোসেন শাহের এবং অপর অংশে সিকন্দর শাহের অধিকার ছিল।

বিহার শরীফের পূর্বোক্ত শিলালিপিতে যে দরিয়া খান নুহানির নাম পাওয়া যায়, তিনি অন্তত সিকন্দর শাহের মৃত্যুর সময় (১৫১৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত "বিহারের" শাসনকর্তা ছিলেন। রিজকুল্লা নামে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে সিকন্দর শাহের মৃত্যুর পর বাংলার সুলতান ও উড়িষ্যার রাজা যখন শত্রুতা করতে সুরু করলেন তখন দরিয়া খান নুহানি তেজের সঙ্গে বলেছিলেন, "সুলতান মারা গিয়েছেন তো কী হয়েছে? আমি এখনও বেঁচে আছি। সুলতান যখন অনেক দূরে তাঁর রাজধানীতে থাকতেন, তখন আমিই সবসময় এখানে থাকতাম। যাও, একদিকে বাংলার আর একদিকে উড়িষ্যার দ্বার বন্ধ কর। কারও যদি সাহস থাকে, সে এদিকে আসুক।" (JBRS, 1955, p. 367)। সিকন্দর শাহের মৃত্যুর পরে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে প্রকাশ্যভাবেই দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করেছিলেন, এই মূল্যবান সংবাদ এখানে পাচ্ছি। দরিয়া খান নুহানির আস্ফালন সত্ত্বেও বিহারে হোসেন শাহের রাজ্যবিস্তার বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে মনে হয় না।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যে সমস্ত সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হয়েছিলেন, তাদের সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এই আলোচনার ফলে যে তথ্যগুলি পাওয়া গেল, নীচে সংক্ষেপে সেগুলি উল্লেখ করছি।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদীর সঙ্গে হোসেন শাহের সংঘর্ষ হয়। বিহারের বাঢ় নামক জায়গায় দুই সুলতানের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষ যুদ্ধ না করে সন্ধি স্থাপন করে।

১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কামতাপুর-কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেখানকার রাজাকে যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে ঐ রাজ্য অধিকার করেন।

এর কিছু পরে এবং ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে হোসেন শাহ আসাম বা অহম্ রাজ্য আক্রমণ করে তার সমতল অঞ্চল অধিকার করেন। ঐ রাজ্যের রাজা তখন পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন এবং বর্ষাকাল আগত হলে প্রতি-আক্রমণ করে হোসেন শাহের লোকদের বিধ্বস্ত করে নিজের হৃত অঞ্চলগুলি পুনরধিকার করেন।

১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুরু করে অন্তত ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ চলে। মাঝে কোন কোন সময় এই যুদ্ধ বন্ধ ছিল এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি আসন্ন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার নতুন করে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন কোন সময় উভয় রাজা অন্য রাজ্যের অঞ্চলবিশেষ অধিকার করেন, কিন্তু কারও অধিকারই স্থায়ী হয়নি। উভয় রাজাই এই যুদ্ধে জয়ের দাবী করেন, কিন্তু মোটের উপর এই যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল বলে মনে হয়। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দেই এই যুদ্ধের অবসান হয়েছিল বলে বোধ হয়।

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দেরও আগে কোন এক সময় ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ সুরু হয় এবং ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ বা তারও পর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধেও দুই রাজাই কোন কোন সময় অন্য রাজ্যের অংশ-বিশেষ অধিকার করেন বটে, কিন্তু এইসব অধিকার বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ত্রিপুরার সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে, তাঁর রাজত্ব শেষ হবার পরেও এই যুদ্ধ চলেছিল।

সম্ভবত ১৫১৪ থেকে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম অধিকার করেন; হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের আগেই চট্টগ্রাম পুনরধিকার করে এবং আরাকানরাজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হোসেন শাহের সামন্তে পরিণত হন।

এছাড়া হোসেন শাহ সম্ভবত ত্রিহুতেরও কতকাংশ জয় করেছিলেন। হোসেন শাহ বিহারের অধিকাংশই নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। এইসব অংশের কিছু কিছু আগে সিকন্দর লোদীর রাজ্যভুক্ত ছিল। সিকন্দর লোদীর সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পরেও তাঁর সঙ্গে হোসেন শাহের পরিপূর্ণ প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়নি। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সিকন্দর লোদীর মৃত্যুর পরে তিনি প্রকাশ্যেই দিল্লীর রাজশক্তির বিরুদ্ধে শত্রুতা সুরু করেন।

বাংলায় পর্তুগীজদের আগমন

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ-দে-বারোস-এর "Da Asia" গ্রন্থে (রচনাকাল ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ) এবং অন্যান্য পর্তুগীজ গ্রন্থে বাংলাদেশে পর্তুগীজদের প্রথম আগমন সম্বন্ধে বিস্তৃত ও প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হোসেন শাহের রাজত্বকালেই বাংলাদেশে পর্তুগীজরা প্রথম পদার্পণ করে। বাংলাতেই বা বলি কেন, ভারতের প্রথম পর্তুগীজ আগন্তুক ভাস্কো-দা-গামা যে বছর (১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন, তখনও হোসেন শাহই বাংলার সুলতান ছিলেন। যাহোক, জোআঁ-দে-বারোস-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগীজরা বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্য সুরু করতে পারেনি। মাঝে মাঝে দু'একজন পর্তুগীজ বণিক বাংলার সমুদ্রোপকূলে এসে অন্যবর জিনিষ কেনাবেচা বা এদেশের কুটিরশিল্পীদের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য বিনিময় করে চলে যেত। প্রাচ্যে পর্তুগীজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা আলবুকার্ক ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজা মনোএলকে এক চিঠি লিখে জানান যে বাংলাদেশের লোকেরা পর্তুগীজদের কাছে জিনিষ কিনতে চায়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক ফার্নাঁ-পেরেস-দা-আঁন্দ্রেদ্ নামে একজন পর্তুগীজকে চারটি জাহাজ দিয়ে বাংলায় বাণিজ্য সুরু করতে এবং আরব বণিকদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করতে বলেন। কিন্তু মাঝসমুদ্রে অগ্নিকাণ্ডে প্রধান জাহাজটি নষ্ট হওয়ার জন্য ফার্নাঁ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে এসে পৌঁছোতে

পারেননি। অবশ্য জোআঁ-কোএল্‌হো নামে তাঁর একজন বার্তাবহ চট্টগ্রামে এসেছিলেন। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্কের স্থলাভিষিক্ত পর্তুগীজ শাসনকর্তা লোপো-সোয়ের্‌স-দে-আলবার্গারিআ জোআঁ-দে-সিলভেরা নামে আর একজন পর্তুগীজকে বাংলাদেশে পাঠান সেই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। সিলভেরা প্রথমে আরাকান নদীর মোহানায় পৌঁছে তারপর চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছোন। জোআঁ-কোএল্‌হো আগে থেকেই সেখানে এসেছিলেন। সিলভেরা পর্তুগালের রাজার পক্ষ থেকে বাংলার রাজাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান এবং বাণিজ্য করার অনুমতি চান। সেই সঙ্গে তিনি একটি কুঠি নির্মাণেরও অনুমতি চান, যেখানে পর্তুগীজ বণিকরা সমুদ্রযাত্রার সময় বিশ্রাম নিতে পারবে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদান করতে পারবে। কিন্তু বাংলার রাজা তাঁর এই আবেদনের কোন উত্তর পাঠাবার আগেই সিলভেরার সঙ্গে চট্টগ্রামের শাসনকর্তার সংঘর্ষ বেধে গেল। এর আগে একবার সিলভেরা গ্রোমাল নামে একজন মুরের দুটি জাহাজ দখল করেছিলেন। এই গ্রোমাল ছিল চট্টগ্রামের শাসনকর্তার আত্মীয়। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা এই ব্যাপার জানতে পেরে পর্তুগীজদের তাড়াবার জন্যে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা হল সিলভেরা জলদস্যু। এদিকে পর্তুগীজদের খাবার ফুরিয়ে যাওয়ায় সিল্‌ভেরা চালে বোঝাই একটা নৌকো দখল করে নিলেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তখন ডাঙা থেকে কামান দাগলেন। পর্তুগীজরাও চট্টগ্রাম বন্দর অবরোধ করে বাংলাদেশের সমস্ত সামুদ্রিক বাণিজ্য বিপর্যস্ত করে দিল। কিন্তু চট্টগ্রামের শাসনকর্তা তখন কয়েকটি জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন; তিনি বেগতিক দেখে পর্তুগীজদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন। কোএলহোর সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল, তাঁর মধ্যস্থতায় সাময়িক ভাবে একটা সন্ধি হল। কিন্তু প্রত্যাশিত জাহাজগুলি বন্দরে এসে পৌঁছোবামাত্র তিনি সিলভেরার উপর আবার আক্রমণ সুরু করলেন। বাংলাদেশের মাটিতে নামতে না পেরে সিলভেরা শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে আরাকানের দিকে গেলেন। কোএলহো চীনে গেলেন। আরাকানের রাজা এই সময় বাংলার সুলতানের প্রজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী আরাকান চট্টগ্রাম থেকে ৩৫ লীগ দূরে অবস্থিত ছিল। আরাকানের রাজার সঙ্গে সিলভেরার কথাবার্তা চলল। আরাকান-রাজ জানালেন তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছুক। সিলভেরা কিন্তু

জানতে পারলেন যে তিনি আরাকানে অবতরণ করলেই তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতা করে বন্দী করা হবে। নিরাশ হয়ে তিনি সিংহলে ফিরে গেলেন।

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে দুয়ার্তে বারবোসা নামে একজন পর্তুগীজ বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন। ইনি বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক ম্যাগেলানের জ্ঞাতি। তিনি এদেশের একটি বিবরণ লিখে গেছেন। সেটি আমরা পরে যথাস্থানে উদ্ধৃত করব।

হোসেন শাহের রাজধানী

হোসেন শাহের রাজধানী কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, "সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তাঁর রাজধানী গৌড় নগরীর সংলগ্ন একডালায় স্থানান্তরিত করেন। হোসেন শাহ ছাড়া বাংলার আর কোন রাজা পাণ্ডুয়া ও গৌড় ভিন্ন অন্য কোন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেননি।" হোসেন শাহের রাজধানী যে একডালায় ছিল, সেকথা হোসেন শাহের মৃত্যুর ৭১ বছর পরে রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তেও লেখা আছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ৯১১ হিজরার ২রা জমাদী অল-আউয়ল অর্থাৎ ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে মুহম্মদ বিন য়জ্‌দান বখ্‌শ্‌ নামে এক ব্যক্তি বিশিষ্ট ঐশ্লামিক গ্রন্থ 'শহীহ্‌ অল-বুখারী'র তিন খণ্ডের পুঁথি নকল সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই তিন খণ্ডের পুঁথি বর্তমানে বাঁকীপুর ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে। সর্বশেষ খণ্ডের পুঁথিটির পুষ্পিকা থেকে জানা যায় যে, পুঁথিগুলি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজকীয় কোষাগারের জন্য নকল করা হয়েছিল বাংলার রাজধানী য়্যাকডালা বা একডালায় ("The...colophon says that all these three copies were written for the Royal Treasury of Alauddin Hussain Shah bin Sayyid Ashraf al-Husaini, the king of Bengal···Dated Yakdalah, the capital of Bengal, A. H. 911."—Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Vol. V, pp. 18-20)

সুতরাং হোসেন শাহের রাজধানী যে একডালায় ছিল, তা জানা গেল। এর আগে চতুর্দশ শতাব্দীতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন বলে জিয়াউদ্দীন বার্নি, শম্‌স্‌-ই-সিরাজ-ই-আফিফ প্রভৃতি সমসাময়িক লেখকরা এবং অন্য ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন। কিন্তু এই

একডালা কোথায় ছিল, তা এখনও পর্যন্ত স্থিরভাবে নিরূপণ করা যায়নি। রেনেল এবং বেভারিজের মতে বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত একডালা গ্রামই এই একডালা। ওয়েস্টমেকটের মতে একডালা বর্তমানে মালদহ জেলার অন্তর্ভুক্ত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতে মালদহ জেলার দমদমা নামক স্থানই প্রাচীনকালে একডালা নামে পরিচিত ছিল। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে এই একডালা পাণ্ডুয়ার খুব নিকটে অবস্থিত ছিল। আবিদ আলীর মতে এই একডালা পাণ্ডুয়ার আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত মুর্চা গ্রাম। ষ্টেপলটন ও নীরোদভূষণ রায়ের মতে এই একডালা ঘোড়াঘাটের ১৫ মাইল পশ্চিমে এবং পাণ্ডুয়ার ২৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত বর্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একডালা গ্রাম। রামপ্রাণ গুপ্ত লিখেছেন "কেহ বা মালদহের কেহ বা দিনাজপুরের 'জগদলকেই' এই একডালা অনুমান করেন।"

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজধানী যে একডালায় ছিল একথা নিশ্চিত রূপে জানবার পর একডালার অবস্থান নির্ণয় করা এখন খুব সহজ হয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য খুব মূল্যবান। চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্ট লেখা আছে যে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলি গ্রামের খুব কাছেই হোসেন শাহের রাজধানী ছিল। এই অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

গৌড়ের নিকটে গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণসমাজ তার 'রামকেলি' নাম॥
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে॥

রামকেলি গ্রামের কাছেই যে হোসেন শাহের রাজধানী, সেকথা বৃন্দাবনদাস এরপর বলেছেন,

নিকটে যবন রাজা পরম দুর্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে হোসেন শাহ কেশব ছত্রী ও দবীর খাসকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে রূপ-সনাতন দুই ভাই লুকিয়ে গভীর রাত্রে রামকেলি গ্রামে গিয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন,

ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্ধরাত্রে দুই ভাই আসিলা প্রভুস্থানে।

এ বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের সাক্ষ্য খুব মূল্যবান, কারণ তিনি দীর্ঘকাল রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উক্তি থেকে আমরা জানতে পারছি যে রূপ-সনাতন তাঁদের নিবাসস্থল অর্থাৎ হোসেন শাহের রাজধানী থেকে এক রাত্রের মধ্যেই গোপনে রামকেলি গ্রামে গিয়ে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছিলেন। এর থেকেও বোঝা যায় হোসেন শাহের রাজধানী একডালা রামকেলির একেবারে কাছাকাছি তথা গৌড়েরও খুব কাছে ছিল। কারণ রামকেলি গ্রাম গৌড় শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে লেখা আছে যে রূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে বাস করতেন,

গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস॥

রামকেলি গ্রামে সে সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার কার্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া॥

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার ১৯শ অধ্যায়ে লেখা আছে,

শ্রীরূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে।
প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে রূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করে নিজের ভবনে ফিরে গেলেন। এর থেকে মনে হয়, তাঁদের ভবন রামকেলি গ্রামে ছিল না, অন্য কোন জায়গায় ছিল। রূপ-সনাতন শুধু হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন না, প্রাইভেট সেক্রেটারীর পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের বেশীর ভাগ সময়েই রাজার কাছে কাছে থাকতে হত। সুতরাং তাঁদের বাসভবন রাজধানীর বাইরে হতে পারে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে রূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামেই বাস করতেন, তাহলেও বলতে হবে হোসেন শাহের রাজধানী গ্রামের খুব কাছে অবস্থিত ছিল, তা না হলে রূপ-সনাতনের পক্ষে সদাসর্বদা রামকেলি থেকে সুলতানের কাছে যাওয়া সম্ভব হত না।

জিয়াউদ্দীন বারনির মতে একডালা পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী একটি মৌজা।

ফিরিশ্‌তার মতে একডালা গঙ্গা থেকে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু এই দু'জন লেখকের মধ্যে কেউই কখনও বাংলাদেশে আসেননি। 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র লেখকের মতে একডালা গৌড়ের পাশেই অবস্থিত ছিল এবং চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য থেকে এই উক্তিই সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। 'রিয়াজ'-রচয়িতা মালদহেরই লোক, সুতরাং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রন্থ রচনা করলেও এ বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, একডালার অবস্থিতি সম্বন্ধে আজকের দিনের তুলনায় তখন অনেক বেশী তথ্যপ্রমাণ ছিল সন্দেহ নেই। গৌড় পাণ্ডুয়া থেকে মাত্র ২০ মাইল দূর, সুতরাং একডালা সম্বন্ধে জিয়াউদ্দীন বারনির উক্তিও একেবারে ভুল নয়। জিয়াউদ্দীন বারনিরই সমসাময়িক কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ-শাহী' গ্রন্থে লেখা আছে যে একডালা গঙ্গার তীরে অবস্থিত এবং গঙ্গার শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই বর্ণনা গৌড় সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য।

এখন কথা হচ্ছে, হোসেন শাহ তাঁর রাজধানী গৌড় থেকে একডালায় স্থানান্তরিত করলেন কেন? রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই তিনি এরকম করেছিলেন। এই কথাই ঠিক্ বলে মনে হয়। এর আগে উপর্যুপরি কয়েকজন সুলতান যেভাবে আততায়ীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন, সেই কথা মনে করেই সম্ভবত হোসেন শাহ একডালায় তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গেই বাস করতেন। তাছাড়া হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের সময় কয়েকদিন অবিশ্রান্ত লুঠের ফলে রাজধানী গৌড় নিশ্চয়ই শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। তার ফলেও হয়তো হোসেন শাহ অন্য জায়গায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে' লেখা আছে যে গৌড়ের একনাখা নামে জায়গায় হোসেন শাহের সমাধি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ক্রেটন এবং মাঝের দিকে মুন্‌শী ইলাহী বখ্‌শ্‌ এই সমাধি দেখেছিলেন। এই সমাধি যে জায়গায় ছিল, সে জায়গাটি এখন বাঙ্গলা-কোট নামে পরিচিত, এটি বাইশ-গজী দেওয়াল বা পুরোনো রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের প্রায় এক ফার্লং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। হোসেন শাহের সমাধি-ভূমির এই অবস্থান থেকেও মনে হয় যে হোসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের খুব কাছে ছিল, কারণ মৃত রাজাকে তাঁর রাজধানী থেকে অনেক দূরে নিয়ে এসে কবর দেওয়ার প্রথা সেযুগে প্রায় ছিলই না বলা চলে।

হোসেন শাহ ও শ্রীচৈতন্য

মধ্যযুগের বাংলার সবচেয়ে বিখ্যাত নরপতি হোসেন শাহ এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য পরস্পরের সমসাময়িক। এই যোগাযোগ সত্যিই আশ্চর্য। ইতিহাসে সাধারণত দেখা যায়, কোন মহাপুরুষের নামের জোরে তাঁর সমসাময়িক রাজাও বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক না হলে রাজা বিম্বিসারকে আজ কে চিনত? কিন্তু হোসেন শাহের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। তিনি শুধুমাত্র তাঁর সমসাময়িক মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জন্যে বিখ্যাত নন, নিজগুণেই তিনি বড়, তাই ব্রহ্মপুত্র থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর স্মৃতি জনসাধারণের মনের মধ্যে আজও বেঁচে আছে।

হোসেন শাহ তাঁর সমসাময়িক এই মহামানবকে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তা জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে শ্রীচৈতন্যদেবের নাম জানতে পেরেছিলেন, সে কথা বৃন্দাবনদাস, কবিকর্ণপুর, জয়ানন্দ, চূড়ামণিদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বহু চরিতকার উল্লেখ করেছেন, কাজেই তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এক চূড়ামণিদাস ভিন্ন অন্য সব চরিতকারই লিখেছেন যে নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের সময় যখন চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে গৌড়ের অনতিদূরে অবস্থিত রামকেলি গ্রাম পর্যন্ত এসেছিলেন, তখন হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শোনেন। অবশ্য এ-সম্বন্ধে বিভিন্ন বইএর বর্ণনার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। চূড়ামণিদাসের মতে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের আগেই তাঁর প্রতি হোসেন শাহের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। যাহোক্, এখন আমরা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থের উক্তি বিচার করে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করব।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে (রচনাকাল ১৫৩৮ খ্রীঃ থেকে ১৫৫০ খ্রীঃর মধ্যে) সর্বপ্রথম আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ পাচ্ছি। বৃন্দাবনদাস বেশ বিস্তৃতভাবেই বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন।

চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে চৈতন্যদেব যখন রামকেলি গ্রামে গিয়ে ভক্তদের সঙ্গে হরিগুণগানে বিভোর ছিলেন, তখন,

নিকটে যখন রাজা পরম দুর্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥

নির্ভয় হইয়া সর্বলোক বোলে হরি।
দুঃখ শোক গৃহ বিত্ত সকল পাসরি॥
কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজ স্থানে।
এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কতজন॥
রাজা বোলে কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন।

"কোটোয়াল" উচ্ছ্বসিত ভাষায় সন্ন্যাসীর রূপ-গুণ ও আচরণ বর্ণনা করলেন ; তাঁর কথা শুনে রাজা কেশব খানকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

কহত কেশব খান কেমত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বোল যার॥
কেমত তাঁহার কথা কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিহোঁ কহিবা অবশ্য॥
চতুর্দ্দিগে আইছে লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভালমতে॥
শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥
কে বোলে গোসাঞি, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।
দেশান্তরি গরিব বৃক্ষের তলবাসী॥

তখন

রাজা বোলে, গরিব না বোলো কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলেও কানে॥
হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ' খোদায় যবনে।
সেই তিহোঁ নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তাঁর আজ্ঞা সর্বদেশে শিরে করি বহে॥
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥

তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে ॥
ছয়মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক সকলে ॥
আপনার সেবি লোক তাহানে খাইতে।
চাহে তাহা কেহো নাহি পায় ভালমতে ॥
অতএব তিঁহো সত্য জানিহ ঈশ্বর।
গরিব করিয়া তাঁরে না বোল উত্তর ॥
রাজা বোলে, এই মুঞি বলিলুঁ সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাঁহারে ॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে ॥
সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন ॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনো জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে ॥”

হোসেন শাহ এই কথা বলে ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর কথা শুনে “তুষ্ট হইলেন যত সজ্জনের গণ”। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। এক সঙ্গে বসে মন্ত্রণা করতে লাগলেন,

স্বভাবেই রাজা মহা কালযবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনেঘন ॥
ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিলে প্রমাদ ॥
দৈবে আসি সত্ত্বগুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেন আমা সভা স্থানে ॥
আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আরবার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥
জানি কদাচিৎ কহে, কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া সভে চাহি দেখি এই ঠাঞি ॥

অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার নিকট-গ্রামে কি কার্য রহিয়া॥

এই যুক্তি করে তাঁরা একজন ব্রাহ্মণকে চৈতন্যদেবের কাছে পাঠালেন। সেই ব্রাহ্মণ সঙ্কীর্তনরত ভাববিভোর চৈতন্যদেবকে দেখে তাঁকে আর কিছু বলতে পারল না, তাঁর ভক্তদের কাছে সব কথা বলে চৈতন্যদেবকে অবসরমত জানাতে অনুরোধ করে গেল। ভক্তেরাও সঙ্কোচবশত চৈতন্যদেবের কাছে কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু "অন্তর্যামী শচীনন্দন" সমস্ত বুঝে নিলেন। তারপর

প্রভু বোলে তুমি সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবেক কারণে॥
আমা চাহে হেন জন আমিও তা চাঙ।
সবে আমা চাহে হেন কোথাও না পাঙ॥
তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে।
রাজা আমা চাহে মুঞি যাইমু আপনে॥
রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে॥
আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে।
তবে সে বলিব রাজা আমারে চাহিতে॥
আমা দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার॥

অতঃপর কিছুদিন বাদে মহাপ্রভু নিজের ইচ্ছায় আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে গেলেন।

কবিকর্ণপূর বৃন্দাবনদাসের সমসাময়িক গ্রন্থকার। চৈতন্যদেবের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করে তিনি সংস্কৃত ভাষায় দু'খানি বই লেখেন—চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য (রচনা কাল ১৫৪২ খ্রীঃ) ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (রচনা কাল ১৫৭২-৭৩ খ্রীঃ)। এর মধ্যে প্রথমটিতে আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোন কথা নেই। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে চৈতন্যদেবের গৌড় ভ্রমণের সহযাত্রী রায় রামানন্দ কর্তৃক প্রেরিত একজন লোক উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে বলছে,

"শ্রুতঞ্চ গৌড়েশ্বরস্য রাজধান্যাঃ পারে গঙ্গং চলতো ভগবতঃ পশ্চাদুভয়োঃ পার্শ্বদ্বয়োশ্চলন্তীং লোক ঘটামালোক্য গৌড়েশ্বরো গঙ্গাতট ঘটমানোপকারি-কামারূঢ়ো বিস্মিতঃ কিমধিকমিতি যদা পৃষ্টবান্ তদা কেশববসুনাম্না তদমাত্যেন

কথিতং সুরত্রাণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোনাম কোঽপি মহাপুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথুরাং প্রয়াতি তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি ইতি তত স্তেনাপ্যুক্তম্ অয়মীশ্বরো ভবতি যস্যৈবংবিধ লোকাকর্ষণমিতি।

[আমি শুনেছি যে ভগবান যখন গৌড়েশ্বরের রাজধানী থেকে গঙ্গাপারে যান, সেই সময় তাঁর পিছনের ও দু'পাশের চলন্ত লোকদের দেখে গঙ্গাতীরের চন্দ্রশালিকায় অধিরূঢ় গৌড়েশ্বর বিস্মিত হয়ে কেশব বসু নামে তাঁর অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে এ কী। এত লোক কেন?" তখন অমাত্য বললেন, "সুলতান! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে একজন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম থেকে মথুরায় যাচ্ছেন, কাজেই তাঁকে দেখতে এত লোক আসছে। তাই শুনে তিনি (গৌড়েশ্বর) বললেন, "ওহে অমাত্য! ইনি সাক্ষাৎ জগদীশ্বর! নয়তো এত লোক আকৃষ্ট হবে কেন?"]

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (১৫৪৮ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত) আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে এই লেখা আছে (এশিয়াটিক সোসাইটির G-5398 নং পুঁথির পাঠ),

গৌড় নিকটে কৃষ্ণকেলি নামে গ্রাম।
তাহে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী ভুবনে অনুপাম॥
সঙ্কীর্ত্তনে নাচে প্রভু কৃষ্ণকেলি গ্রামে।
সর্ব্বলোক উন্মত্ত হইল হরি নামে॥
চৈতন্য চান্দের রূপ দেখীয়া বিশাল।
রাজারে জানাএ গিয়া রাজার কোটাল॥
এক সন্ন্যাসী কৃষ্ণচৈতন্য তার নাম।
উন্মত্ত করাইলেক নাটে কৃষ্ণকেলি গ্রাম॥
তাহার নাট দেখীআ বনের পশু কান্দে।
রূপ দেখী কুলবধূ বুক নাঞি বান্ধে॥
গাছে মাথা নওাএ গোসাঞার নাটে।
আছুক মানুষের কাজ পাথর দেখীআ ফাটে॥
রাজা বলে কেশবখাঁ ধরিয়া আন এথা॥
কেমন কৃষ্ণচৈতন্য তারে পাথর নওাএ মাথা॥
তাহা শুনি নিবর্ত্ত হইল চৈতন্য ঠাকুর।
সর্ব্ব পারিষদ সঙ্গে গেলা শান্তিপুর॥

চূড়ামণিদাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়ে' (রচনাকাল সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ) হোসেন শাহ যে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বচক্ষে দেখেছেন, এরকম আভাস দেওয়া হয়েছে। চূড়ামণিদাসের মতে মহাপ্রভু যখন পিতার পিণ্ড দিতে গয়া যাচ্ছিলেন, তখন গৌড় হয়ে যান এবং সে সময়ে হোসেন শাহ তাঁর অলৌকিক কীর্তি দর্শন করে মুগ্ধ হন। চূড়ামণি দাস লিখেছেন, গৌড়ের বিস্তীর্ণ গঙ্গা দেখে

আবেশে অবশ প্রভু গঙ্গাস্নান করে।
পূজিল গোবিন্দ গঙ্গা বহু উপচারে॥
এক অযুত পদ্ম প্রভু কিনি আনে।
গঙ্গানিবেদন করে এ মন্ত্রবিধানে॥
গঙ্গার দুকুল মাঝে পদ্ম ভাসি যায়।
দেখিয়া গৌড়ের লোক চমৎকার পায়॥
দেখিয়া দুকুল লোক আকুল আনন্দে।
কোন ভাগ্যবান কৈল এসব প্রবন্ধে॥
গঙ্গার দুকুল মাঝে ভাসে পদ্মরাশি।
শিবশিরে রহে গিয়া পলাইয়া শশী॥
কিবা লক্ষ্মী গৌড়ে রহি করএ বিহার।
গঙ্গা বা দিলেন তাঁরে পদ্ম উপহার॥
সুলুতান হুসেন সাহা শুনিয়া এ রঙ্গ।
আপনি দেখিতে আল্যা পাত্রমিত্র সঙ্গ॥
সুলুতান কহে শুন অহে পাত্রমিত্র।
এসব মানুষি নহে গোসাঞী চরিত্র॥
এক এক পদ্ম হৈল লাখ লাখ দলে।
দেখি পদ্মময় গঙ্গা না দেখিএ জলে॥

গয়া যাবার সময় যে চৈতন্যদেব গৌড় হয়ে গিয়েছিলেন, এ কথা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও পাওয়া যায়। কিন্তু এক অযুত পদ্ম কিনে গঙ্গায় ভাসিয়ে গঙ্গাকে ঢেকে ফেলা এবং তাই দেখতে স্বয়ং হোসেন শাহের গঙ্গাতীরে আসার কাহিনী গল্পকথার মতই শোনায়। যা হোক, অন্য কোন সূত্রে চূড়ামণিদাসের উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না বলে বর্তমান অবস্থায় তার যাথার্থ্য নির্ধারণ করার কোন উপায় নেই।

অতঃপর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করব। এই বই সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত হলেও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে এর বিবরণ খুব মূল্যবান, কারণ চৈতন্যদেব ও হোসেন শাহ এই দুজনেরই যাঁরা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, এমন কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের অন্তরঙ্গতা ছিল; কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিবরণের প্রথম অংশের সঙ্গে পূর্ববর্তী লেখকদের বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য নেই, কিন্তু তার শেষ অংশে দুটি নতুন কথা পাই। সে দুটি কথা এই যে কেশব ছত্রীকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার পরে হোসেন শাহ "দবীর খাসের" সঙ্গে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন এবং রূপ-সনাতন নিজের মুখে চৈতন্যদেবকে রামকেলি গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই নতুন সংবাদ দুটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর নিবিড় সঙ্গ লাভ করেছিলেন। যাহোক্, 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা নীচে উদ্ধৃত হল।

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলিগ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যার পাছে হয়।
সেই ত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজী যবন! ইহার না করিহ হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বুলুন—যাঁহা উঁহার মন॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন।
তাঁহা দেখিবারে আইসে দুইচারিজন॥
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় আরো হানি॥

রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া॥
দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেহোঁ লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোঁসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিয়া॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্যসিদ্ধ হয়॥
ইহাঁর আশীর্বাদে তোমার সর্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেনে পুছ, তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশসম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যের কৈছে হয় জ্ঞান?
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেইত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয়॥

এরপর রূপ-সনাতন চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর চরণে পতিত হলেন। চৈতন্যদেব তাঁদের কৃপা করলেন। তাঁর কৃপা লাভ করে রূপ-সনাতন তখনকা মত বিদায় নিলেন। যাবার সময় রূপ-সনাতন

প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।

মহাপ্রভু এই অনুরোধ রেখেছিলেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বিভিন্ন চৈতন্যচরিতগ্রন্থে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলি আমরা উদ্ধৃত করলাম। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই বিবরণগুলি একই সূত্র থেকে সংগৃহীত নয়, কারণ তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে বর্ণিত ঘটনা যে মূলত সত্য, তাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। বাস্তব ভিত্তি না থাকলে এতগুলি বইয়ে এই প্রসঙ্গ স্থান পেত না। কিন্তু বিভিন্ন বইয়ে যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য আর কোন্‌গুলি অমূলক, তা বলা শক্ত। তিনটি বিষয়ে অধিকাংশ বিবরণের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়। সেগুলি এই,

(১) চৈতন্যদেব যখন ভক্তদের সঙ্গে রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন, তখন হোসেন শাহ প্রথম চৈতন্যদেবের কথা জানতে পারেন।

(২) হোসেন শাহ কেশব ছত্রীর কাছে চৈতন্যদেবের পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন।

(৩) হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের কোন ক্ষতি করেন নি।

এই তিনটি বিষয় সত্য বলেই গ্রহণ করা যায়। এদের মধ্যে তৃতীয় বিষয়টি সন্দেহের অতীত, কারণ এ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণের মধ্যে ঐক্য আছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত। হোসেন শাহ যে চৈতন্যদেবকে চোখে দেখেছিলেন, এরকম আভাস চূড়ামণি দাস ভিন্ন আর কেউ দেন নি। কবিকর্ণপূর লিখেছেন যে হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের পিছনের ও দুপাশের জনতা দর্শন করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস লিখেছেন যে হোসেন শাহের সজ্জন হিন্দু কর্মচারীরা একসঙ্গে মিলে বলাবলি করছিলেন যে দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় পড়ে হয় তো হোসেন শাহ চৈতন্যদেবকে তাঁর সামনে নিয়ে আসতে বলবেন। জয়ানন্দ বলেন যে হোসেন শাহ চৈতন্যদেবকে ধরে আনতেই বলেছিলেন ; কিন্তু একথার সমর্থন অন্য কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না বলে এর উপর নির্ভর করা যায় না। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের মতে কেশব ছত্রী চৈতন্যদেবের নিরাপত্তার কথা ভেবে হোসেন শাহের কাছে চৈতন্য-দেবের মহিমা লাঘব করে বলেছিলেন ; একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। বৃন্দাবন দাসের মতে হোসেন শাহের সজ্জন অমাত্যেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে চৈতন্যদেবের কাছে ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে তাঁকে রামকেলি গ্রাম থেকে দূরে চলে যেতে বলেছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব রাজার ভয়ে ভীত হন নি, তিনি সেখানে কিছুদিন থেকে তারপর স্বেচ্ছায় সেখান থেকে গিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে প্রথমে কেশব ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে এবং পরে রূপ-সনাতন নিজেরা চৈতন্যদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, চৈতন্যদেব রাজ-ভয়ে ভীত না হলেও তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেব হোসেন শাহের কথা শুনেই আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে আসেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সঙ্গে রূপ-সনাতনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে তাঁর কথাই এক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়। কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবনদাসের মতে হোসেন শাহ কেশব ছত্রীর কাছে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে দবীর খাসের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান ভিন্ন আর কেউ নন। নিষ্ঠাবান মুসলমান

হোসেন শাহ চৈতন্তদেবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেছিলেন বলে মনে হয় না, তবে চৈতন্তদেব যে সাধারণ লোক নন, একথা বুঝতে পারাই তাঁর মত বিচক্ষণ রাজার পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি যে চৈতন্তদেবের অসাধারণত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তাকেই ভক্ত চৈতন্তচরিতকারেরা চৈতন্তদেবের ভগবত্তার স্বীকৃতিরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

হোসেন শাহ চৈতন্যদেবের কোন ক্ষতি করেন নি বা তাঁর চলার পথে বাধা সৃষ্টি করেন নি। বৃন্দাবন দাসের মতে তিনি বলেছিলেন, চৈতন্যদেবকে কেউ কিছু বললে তিনি তাকে বধ করবেন। এর মধ্যে একটু অতিরঞ্জন থাকলেও মোটামুটিভাবে একথা বিশ্বাসযোগ্য। কারণ হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ ছিলেন না। চৈতন্যদেব থেকে যখন তাঁর কোন অনিষ্ট হচ্ছে না, তখন তাঁর ক্ষতি করে অযথা হিন্দু প্রজাদের অসন্তোষ সৃষ্টি করা তাঁর মত দূরদর্শী রাজার দ্বারা সম্ভব নয়। বরং সহজে হিন্দু প্রজাদের মন পাবার উপায় হিসাবে চৈতন্যদেবের নিরাপত্তা বিধান করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। যাহোক্, চৈতন্যদেবকে হোসেন শাহ ভগবান বলে স্বীকার করুন বা না করুন, চৈতন্তদেব যে হোসেন শাহের মনে খুব গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমস্ত চরিতগ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র দুই তিন জায়গায় শ্রীচৈতন্যদেবকে হোসেন শাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দেখা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৫শ পরিচ্ছেদে দেখি চৈতন্যদেব অন্য ভক্তদের কাছে মুকুন্দের পরিচয় দেবার সময় বলেছেন, তিনি "ম্লেচ্ছ রাজা"র চিকিৎসা করেন। শেষে অবশ্য "ম্লেচ্ছ রাজা"কে "মহাবিদগ্ধ রাজা" বলেছেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখি, প্রতাপরুদ্রকে গৌড় আক্রমণ থেকে বিরত করবার সময় চৈতন্যদেব বলেছেন, "কালযবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর"। তিনি তাঁর প্রচণ্ড শক্তির কথাও সেই প্রসঙ্গে বলেছেন। চৈতন্যদেব যদি সত্যিই এই সব উক্তি করে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি হোসেন শাহকে খুব শ্রদ্ধা না করলেও তাঁর শক্তি এবং বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

হোসেন শাহের বিশিষ্ট অমাত্য রূপ-সনাতন পরবর্তী জীবনে চৈতন্তদেবের পার্ষদ হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের দুজনকে এক মহাপুরুষ ও এক মহানৃপতির মধ্যের যোগসূত্র বলা যায়।

হোসেন শাহ কি সত্যপীর-পূজার প্রবর্তক ?

অনেকের মনে ধারণা আছে যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রথম সত্যপীরের সির্নি প্রবর্তন করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষে' সর্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন। দীনেশচন্দ্র সেনও এই কথা লিখেছেন তাঁর History of Bengali Language and Literature বইয়ে। এঁদের উক্তিকে অনেকে যাচাই না করে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। বাংলা দেশে অনেকের মনেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে হোসেন শাহ সত্যপীর-পূজার প্রবর্তক। সেইজন্য তার বিচার করা দরকার।

প্রথমে বলে রাখা দরকার, হোসেন শাহ যে সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন করেছিলেন, একথা কোন প্রামাণিক সূত্রে পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে সত্যপীরের কোন উল্লেখ নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এদেশে সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে হোসেন শাহ কর্তৃক সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন করার ধারণা লোকের মনে এল কেন ? এল, তার কারণ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে সত্যপীর সম্বন্ধে নানা রকম অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল এবং এই সব কাহিনী অবলম্বনে অনেক ছড়া ও পাঁচালী রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি কাহিনীতে আছে সত্যপীর "আলা বাদ্শাহ" নামে জনৈক নৃপতির কুমারী কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং আলা বাদ্শাহ সত্যপীরের পূজা করেন। আর একটি কাহিনীতে আছে হোসেন শাহ নামে জনৈক রাজা সত্যপীরের কৃপা লাভ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বিশ্বকোষে' (অষ্টাদশ ভাগ, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬০) সর্বপ্রথম এই কাহিনীগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি লেখেন, "……সত্যনারায়ণের কথায় যে 'আলা' বাদশাহের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে আমরা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ বলিয়া মনে করি। হোসেন শাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন; তাঁহার উদারতা ও ন্যায়পরতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহারই যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।" দীনেশচন্দ্র সেন রামানন্দ এবং নায়েক ময়াজ গাজীর লেখা দুটি সত্যপীরের পাঁচালীর তুলনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে হোসেন শাহ-ই সত্যপীর-পূজার প্রবর্তক (History of Bengali Language and Literature, 1911, p. 797)।

এ সম্বন্ধে আমি কয়েক বছর আগে লিখেছিলাম, "শঙ্কর-আচার্য এবং কবি কর্ণ রচিত 'সত্যপীরের পাঁচালী'তে জনৈক 'আলা বাদশাহ' কর্তৃক সত্যপীরের পূজার একটি অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনী পাওয়া যায় এবং আরিফ রচিত 'লালমোনের কেচ্ছা'য় এই কটি চরণ মেলে,

সত্যপীর ছিল ছলে লালমোন সুন্দরী।
হোছেন শাহা বাদশা নিয়া হয় দেশান্তরী

পূরিল মনের সাধ পোহাইল রজনী।
সও লক্ষ টাকা দিল সত্যপীরের সির্নি॥

একথা মনে করা যেতে পারে, শঙ্কর-আচার্য ও কবি কর্ণের পাঁচালীতে উল্লিখিত 'আলা বাদশাহ' এবং লালমোনের কেচ্ছায় উল্লিখিত 'হোছেন শাহা বাদশা' অভিন্ন লোক, এবং ইনি আসলে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃঃ)। হয়ত হোসেন শাহ কোন সময় সত্যপীরের সির্নি দিয়েছিলেন, সেই কাহিনীই পরবর্তী সাহিত্যে পল্লবিত ও নানা অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আকারে স্থান পেয়েছে।" (বাংলার নাথসাহিত্য, বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য-প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩০)

কিন্তু এখন আর এই মত সমর্থন করতে পারছি না। কারণ প্রথমত "আলা বাদশাহ" ও "হোসেন শাহ" সংক্রান্ত কাহিনীগুলি একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। এগুলি থেকে দুজনকে এক লোক বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, এই সব কাহিনীতে "আলা বাদশাহ" ও "হোসেন শাহ" কাউকেই বাংলার রাজা বলা হয় নি। বাংলার বিখ্যাত রাজা আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সঙ্গে তাঁদের অভিন্ন ভাবার অনুকূলে এক নামসাদৃশ্য ছাড়া আর কোন যুক্তিই নেই। তৃতীয়ত, "আলা বাদশাহ" ও হোসেন শাহ"র কাহিনীগুলি এতই অলৌকিক-রসাশ্রিত যে তাদের কোন সামান্যতম বাস্তব ভিত্তি আছে বলেও মনে হয় না।

সুতরাং, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সত্যপীর-পূজার প্রবর্তন করেছিলেন, এরকম ধারণার কোন হেতু নেই।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস'-এ লিখেছেন যে রাজা গণেশ বাংলা দেশে সত্যপীরের সির্নি দেবার প্রথা প্রবর্তন করেন। বলা বাহুল্য, এই উক্তির পিছনেও কোন প্রমাণ নেই।

হোসেন শাহের মন্ত্রী, কর্মচারী ও অমাত্যবর্গ

বিভিন্ন সূত্র থেকে হোসেন শাহের বহু মন্ত্রী, কর্মচারী ও অমাত্যের নাম পাওয়া যায়। নীচে আমরা তার একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করলাম।

হোসেন শাহের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে তাঁর এই সব মুসলমান কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

(১) খলিশ খান

ইনি ৯১১ হিঃ বা ১৫০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুয়াজ্জমাবাদ বা সোনার গাঁও অঞ্চলের উজীর ও সর-এ-লস্কর ছিলেন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

(২) হিজু খান

ইনি ৯১১-১২ হিঃ বা ১৫০৫-০৭ খ্রীষ্টাব্দে হুসেনাবাদ, অর্‌সা সজ্‌লা মন্খ্‌বাদ এবং লাওবলা এলাকার সর-এ-লস্কর এবং প্রথম দুই স্থানের উজীর ছিলেন। দুটি শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

(৩) রুকনুদ্দীন রুক্‌ন্ খান

ইনিও হুসেনাবাদ, অর্‌সা সজ্‌লা মন্খ্‌বাদ ও লাওবলা এলাকার সর-এ-লস্কর এবং প্রথম দুই স্থানের উজীর ছিলেন। সম্ভবত ইনি হিজু খানের পরে ঐ পদে নিযুক্ত হন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—"রুকনুদ্দীন রুক্‌ন্ খান ইব্‌ন্ আলাউদ্দীন সরহাটী।"

(৪) আলাউদ্দীন রুক্‌ন্ খান

ইনি পূর্বোক্ত রুকনুদ্দীন রুক্‌ন্ খানের পিতা। ইনি ৯১৮ হিঃ বা ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে মুজঃফরাবাদ শহরের উজীর, ফিরোজাবাদ শহরের সর-এ-লস্কর, কোটবাল-বাক (প্রধান কোটাল) এবং মুনসিফ দিওয়ান কোতবালী (ফৌজদারী আদালতের বিচারক) ছিলেন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম এইভাবে উল্লিখিত হয়েছে—"খান মুয়াজ্জম রুকন খান আলাউদ্দীন সরহাটী।" ব্লকম্যানের মতে "আলাউদ্দীনের" আগে "ইব্‌ন্" শব্দটি বাদ পড়ে গেছে এবং এই শিলালিপিতে প্রকৃতপক্ষে পুত্র রুকনুদ্দীনের নামই উল্লিখিত হয়েছে। আর একটি শিলালিপিতে শুধুমাত্র "রুক্‌ন্ খান" নাম আছে—তাতে "আলাউদ্দীন" বা "রুকনুদ্দীন" এর উল্লেখ নেই। এই রুক্‌ন্ খান আটটি কামহার (?) জয় করেছিলেন, বিভিন্ন শহরের উজীর ও লস্কর ছিলেন এবং কামরূপ, কামতা,

জাজনগর ও উড়িষ্যা বিজয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে শিলালিপিটি থেকে জানা যায়। ৺সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে এই রুক্‌ন্ খান অসমীয়া বুরঞ্জীতে বর্ণিত "বড় উজীর" এর সঙ্গে অভিন্ন (Mughal North-East Frontier Policy, pp. 86-87, f. n. দ্রষ্টব্য)।

(৫) খওয়াস খান

ইনি ৯১৯ হিজরা বা ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুয়াজ্জমাবাদের উজীর এবং ত্রিপুরার সর-এ-লস্কর ছিলেন। একটি শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়।

(৬) মজলিস মাহ্‌মুদ

ইনি কোন এক জায়গার (সম্ভবত ভাগলপুর অঞ্চলের) সর-এ-লস্কর ছিলেন। ভাগলপুরের এক শিলালিপিতে এঁর নাম পাওয়া যায়। এঁর পিতার নাম য়ুসুফ।

(৭) রামান্‌দল (?)

ইনি ৯০৪ হিজরার ১৩ই জমাদী অল-আউয়ল তারিখে একটি মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন। এঁর পিতার নাম কিনাপতি (?)।

এঁরা ছাড়াও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর আরও অনেক কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এঁরা মসজিদ, দরগা প্রভৃতি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের বিস্তৃত পরিচয় জানা যায় না। নীচে এঁদের নাম উল্লেখ করা হল।

(৮) মজলিস রাহৎ
(৯) শেরখান
(১০) আতা মালিক
(১১) রিফায়ৎ খান
(১২) মজলিস অল-মজালিস (উপাধি)
(১৩) মুকাবর খান
(১৪) মজলিস আখিয়ার
(১৫) ওয়ালী মুহম্মদ
(১৬) জাফর খান
(১৭) নাজির খান

এঁরা ছাড়া সমসাময়িক সাহিত্য থেকে হোসেন শাহের এই কজন মুসলমান কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়।

(১) পরাগল খান

ইনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই বিশেষ ভাবে পরিচিত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতে লিখেছেন, পরাগল খান হোসেন শাহ কর্তৃক চট্টগ্রাম অঞ্চলের লস্কর নিযুক্ত হয়েছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার 'পরাগলপুর' নামে একটি গ্রাম এখনও এঁর স্মৃতি বহন করছে।

(২) নসরৎ খান বা ছুটি খান

পরাগল খানের পুত্র নসরৎ খান ছুটি খান নামেই সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন। এঁর প্রকৃত নাম যে নসরৎ খান, তা শ্রীকর নন্দীর উক্তি থেকে জানা যায়—ছুটি খান নাম নসরৎ মহামতি। এঁরই আজ্ঞায় শ্রীকর নন্দী জৈমিনি-ভারতের অশ্বমেধ পর্ব অবলম্বনে বাংলা মহাভারত লিখেছিলেন। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন যে ছুটি খান ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেন এবং ত্রিপুরার লস্কর পদে নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ ইনি এই পদে পূর্বোক্ত খওয়াস খানের স্থলাভিষিক্ত হন।

(৩) হামিদ খান

দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খানের লেখা 'লায়লী-মজনু'তে এঁর নাম পাওয়া যায়। লায়লী-মজনু ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল। এতে দৌলত-উজীর লিখেছেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খান হোসেন শাহের প্রধান উজীর ছিলেন। তিনি বহুগুণে বিভূষিত এবং অদ্বিতীয় দাতা ছিলেন,

পূর্বকালে নরপতি ভুবন বিখ্যাত অতি
আছিল হোসেন শাহাবর।
তান রত্ন সিংহাসন অতি মহা বিলক্ষণ
গৌড়েত শোভিত মনোহর॥
প্রধান উজির তান সুনাম হামিদ খান
তাহার গুণের অন্ত নাই।
অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই॥

অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি
সর্করাদি দিলেন্ত খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী
যোগাইলা সভান আহার॥
বাতুল আতুর জথ পালিলেন্ত অবিরত
দান ধর্ম করিলা বিশেষ॥
নটক গাইন জান সত্য জথ কৃতি তান
প্রকাশ হইল সর্বদেশ॥
শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হইল নৃপমণি
জথ ধন লুটাএ সদাএ।
কেমত ধার্মিক সার একে একে সপ্তবার
তাহাকে বুঝিল পরীক্ষাএ॥

হোসেন শাহ নাকি সাতবার সাতরকম উপায়ে হামিদ খানের পরীক্ষা করে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। অন্তত হামিদ খানের বংশধর বাহ্রাম খান এই কথা লিখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে হামিদ খানের শক্তির পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পর হোসেন শাহ তাঁকে

করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া ধর্মের সাজ ভালবাসে মহারাজ
প্রসাদ করিলা দুই সিক॥
নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোভব মনোরম অমরাবতীর সম
সাধু সৎ অনেক নিবাস॥
লবণাম্বু সন্নিকট কর্ণফুলি নদীতট
শুভপুরী অতি দিব্যমান।
চৌদিকে পর্বত গড় অধিক উজ্জ্বলতর
তাত শাহা বদর আলাম॥
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈতে চাটিগ্রাম।
আন্তরূপে দানধর্ম করিলা পুণ্যের কর্ম
আনন্দে রহিলা সেই ঠাম॥

বাহ্‌রাম খানের এই বর্ণনা কতদূর সত্য আর কতখানি অতিরঞ্জিত, তা নির্ণয় করার বর্তমানে কোন উপায় নেই।

(অধ্যাপক আহ্‌মদ শরীফ সম্পাদিত ও ঢাকার বাঙ্‌লা-একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত দৌলত-উজীর বাহ্‌রাম খানের লায়লী-মজনু থেকে উপরের উদ্ধৃতগুলি গৃহীত হয়েছে। ইতিপূর্বে বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার ১৪-১৭ পৃষ্ঠায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এই বইয়ের একটি পুঁথির বিবরণ দিয়েছিলেন এবং উপরে প্রদত্ত অংশ উদ্ধৃত করেছিলেন। তার মধ্যে এক জায়গায় 'সুনাম হামিদ খান' এর জায়গায় 'মহম্মদ খান নাম' এই ভ্রান্ত পাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় কবির পূর্বপুরুষের নাম 'হামিদ খান' রূপেই উল্লিখিত হয়েছে।)

(৩) হৈতন খাঁ

'রাজমালা'তে এঁর নাম পাওয়া যায়। হোসেন শাহের ইনি অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। 'রাজমালা'র মতে হোসেন শাহের আর একজন সেনাপতি গৌরাই মল্লিক ত্রিপুরা জয় করতে গিয়ে ব্যর্থতা বরণ করার পরে হৈতন খাঁর উপর ত্রিপুরা অভিযানের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়; কিন্তু তিনিও সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 'হৈতন খাঁ' নামটি বড়ই অদ্ভুত। এর অর্থও করা যায় না। তবে হোসেন শাহের কর্মচারীদের মধ্যে এই জাতীয় অর্থহীন (?) নামের আরও নিদর্শন পাওয়া যায়। 'পরাগল খান' নামই এর দৃষ্টান্ত।

(৪) মজিলীশ বারবক

১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মহাদেব আচার্যসিংহের 'মালতী-মাধব'-টীকায় এঁর নাম পাওয়া যায়। আচার্যসিংহ এঁকে "গৌড়মহীমহেন্দ্রসচিবশ্রেণীশিরোভূষণ" বলেছেন। ইনি সম্ভবত ঐ সময়ে নবদ্বীপ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।

(৫) অজ্ঞাতনামা সীমাধিকারী

কবিকর্ণপূর তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এই ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। এঁরা লিখেছেন যে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের সময় জলপথে আসছিলেন। কিন্তু উৎকল ও গৌড় রাজ্যের সীমানায় এসে তাঁরা সঙ্কটে পড়লেন, কারণ সে সময় দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তাই যারা উড়িষ্যা থেকে সীমান্ত পার হয়ে বাংলায় যেত, তাদের দুরবস্থার একশেষ হত, বাংলার সীমাধিকারী (officer-in-charge of

the frontier) ছিল জনৈক মুসলমান, সে ঘোরতর মাতাল ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতির ছিল এবং যারা সীমানা পার হয়ে আসত, তাদের চরম দুর্গতি করত। কবিকর্ণপূর লিখেছেন,

"তৎসীমাধিকারী তুরুষ্কোঽরুষ্কোষকার ইব সর্বেষাং মর্মহা মহামদ্যপো দুর্বৃত্তচক্রচূড়ামণিঃ ইতো দেশাদ্ যে গচ্ছন্তি তেষাং দুর্গতিঃ ক্রিয়তে।"

[সেই সীমানার অধিকারী মহামদ্যপ, দুর্বৃত্তমণ্ডলীর চূড়ামণি এবং হৃদয়জাত ব্রণের মত সকলের মর্মপীড়ক এক "তুরুষ্ক" আছে, সে এই দেশ (অর্থাৎ উড়িষ্যা থেকে) যারা গমন করে, তাদের দুর্গতি করে থাকে।]

কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে এই মুসলমান সীমাধিকারী আকস্মিক ভাবে চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁকে নিরাপদে সীমান্ত পার করিয়ে দিয়ে অনেকদূর অবধি তাঁর সঙ্গে যায়।

(৫) ছিলে খোজা

'রাজমালা'য় এর নাম পাওয়া যায়। গৌরাই মল্লিকের নেতৃত্বে হোসেন শাহের যে সৈন্যবাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করে, এই ব্যক্তি সেই বাহিনীর অন্যতম সৈন্য ছিল।

(৬) নবদ্বীপের কাজী

ইনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার সময়ে কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। চৈতন্যদেব সদলবলে কীর্তনে বেরিয়ে সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিলেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে লেখা আছে যে চৈতন্যদেবের ভক্তের দল কাজীর ঘর ভেঙে ফেলে ফুলের বাগানের গাছ উপড়ে তছনছ করে দিয়েছিলেন; চৈতন্যদেব স্বয়ং কাজীকে ধরে আনতে বলেন ও তাঁর ঘরে আগুন দিতে বলেন, ভক্তেরাই তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন যে এরপর চৈতন্যদেব "ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা।" কাজী এসে চৈতন্যদেবকে বলল,

গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

অতঃপর চৈতন্যদেবের সঙ্গে কাজীর গোবধ নিয়ে বিচার হয় এবং বিচারে

পরাস্ত হয়ে কাজী চৈতন্যদেবের পা ছুঁয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন, "এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি।" জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে লেখা আছে যে এই কাজীর বাড়ী ছিল সিমুলিয়া গ্রামে ("সিমুলিয়া গ্রামেতে কাজীর ঘর ভাঙ্গি")।

কোন প্রামাণিক চরিতগ্রন্থে এই কাজীর কোন নাম উল্লিখিত হয়নি। একটি অর্বাচীন কিংবদন্তীর মতে এঁর নাম ছিল 'চাঁদ কাজী' এবং ইনি হোসেন শাহের দৌহিত্র ছিলেন। আর একটি অর্বাচীন কিংবদন্তীর মতে এঁর নাম ছিল মৌলানা সিরাজুদ্দীন এবং ইনি হোসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন।

(৭) গদাধর দাসের গ্রামের কাজী

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে এঁর উল্লেখ আছে। বৃন্দাবনদাস লিখছেন,

সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্বার।
কীর্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়॥

যে কাজীর ভয়ে লোক পালাত, নির্ভয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে

গদাধর বোলে, আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট কৃষ্ণ বোল নহে ছিণ্ডোঁ এই মাথা॥
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইল বাহির।
গদাধরদাস দেখি মাত্র হৈল স্থির॥
কাজী বোলে গদাধর তুমি কেনে এথা।

গদাধর তখন বললেন, "শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভু অবতীর্ণ হয়ে সকলকে 'হরি' বলিয়েছেন, কেবল তুমি 'হরি' নাম করনি। তাই

তাহা বোলাইতে আইলাঙ তোমা স্থান॥
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বোল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি॥
যদ্যপিহ কাজী মহা হিংসক চরিত।
তথাপিহ না বোলে কিছু হইল স্তম্ভিত॥
হাসি বোলে কাজী শুন দাস গদাধর।
কালিকা বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর॥

হরি-নাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈল প্রেম সুখে॥
গদাধরদাস বোলে, আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা 'হরি' আপন বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে।
যখনে করিলা 'হরি' নামের গ্রহণে॥

কাজীদের সঙ্গে চৈতন্যভক্তদের বিরোধ প্রায়ই লেগে থাকত। কোন কোন সময় তাঁরা কাজীদের উপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতেও সমর্থ হতেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেবের কয়েকজন ভক্ত ও পার্ষদের কাজীদের সঙ্গে বিরোধ এবং কাজীদের নিয়ে হরিনাম করানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা

(১) কাজি মুখে হরি বোলাই নিত্যানন্দ। (উত্তরখণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সং, পৃঃ ১৪৮)

(২) কাজি সনে বাদ করে প্রেম উনমাদে।
সাতদিন গৌরীদাস ছিলা গঙ্গাহ্রদে॥ (ঐ, পৃঃ ১৫১)

(৩) কাজি সনে বাদ করিল গদাধর দাস।
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল দেখি লোকে ত্রাস॥ (ঐ, পৃঃ ১৫১)

চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলিতে যেভাবে কাজীদের পরাজয়ের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকখানি অতিরঞ্জন আছে সন্দেহ নেই।

(৮) করবে খাঁ

'রাজমালা'য় এঁর নাম পাওয়া যায়। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে হৈতন খাঁর নেতৃত্বে যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, তার সঙ্গে ইনি সহকারী সেনানায়ক হিসাবে গিয়েছিলেন। ইনি জাতিতে পাঠান ছিলেন।

(৯) অজ্ঞাতনামা কারাধ্যক্ষ (শেখ হাবু ?)

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। সনাতন হোসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যা-অভিযানে যেতে রাজী না হওয়ায় হোসেন শাহ সনাতনকে কারারুদ্ধ করে উড়িষ্যায় চলে যান। সনাতন তখন এই "যবন-রক্ষক"কে অনেক কাকুতিমিনতি করেন এবং অবশেষে সাত হাজার মুদ্রা দিয়ে তাঁকে বশীভূত করেন।

সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥
লোভ হৈল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্র্যে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া॥

কিংবদন্তী অনুসারে এই মুসলমান কারাধ্যক্ষের নাম শেখ হাব্বু এবং এঁর বাড়ী ছিল ফতেপুর গ্রামে ; সেখানে একটি ধ্বংসস্তূপকে এখনও লোকে এঁর ভিটা বলে দেখিয়ে দেয় (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 35 দ্রষ্টব্য)।

(১০) সপ্তগ্রাম-মুলুকের চৌধুরী

চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এঁর উল্লেখ আছে। ইনি সপ্তগ্রাম মুলুকের "অধিকারী" অর্থাৎ শাসনকর্তা ছিলেন। হিরণ্য মজুমদার যখন গৌড়ের সুলতানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এই মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার নেন এবং বিশ লক্ষ টাকা রাজস্বের মধ্যে বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দিয়ে বাকী আট লক্ষ টাকা নিজে নিতে থাকেন, তখন এই "চৌধুরী" হিংসায় জ্বলতে থাকেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন,

হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশলক্ষ।
সেই তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥
রাজঘরে কৈফিতি দিয়া উজীর আনিল।
হিরণ্য মজুমদার পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভৎর্সনা।
বাপ-জ্যেঠা আনহ নহে পাইবি যাতনা ॥

রঘুনাথ মিষ্ট কথায় এই মুসলমানের মন জয় করেন এবং তাঁর জ্যাঠা হিরণ্য মজুমদারের সঙ্গে এঁর একটা মিটমাট করে দেন।

এখন হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্য ও কর্মচারীদের পরিচয় দেব। এঁদের মধ্যে অনেকের নাম সুপরিচিত, কিন্তু প্রামাণিক সূত্র অবলম্বনে হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্য-কর্মচারীদের নাম ও পরিচয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা এপর্যন্ত কেউ করেননি। এখন আমরা সেই চেষ্টাই করব।

(১) সনাতন

ইনি ছিলেন হোসেন শাহের বিশিষ্ট অমাত্যদের অন্যতম। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক চরিতকার মুরারি গুপ্ত তাঁর 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' গ্রন্থের ৩য়

প্রক্রম ১৮শ সর্গ ১০ম শ্লোকে সনাতন ও তাঁর ভ্রাতা রূপকে "রাজপাত্র" বলেছেন। সনাতন যে হোসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর সভায় বসতেন, তা কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি থেকে জানা যায়। কবিকর্ণপূর সনাতনকে "গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিঃ" বলেছেন; কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন, "রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।" চৈতন্যদেব যখন রামকেলিতে যান, তখন সনাতন ও রূপ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছুদিন পরে চাকরী ও সংসার ছেড়ে তাঁরা চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। এঁদের অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে কাটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাষ্যকার ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা হিসাবেই এই দুই ভাই অমর হয়েছেন। সনাতন যে হোসেন শাহের কত প্রিয় ছিলেন ও তাঁর সরকারে কত দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেকথা 'চৈতন্যচরিতামৃতের' মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পড়লে বোঝা যায়।

এথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনেমন।
রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন॥

অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে॥
লেভ কায়স্থগণে রাজকার্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবতবিচার করে সভাতে বসিয়া॥
আরদিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥
পাৎশা দেখিয়া সভে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ সে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য সব তোমা লঞা।
কার্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥

(২) রূপ

ইনি সনাতনের ছোট ভাই। ইনিও সনাতনের মত হোসেন শাহের মন্ত্রী

ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদে দেখি চৈতন্যদেব রূপ-সনাতন সম্বন্ধে বলছেন, "দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র। ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥" রূপ ছিলেন অপূর্ব কবিত্বশক্তির অধিকারী। চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হবার আগে ইনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি লৌকিক কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পরে অনেক কাব্য ও নাটক রচনা করেন, সমস্তই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ও ভক্তিরসাত্মক। রূপ গোস্বামী 'ভক্তির-সামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেন এবং 'পদ্যাবলী' নামে বিখ্যাত পদসঙ্কলনগ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি চরিতগ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রে সনাতন ও রূপের কথা যখন বলা হয়েছে, তখন দুটি উপাধিরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি উপাধি হচ্ছে—সাকর মল্লিক ও দবীর খাস। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি কার উপাধি, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখা যায়। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে সনাতনের উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং রূপের 'দবীর খাস'। কিন্তু 'সপ্তগোস্বামী' নামক গ্রন্থের মতে রূপেরই উপাধি ছিল 'সাকর মল্লিক' এবং সনাতনের 'দবীর খাস'। এই মত কোন কোন বিশিষ্ট গবেষক গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ' বইয়ে (পৃঃ ১৪৭-১৪৯) এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে "সাকর মল্লিক ও দবির খাস—শ্রীসনাতনকেই এই দুই নামে অভিহিত করা হইয়াছে।" এইসব পরস্পরবিরোধী অভিমতের জন্য বিষয়টি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে; এই আলোচনায় আমরা কেবলমাত্র প্রামাণিক চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির উক্তির উপরেই নির্ভর করব।

সনাতনের উপাধি যে সাকর মল্লিক ছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। প্রমাণস্বরূপ আমি চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত থেকে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি,

> সাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই। (চৈ. ভা., অন্ত্য, ১০ম অঃ)
>
> সাকর মল্লিক নাম ঘুচাইয়া তান।
> সনাতন অবধূত থুইলেন নাম॥ (চৈ. ভা., অন্ত্য, ১০ম অঃ)
>
> অর্দ্ধরাত্র্যে দুই ভাই আসিলা প্রভুস্থানে।
> প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে॥

তাঁহা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥

(চৈ. চ., মধ্য, ১ম পঃ)

সর্বশেষ উদ্ধৃত অংশটির "রূপ সাকর মল্লিক" কথার অর্থ—রূপ এবং সাকর মল্লিক। ঐ কথাটি থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে রূপ আর সাকর মল্লিক একই লোক। কারণ দু'জন লোক যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখন নিত্যানন্দ এবং হরিদাস মহাপ্রভুকে তাঁদের কথা বলতে গিয়ে মাত্র একজনের নাম করবেন বলে কল্পনা করা যায় না।

'সাকর মল্লিক' সম্ভবত ফার্সী শব্দ 'সগীর মলিক'-এর অপভ্রংশ। 'সগীর মলিক' অর্থ 'ছোট রাজা'। এই উপাধিটি থেকে বোঝা যায়, সনাতন হোসেন শাহের সরকারে কত সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

'সাকর মল্লিক' বলতে যে সনাতনকেই বোঝানো হয়েছে, তা জানা গেল। এখন 'দবীর খাস' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে। 'সাকর মল্লিক' ও 'দবীর খাস' সমজাতীয় শব্দ নয়। 'সাকর মল্লিক' একটি উপাধি মাত্র, কিন্তু 'দবীর খাস' একটি রাজপদের নাম। 'দবীর' মানে লেখক; 'দবীর' ও 'মুন্সী' সমার্থবাচক শব্দ। 'খাস' শব্দের অর্থ প্রধান। সুতরাং 'দবীর খাস' বলতে রাজার প্রধান সেক্রেটারীকে বোঝাত। 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস)-এর কাজ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসম্বন্ধে আই এইচ কুরেশী লিখেছেন, "The third office was the diwan-i-insha which dealt with royal correspondence. It has rightly been called the 'treasury of secrets', for the dabīr-i-khās, who presided over this department, was also the confidential clerk of the state.......The dabīr-i-khās was assisted by a number of dabīrs, men who had already established their reputation as masters of style......The dabīr-i-khās was always at hand so that he could be summoned to draft an urgent letter or even take down notes of any conversation worth-recording. (The Administration of the Sultanate of Delhi, 4th Edition, pp. 86-87)

প্রামাণিক চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়

যে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র রূপকে বা কেবলমাত্র সনাতনকে 'দবীর খাস' বলা হয়নি, দুজনকেই 'দবীর খাস' বলা হয়েছে, অর্থাৎ রূপ ও সনাতন দুজনেই হোসেন শাহের 'দবীর খাস' ছিলেন। চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির যে সব অংশে 'দবীর খাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত কয়েক জায়গায় 'দবীর খাস'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ; যেমন,

(১) শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবীর খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ-সনাতন॥ (আদি খণ্ড, প্রথম অধ্যায়)

(২) হেনমতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥
তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবীর খাস।
রাজ্যপাট ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥ (আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়)

(৩) দবীর খাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
এখানে তোমার কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হইলা॥
অদ্বৈতের প্রসাদে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি॥
কথোদিন জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া॥
তোমা সভা হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সভারে দিয়া দেহ ভক্তিরস॥ (অন্ত্যখণ্ড, দশমঅধ্যায়)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'ও কয়েক জায়গায় 'দবীর খাস'এর উল্লেখ দেখতে পাই ; যেমন,

(৪) দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেহোঁ লাগিলা কহিতে॥
(মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ)

(৫) তবে দবীর খাস আইলা আপনার ঘরে ॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ॥ (ঐ)

(৬) শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীর খাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ॥ (ঐ)

যাঁরা 'দবীর খাস'কে রূপের উপাধি বলে মনে করেছিলেন, তাঁদের একমাত্র অবলম্বন উপরে উদ্ধৃত (৬) নং উদাহরণের প্রথম চরণের পাঠান্তর, "শুনি প্রভু কহে শুন রূপ দবীর খাস।" কিন্তু এখানে "রূপ দবীর খাস" শব্দের অর্থ 'দবীর খাস উপাধিধারী রূপ' যেমন করা যায়, তেম্‌নি 'রূপ এবং দবীরখাস'ও করা যায়; তাহলে 'দবীর খাস' সনাতনের উপাধি হয়। কিন্তু "শুনি প্রভু কহে শুন রূপ দবীরখাস" প্রকৃত পাঠ নয়, "শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীরখাস"-ই প্রকৃত পাঠ, চৈতন্যচরিতামৃতের বহু নির্ভরযোগ্য পুঁথিতে এবং প্রাচীন মুদ্রিত সংস্করণ গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' (মধ্যখণ্ড, পৃঃ ৬) এই পাঠ দেখা যায়। আর চৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য চরিত গ্রন্থগুলির সর্বত্রই যখন রূপ-সনাতনকে যুক্তভাবে 'দবীর খাস' বলা হয়েছে (নীচে আলোচনা দ্রষ্টব্য), তখন 'রূপ দবীর খাস'—এই খাপছাড়া পাঠকে প্রকৃত পাঠ বলে মেনে নেওয়া যায় না।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে রূপ ও সনাতন দুজনকেই খুব স্পষ্টভাবে 'দবীর খাস' (দবির খাশ) বলা হয়েছে। নীচে আমরা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধৃত করছি (এসিয়াটিক সোসাইটির G.5398 নং পুঁথির পাঠ, প্রয়োজন বোধে ছাপা বইয়ের পাঠ গৃহীত হয়েছে),

(৭) হেনকালে দবির খাশ (স) ভার সহিতে।
চৈতন্যচন্দ্রের ঠাঞি গেলা আচম্বিতে ॥
মহাবৈরাগ্য মৃত্তিকাভাণ্ড সঙ্গে।
নিরবধি প্রেমধারা পুলক সর্বাঙ্গে ॥
গৌড়েন্দ্র সম্পদ তারা তৃণজ্ঞান করি।
বৃন্দাবনে ভ্রমেন অকিঞ্চন বেশ ধরি ॥
ঈশ্বর দবির খাশ তাই সনাতন।*

* এই ছত্রটির পাঠ এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথির। এর অর্থ পরের

গৌড়েন্দ্র সম্পদ ছাড়ি হইলা অকিঞ্চন ॥*
সহস্র ঘোড়া যার আগু-পাছু দৌড়ে।
বাইশ লক্ষ সুবর্ণ রহিল পোঁতা গৌড়ে ॥
পূর্বে তারা ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলা।
শাপভ্রষ্ট দুই ভাই পৃথিবী জন্মিলা ॥
চৈতন্যদর্শনে তার পাপ বিমোচন।
গোসাঞি নাম থুইল দুই ভাই রূপ-সনাতন।
প্রভু বলেন শাপান্তর হইল দবির-খাশ।
রূপ-সনাতন হইলা ক্ষিতি-পরকাশ ॥

(৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রহিলেন কুতুহলে।
দবির খাশ দুই ভাই গেলা নীলাচলে ॥
দবির খাশ দুই ভাএ খণ্ডাল্য সংসার বন্ধন।
দুই ভাএর নাম থুইল রূপ-সনাতন ॥

উপরে উদ্ধৃত উদাহরণগুলি যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 'দবীর খাস' পদের দ্বারা রূপ বা সনাতন, কাউকেই একক ভাবে বোঝানো হয়নি। রূপ ও সনাতন উভয়কেই "দবীর খাস" বলা হয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ, (৩) নং উদাহরণে বলা হয়েছে মহাপ্রভু দবীর খাসকে বললেন, "তোমরা দুই ভাই মথুরায় গিয়ে থাক।" (৫) নং উদাহরণে বলা হয়েছে দবীর খাস ঘরে ফিরলেন এবং দুই ভাই প্রভুকে দেখবার জন্যে ছদ্মবেশ ধরে গেলেন, (৬) নং উদাহরণে বলা হয়েছে মহাপ্রভু 'দবীর খাস' কে বলছেন, "তোমরা দুই ভাই আমার পুরাতন দাস", (১), (৭) ও (৮) নং উদাহরণে বলা হয়েছে চৈতন্যদেব দবীর খাসের নাম রাখলেন রূপ সনাতন; এই তিনটি উদাহরণে খুব স্পষ্টভাবেই রূপ ও সনাতন উভয়কেই দবীর খাস' বলা হয়েছে। (২) নং উদাহরণে' 'যার', (৩) নং উদাহরণে 'তোমার', (৪) নং উদাহরণে 'তেহোঁ' এবং (৬) নং উদাহরণে 'তুমি' 'দবীর

পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। ছাপা বইয়ের পাঠ "ঈশ্বর দবিরখাস ভাই সনাতন" নিতান্তই ভুল।

* এই পয়ারটির অর্থ—সনাতন ঈশ্বরের দবির-খাস, তাই তিনি গৌড়েশ্বরের সম্পদ ত্যাগ করে অকিঞ্চন হলেন। জয়ানন্দ যে 'দবীর খাস'এর অর্থ জানতেন, তা এর থেকে বোঝা যায়।

খাস'এর সর্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে 'দবীর খাস' একজন লোকেরই নাম কারণ এই সর্বনামগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে একবচন ও বহুবচন উভয় বচনেই ব্যবহৃত হত।

সুতরাং এখন পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে, রূপ ও সনাতন দুজনেই হোসেন শাহের 'দবীর খাস' ছিলেন। একজন সুলতানের দুজন 'দবীর খাস' থাকতে যেমন বাধা নেই, তেমনি 'দবীর খাস' পদের অধিকারীর পক্ষে 'সাকর মল্লিক' উপাধি লাভ করতেও কোন বাধা নেই। অতএব দুই ভাইয়ের যে একই পদ ছিল, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। তবে সনাতনের 'সাকর মল্লিক' উপাধি এবং তাঁর প্রতি হোসেন শাহের "আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা" উক্তি থেকে মনে হয়, দুজনের মধ্যে সনাতনেরই পদমর্যাদা বেশী ছিল, তাঁরই হাতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ভার ন্যস্ত ছিল এবং তিনিই হোসেন শাহের বেশী প্রিয় ছিলেন।

(৩) **বল্লভ**

ইনি সনাতন-রূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও কৃপা লাভ করেছিলেন। কিন্তু লাভ করার অল্পদিন পরেই এঁর মৃত্যু হয়। বিখ্যাত জীব গোস্বামী এঁর পুত্র। চৈতন্য চরিতামৃতে এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে, "অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ"। সুতরাং এঁর প্রকৃত নাম বল্লভ এবং 'অনুপম মল্লিক' উপাধি—'সাকর মল্লিক'এর মত। অতএব রূপ সনাতনের মত বল্লভও যে হোসেন শাহের সরকারে কাজ করতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বল্লভ রূপ-সনাতনের সঙ্গে গৌড়েই বাস করতেন, কারণ চৈতন্যচরিতামৃতে দেখি সনাতন বলছেন,

> আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।
> আমা দোঁহা সঙ্গে তেহোঁ রহে নিরন্তর॥

বল্লভ রামভক্ত ছিলেন। রূপ গোস্বামীর সঙ্গে তিনি প্রয়াগে গিয়ে মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। প্রয়াগ থেকে বৃন্দাবন হয়ে বাংলায় আসার পর তিনি পর-লোক গমন করেন। কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে বল্লভ বা অনুপম মল্লিক 'অনুপ' নামে উল্লিখিত হয়েছেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন।

(৪) **শ্রীকান্ত**

ইনি সনাতন রূপের ভগ্নীপতি। ইনি হাজিপুরে থাকতেন। সুলতান

হোসেন শাহের ঘোড়া সংগ্রহ করে পাঠানো ছিল এঁর কাজ। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে এঁর সম্বন্ধে লেখা আছে,

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎশার স্থানে।

(৫) সনাতনের "বড় ভাই" (রঘুনন্দন ?)

রূপ-সনাতনের যে আরও ভাই ছিল, তা জীব গোস্বামী তাঁর 'লঘু বৈষ্ণব-তোষণী'র উপক্রমে বলেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদে সনাতনের এক বড় ভাইয়ের উল্লেখ পাই। সনাতন যখন রাজকার্য ছেড়ে ঘরে বসেছিলেন, তখন হোসেন শাহ তাঁকে বলেছিলেন,

তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার॥
জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্বকার্য্য নাশ॥

'খাস' অর্থ রাজার নিজস্ব এলাকা। সনাতনের বড় ভাই যখন বাক্‌লাকে "খাস" করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সুলতান হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন এবং এই কাজের ভার পেয়েছিলেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি বহু জীব হত্যা করেছিলেন; অর্থাৎ পশুপাখী মেরেছিলেন এবং সম্ভবত যে সব মানুষ দখল ছাড়তে রাজী হয়নি, তাদেরও অনেককে বধ করেছিলেন। এই জন্য হোসেন শাহ তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে তাঁর কাজকে "দস্যু ব্যবহার" বলেছেন।

অবশ্য উদ্ধৃত শ্লোকের কেউ কেউ এই অর্থও করতে পারেন যে সনাতনের বড় ভাই বাক্‌লায় হোসেন শাহের বহু প্রজাকে হত্যা করে সেখানে স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাহলে হোসেন শাহ তাঁর ভাই ও আত্মীয়দের রাজপদে বহাল রাখতেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান না করে বসে থাকতেন না।

অর্বাচীন কিংবদন্তীর মতে সনাতনের এই বড় ভাইয়ের নাম রঘুনন্দন।

'বাক্‌লা'র সঙ্গে সনাতন-রূপের পরিবারের সম্পর্ক খুবই পুরোনো। জীব গোস্বামী তাঁর 'লঘুবৈষ্ণব তোষণী'তে বলেছেন সনাতন-রূপের পিতা কুমারদেব "দ্রোহ" বশত নৈহাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গ চলে যান ("কশ্চিৎ দ্রোহমবাপ্য সংকুল-

ভূনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গত:")। ভক্তিরত্নাকরে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে কুমারদেব বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে গিয়েছিলেন,

নিজগণ সহ বঙ্গদেশেতে শীঘ্র গেলা।
বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা॥

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সনাতন, রূপ ও বল্লভ বাক্‌লা ছেড়ে গৌড়ে এসে রাজকার্য করছিলেন আর তাঁদের বড় ভাই বাক্‌লাতে থেকেই রাজকার্য করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই চার ভাই ও তাঁদের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত—এক পরিবারের এই পাঁচজনই হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন।

বর্ধমান সাহিত্য-সভার একটি সংস্কৃত পুঁথিতে (এই বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত) ভুল সংস্কৃতে লেখা আছে সনাতন-রূপ-বল্লভের একজন নয়—দুজন বড় ভাই ছিলেন এবং তাঁরা "দেশাধিকারী" ছিলেন ("জ্যেষ্ঠ অগ্রজৌ দ্বৌ দেশাধিকারিণৌ ভবৎ")। চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে "দেশাধিকারী" মানে এখানে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ধরতে হবে। তাহলে বলতে হবে পাঁচ ভাইই হোসেন শাহের অধীনে কাজ করতেন! অবশ্য সংস্কৃত পুঁথিটির উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে তথা রূপ-সনাতনের আর একজন ভাইয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই।

(৬) কেশব ছত্রী

ইনি কেশব ছত্রী, কেশব বসু ও কেশব খান তিন নামেই বিভিন্ন জায়গায় উল্লিখিত হয়েছেন। এঁর নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত এবং রূপ গোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীতে লেখা হয়েছে 'কেশব ছত্রী', কবিকর্ণপূরের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ও কুলজীগ্রন্থে 'কেশব বসু' এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে 'কেশব খান'। সম্ভবতঃ এঁর পদবী 'বসু', উপাধি 'খান' এবং রাজপদের নাম 'ছত্রী'। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতে লেখা আছে যে হোসেন শাহ যখন কেশবের কাছে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানতে চান, তখন কেশব চৈতন্যদেবের যাতে অনিষ্ট না হয়, সেজন্যে তাঁর মহিমা লাঘব করে বলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এও লেখা আছে যে ইনি চৈতন্যদেবের কাছে ব্রাহ্মণ পাঠিয়ে তাঁকে চলে যেতে বলেছিলেন। এই ব্যাপার থেকে বোঝা যায়, কেশব ছত্রীও চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। তিনি সুকবিও ছিলেন। তাঁর লেখা একটি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত হয়েছে।

এই পদে ভক্ত হৃদয়ের ছাপ আছে। জনশ্রুতি অনুসারে কেশব ছত্রী হোসেন শাহের প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন।

কুলগ্রন্থের মতে কেশব ছত্রী মালাধর বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। মালাধর বসুর উপাধি ছিল গুণরাজ খান, কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তিনি 'গুণরাজ ছত্রী' বলে উল্লিখিত হয়েছেন। সম্ভবত মালাধর বসুও গৌড়েশ্বরের (বারবক শাহের) কর্মচারী ছিলেন এবং কেশব ছত্রীর মত তাঁরও রাজপদের নাম ছিল 'ছত্রী'।

(৭) সুবুদ্ধি রায়

সুবুদ্ধি রায় ছিলেন "গৌড় অধিকারী" অর্থাৎ গৌড় শহরের চৌধুরী বা ভার-প্রাপ্ত প্রশাসক। হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের অনেক আগে থেকেই তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হোসেন তখন তাঁর অধীনে কাজ করতেন। কাজের ত্রুটির জন্য তিনি হোসেনকে চাবুক মেরেছিলেন। পরে হোসেন সুলতান হলে, "সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাঢ়াইল।" কিন্তু তাঁর বেগম চাবুক মারার কথা জেনে সুবুদ্ধি রায়ের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর উপরোধে হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নাশ করেন। সুবুদ্ধি রায় তখন কাশী চলে যান এবং পণ্ডিতদের কাছে প্রায়শ্চিত্তের বিধান চান। পণ্ডিতদের পরস্পরবিরোধী বিধান শুনে "শুনিঞা রহিলা রায় করিয়া সংশয়।" পরে কাশীতে চৈতন্যদেব এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। চৈতন্যদেব বলেন, "বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন কর, তাহলেই সব পাপ খণ্ডন হবে।" সুবুদ্ধি রায় তাই করলেন। শুকনো কাঠ বেচে তিনি নিজের জীবনধারণ ও বৈষ্ণবদের সেবা করতেন। রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে এলে তাঁদের সুবুদ্ধি রায় অনেক যত্ন করেছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৫শ পরিচ্ছেদে সুবুদ্ধি রায়ের কাহিনী বর্ণিত আছে। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে চৈতন্যদেব কাশীতে এসে-ছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহের হাতে সুবুদ্ধি রায়ের লাঞ্ছনা তার কিছু আগে ঘটেছিল। সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে হোসেন শাহের চাকরী করা তারও ৩০।৪০ বছর আগেকার ঘটনা, কারণ হোসেন তখন যুবক। ১৪৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণের সময় যে হোসেন প্রবীণ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি।

(৮) মুকুন্দ

ইনি ছিলেন হোসেন শাহের চিকিৎসক। এঁর পিতা নারায়ণদাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের চিকিৎসক ছিলেন। মুকুন্দ চৈতন্যদেবের একজন বড় ভক্ত

ছিলেন। এঁর অনুজ নরহরি ও পুত্র রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ষদদের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁরা পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা ও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মুকুন্দদের বাড়ী ছিল শ্রীখণ্ডে। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র মধ্যলীলা ১৫শ অধ্যায়ে লেখা আছে চৈতন্যদেব স্বয়ং নীলাচলে বসে মুকুন্দের সামনে তাঁর প্রেমভক্তির পরিচয় অন্য ভক্তদের কাছে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে "ম্লেচ্ছ রাজা" অর্থাৎ হোসেন শাহেরও উল্লেখ আছে। এই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করছি।

ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিলে হয় পঞ্চমুখ॥
ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।
নিগূঢ় নির্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥
বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো করে রাজসেবা।
অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥
একদিন ম্লেচ্ছ রাজার উচ্চ টুঙ্গীতে।
চিকিৎসার বাত কহে তাহার অগ্রেতে॥
হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী।
রাজার শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি॥
ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হৈল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি।
মুকুন্দ কহে অতিবড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহা বিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে॥

(৯) রামচন্দ্র খান

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রামচন্দ্র খান নামে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন হোসেন শাহের সমসাময়িক।

প্রথম রামচন্দ্র খানের কাহিনী চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়। ইনি ছিলেন বেনাপোলের জমিদার। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে ইনি যখন হরিদাসের উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং বারাঙ্গনা দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করে তাঁর সাধনা নষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন ; পরে নিত্যানন্দ এঁর গ্রামে এলে তাঁকেও ইনি অপমান করেছিলেন ; ইনি পরে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতেন এবং রাজকর দিতেন না ; তারপরে "ম্লেচ্ছ উজীর" এসে স্ত্রীপুত্র সমেত তাঁকে বন্দী করেন, অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করান এবং ঘর ও গ্রাম তিন দিন ধরে লুঠ করে শ্মশানে পরিণত করেন। দ্বিতীয় রামচন্দ্র খান একখানি বাংলা মহাভারত রচনা করেন। এটি জৈমিনী রচিত অশ্বমেধ পর্বের মর্মানুবাদ। এর শেষে যে রচনাকালবাচক শ্লোক আছে, তার পাঠ বিকৃত বলে অর্থ সম্বন্ধে সকলে একমত নন। কারও মতে এর থেকে ১৪.৪ শক, কারও মতে ১৪৭৪ শক পাওয়া যায়। যাহোক্, ১৪৫৪ থেকে ১৪৭৪ শকাব্দের (১৫৩২-১৫৫২ খ্রীঃ) মধ্যে যে এই মহাভারত লেখা হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই রামচন্দ্র খানও সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন, অন্তত ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁর নিবাস ছিল উত্তর রাঢ়ে, কোন পুঁথির মতে দণ্ড সিমলিয়া-ডাঙা গ্রামে, কোন পুঁথির মতে জঙ্গীপুরে। তৃতীয় রামচন্দ্র খানই আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি। এঁর কথা চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়। ইনি হোসেন শাহের অধীনে কাজ করতেন এবং গৌড়-উৎকল সীমান্ত অঞ্চলের লস্কর বা শাসনকর্তা ছিলেন। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব এঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। চৈতন্যভাগবতে দেখি রামচন্দ্র খান সম্বন্ধে চৈতন্যদেবকে ছত্রভোগের "সর্ব-লোক" বলছে, "এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে" এবং রামচন্দ্র খান চৈতন্যদেবকে নিজের সম্বন্ধে বলছেন, "মুঞি সে লস্কর এথা সব মোর ভার।" ইনিই ছত্রভোগে চৈতন্যদেবকে নিরাপদে গৌড়-উৎকল সীমান্ত পার হতে সাহায্য করেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন এই রামচন্দ্র খানই মহাভারতের রচয়িতা। কিন্তু এই মতের পক্ষে বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নেই, বরং বিপক্ষে প্রমাণ আছে। মহাভারত-রচয়িতা রামচন্দ্র খানের বাড়ী ছিল উত্তর রাঢ়ে, আর এই রামচন্দ্র খানকে দেখতে পাওয়া যায় বাংলা ও উড়িষ্যার সীমান্তে। এই রামচন্দ্র খান ব্রাহ্মণ ছিলেন না (বা. সা. ই. ১৷২, পৃঃ ২৩১ দ্রঃ), কিন্তু মহাভারত-রচয়িতা রামচন্দ্র খান কোন কোন পুঁথির মতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং এই দুই রামচন্দ্র খানের অভিন্নতা কোন ক্রমেই প্রমাণ করা যায় না।

(১০) চিরঞ্জীব সেন

ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা। গোবিন্দদাস তাঁর 'সঙ্গীত-মাধব' নাটকে নিজের সম্বন্ধে বলেছেন,

স্বর্ধুন্যান্তীরভূমৌ শরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রাদ্
ব্রহ্মণ্যাদ্ বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যো স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ॥

এর থেকে জানা যায়, গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেন 'গৌড়ভূপাধিপাত্র' ছিলেন। এই 'গৌড়ভূপ' নিশ্চয়ই আলাউদ্দীন হোসেন শাহ। কারণ চিরঞ্জীব সেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্ত। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলা ১০ম পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের পার্ষদদের যে তালিকা দেওয়া আছে, তাতে শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের নাম আছে। সুতরাং চিরঞ্জীব হোসেন শাহেরই সমসাময়িক।

(১১) যশোরাজ খান

সপ্তদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে যশোরাজ খানের একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে; তার ভণিতা এই,

শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশোরাজ খান॥

এই ভণিতায় "শ্রীযুত হুসন"এর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যশোরাজ খান হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হোসেন শাহের দরবারে কাজ করতেন বলেও এর থেকে অনুমান হয়। এই অনুমান যে ঠিক্, তার প্রমাণ পাওয়া যায় গোপালদাস-রসিকদাসের শাখানির্ণয়ে। তাতে লেখা আছে যশোরাজ "রাজসেবী" ছিলেন।

যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সবে রাজসেবী॥

সুতরাং যশোরাজ খান যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(১২) দামোদর

উপরে উদ্ধৃত পয়ারটিতে "রাজসেবী"দের তালিকায় যশোরাজ খান-এর পরেই দামোদর-এর নাম আছে। দামোদর গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহ।

অতএব যশোরাজ খানের মত তিনিও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তিনি হোসেন শাহেরই সরকারে কাজ করতেন বলে মনে হয়। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' থেকে জানা যায়, এই দামোদর 'সঙ্গীত-দামোদর' নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন। বইটি এখন আর পাওয়া যায় না।

(১৩) কবিরঞ্জন

পূর্বোদ্ধৃত পয়ারে তৃতীয় নাম 'কবিরঞ্জন'-এর। কবিরঞ্জন শুধুমাত্র রাজসেবী ছিলেন না, একজন বিখ্যাত কবিও ছিলেন। এঁর প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। এঁর তিনটি উপাধি—কবিরঞ্জন, কবিশেখর ও বিদ্যাপতি। এই তিন ভণিতাতেই তিনি পদরচনা করতেন। এঁর লেখা বহু পদ পাওয়া গিয়েছে। ইনি গোপালচরিত মহাকাব্য, গোপীনাথবিজয় নাটক, গোপালবিজয় কাব্য এবং দণ্ডাত্মিকা পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে মাত্র শেষ দুখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৭০-১৭৫ দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন পদের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাগুলির প্রথম তিনটি থেকে বোঝা যায়, এই "রাজসেবী" কবিরঞ্জন বা কবিশেখর বা বাঙালী বিদ্যাপতি হোসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের সরকারে কাজ করতেন। চতুর্থ ভণিতাটি যদি এই কবিরই হয়, তাহলে বলতে হবে, এই কবি হোসেন শাহের অপর পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের অধীনেও কাজ করতেন (এ সম্বন্ধে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

(১) শাহ হুসেন অনুমানে যারে হানল মদনবাণে।
চিরজীব হউ পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

(২) বিদ্যাপতি ভাণি অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমলা বাণী॥

(৩) কবিশেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুললি কমলমুখী॥

(৪) বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম জুগপতি চিরেজীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥

যশোরাজ খান ও দামোদরের সঙ্গে একত্র উল্লেখ থেকেও মনে হয়, কবিরঞ্জন

এঁদের সমসাময়িক ছিলেন। এর থেকেও তিনি এইসব সুলতানদের সরকারে কাজ করতেন বলে প্রতীত হয়।

(১৪-১৫) হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস

এঁরা দুই ভাই। ষট্ গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাসের এঁরা যথাক্রমে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা। এঁদের নিবাস ছিল সপ্তগ্রামে। এঁদের সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে লিখেছেন,

হিরণ্য গোবর্ধন দুই মুলুকের মজুমদার।

এবং অন্ত্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখেছেন,

হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।

... ...

বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ॥

এর থেকে বোঝা যায় যে হিরণ্য মজুমদারের উপর হোসেন শাহ সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেছিলেন এই সর্তে যে বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংগ্রহ করে হিরণ্য বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দেবেন।

(১৬) গোপাল চক্রবর্তী

ইনি হোসেন শাহের আরিন্দা অর্থাৎ কর-আদায়কারী ছিলেন। ইনি গৌড়ে থাকতেন এবং রাজকোষে বার লক্ষ টাকা জমা দিতেন। চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

গোপাল চক্রবর্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে॥
পরম সুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।

ইনি হিরণ্য মজুমদারের ঘরে সমবেত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের সামনে হরিদাসকে বলেছিলেন যে নামাভাসে মুক্তিলাভ করা যায় না এবং এই নিয়ে হরিদাসের সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে তর্ক বিতর্ক করেছিলেন। তার ফলে এঁকে ধিক্কৃত হতে হয়। সম্ভবত এই সময় ইনি গৌড়েশ্বরের প্রাপ্য বার লক্ষ টাকা নেবার জন্যে সপ্তগ্রামে এসেছিলেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। এই গোপাল চক্রবর্তী গৌড়ের

সুলতানের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র খর্ব হয়নি। অতএব যাঁরা রূপ-সনাতনের দৃষ্টান্ত থেকে বলেন যে রাজসরকারে কাজ করলেই সে যুগে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সমাজে পতিত হত, তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

কারও কারও মতে এই গোপাল চক্রবর্তী গৌড়েশ্বরের কর্মচারী নয়, হিরণ্য মজুমদারেরই কর্মচারী। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্ট লিখেছেন যে গোপাল চক্রবর্ত্তী গৌড়ে থাকতেন। হিরণ্য মজুমদারের কর্মচারী হলে বার মাস গৌড়ে থাকার দরকার হত না। তা ছাড়া যখন গোপাল চক্রবর্তীর সঙ্গে হরিদাসের তর্ক হয়, তখন রঘুনাথদাস বালক। চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই কথা লেখা আছে এবং ঐ পরিচ্ছেদেই এই তর্কের বর্ণনা আছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হিরণ্য মজুমদারের গৌড়েশ্বরের রাজস্ব আদায়ের ভার লাভের কথা আছে এবং ঐ সময়ে যে রঘুনাথ যুবক, সে কথাও সেখানে বলা হয়েছে। অতএব গোপাল চক্রবর্তী যখন হরিদাসের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন, তখন হিরণ্য মজুমদারের বার লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা দেবার কথা উঠতে পারে না। গোপাল চক্রবর্তী পূর্ববর্তী ইজারাদারের কাছ থেকে গৌড়েশ্বরের প্রাপ্য বার লক্ষ টাকা নেবার জন্যে এই সময়ে সপ্তগ্রামে এসেছিলেন।

(১৭) গৌরাই মল্লিক

'রাজমালা'তে এঁর নাম পাওয়া যায়। ১৪৩৫ ও ১৪৩৭ শকাব্দের মধ্যে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযানের সময় ইনি হোসেন শাহের সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব করেন। এই অভিযান ও তার ফলাফল সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত এঁর প্রকৃত নাম ছিল গৌর মল্লিক।

(১৫) বিদ্যাবাচস্পতি

ইনি ছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভাই। গঙ্গার পশ্চিম তীরে কুলিয়ার কাছে ইনি বাস করতেন। সনাতনের ইনি অন্যতম শিক্ষাগুরু ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচল থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তখন এঁর বাড়ীতে উঠেছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকরে'র মতে ইনি মাঝে মাঝে রামকেলি গ্রামে থাকতেন,

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি॥

বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি তাঁর 'ভ্রমরদূত' কাব্যের শেষে এঁর সম্বন্ধে লিখেছেন,

যোঽভূদ্ গৌড়ক্ষিতিশিখাবতংসঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণু -
বিদ্যাবাচস্পতিরিতি জগদ্গীতকীর্তিপ্রপঞ্চঃ।

এই শ্লোকে বলা হয়েছে বিদ্যাবাচস্পতিকে পদরেণু গৌড়ক্ষিতিপতির মুকুটমণিকে ঘর্ষণ করত। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, সমসাময়িক গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ বিদ্যাবাচস্পতিকে খুব সম্মান করতেন। অবশ্য হোসেন শাহ বিদ্যাবাচস্পতির চরণে সমুকুট মাথা ঠেকিয়ে প্রমাণ করতেন বলে মনে হয় না। এখানে রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি একটু বেশী রকমের অত্যুক্তি করেছেন। বিদ্যাবাচস্পতি কি হোসেন শাহের সভাপণ্ডিত ছিলেন?

(১৬-১৭) জগাই-মাধাই

এরা নবদ্বীপের অধিবাসী ও ব্রাহ্মণ সন্তান। এরা ছিল মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল, ও পাপাচারী। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের কৃপা পেয়ে এদের চরিত্র সংশোধিত হয় এবং তারা পরে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হয়ে ওঠে। জগাই ও মাধাইও সম্ভবত কোন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল। কারণ লোচনদাস তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখেছেন যে তারা ছিল নবদ্বীপের "ঠাকুর",

মহাপাপী ব্রাহ্মণ সে আছে দুই ভাই।
নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই॥

এই বইয়ে দেখি, চৈতন্যদেবের কৃপা পাবার পর জগাই-মাধাই বলছে,

ধিক্ জাউ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল।
গুরু হত্যা ব্রহ্ম হত্যায় এ দেহ আমার॥

'ঠাকুর' অর্থে রাজা, ব্রাহ্মণ, পূজ্য, নায়ক, অধিকারী—সবকিছুকেই বোঝাতে পারে। জগাই-মাধাই সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তাদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত অর্থের কোনটিই খুব সুষ্ঠু বলে মনে হয় না। এই কারণে মনে হয়, এক্ষেত্রে 'ঠাকুর' শব্দটি দ্বারা কোটালজাতীয় কোন রাজপদকে বোঝাচ্ছে।

বৃন্দাবনদাস তাঁর চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের ১৩শ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই সম্বন্ধে লিখেছেন,

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ॥

দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥

উপরে উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় ছত্রের 'বোলায়' ক্রিয়াপদটির দুটি অর্থ করা যায়—(১) 'পরিচয় দেয়'—এই অর্থে 'বোলায়' ক্রিয়ার ব্যবহারের অন্য নিদর্শন জগাই-মাধাই সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতের আর একটি উক্তি "পরম মদ্যপ পুন বোলায় ব্রাহ্মণ" ; (২) 'ডাকায়'—এই অর্থে ক্রিয়াপদটির ব্যবহারের নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই উক্তি "একেঁ একেঁ সখিজন সন্ধাক বোলাইলোঁ।" প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় চরণের অর্থ হবে—'তারা (জগাই-মাধাই) কোটাল বলে (নিজেদের) পরিচয় দিত, কিন্তু দেয়ানে (অর্থাৎ রাজদ্বারে) উপস্থিত থাকত না (কোটালদের যা অবশ্য কর্তব্য)'। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে চরণটির অর্থ হবে—'কোটাল ডাকলেও তারা দেয়ানে (অর্থাৎ রাজদ্বারে) দেখা দিত না'। কিন্তু শেষোক্ত অর্থ খুব সঙ্গত নয় ; কারণ সেযুগে কোটালদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল বলে মনে হয় না। প্রথম অর্থটিই সুষ্ঠু, কারণ এই অর্থ গ্রহণ করলে লোচনদাসের পূর্বোদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব জগাই-মাধাই যে নবদ্বীপের কোটাল ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ; লোচনদাস 'ঠাকুর' অর্থে কোটালই বুঝিয়েছেন। জগাই-মাধাই নিজেরা নবদ্বীপের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল বলেই তারা নির্ভয়ে দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পেরেছিল। হোসেন শাহের আমলে বাংলাদেশের সর্বত্র যে আদর্শ শাসনব্যবস্থা চালু ছিল না, তাও এর থেকে বোঝা যায়।

উপরে যাঁদের নাম উল্লিখিত হল, তাঁরা ছাড়াও হোসেন শাহের যে অনেক হিন্দু অমাত্য ও কর্মচারী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হোসেন শাহের যে হিন্দু চরও ছিল, তা চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ, ১৬০-১৬৬ শ্লোক) থেকে জানা যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে নীলাচল থেকে গৌড়ে আসবার সময় চৈতন্যদেব যখন উড়িষ্যা-বাংলা সীমান্ত পার হবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন বাংলার "যবন সীমাধিকারী"র কাছ থেকে একজন হিন্দুচর ছদ্মবেশে এসে তাঁর দলে প্রবেশ করে ও খোঁজখবর নিয়ে যায়।

সেইকালে সে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর ॥
প্রভুর সে অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দুচর কহে সেই যবন পাশ গিয়া ॥

'রাজমালা' থেকে জানা যায়, হৈতন খাঁর নেতৃত্বে হোসেন শাহের যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল, তাতে অনেক হিন্দু সৈন্য ছিল এবং তারা গোমতী নদীর তীরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পাথরের প্রতিমা পূজা করেছিল।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন যে, হোসেন শাহের অন্তঃপুরে মালতী নামে একজন ধাত্রী ছিলেন। সম্ভবত এই কথা সত্য, কারণ ঐ সময়ে গৌড়ে যে ঐ নামের একজন মহিলা সত্যিই ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে নির্মিত গৌড়ের একটি মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে বিবি মালতী নামে জনৈক মহিলা ৯৪১ হিজরা বা ১৫৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। সম্ভবত এই মহিলা প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিতা হন। ইসলামধর্মে তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় মেলে মসজিদ নির্মাণ করানোর মধ্যে; কিন্তু হিন্দু নামকে তিনি ত্যাগ করেননি। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে ধাত্রী মালতীর নাম থেকেই গুয়ামালতী নামক স্থানের নামকরণ হয়েছে। আবিদ আলীর মতে 'গুয়ামালতী' 'বুয়া মালতী'র অপভ্রংশ। 'বুয়া' শব্দের মানে 'দিদি', প্রাচীন মালদহ শহরের 'চলীসপাড়া' অঞ্চলে একটি শিলালিপি পাওয়া যায়, তার থেকে জানা যায় যে, হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালে ৯৩৮ হিজরা বা ১৫৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'বুয়া মালতী' একটি সিকায়াহ্ বা জলসত্র তৈরী করেছিলেন। 'বিবি মালতী' ও 'বুয়া মালতী' যে অভিন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এছাড়া রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'গৌড়ের ইতিহাসে' লিখেছেন যে, পুরন্দর খান নামে এক ব্যক্তি হোসেন শাহের উজীর ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় খণ্ডে এবং ডঃ হবিবুল্লাহ্ History of Bengal, Vol. IIতে এই উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, তার ফলে "পুরন্দর খান" এখন ঐতিহাসিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু কিংবদন্তী ও কুলজীগ্রন্থের বাইরে কোথাও পুরন্দর খানের নাম পাওয়া যায় না। কুলজীগ্রন্থের মতেও পুরন্দর খান হোসেন শাহের নয়, তাঁর পূর্ববর্তী কোন সুলতানের অমাত্য ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, "পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয় সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যে সুলতান হোসেন শাহের সময় তিনি গৌড়েশ্বরের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব্বে তিনি কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন এবং গৌড়ের দরবারে লেখাপড়ার কর্ত্তা বা

সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন ।···গোপীনাথ বসু সুলতানগণের প্রিয়কার্য্যসাধন করিয়া রাজস্ব বিভাগের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি পুরন্দর খাঁ উপাধি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ বসু ধনাধ্যক্ষ হইয়া গন্ধর্ব্ব খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন।" সুতরাং পুরন্দর খান বলে হোসেন শাহের কোন মন্ত্রী ছিলেন না।

প্রসঙ্গ ক্রমে 'গন্ধর্ব খাঁ' সম্বন্ধে একটি কথা বলা যেতে পারে। আমরা আগেই বলেছি, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় 'গন্ধর্ব রায়' নামে একজন সভাসদ ছিলেন এবং ইনি কুলজীগ্রন্থে উল্লিখিত গন্ধর্ব খাঁ-র সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, "হোসেন-শাহার দরবারে গন্ধর্ব্ব রায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন" (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৫৬৩)। তাঁর মতে এর প্রমাণ—কুতবনের 'মৃগাবতী'তে সুলতান হোসেন শাহের প্রশস্তির একটি চরণ—"রায় জহাঁ লউ গংদ্রপ্ন রহহী" (পাঠান্তর—"রায় জহাঁ লহু গন্ধর্প অহঈ")। কিন্তু এর থেকে হোসেন শাহের সভায় গন্ধর্ব রায়ের অবস্থান প্রমাণিত হয় না। কারণ প্রথমত চরণটির অর্থ "গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদুর পর্যন্ত রাজার গতি"—"যেখানে গন্ধর্ব রায় থাকেন" নয়। দ্বিতীয়ত সৈয়দ হাসান আস্কারির মতে এই হোসেন শাহ বাংলার হোসেন শাহ নন, জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

হোসেন শাহের রাজ্যসীমা

বহুরাজ্যবিজেতা হোসেন শাহ তাঁর রাজ্যের সীমানাকে পূর্ববর্তী সুলতানদের তুলনায় কতখানি প্রসারিত করেছিলেন, তা আলোচনা করলে বিস্মিত হতে হয়।

হোসেন শাহের মুদ্রাগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল হোসেনাবাদ, মুহম্মদাবাদ, মুয়াজ্জমাবাদ, খলিফতাবাদ ও ফতেহাবাদের টাকশালে। আজ পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গায় তাঁর শিলালিপি পাওয়া গেছে :—

মালদহ, মান্দারণ (হুগলী), খেরোল (মুর্শিদাবাদ), আজিমনগর (ঢাকা), মুঙ্গের, মোরগ্রাম (মুর্শিদাবাদ), বাবারগ্রাম (মুর্শিদাবাদ), ইসমাইলপুর (সারণ), মচাইন (ঢাকা), ইংরেজবাজার (মালদহ), বোনহরা (পাটনা), গৌড়, সুতী (মুর্শিদাবাদ), গিলহরী (মুর্শিদাবাদ), হায়দরপুর (মালদহ), সোনারগাঁও (ঢাকা), সিলেট, ত্রিবেণী (হুগলী), চক অমৃতিয়া (মালদহ), অতিয়া (ময়মনসিংহ), হজরৎ পাণ্ডুয়া

(মালদহ), মঙ্গলকোট (বর্ধমান), দেওকোট (দিনাজপুর), মৌলানাতলী (মালদহ), সাগরদীঘি (মুর্শিদাবাদ), বাদশাহী শড়ক (বীরভূম), ধমরাই (ঢাকা), কাঁটাদুয়ার (রংপুর), জাহানাবাদ (রাজসাহী), কুসুম্বা (রাজসাহী), ভাগলপুর, বাঢ় (পাটনা), মচ্ছিহাটা (পাটনা), ব্যাণ্ডেল (হুগলী), জোয়র (ময়মনসিংহ), চেরান্দ (সারণ), নর্‌হন (সারণ)।

এর থেকে বোঝা যায় বাংলা দেশের প্রায় সবটা এবং বিহারের এক বৃহদংশ তাঁর রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। এছাড়া কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিয়দংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

হোসেন শাহের রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমা কামরূপ-কামতা রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বলে ধরতে পারি। মোটামুটিভাবে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য ছিল মনে করলে অন্যায় হবে না।

গঙ্গার উত্তরে হাজীপুর অঞ্চল হোসেন শাহের অধিকারভুক্ত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে হাজীপুরে সনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত থাকতেন এবং তিনি বাংলার সুলতানের জন্যে ঘোড়া কিনে পাঠাতেন। হোসেন শাহের রাজ্যের উত্তর সীমারেখার সঙ্গে বর্তমান বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমারেখার খুব তফাৎ ছিল বলে মনে হয় না। কারণ বর্তমান পাটনা ও সারণ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে এই সীমা রেখা বর্তমান বিহার-উত্তরপ্রদেশের সীমা-রেখার অনেকখানি পূর্বেই অবস্থিত ছিল। কারণ হোসেন শাহ ও সিকন্দর শাহ লোদীর সৈন্যদল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বিহার-শরীফের ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বাঢ় নামক জায়গায়। বাঢ়ে হোসেন শাহ কর্তৃক নির্মিত একটি জামী মসজিদ আছে, এতে তাঁর শিলালিপি পাওয়া যায়।

আরও দক্ষিণে হোসেন শাহের রাজ্যসীমা ছিল সম্ভবত খড়্গপুর পর্বতমালা। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক জোআঁ দে বারোস লিখেছেন যে কোন একটি পর্বতমালা বাংলাকে "Patane" দেশ এবং উড়িষ্যা থেকে পৃথক করে রেখেছিল। তাঁর ভাষায়, "...these mountains separate the Bengalas from the Patane peoples, and lower down towards the south, from the kingdom of Orissa." এই "these mountains" খড়্গপুর পর্বতমালা ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না। জোআঁ দে বারোস তাঁর বইয়ে বাংলার যে

মানচিত্র দিয়েছেন, তাতে তিনি বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি ভূখণ্ডকে "Patane" নামে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলার দক্ষিণে উড়িষ্যা প্রদেশ। কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবের নীলাচল থেকে গৌড়ে আগমনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকে দেখা যায় যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে রেমুনার খানিকটা উত্তরে এবং পিছলদার খানিকটা দক্ষিণে অবস্থিত মন্ত্রেশ্বর নদ ছিল দুই রাজ্যের সীমারেখা। কবিকর্ণপূর লিখেছেন যে বাংলার যবন সীমান্তরক্ষী স্বয়ং চৈতন্যদেবকে মন্ত্রেশ্বর নদ পার করিয়ে পিছলদা গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল ("অথ সব এব জলচরদস্যুভয়নিবারণায় স্বয়মগ্রেসরোভূত্বা মন্ত্রেশ্বরমুত্তীর্য পিচ্ছলদাগ্রাম পর্যন্তমাগতবান"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—নবম অঙ্ক)। কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই কথা লিখেছেন।

পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার ভ্রমণ-বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে "গঙ্গা" নামে একটি নদী ছিল বাংলা ও উড়িষ্যার সীমারেখা। জোআঁ-দে-বারোসও এই নদীটির কথা বলেছেন। তিনি বাংলাদেশের যে মানচিত্র দিয়েছেন, তার থেকে দেখা যায় যে এই গঙ্গা নদী (R. Ganga) উড়িষ্যা (Reino De Orixa) থেকে এসে পিছলদার (Pisolta) খানিকটা দক্ষিণে ভাগীরথীর (R. Ganges) সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জোআঁ দে বারোস লিখেছেন যে হিন্দুরা এই দ্বিতীয় "গঙ্গা" নদীকে মূল গঙ্গা নদীর মতই পবিত্র মনে করতেন এবং এটি "Gate" (ঘাট) পর্বতমালা থেকে বেরিয়ে সাতগাঁওয়ের কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হত। এই দ্বিতীয় গঙ্গা নদীকে কেউ বর্তমান কাঁসাই নদীর সঙ্গে, কেউ সুবর্ণ রেখার সঙ্গে, কেউ ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীর মিলিত প্রবাহ ধামরা নদীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। এই সব নদীর গতিপথ যে তখনকার দিনে এখনকার তুলনায় পৃথক ছিল, তা বলাই বাহুল্য। যা হোক্, বারবোসার বিবরণ এবং জোআঁ-দে-বারোসের মানচিত্র ও বিবরণের সঙ্গে কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি মিলিয়ে দেখে আমাদের মনে হয়, এই তথাকথিত দ্বিতীয় "গঙ্গা" নদী মন্ত্রেশ্বর নদের সঙ্গে অভিন্ন।

বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ছত্রভোগ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজ্য এবং উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত ছিল। বাংলার সীমাধিকারী এইখানে থাকতেন। চৈতন্যদেব প্রথমবার নীলাচলে যাবার সময় এইখানে সীমান্ত পার হয়েছিলেন, একথা বৃন্দাবনদাস বলেছেন।

বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে এই দুই রাজ্যের সীমারেখা প্রায়ই পরিবর্তিত হত।

হোসেন শাহের বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর অধিকারভুক্ত অঞ্চল হিসাবে অর্সলা সাজলা মংখাবাদ, থানা লাওবলা, সিমলাবাদ, হোসেনাবাদ ও হাদীগড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্লকম্যান দেখিয়েছেন যে, অর্সলা সাজলা মংখাবাদ একটি প্রশাসনিক অঞ্চল, সাতগাঁও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং থানা লাওবলা বর্তমান ২৪ পরগণার জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণীর ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত লাওপাল। সিমলাবাদ বর্তমান বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদর তীরবর্তী সেলিমাবাদ। হোসেনাবাদও ২৪ পরগণা জেলার মধ্যেই অবস্থিত। হাদীগড় বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবারের দক্ষিণে অবস্থিত হাতিয়াগড়ের সঙ্গে অভিন্ন।

হোসেন শাহের রাজত্বের দক্ষিণ সীমা সম্বন্ধে এ থেকে একটা ধারণা করা যায়।

দক্ষিণ বঙ্গে অনেকদূর পর্যন্ত হোসেন শাহের অধিকার ছিল। খলিফতাবাদ (আধুনিক বাগেরহাট) ও ফতেহাবাদে (আধুনিক ফরিদপুর) হোসেন শাহের টাকশাল ছিল। বর্তমান বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত 'বাকলা' অঞ্চল যে হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ২০শ অধ্যায়ে সনাতনের প্রতি হোসেন শাহের উক্তি,

> তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ॥
> জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।

সুতরাং দক্ষিণ বঙ্গের এক বৃহদংশ হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সন্দেহ নেই। মোটের উপর বঙ্গোপসাগর থেকে হোসেন শাহের রাজ্যের দক্ষিণ সীমা খুব দূরে ছিল না এবং স্থানে স্থানে বঙ্গোপসাগরকে স্পর্শ করেছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারত এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ-পূর্বে হোসেন শাহের রাজ্য চট্টগ্রাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। শ্রীকর নন্দী লিখেছেন যে চট্টগ্রাম "ফণী (ফেণী) নদীএ বেষ্টিত" এবং তার "পূর্বদিকে মহাগিরি"। জোআঁ-দে-বারোসের মতে "Chatigram river" ছিল বাংলা এবং "lands of Codavascam"এর সীমারেখা। তিনি লিখেছেন,

"The Chatigram river rises in the mountains of the kingdoms of Ava and Vagaru, and flowing from the North-East to the South-West divides the kingdom of Bengala from the lands of Codavascam, and along the course of this river lie the kingdoms of Tipora and of Brema Limma which surround Bengala in the East." এই "Chatigram river" সম্ভবত কর্ণফুলী নদী। "Codavascam" 'খোদা বখ্‌শ খান' নামের বিকৃতি। বারোস যাকে "lands of Codavascam" বলেছেন, তা একটি পার্বত্য অঞ্চল, আরাকান পর্বত এবং মাতামুহুরি নদী পর্যন্ত প্রসারিত। এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে বাংলার সঙ্গে ত্রিপুরা ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের বিবাদ লেগে থাকত। অন্ততপক্ষে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ থেকে সুরু করে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ পর্যন্ত সুলতানদের রাজত্বকালে এই অঞ্চল তাঁদের রাজ্যভুক্ত এবং খোদা বখ্‌শ্‌ খান নামে একজন শাসনকর্তার শাসনাধীন ছিল, একথা পর্তুগীজদের লেখা থেকে জানা যায়। বারোসের মতে এই "Chatigram river" ছিল বাংলা ও ত্রিপুরা রাজ্যেরও সীমারেখা। হোসেন শাহের সৈন্যেরা যে অন্তত দুবার ত্রিপুরার গোমতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত অধিকার করেছিল এবং অন্তত ছয়কড়িয়া অবধি অঞ্চল যে শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা ত্রিপুরার 'রাজমালা'র সাক্ষ্য থেকেই জানা যায়।

হোসেন শাহের চরিত্র

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তা একত্র সংগ্রহের চেষ্টা করলাম। তথ্যের পরিমাণ আশানুরূপ না হলেও এর থেকেই বোঝা যাবে নৃপতি হিসাবে তিনি কত অসামান্য ছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশ, বর্তমান বিহারের প্রায় অর্ধেক, কোচবিহার ও উত্তর আসাম এবং উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার কিয়দংশ যাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বিভিন্ন দেশের রাজারা যাঁর বাহুবলের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন এবং সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর যিনি ঐ বিশাল ভূখণ্ডে নিরুদ্বেগে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করেছিলেন, তিনি যে শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে ইতিহাসে ও জনসাধারণের স্মৃতিতে পূজিত হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

যে অবস্থার মধ্যে হোসেন শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তার কথা মনে রাখলেও তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের কথা উপলব্ধ হবে। গোলাম হোসেন লিখেছেন, জলালুদ্দীন ফতে শাহের হত্যার পরে যে কেউ রাজাকে হত্যা করত, সেই দেশের সর্বত্র সিংহাসনের অধিকারিরূপে সম্মানিত হত। ফিরিশ্‌তা ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, প্রভুহত্যা না করলে কেউ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করতে পারত না। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ফরিয়া-ই-সুজা লিখেছেন, গৌড় দেশে পুত্র পিতৃসিংহাসন অধিকার করে না, সময়ে সময়ে ক্রীতদাসেরা প্রভুহত্যা করে রাজ্যলাভ করে। মোগল সম্রাট বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এই সময়ে সৈয়দ সুলতান আলাউদ্দীনের পুত্র নসরৎ শাহ বাংলা দেশের রাজা, তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলার সিংহাসন লাভ করেছেন। বাংলা রাজ্যে উত্তরাধিকার প্রথায় সিংহাসন লাভ অত্যন্ত বিরল। যে কেউ সিংহাসন অধিকার করতে পারে, সেই দেশের সর্বত্র রাজা বলে সম্মানিত হয়। নসরৎ শাহের পিতার রাজ্যলাভের আগে একজন হাবশী রাজাকে হত্যা করে কিছুকাল বাংলা রাজ্য শাসন করেছিল এবং সুলতান আলাউদ্দীন সেই হাবশীকে বধ করে রাজ্যলাভ করেছিলেন।" দেশের যখন এইরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা, এবং কোন রাজারই রাজত্ব যখন স্থায়ী হচ্ছিল না, সেই সময়ে হোসেন শাহ আবির্ভূত হয়ে এই বিরাট দেশকে নিজের আয়ত্তে এনে তাতে এমন স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা তাঁর সুদীর্ঘকাল ব্যাপী রাজত্বের মধ্যে কোন দিনই বিচলিত হয়নি।

হোসেন শাহ যে সুশাসক ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহের কারণ নেই। তা না হলে তাঁর রাজত্ব অতদিন স্থায়ী হত না এবং সমসাময়িক হিন্দু কবিদের রচনায় তাঁর সপ্রশংস উল্লেখ থাকত না। তবকাৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা ও রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে হোসেন শাহের সুশাসন সম্বন্ধে অনেক প্রশংসার কথা লেখা আছে। এইসব বইয়ের মতে হোসেন শাহ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকদের, প্রধান প্রধান অমাত্যদের এবং নিজের অনুগত ব্যক্তিদের উচ্চপদ দান করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শাসনকার্য নির্বাহের জন্য উপযুক্ত রাজকর্মচারী পাঠাতেন। তার ফলে পূর্ববর্তী রাজাদের আমলে যে রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় পৌঁছেছিল, তাতে আবার শান্তি, শৃঙ্খলা ও শ্রী ফিরে এসেছিল এবং অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মূল উৎপাটিত হয়েছিল। ফিরিশ্‌তার মতে হোসেন শাহ তাঁর রাজ্যে কোথাও আঞ্চলিক শাসনকর্তা মাথা তুলছে বা

বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করছে জানতে পারলেই তক্ষণি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করতেন।

তবকাৎ-ই-আকবরীতে লেখা আছে, "দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যে, দেশের উন্নতি বিধানের জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করেন। ...তাঁর প্রশংসনীয় চরিত্র ও মনোরঞ্জক গুণগুলির জন্য তিনি বহু বছর ধরে রাজার কর্তব্য পালন করতে পেরেছিলেন।" ফিরিশ্‌তার মতে হোসেন শাহ বাংলা-দেশের শহরগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন এবং অনেক জায়গায় বিনা পয়সার অন্নসত্র বা লঙ্গরখানা স্থাপন করেন।

'রিয়াজ'এর মতে পূর্ববর্তী রাজাদের রাজত্বকালে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হত, হোসেন শাহের সুব্যবস্থায় সে সমস্ত দূর হয় এবং সকলেই শান্তিতে কাল যাপন করে। কারও বিরুদ্ধাচরণের সমস্ত সম্ভাবনাই তিনি দূর করেন। বাহাতি বা গণ্ডক নদীর কূলে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করে তিনি রাজ্যের সীমানা সুরক্ষিত করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করে-ছিলেন এবং আলিম ও দরবেশদের বহু অর্থ দান করেছিলেন। স্টুয়ার্ট তাঁর History of Bengal-এ রিয়াজের এই সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। এই সমস্ত কথা যে অনেকাংশে সত্য, হোসেন শাহের শিলালিপি ও সমসাময়িক সাহিত্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে বারথেমা ও বারবোসা নামে দুইজন ইউরোপীয় পর্যটক যথাক্রমে ১৫০৫ ও ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভ্রমণ করেন। এঁদের লেখা ভ্রমণ-বিবরণী থেকে হোসেন শাহ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া পাওয়া যায়। বারথেমা লিখেছেন যে বাংলার সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে ২০,০০০ নিয়মিত সৈন্য ছিল। বারবোসা লিখেছেন যে ইনি একজন খুব বড় এবং অত্যন্ত ধনী রাজা ছিলেন, বিভিন্ন শহরে এঁর অধীনস্থ শাসনকর্তারা এবং রাজস্ব ও শুল্ক আদায়কারী কর্মচারীরা থাকত।

হোসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁর বা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা অনেক সুন্দর সুন্দর মসজিদ, প্রাসাদ, ফটক প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। তাদের কয়েকটি এখনও বর্তমান আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গৌড়ের দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত ফিরোজপুরের ছোটা সোনা মসজিদ এবং গৌড়ের গুম্‌টি ফটক। এদের শিল্পসৌন্দর্য অসাধারণ।

তবে হোসেন শাহের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে দেশের সবসময় যে কেবল ভালই

হয়েছে তা নয়। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে যে হোসেন শাহের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। ঐ বছরে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে সংকীর্তন করছিলেন। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে লেখা আছে যে পাষণ্ডীরা তখন এই কথা বলেছিল,

যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিঞা কীর্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিল নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥

প্রাকৃতিক কারণেই এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এই জাতীয় দুর্ভিক্ষের জন্য হোসেন শাহকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না করা গেলেও পরোক্ষ দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে ক্রমাগত একের পর এক যুদ্ধই করে গিয়েছেন। এইসব যুদ্ধের ব্যয়ভার নিশ্চয়ই বাংলাদেশের জনসাধারণকে যোগাতে হত। ফলে তাঁর রাজত্বকালে বাঙালী জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল এবং তাদের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের শক্তি কমে গিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাংলাদেশে জিনিষপত্রের দাম খুব সস্তাই ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে সনাতন গোস্বামী তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের দেওয়া যে "বহুমূল্য" ভোটকম্বল গায়ে দিয়ে কাশীতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তার দাম ছিল তিন টাকা ("তিন মুদ্রার ভোট গায়"—"মুদ্রা" মানে এখানে রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা নয়; স্বর্ণমুদ্রাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সবসময় "মোহর" বলেছেন।) চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইবন্ বতুতা বাংলাদেশে জিনিসপত্রের যে সুলভ মূল্য দেখেছিলেন, এ মূল্য তার চেয়েও সুলভ বলে মনে হয়। সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে জনসাধারণের ক্রয়শক্তি হ্রাস পাওয়াতেই জিনিষপত্রের মূল্য কমে গিয়েছিল।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। হোসেন শাহ বহু যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু পরিপূর্ণ জয়লাভ করেছেন মাত্র কয়েকটি যুদ্ধে। যতদিন ধরে তিনি যুদ্ধ করেছেন এবং যত শক্তি ক্ষয় করেছেন, তার তুলনায় তিনি ভিন্ন রাজ্যগুলির যতটা অঞ্চল স্থায়িভাবে অধিকার করতে পেরেছিলেন, তা খুবই কম বলে মনে হয়। সুতরাং সামরিক ক্ষেত্রে হোসেন শাহ যথেষ্ট দক্ষতা দেখালেও পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলা যায় না।

এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে রাজা হিসাবে হোসেন শাহকে ষোল আনা কৃতিত্ব দেওয়া যায় না। তবে মোটের উপর তিনি যে একজন অত্যন্ত সুদক্ষ শাসক ছিলেন, তা পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রের সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। বহু বছর ধরে বাংলাদেশে যে বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত অবস্থা বিরাজ করছিল, তাকে অল্প সময়ের মধ্যে দূর করা এবং সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখাই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। যদিও তিনি তাঁর রাজত্বের বেশীর ভাগ সময়েই ভিন্ন দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তাতে দেশের শান্তি ব্যাহত হয়নি, কারণ এই সব যুদ্ধ রাজ্যজয়ের যুদ্ধ এবং এগুলি অনুষ্ঠিত হত দেশের বাইরে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে হোসেন শাহ বহুবার নিজেই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করে বিদেশে যুদ্ধ করতে গেছেন, কিন্তু কখনও কেউ রাজ্যে তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিদ্রোহ করতে চেষ্টা করেছিল বলে জানা যায় না। এ ব্যাপার থেকেও হোসেন শাহের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের চরিত্রে মহত্ত্বেরও অভাব ছিল না। এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখি জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কীকে আশ্রয়দানের মধ্যে।

কিন্তু আধুনিক যুগের এক শ্রেণীর সমালোচক ব্যক্তিত্ব, শাসনদক্ষতা, সামরিক দক্ষতা ও মহত্ত্ব ছাড়াও হোসেন শাহের চরিত্রে অন্য সমস্ত গুণ দেখেছেন, যার জন্যে তাঁরা হোসেন শাহকে আকবরের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁদের মতে হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষণের ফলে বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে; এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে "হোসেন শাহী আমল" নামে চিহ্নিত করেছেন। তারপর, এইসব সমালোচকেরা বলেন হোসেন শাহের ধর্মমত ছিল উদার; তিনি হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, হিন্দুদের প্রতি তাঁর উদার ও অপক্ষপাত আচরণের ফলেই বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব এমন অবাধে ধর্মপ্রচার করতে পেরেছিলেন। এইসব মত কতদূর সত্য, তা আমরা এখন বিচার করব।

হোসেন শাহ কি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

হোসেন শাহের কয়েকজন অমাত্য—যথা রূপ, সনাতন ও কেশব ছত্রী সুকবি ছিলেন। এছাড়া যশোরাজ খান, দামোদর ও কবিরঞ্জন প্রভৃতি কবিরা যে

হোসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন, তা আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যদিও এই সমস্ত কবিরা হোসেন শাহের কর্মচারী বা অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এঁদের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে হোসেন শাহের পৃষ্ঠপোষণ বা অনুপ্রেরণা ছিল, এমন কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। বিপ্রদাস পিপিলাই, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সমসাময়িক কবিরা তাঁদের কাব্যে হোসেন শাহের নাম করেছেন, কিন্তু হোসেন শাহের কাছে তাঁরা কোন পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। হোসেন শাহের বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধেও বিশেষ প্রমাণ পাই না। বিদ্যাবাচস্পতির সম্বন্ধে তাঁর পৌত্রের উক্তি "যোঽভূদ্ গৌড়ক্ষিতিপতিশিখারত্নঘৃষ্টাঙ্ঘ্রিরেণুর্বিদ্যাবাচস্পতিরিতি" ভিন্ন কোন সংস্কৃত-পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগের আর কোন আভাস কোথাও পাই না। বিদ্যাবাচস্পতির সঙ্গেও তাঁর ঠিক্ কী ধরণের সম্পর্ক ছিল, তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না।

কোন কোন সমসাময়িক মুসলমান পণ্ডিতের সঙ্গে হোসেন শাহের যোগাযোগের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে পাই। এঁদের মধ্যে একজনের নাম মুহম্মদ বুদই উর্ফ সৈয়দ মীর অলাওয়ী। ইনি ফার্সী ভাষায় একটি ধনুর্বিদ্যা-বিষয়ক বই লিখেছিলেন; বইটির নাম হিদায়ৎ অল-রামী। বইটি সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। লেখক এই বই সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে উৎসর্গ করেছেন। এই বইয়ের পুঁথি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে (Charles Rieu: Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, Vol. II, p. 489, No. Add. 26, 306 দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় জনের নাম মুহম্মদ বিন য়জ্‌দান বখ্‌শ্। ইনি খওয়াজ্‌গী শির্‌ওয়ানী নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজধানী একডালায় বসে ইনি রাজকীয় কোষাগারের জন্য ৯১১ হিজরার ২রা জমাদী অল-আউয়ল, বুধবারে (=১লা অক্টোবর, ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ) শহীহ্-অল-বুখারী নামে ঐশ্লামিক গ্রন্থের তিনটি খণ্ড নকল সম্পূর্ণ করেন। এর পুঁথি বর্তমানে বাঁকীপুরের ওরিয়েণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে (Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Vol. V, Pt. I, Nos. 130-132)। তৃতীয় খণ্ডের পুঁথির পুষ্পিকায় হোসেন শাহের এক দীর্ঘ প্রশস্তি আছে। এই বই আলাউদ্দীন হোসেন শাহই উৎসাহী হয়ে নকল করিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু এই

নকল করানোর মধ্যে তাঁর বিদ্যোৎসাহিতার বদলে ধর্মপরায়ণতারই নিদর্শন বেশী মেলে।

সমসাময়িক মুসমান কবিদের মধ্যে মাত্র একজন তাঁর কাব্যে রাজা হোসেন শাহের নাম করেছেন, কিন্তু তিনি কোন্ হোসেন শাহ সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। এই কবির নাম শেখ কুৎবন। এঁর কাব্যের নাম 'মৃগাবতী'। এটি প্রাচীন অবধী ভাষায় লেখা। কবি নিশ্চয়ই উত্তর ভারতের লোক। অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্কারি লিখেছেন, "The 'Pir' or the 'Guru' to whom the poet was so greatly devoted was Makhdum Shaikh Badhan, the greatest of the spiritual disciple and successor of the celebrated saint Md Isā Taj, Jaunpuri, whose brother Ahmad Isā Taj, lies buried in Bhainsāsur Muhalla of Bihār Sharif town. He was an inhabitant of the 'Qasba' of Ajauli in U. P. where he lies buried." এই সমস্ত বিষয় থেকে ও 'মৃগাবতী' কাব্যের ভাষা থেকে শেখ কুৎবন যে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কোন স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত উত্তর ভারতের এক বৃহদংশ জুড়ে যে জৌনপুর সাম্রাজ্য বর্তমান ছিল, কুৎবনের নিবাসভূমি তারই অন্তর্গত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জৌনপুরের শর্কী রাজবংশের শেষ রাজা হোসেন শাহ শর্কী ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বহ্‌লোল লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। এরপর তিনি বিহারে আশ্রয় নেন এবং ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার একবার সিকন্দর লোদীর সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয় এবং সিকন্দর লোদীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যে এসে আশ্রয় নেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সহৃদয়তায় তিনি এখানে আশ্রয় লাভ করেন এবং ভাগলপুরের কাছে কহলগাঁও নামক স্থানে তাঁর শেষ জীবন কাটে।

কুৎবনের 'মৃগাবতী' ৯০৯ হিজরার মহরম মাসে অর্থাৎ ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে সম্পূর্ণ হয়েছিল (ডঃ সুকুমার সেন নানা জায়গায় ভুল করে ৯০৯ হিজরা = ১৫১২ খ্রীঃ লিখেছেন)। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এর একটি মাত্র খণ্ডিত পুঁথির অস্তিত্ব জানা ছিল, সেটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামসুন্দর দাস সঙ্কলিত Report for the Search for

Hindi manuscripts-এর ১৭-১৯ পৃষ্ঠায়। কয়েক বছর আগে অধ্যাপক সৈয়দ হাসান আস্‌কারি 'মৃগাবতী'র আর একটি খণ্ডিত পুঁথি পান এবং তার কিছুদিন পরে তিনি এর একটি সম্পূর্ণ এবং প্রাচীন পুঁথিও আবিষ্কার করেন; এই সম্পূর্ণ পুঁথিটির বিস্তৃত বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন Journal of the Bihar Research Societyর ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় (pp. 454 ff)। আস্‌কারি সাহেবের এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে 'মৃগাবতী'র এই সম্পূর্ণ পুঁথিটি ফার্সী অক্ষরে লেখা এবং এটি দিল্লীর এক পুরোনো 'খান্‌কা'র সম্পত্তি।

'মৃগাবতী'র গোড়ার দিককার কয়েকটি শ্লোকে জনৈক রাজা হোসেন শাহের প্রশস্তি আছে। Report for the Search for Hindi manuscripts-এ প্রশস্তিটির যে পাঠ পাওয়া যায়, তার ভাষা আধুনিক ধরণের এবং সব জায়গার অর্থও বোঝা যায় না। আস্‌কারি সাহেবের আবিষ্কৃত পুঁথিটিতে এর যে পাঠ পাওয়া যায়, তার ভাষা প্রাচীন। আস্‌কারি সাহেব তাঁর প্রবন্ধে এই পুঁথির থেকে প্রশস্তি-অংশটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেছেন (JBRS, Dec, 1955, p. 458 দ্রষ্টব্য)। অবশ্য এই পাঠেও কিছু কিছু লিপিকরপ্রমাদ থাকায় কোন কোন অংশের অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের অধ্যাপক শিবনাথজী এই দুই পাঠ মিলিয়ে রাজ-প্রশস্তিটির একটি আদর্শ পাঠ প্রস্তুত করেছেন। নীচে সেই পাঠটি আমরা বাংলা অনুবাদ সমেত দিলাম,

শাহ হুসেন আহ বড় রাজা।
ছাৎ সিংহাসন ইন্‌হু য়ে ছাজা॥
পণ্ডিৎ অউ বুধবন্ত সিয়ানঁা।
পোথা বাঁচ অর্থ সব জানঁা॥
ধরম দুদিষ্টিল ইন্‌হু কিন্‌হু ছাজা॥
হম পর ছাহ জিব (jiw) জগ রাজা॥
দান দৈ য়ী বহু গিনৎ ন আওয়া।
বল অউ করন না সরবর পাওয়া॥
রায় জহাঁ লহু গন্ধর্প অহঈঁ।
সেবা করহিঁ বার সব চহহীঁ॥

চতুর সুজন ভাখা সব জানঁ।
ঐস ন দেখ নুঁ কোয়ী।
সভা সুনো সব কান দৈ
য়ীঁ ফিন্ দেখা নুঁ সোয়ী॥

[শাহ হুসেন বড় রাজা আছেন, যাঁর ছত্র ও সিংহাসন সুশোভিত, (যিনি) পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ, বই পড়ে তার সমস্ত অর্থ (যিনি) বোঝেন, । এঁকেই ধর্মে যুধিষ্ঠির বলা শোভা পায়। সংসারে (এই) রাজা আমার উপরে ছায়ার মত। ইনি বহু দান দেন, (যার) গণনা হয় না, বলি আর কর্ণও (দানে যাঁর) সমকক্ষতা পায় না। গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদূর পর্যন্ত রাজার গতি। সবাই (তাঁর) সেবা করে ও দ্বারে (শরণ) চায়। (ইনি) চতুর ও জ্ঞানী, সব ভাষা জানেন, এরকম কাউকে দেখা যায় না। সভাতে সবাই কান দিয়ে শোন, এঁর মত আর (কাউকে) দেখা গেল না।]

এই "বড় রাজা" "শাহ হুসেন" যে বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, সে সম্বন্ধে এতদিন কারও মনে কোন সংশয় ছিল না। কারণ ৯০৯ হিজরা বা ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্য কোন রাজা হোসেন শাহের নাম কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা যায় নি। কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল এই যে উত্তর-ভারতের এবং সম্ভবত জৌনপুর অঞ্চলের কবি কুৎবন তাঁর অবধী ভাষায় লেখা কাব্যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের প্রশস্তি কেন করেছেন। তার একটা আনুমানিক ব্যাখ্যা কোন কোন পণ্ডিত দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেনের ভাষাতে ব্যাখ্যাটা এই, "জৌনপুরের শেষ সর্কীবংশীয় সুলতান হোসেন শাহা দিল্লীর বাদশাহ্‌া বহলুল লোদী ও সিকন্দর লোদীর কাছে হার মানিয়া প্রথমে বিহারে (১৪৭৮*) পরে বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন। গৌড়-সুলতান হোসেন শাহা তাঁহাকে সাদরে আশ্রয় দেন। সপরিবার ও সপরিজন হোসেন শাহা সর্কী গঙ্গাতীরে কহলগাঁয়ের কাছে বাসস্থান করিয়া শেষ জীবনে এইখানেই কাটাইয়া দেন। সর্কী-সুলতানের সঙ্গে কবি গুণীও কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন সুফী সাধক কবি কুতবন।" (বা. সা. ই. ১/৩ (পূ), পৃঃ ৯৬)

এতদিন পর্যন্ত ব্যাপারটাকে এইভাবেই দেখা হয়েছে, কুৎবন-উল্লিখিত "শাহ হুসেন" যে বাংলার সুলতান হোসেন শাহই, সেসম্বন্ধেও কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ

*এখানে ভুলবশত "১৪৭৯"র জায়গায় ডঃ সেন "১৪৭৮" লিখেছেন।

করেননি। কিন্তু সম্প্রতি সৈয়দ হাসান আস্‌কারি এই মত প্রকাশ করেছেন যে এই "শাহ হুসেন" জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কী (JBRS, Dec. 1955 p. 457)। পরবর্তীকালের কোন কোন ইতিহাস-গ্রন্থে লেখা আছে যে হোসেন শাহ শর্কী ৯০৬ হিজরা বা ১৫০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেছিলেন, Cambrige History of India, Vol. III তে তাঁর মৃত্যুর এই তারিখই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হোসেন শাহ শর্কীর কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি ৯১০ হিজরা বা ১৫০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। আস্‌কারি সাহেব লিখেছেন, "He (Hussain Shah Sharqi) lived at least till 910 at Kahalgaon as a refugee, for the last of the coins bearing his name, but not that of the mint town, is of that date." অবশ্য এর অনেক আগে নেলসন রাইট-ও হোসেন শাহ শর্কীর ৯১০ হিজরার মুদ্রার কথা বলেছিলেন (Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Vol. II, p. 207), তা তখন কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি।

জৌনপুরের রাজ্যচ্যুত সুলতান হোসেন শাহ শর্কী যখন ৯০৪ হিজরায়ও বেঁচে ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তখন ৯০৩ হিজরায় লেখা 'মৃগাবতী'তে কুৎবন কোন্ হোসেন শাহের নাম করেছেন—জৌনপুরের না বাংলার ? আপাতদৃষ্টিতে জৌন-পুরের হোসেন শাহেরই দাবী বেশী বলে মনে হয়। কারণ কুৎবনের দেশ সম্ভবত জৌনপুর অঞ্চলেই এবং তিনি জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহের সহচর হয়ে বাংলা দেশে এসেছিলেন বলে আগেই অনুমান করা হয়েছিল। আস্‌কারি সাহেব মনে করেন যে কুৎবন নিজের দেশে বসেই কাব্য রচনা করেছিলেন এবং ঐ অঞ্চলে তখন হোসেন শাহ শর্কীর আধিপত্য না থাকলেও তিনি হোসেন শাহ শর্কীকেই আসল রাজা ধরে নিয়ে তাঁর প্রশস্তি করেছেন। কিন্তু এই অনুমান সমর্থন করা যায় না। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুর অঞ্চল দিল্লীর লোদী সম্রাটদের অধীন ছিল। কুৎবন নিজের দেশে বসে কাব্য লেখবার সময় তাঁদের নাম না করে প্রায় ২৪ বছর আগে যিনি রাজ্যচ্যুত হয়েছেন, তাঁকেই আসল রাজা বলে ধরে নিয়ে তাঁর প্রশস্তি করেছেন, এরকম কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এরকম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে হোসেন শাহ শর্কী যে কজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে জৌনপুর থেকে বাংলায় এসেছিলেন এবং যাঁদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি প্রজাহীন অবস্থায় "রাজত্ব" করছিলেন ও মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন (টাঁকশালের নাম দিতে পারেন নি, কারণ জায়গাটা বাংলার সুলতানের অধীন ; এরকম রাজ্য-

হীন রাজার ভিন্ন দেশে বসে "রাজত্ব" করার দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগেও দেখা যায়), শেখ কুৎবন তাঁদের অন্যতম। তাই কুৎবন 'মৃগাবতী'তে তাঁর প্রশস্তি করেছেন।

কিন্তু এখানে দুটো কথা আছে। প্রথমত, এই "শাহ হুসেন"কে হোসেন শাহ শর্কীর সঙ্গে অভিন্ন ধরলে রাজপ্রশস্তিটি অনেকখানি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। এই প্রশস্তি পরাশ্রয়বাসী রাজ্যভ্রষ্ট হোসেন শাহ শর্কী সম্বন্ধে আক্ষরিকভাবে সত্য হতে পারে না, অবশ্য কবিরা তাঁদের প্রভুদের সম্বন্ধে এইজাতীয় অতিরঞ্জিত উক্তি অনেক সময়েই করে থাকেন। কিন্তু বাংলার সুলতান হোসেন শাহ সম্বন্ধে এই সব উক্তি আক্ষরিকভাবেই সত্য হতে পারে। দ্বিতীয়ত, শেখ কুৎবন যে সত্যিই হোসেন শাহ শর্কীর সহচর হয়ে জৌনপুর থেকে এসেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনুমান ছাড়া কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং বাংলার সুলতান হোসেন শাহের দাবীকে এখনও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে নতুন কোন তথ্য না পাওয়া গেলে এসম্বন্ধে সুনিশ্চিত মীমাংসা করা যাবে না।

যা হোক্, শেখ কুৎবন যে হোসেন শাহেরই নাম করে থাকুন না কেন, তিনি যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যে বসেই 'মৃগাবতী' লিখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ দুই হোসেন শাহই তখন এই রাজ্যের সীমার মধ্যে বাস করছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, কুৎবন-উল্লিখিত "শাহ হুসেন" শের শাহের পিতা হাসান খাঁ সুর। কিন্তু এই মত সত্য হতে পারে না, কারণ প্রথমত 'হাসান' ও 'হোসেন' ভিন্ন নাম, দ্বিতীয়ত হাসান খাঁ সুর কোনদিনই স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না।

যা হোক্, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ যে বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমরা কোন সূত্র থেকেই পেলাম না। কয়েক-জন সমসাময়িক কবি ও গ্রন্থকার তাঁর নাম করেছেন, একজন তাঁর নামে বই উৎসর্গও করেছেন। তাঁর সভাসদ ও কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ পণ্ডিত বা কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর অমাত্য ও সেনানায়কদের মধ্যে পরাগল খান ও ছুটি খান সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সনাতন পণ্ডিতদের পৃষ্ঠ-পোষণ করতেন। এই সমস্ত বিষয় থেকে এবং ভুলবশত হোসেন শাহকে মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ধরে সকলে ভেবেছিলেন যে, হোসেন শাহ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। আর একটি বিষয় দেখতে হবে। বারবক শাহের কাছ থেকে যেমন বহু ব্যক্তি পাণ্ডিত্য বা অন্য কোন কারণের জন্য

সম্মানসূচক উপাধি পেয়েছিলেন, হোসেন শাহের কাছে সেরকম উপাধি কেউ পেয়েছিলেন বলে জানা যায় না। এর থেকেও হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—এরকম ধারণা সমর্থিত হয় না। অবশ্য আমরা জোর করে একথা বলতে পারি না যে হোসেন শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের কোন পৃষ্ঠপোষকতাই করেননি। করে থাকতে পারেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় না। বরং বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে হোসেন শাহ সম্বন্ধে লেখা আছে, "না করে পাণ্ডিত্য-চর্চা রাজা সে যবন।"

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বকে 'হোসেন শাহী আমল' নামে চিহ্নিত করারও কোন সার্থকতা নেই। কারণ হোসেন শাহের রাজত্বকালে মাত্র দুখানি উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল—বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত। অনেকের মতে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারতও হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল তাঁর রাজত্বকালের আগে রচিত হয়েছিল। শ্রীকর নন্দীর মহাভারত হোসেন শাহের রাজত্বকালের পরে রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক্ এই সমস্ত গ্রন্থ রচনার মূলে যেমন হোসেন শাহের প্রত্যক্ষ প্রভাব কার্যকরী ছিল না, তেমনি এই সব গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয়েছিল, এমন কথাও বলা চলে না। হোসেন শাহের আমলেই বাংলার পদাবলী সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যের চরম উন্নতি ঘটে হোসেন শাহের রাজত্ব অবসানের কয়েক দশক পরে, যখন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিরা পদ রচনা সুরু করেন। পদাবলী-সাহিত্য তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের চরম সমৃদ্ধির মূলে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী সক্রিয়, তিনি চৈতন্যদেব, হোসেন শাহ নন। এই কারণে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষভাবে হোসেন শাহের নাম যুক্ত করে রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

হোসেন শাহের ধর্ম-সম্বন্ধীয় নীতি

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, হোসেন শাহের ধর্ম সম্বন্ধে কোন গোঁড়ামি ছিল না এবং তিনি হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর এঁদের এই ধারণা নির্ভর করছে। প্রথম—হোসেন

শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেবের পূর্ণ অভ্যুদয় ঘটেছিল ; হোসেন শাহ একবার চৈতন্যদেবের মহিমা স্বীকার করেছিলেন এবং তাঁর নিরাপত্তা রক্ষার আশ্বাস দিয়েছিলেন ; এর থেকে মনে হয় ধর্মবিষয়ে তিনি উদার ছিলেন। দ্বিতীয়—হোসেন শাহ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে হিন্দুদের নিয়োগ করেছিলেন, এঁদের মধ্যে সনাতন ছিলেন হোসেন শাহের ডান হাত ; এ ব্যাপার কি হোসেন শাহের হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের পরিচায়ক নয় ?

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে বলা যায়, হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় ঘটেছিল বটে, কিন্তু এজন্য চৈতন্যদেবকে নানারকম বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। এ ব্যাপারও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, সন্ন্যাসগ্রহণ করার পরে চৈতন্যদেব আর হোসেন শাহের রাজ্যে থাকেন নি, হিন্দু রাজার দেশ উড়িষ্যায় চলে গিয়েছিলেন। মুসলিম শাসিত বাংলা দেশে থাকলে তাঁর ধর্মচর্চার বিঘ্ন হতে পারে, এরকম আশঙ্কার বশবর্তী হয়েই তিনি বোধ হয় উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন। হোসেন শাহ কর্তৃক চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য স্বীকার ও নিরাপত্তার আশ্বাস দান যে একটি বিচ্ছিন্ন আকস্মিক ঘটনা, সেকথা চৈতন্যদেবের চরিতকারেরাই বলেছেন। বৃন্দাবনদাস বলেছেন সে সময়ে হোসেন শাহের "দৈবে আসি সত্বগুণ উপজিল মনে।" হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরাও এর উপর ভরসা রাখতে পারেননি।

দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে বলা চলে, হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের প্রথা অনেকদিন আগে থেকেই চলে আসছিল—রুকনুদ্দীন বারবক শাহের আমলেও বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহ এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সুলতানদেরই প্রথা অনুসরণ করেছিলেন। সনাতনও সম্ভবতঃ তাঁর পূর্ববর্তী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেই প্রথম নিযুক্ত হয়েছিলেন। আসল কথা, সনাতন, রূপ এবং অন্যান্য হিন্দু অমাত্য ও কর্মচারীদের অতুলনীয় কর্মদক্ষতার জন্যই হোসেন শাহ তাঁদের উচ্চপদে বহাল রেখেছিলেন। এতে রাজা হিসাবে তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারই প্রমাণ পাওয়া যায়, হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবের প্রমাণ মেলে না।

যাহোক্, বিশ্বাসযোগ্য সূত্রগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্ ধর্ম সম্বন্ধে হোসেন শাহ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। তাঁর দেহত্যাগের ৭১ বছর পরে রচিত 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে তাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে, "তিনি শেখ নূর কুৎব্ আলমের সমাধিসংলগ্ন দানসত্রগুলির খরচ চালাবার জন্যে অনেকগুলি গ্রাম দান

করেছিলেন। প্রতি বছর তিনি তাঁর রাজধানী একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় আসতেন, শেখ নূরের সমাধি প্রদক্ষিণ করার জন্য।" 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা', 'মাসির-ই-রহিমী' এবং 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীন'-এও এই কথাগুলি লেখা আছে। 'মাসির'-এর মতে তিনি একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় আসার পথে সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন, সেগুলি ব্যবহার করতে পয়সা লাগত না। 'রিয়াজ'-এর মতে তিনি প্রতি বছর পায়ে হেঁটে একডালা থেকে পাণ্ডুয়ায় নূর কুৎব আলমের সমাধিভূমিতে আসতেন। সুতরাং হোসেন শাহ সত্যিকারের নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন বলেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে।

তাঁর শিলালিপিগুলির সাক্ষ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে উৎকীর্ণ ৫৮টি শিলালিপি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি ব্যতীত আর সবগুলিতেই তাঁর নাম আছে। বাংলার আর কোন সুলতানের এর অর্ধেক সংখ্যক শিলালিপিও মেলে না। এর অর্থ এই যে অন্য সুলতানদের রাজত্বের তুলনায় হোসেন শাহের রাজত্বকালে অনেক বেশী নতুন মসজিদ তৈরী হয়েছিল; কারণ মুসলিম আমলের বেশীর ভাগ শিলালিপিই মসজিদের গাত্রে উৎকীর্ণ। হোসেন শাহের রাজত্বকালে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে ৩১টিতে শিলালিপি পাওয়া গেছে। স্বয়ং সুলতান হোসেন শাহের নির্দেশে সুতী (মুর্শিদাবাদ), হজরৎ পাণ্ডুয়ার ছোটী দরগা, মৌলানাতলী (মালদহ) প্রভৃতি জায়গায় মসজিদ এবং মচাইন (ঢাকা), বনহরা (পাটনা), শাহ গদার দরগা (মালদহ), ধরমাই (ঢাকা), বাঢ় (পাটনা) ও আরও দু'তিন জায়গায় জামী মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তিনি গৌড়ে মখদুম শেখ আখী সিরাজুদ্দীনের সমাধিগৃহে দুটি দরজা এবং একটি সিকায়াহ্ বা জলসত্র তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। ৯০৭ হিজরায় "ধর্মবিজ্ঞান শিক্ষা এবং কেবলমাত্র যেসব আদেশ সত্য, সেগুলি সম্বন্ধে নির্দেশ" দেবার জন্যে তিনি একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়েছিলেন। গৌড়ের 'কদম্ রসুল' ভবনের (যেটি তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে ভুলবশত মনে করা হয়) একটি তোরণ তিনি তৈরী করিয়েছিলেন, এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে মৌলানা হামিদ দানিশমন্দের সমাধির পাশে তিনি একটি জলাশয় খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। 'কদম্ রসুল' ভবনের শিলালিপিতে সুলতান হোসেন শাহকে "ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষক" বলা হয়েছে, কাঁটাদুয়ারের শিলালিপিতে তাঁকে বলা হয়েছে "মুসলিম পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের প্রতি

দয়াশীল" এবং জাহানাবাদের শিলালিপিতে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে, "যাঁর উদ্যোগে ইসলাম বর্ধিত হচ্ছে।" সুতরাং হোসেন শাহ যে সত্যকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৈয়দ বংশের সন্তানের পক্ষে তা'ই হওয়া স্বাভাবিক।

এখন দেখা যাক্, হিন্দুদের প্রতি হোসেন শাহ উদার নীতি অবলম্বন করেছিলেন, এই ধারণা কতদূর সত্য? চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি থেকে কিন্তু এসম্বন্ধে প্রতিকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন চৈতন্যদেব সদলবলে রামকেলি গ্রামে গিয়েছিলেন, সেই সময় সকলে মিলে যে হরিধ্বনি করেছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

নিকটে যবন রাজা পরম দুর্বার।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥

এর কয়েকবছর আগে চৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপে শ্রীবাসের ঘরে হরিসংকীর্তন করেছিলেন, সেই সময় নবদ্বীপে গুজব রটেছিল যে রাজার আদেশে কীর্তনীয়াদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে দুটি নৌকা আসছে। চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

কেহো বোলে আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের বাদে হৈল দেশের উৎপাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা॥
শুনিলে নদীয়ার কীর্তন বিশেষ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ॥

এই মত কথা হৈল নগরে নগরে॥
রাজ-নৌকা আইসে বৈষ্ণব ধরিবারে।

শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে তাই প্রতীত তাঁহার॥
যবনের রাজ দেখি মনে হৈল ভয়।

চৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ে লেখা আছে স্বয়ং চৈতন্যদেবকে নবদ্বীপের "পাষণ্ডী"রা রাজার রোষের কথা বলে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল,

পাষণ্ডি-সকল বোলে নিমাঞি পণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥

প্রভু বলে অস্ত অস্ত এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে করেঁ৷ রাজ-দরশন

পাষণ্ডী বলয়ে রাজা চাহিব কীর্তন।
না করে পাণ্ডিত্য-চর্চা রাজা সে যবন॥

এই সমস্ত প্রবাদ রটা এবং পাষণ্ডীদের এই জাতীয় উক্তি করা থেকে মনে হয় হোসেন শাহ হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। হয়তো এসম্বন্ধে নবদ্বীপবাসীদের অপ্রীতিকর পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল, তাই তাঁদের মধ্যে এই জাতীয় কথা রটত। নবদ্বীপের হিন্দুরা যে হোসেন শাহকে সবিশেষ ভয়ের চোখে দেখতেন, তাও এই সব বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায়।

এসম্বন্ধে সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসার সাক্ষ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন যে বাংলার রাজার অধীনে "হীদেন (হিন্দু) অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চল ছিল, তাদের (হিন্দুদের) মধ্যে প্রত্যেক দিন বহু লোক রাজা এবং শাসনকর্তাদের আনুকূল্য অর্জনের জন্য মুর (মুসলমান) হয়ে যেত।" সুতরাং হোসেন শাহ যে গোড়া মুসলমান ছিলেন না এবং তিনি হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন—একথা বলবার আর কোন উপায় নেই।

হোসেন শাহ যে উড়িষ্যায় অভিযানে গিয়ে বহু দেবমন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন, একথা সমস্ত চৈতন্যচরিতগ্রন্থেই নানা জায়গায় পাওয়া যায়। 'চৈতন্যভাগবতে' আছে,

যে হুসেন-সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিলে প্রমাদ॥

'চৈতন্যচরিতামৃতে' লেখা আছে, উড়িষ্যা-অভিযানে যাবার সময় হোসেন শাহ যখন সনাতনকে তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করেন, তখন সনাতন বলেন,

যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥

সনাতনের এই স্পর্ধিত উক্তি শুনে হোসেন শাহ "তবে তারে বান্ধি রাখি করিল গমন।"

তবে এখানে একটা কথা উঠতে পারে, হোসেন শাহ উড়িষ্যার মন্দির ভেঙেছেন যুদ্ধের সময়। শান্তির সময়েও যে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন ও হিন্দুদের প্রতি অনুদার ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ কই? এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তিনি সুবুদ্ধি রায়ের জাতি নষ্ট করেছিলেন। এসম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণ যথেষ্টই আছে। হোসেন শাহ যখন কেশব ছত্রীকে চৈতন্যদেবের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন কেশব ছত্রী তাঁর কাছে চৈতন্যদেবের মহিমা লাঘব করে বলেছিলেন, এর থেকে মনে হয়, হিন্দুদের প্রতি, বিশেষত হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি হোসেন শাহের পূর্ব-ব্যবহার খুব সন্তোষজনক ছিল না।

হোসেন শাহের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও রাজকর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাই, তাও হোসেন শাহের হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা প্রমাণ করে না। যখন চৈতন্যদেব নবদ্বীপে হরি-সঙ্কীর্তন করছিলেন এবং "নগরে নগরে সঙ্কীর্তন" করাচ্ছিলেন, তখন নবদ্বীপের কাজী কীর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতের' মধ্যখণ্ড, ২৩শ অধ্যায়ে লেখা আছে,

কাজী বোলে হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাও আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগি পাইলেই লইব জাতি॥
এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগরে ভ্রময়ে কাজি কীর্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।

প্রভু-স্থানে গিয়া সভে করিলা গোচর॥
কাজীর ভয়েতে আর না করি কীর্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥

চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে গদাধর দাসের গ্রামের কাজীর অনুরূপ আচরণের বর্ণনা আছে,

সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্বার।
কীর্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে'র কয়েক জায়গাতেও কাজীদের সঙ্গে চৈতন্য-ভক্তদের বিরোধের উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার সময়ে নবদ্বীপের কাজী জনৈক কীর্তনীয়ার ঘরে গিয়ে তাঁর খোল ভেঙে দিয়ে কীর্তন করতে নিষেধ করেছিলেন,

মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্তন উচ্চধ্বনি।
হরিহরিধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী পাশে আসি সভে কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকাল কেহো নাহি কৈল হিন্দুয়ানী॥
এবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি॥
কেহো কীর্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥

হোসেন শাহের রাজত্বকালেরই আর একটি ঘটনা থেকে জানতে পারি তাঁর মুসলমান উজীররা কীভাবে কথায় কথায় হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করতেন। এইসময় বেনাপোলের (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের যশোহর জেলার অন্তর্গত) জমিদার ছিলেন রামচন্দ্র খান। ইনি একজন গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণবদের সহ্য করতে পারতেন না, হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দ এঁর কাছে বিরূপ ব্যবহার পেয়েছিলেন; কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' এঁর চরিত্র এমনভাবে বর্ণনা করেছেন, যার থেকে মনে হয় ইনি ঘোরতর দুষ্কৃতকারী ছিলেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস এই বৈষ্ণববিরোধীর চরিত্র অঙ্কনে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন বলে মনে হয়। এই রামচন্দ্র খানের রাজকর বাকী পড়ায় হোসেন শাহের

উজীরের হাতে তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল, তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি,

দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্যবধ করি মাংস সে ঘরে রান্ধাইল॥
স্ত্রী-পুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিনদিন করে অমেধ্য-রন্ধন।
আর দিন সভা লঞা করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥

রাজকর না দেওয়ার জন্য রামচন্দ্র খানকে বন্দী করে এবং তার ঘর গ্রাম লুঠ করেও উজীরের তৃপ্তি হল না, তিনি হতভাগ্য রামচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে "অবধ্য" অর্থাৎ গরু বধ করে তার মাংস তিনদিন ধরে রন্ধন করে তবে ক্ষান্ত হলেন! (সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনা অত্যন্ত পরিতোষ সহকারে বর্ণনা করেছেন, হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দের প্রতি অসদাচরণকারী রামচন্দ্রের উচিত শাস্তি হল ভেবে। রামচন্দ্রের এই লাঞ্ছনা যে সমগ্র হিন্দু-সমাজের অপমান, সে কথা তাঁর মনে জাগেনি।)

চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায় যে সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তার মিথ্যা নালিশ শুনে হোসেন শাহের উজীর হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্ধন মজুমদারের মত সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভূস্বামীদের বন্দী করতে এসেছিলেন এবং হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারকে না পেয়ে গোবর্ধনের পুত্র নিরীহ রঘুনাথদাসকে বন্দী করেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, রাজার কারাগারে বন্দী হবার পরেও সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা রঘুনাথকে তর্জনগর্জন ও ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকে। শুধু উজীর ও রাজকর্মচারীরা নয়, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানরাও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দুদের উপর অনেক সময় জুলুম করতেন। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' হোসেন শাহের রাজত্বকালে—১৪৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। তার চতুর্থ পালায় তিনি হাসন-হুসেনের রাজ্যের মুসলমানদের সম্বন্ধে লিখেছেন,

কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
ক্রুজু করি করয়ে নছাব।
জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব॥
হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুছলমান।

এই বর্ণনা নিশ্চয়ই তৎকালীন মুসলমানদের দেখে কবি লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং ঐ সময়ে যে "সৈয়দ মোল্লা"রা হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করত, তার আভাস এখানে পাচ্ছি।

অত্যাচারের কথা বাদ দিলেও হোসেন শাহের মুসলমান কর্মচারীদের পরধর্ম-বিদ্বেষের নিদর্শন বহু সূত্র থেকেই পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদের কীর্তনকে তাঁরা বলতেন "ভূতের সংকীর্তন"। 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে লেখা আছে যে হোসেন শাহের "কোটোয়াল" তাঁর কাছে চৈতন্যদেবের বর্ণনা দেবার সময় বলেছিল,

এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন॥

কেউ কেউ বলতে পারেন, উজীর ও কর্মচারীদের বা অন্যান্য মুসলমানদের এই সমস্ত কাজ থেকে রাজার হিন্দু-বিদ্বেষ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু রাজা যদি হিন্দুদের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হতেন, তাহলে উজীর ও কর্মচারীরা বা অন্য মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন করতে ও তাদের ধর্ম নষ্ট করতে পারতেন বলে মনে হয় না।- আকবরের সময়েও হিন্দুদ্বেষী মুসলমান কর্মচারীর ও সাধারণ মুসলমানের অভাব ছিল না। কিন্তু সম্রাটের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে তাঁরা সাহস করেন নি। সুতরাং হোসেন শাহ যে আকবরেরই মত ধর্মবিষয়ে উদার ও হিন্দুমুসলমানে সমদর্শী ছিলেন, একথা বলা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ মাত্র। যাহোক্, স্বয়ং হোসেন শাহেরও ধর্মবিষয়ে অনুদারতার প্রমাণ যথেষ্টই পাই। 'চৈতন্যচরিতামৃত' আদিলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদ থেকে বোঝা যায়, হোসেন শাহ হরি-সঙ্কীর্তন একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং কোথাও হিন্দুরা হরি-সঙ্কীর্তন করলে তিনি স্থানীয় কাজীকে শাস্তি দিতেন। জনৈক মুসলমান নবদ্বীপের কাজীকে বলেছিল,

হরি-হরি করি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎশা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল॥

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে দেখি হোসেন শাহের হিন্দু কর্মচারীরা তাঁর সম্বন্ধে বলছেন,

স্বভাবেই রাজা মহা কালযবন।
মহাতমোগুণবুদ্ধি জন্মে ঘনেঘন॥

এর থেকে বোঝা যায়, হোসেন শাহ বহুবারই হিন্দুবিদ্বেষ ও হিন্দুবিরোধী কার্য-কলাপের পরিচয় দিয়েছেন।

সুতরাং হোসেন শাহ যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন ও হিন্দুদের প্রতি অপক্ষপাত আচরণ করতেন, এ ধারণা একেবারেই ভুল। হোসেন শাহ একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন, তাঁর শাসনদক্ষতা অতুলনীয় ছিল এবং তিনি উচ্চস্তরের সামরিক প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। কিন্তু পরধর্ম সম্বন্ধে উদারতা তাঁর খুব বেশী ছিল না। অপরদিকে নিজের ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল খুবই বেশী। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা হোসেন শাহকে ধর্ম-বিষয়ে উদার মনে করেননি কোনদিনই। তাঁরা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বিভিন্ন বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ব্যক্তির তত্বনিরূপণ করেছেন, অর্থাৎ দ্বাপরযুগে কৃষ্ণলীলার সময় কে কী ছিলেন, তা কল্পনা করেছেন। তাঁদের মতে হোসেন শাহ কৃষ্ণলীলার সময় জরাসন্ধ ছিলেন (চিত্রে নবদ্বীপ, শরদিন্দুনারায়ণ রায়, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৭৮)। হোসেন শাহের হিন্দু সম্বন্ধীয় নীতির অনুদারতা সম্বন্ধে এর থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' নামে একখানি বই প্রকাশ করেছেন। এই বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে তিনি "হোসেন শাহ স্বীয় প্রকৃতি ও কৃতকার্য্যের জন্য হিন্দুদিগের কিরূপ ভয় ও অবিশ্বাসের কারণ হইয়াছিলেন," তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু তাঁর আলোচনার একটি প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে তিনি কয়েকটি অপ্রামাণিক সূত্রের উক্তি প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন, যেমন, ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ', 'প্রেমবিলাস' ও 'বৃহৎ সারাবলী'। তিনি যাকে সমসাময়িক ও প্রামাণিক সূত্র বলে মনে করেছেন, সেই ঈশান নাগরের 'অদ্বৈতপ্রকাশ' আসলে জাল বই—অনেক পরবর্তী কালের রচনা; 'প্রেমবিলাসে'র এক বৃহদংশই প্রক্ষিপ্ত এবং 'বৃহৎ সারাবলী'

নিতান্তই অর্বাচীন গ্রন্থ—১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। তাছাড়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যে সমস্ত ঘটনা হোসেন শাহের রাজত্বকালে ঘটেছিল বলে মনে করেছেন, তাদের মধ্যে অনেকগুলি হোসেন শাহের রাজত্ব সুরু হবার অনেক আগে ঘটেছিল, যেমন গৌড়েশ্বর কর্তৃক "নদীয়া উচ্ছন্ন" করা এবং হরিদাস ঠাকুরের নির্যাতন (এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে 'জলালুদ্দীন ফতে শাহ' সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তিনি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের সাক্ষ্যও উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল হোসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় ন' বছর আগে লেখা (পৃঃ ১২৭-১২৮ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুদের প্রতি হোসেন শাহের আচরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেও অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সেগুলি আমরা আগেই বিচার করে এসেছি। এসম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা দরকার। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে পরধর্ম সম্বন্ধে হোসেন শাহের অনুদারতার প্রমাণ মেলে, কিন্তু তাঁর ধর্মোন্মত্ততার প্রমাণ মেলে না। হোসেন শাহ হিন্দুধর্ম তথা পরধর্মের উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না, তাই সময়ে সময়ে তিনি হিন্দুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি যে ফিরোজ শাহ তুঘলক, সিকন্দর লোদী বা ঔরংজেবের মত ধর্মোন্মাদ ছিলেন না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হোসেন শাহ যদি ধর্মোন্মাদ হতেন, তাহলে নবদ্বীপের কীর্তন বন্ধ করায় সেখানকার কাজী ব্যর্থতা বরণ করার পর নিজেই অকুস্থলে উপস্থিত হতেন এবং জোর করে কীর্তন বন্ধ করে দিতেন। তাঁর রাজত্বকালে কয়েকজন মুসলমান হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত থেকে জানা যায় যে, শ্রীবাসের মুসলমান দর্জি চৈতন্যদেবের রূপ দেখে প্রেমে পাগল হয়ে মুসলমানদের তিরস্কার এবং তাড়নাকে অগ্রাহ্য করে হরিনাম ও কীর্তন করেছিল, আর উৎকল-সীমান্তের মুসলমান সীমাধিকারী ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইতিপূর্বে-নির্যাতিত যবন হরিদাস হোসেন শাহের রাজত্বকালে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন এবং নবদ্বীপে নগর-সঙ্কীর্তনের সময় সামনের সারিতে থাকতেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খান হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ মহাভারত শুনতেন। এসব ব্যাপার—অন্তত শেষ ব্যাপারটা হোসেন শাহের কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। হোসেন শাহ যখন এঁদের কোন শাস্তি দেননি, তখন বুঝতে হবে তিনি ধর্মোন্মাদ ছিলেন না। একথাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর রাজধানীর খুব কাছেই রামকেলি, কানাই-নাটশালা প্রভৃতি গ্রামে বহু নিষ্ঠাবান

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব বাস করতেন। 'রাজমালা'য় লেখা আছে যে হোসেন শাহের হিন্দু সৈন্যেরা ত্রিপুরায় যুদ্ধ করতে গিয়ে গোমতী নদীর তীরে পাথরের প্রতিমা পূজা করেছিল। হোসেন শাহ ধর্মোন্মাদ হলে এ সব ব্যাপার সম্ভব হত না।

আসল কথা হোসেন শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও রাজনীতিচতুর নরপতি; হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যধিক বিদ্বেষের পরিচয় দিলে অথবা হিন্দুদের মনে বেশী আঘাত দিলে তার ফল যে বিষময় হবে, তা তিনি বুঝতেন। তাই তাঁর হিন্দু-বিরোধী কার্যকলাপ সংখ্যায় অল্প না হলেও তা কোনদিনই একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি।

হোসেন শাহের মৃত্যু

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া যায়, তার মধ্যে সোনারগাঁওয়ের গোয়ালদী মসজিদের শিলালিপিটিই শেষতম; এর তারিখ ৯২৫ হিজরার ১৫ই শাবান অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট। অতএব হোসেন শাহ অন্তত ঐ তারিখ অবধি নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন। এর অল্প কিছুদিন পরেই বোধহয় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল; কারণ ৯২৫ হিজরা থেকেই তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে, পরের বছর থেকে নসরৎ শাহের শিলালিপিও পাওয়া যাচ্ছে। হোসেন শাহের নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল, কারণ বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে নসরৎ শাহ শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে স্পষ্টভাবেই লেখা আছে যে আলাউদ্দীনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। অন্যান্য গ্রন্থেও একথা লেখা আছে।

উপসংহার

যে রাজার নাম বাঙালীর কাছে একান্ত পরিচিত, ইতিহাসে, সাহিত্যে ও কিংবদন্তীতে যিনি অমরতা লাভ করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমরা যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। অবশ্য দীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও যেটুকু তথ্য উদ্ধার করা গেল, তা পর্যাপ্ত নয়। দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর ব্যাপী এক গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের কতটুকু সংবাদই বা আমরা জানতে পারলাম? এ সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্যই বিস্মৃতির গহন অরণ্যের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, জানি না কোনদিন তাদের উদ্ধার সাধন সম্ভব হবে কিনা।

'হোসেন শাহের আমল' কথাটি শুনলেই বাঙালীর মনে একটি অত্যুজ্জ্বল গরিমাময় আলেখ্য ফুটে ওঠে। 'হোসেন শাহের আমল' বলতে বাঙালী বোঝেন এমন এক আমল, যে সময় এদেশ ও তার মানুষেরা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সব দিক দিয়েই উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। এই ধারণা অমূলক নয়। তবে আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে হোসেন শাহের আমল সম্বন্ধে বারো আনা সংবাদই আমরা পাই চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলি থেকে। হোসেন শাহের রাজত্বকালেই চৈতন্যদেব নবদ্বীপে লীলা করেছিলেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন। চরিতকাররা চৈতন্যদেবের জীবনের এই অংশের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার থেকেই আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে হোসেন শাহের আমল সংক্রান্ত তথ্যগুলি পাই। অন্য গৌড়েশ্বরদের রাজত্ব-কালে অনুরূপ বিশিষ্ট ঘটনা ঘটেনি, তাই তাঁদের আমল সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। তার ফলে—তাঁদের আমলের তুলনায় হোসেন শাহের আমল যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। হোসেন শাহের ছাব্বিশ বৎসর ব্যাপী নির্বিঘ্ন রাজত্ব, রাজ্যের বিশাল আয়তন ও রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখার কথা ভাবলে এবং তাঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের কথা স্মরণ করলে এই ধারণার অনুকূলে যুক্তিও পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে বাংলার অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সুলতানদের আমল সম্বন্ধে আমরা পর্যাপ্ত তথ্য পাইনি। তাই এ সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

হোসেন শাহের আমলে দেশের লোকে মোটামুটি সুখেই ছিল। সুলতানের পরধর্ম সম্বন্ধে উদারতার যেটুকু অভাব ছিল, তাঁর শাসনদক্ষতা দিয়ে তিনি সেটুকু পুষিয়ে নিয়েছিলেন, তাই গোলযোগ বিশেষ হয়নি।

যাহোক, কল্পনা ও সংস্কারের ধূম্রজাল ভেদ করে এই লোকবিশ্রুত নরপতির সত্য পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করা গেল। এখন তাঁর কাছ থেকে আমরা বিদায় নিতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হোসেন শাহী বংশের শেষ পর্ব

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। আগেই বলেছি যে মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায়, ৯২৫ হিজরাতে হোসেন শাহের মৃত্যু ও নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণ ঘটেছিল।

কিন্তু নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের ৯২২ হিজরায় উৎকীর্ণ মুদ্রাও পাওয়া গেছে। এগুলি খলিফতাবাদের টাকশালে তৈরী। এর থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছিলেন, "নস্রৎ শাহ্ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। বাংলার সুলতানদের পুত্রেরা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার সময়েই যে নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশের অধিকারী হতেন, তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ও শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ এইরকম যুবরাজ হবার পরে পিতার জীবদ্দশায় মুদ্রা ও শিলালিপি প্রকাশ করেছিলেন। সুতরাং নসরৎ শাহের ৯২২ হিজরার মুদ্রাগুলিকে তাঁর যুবরাজ অবস্থার মুদ্রা বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত। হোসেন শাহের জীবদ্দশায় যে নসরৎ তাঁর প্রতি চিরদিনই অনুগত ছিলেন, তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে নসরৎ শাহ তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেছিলেন। বাবরই লিখেছেন যে বাংলাদেশে উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ অত্যন্ত বিরল এবং যে রাজাকে বধ করে, সেই রাজা হয়। সুতরাং নসরৎ শাহ যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, একথা বলার কোন কারণই নেই।

তবকাৎ-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী ও রিয়াজ-উস্-সলাতীনে লেখা আছে সুলতান হোসেন শাহের ১৮ জন পুত্র ছিলেন এবং নসরৎ শাহ তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে, অন্যান্য রাজাদের মত নসরৎ শাহ তাঁর ভাইদের বন্দী করেননি, তার বদলে তাঁদের পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করে দেন। একথা সত্য হলে বলতে হবে নসরৎ শাহ অত্যন্ত মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন।

কিন্তু এই উদারতার পরিণাম খুব শুভ হয় নি। নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ যখন রাজা হলেন, তখন নসরৎ শাহের একজন ভাইই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে নিজে রাজা হয়েছিলেন।

নসরৎ শাহের পরবর্তী কাজ সম্বন্ধে 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে, "তিনি ত্রিহুতের রাজাকে বন্দী করে বধ করলেন। ত্রিহুত ও হাজীপুরের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত জয় করার জন্য তিনি হোসেন শাহের জামাতা ও তাঁর অমাত্য আলাউদ্দীন ও মখদুম আলম বা শাহ আলমকে নিযুক্ত করেন।" 'রিয়াজ'-এর এই উক্তি সত্য বলেই মনে হয়। কারণ, এই সময় ত্রিহুত বা মিথিলায় কামেশ্বর-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের মধ্যে শেষ যে রাজার নাম জানা যায়—তিনি ভৈরব সিংহের পৌত্র ও রামভদ্র সিংহের পুত্র লক্ষ্মীনাথ বা কংসনারায়ণ (J. A. S. B. 1915, pp. 430-431 এবং Select Inscriptions of Bihar by R. K. Choudhary, pp 126-127 দ্রষ্টব্য)। এঁর রাজত্বকাল নসরৎ শাহের সমসাময়িক। এঁর পরে এই বংশের আর কোন রাজার নাম পাই না। সুতরাং নসরৎ শাহই কংসনারায়ণকে বধ করে এই বংশ লোপ করেছিলেন বলে মনে হয়। 'রিয়াজ'-এ উল্লিখিত মখদুম আলম (মখদুম-ই-আলম)-এর নাম বাবরের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়। ত্রিহুত যে নসরৎ শাহের রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়েছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প ; কারণ ত্রিহুতের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম তিন দিকে অবস্থিত অঞ্চলই যে নসরৎ শাহের রাজ্যভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ আছে। নসরৎ শাহের ত্রিহুত অধিকারের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। ত্রিহুতের বেগুসরাইয়ে নসরৎ শাহ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, মসজিদটিকে নদী গ্রাস করেছে (JBRS, 1955, pp. 367-368)। তাছাড়া ত্রিহুতে নসরৎ শাহ, তাঁর পিতা হোসেন শাহ ও হাবশী সুলতান মুজঃফর শাহের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

নসরৎ শাহের রাজত্বকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ।

হোসেন শাহের রাজ্য বাংলার সীমা অতিক্রম করে বিহারের অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার পাশেই ছিল পরাক্রান্ত সুলতান সিকন্দর লোদীর রাজ্য। এইজন্যে বাংলার সুলতানকে কতকটা সশঙ্কভাবেই থাকতে হত। কিন্তু নসরৎ শাহের সিংহাসনে আরোহণের দু' বছরের মধ্যেই লোদী সুলতানদের রাজ্যে ভাঙন ধরল। জৌনপুর থেকে পাটনা পর্যন্ত অঞ্চল প্রায় স্বাধীন হল এবং

এই অঞ্চলে লোহানী ও ফর্মুলী বংশীয় লোকরা মাথা তুলে দাঁড়ালেন। নসরৎ এঁদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করলেন। এর ফলে নতুন কিছু অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল মনে করা যেতে পারে।

এর পরবর্তী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বাবরের আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়। এই বিবরণের সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লী দখল করেন এবং তখন থেকেই রাজ্য-বিস্তারে মন দেন। আফগান নায়কেরা তাঁর হাতে পরাজিত হয়ে পূর্ব ভারতে পালিয়ে গেলেন। ১৫২৬ খ্রীঃর আগষ্ট মাসে হুমায়ুন কনৌজ ও জৌনপুর থেকে মারুফ এবং নাসির লোহানীকে বিতাড়িত করলেন। টঁস নদীর দক্ষিণ থেকে সুরু করে ঘর্ঘরা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল এইভাবে বাবরের রাজ্যভুক্ত হল এবং তাঁর রাজ্যের সীমা নসরৎ শাহের রাজ্যের সীমাকে স্পর্শ করল। নসরৎ বাবর কর্তৃক বিতাড়িত আফগানদের অনেককে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু তিনি খোলাখুলিভাবে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। বাবর তাঁর সভায় দূত পাঠিয়ে তাঁকে তাঁর মনোভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সেই দূত নসরৎ শাহের সভায় এক বছরেরও বেশী সময় রইল, কিন্তু নসরৎ এক বছরের মধ্যেও তাকে খোলাখুলিভাবে কিছু জানালেন না। অবশেষে যখন বাবরের সন্দেহ জাগ্রত হল, তখন নসরৎ বাবরের দূতকে ফেরৎ পাঠালেন নিজের দূত সঙ্গে দিয়ে। বাবরের কাছে অনেক উপহার পাঠিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করলেন। ফলে ১৫২৯ খ্রীঃর জানুয়ারী মাসে বাবর স্থির করলেন বাংলা আক্রমণ করা তাঁর পক্ষে উচিত হবে না।

এর পরবর্তী কিছু সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে পারি না, কারণ বাবরের আত্মকাহিনীর এই অংশ হারিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বিহারের লোহানী-প্রধান বহার খানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর বালক পুত্র জলাল খান। শের খান সুর দক্ষিণ বিহারের জায়গীর গ্রহণ করলেন এবং জৌনপুরের শাসনকর্তার (মোগলের অধীন) সঙ্গে মিলে নিজের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজতে লাগলেন।

এদিকে ইব্রাহিম লোদীর ভাই মাহমুদ নিজেকে ইব্রাহিম লোদীর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। তিনি জৌনপুর অধিকার করলেন এবং বালক জলাল খান লোহানীকে আক্রমণ করে তার রাজ্য কেড়ে

নিলেন। জলাল দলবল সমেত হাজীপুরে পালিয়ে গিয়ে তার পিতৃবন্ধু নসরৎ শাহের কাছে আশ্রয় চাইল। নসরৎ কিন্তু জলালকে হাজীপুরে আটক করে রাখলেন। এদিকে বিহারের আফগান নায়কেরা মাহ্মূদ লোদীর সঙ্গে যোগ দিলেন। এঁদের মধ্যে শের খাঁ-ও ছিলেন।

অতঃপর শের খাঁ এবং মাহ্মূদ লোদী বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মাহ্মূদ এবং শের গঙ্গার দুই তীর ধরে যথাক্রমে চুনার ও কাশীর দিকে রওনা হলেন। বিবন এবং বেয়াজিদ নামে অপর দুজন আফগান নায়ক ঘর্ঘরা নদী ধরে উত্তরে গোরক্ষপুরের দিকে রওনা হলেন। বাবরের আত্মকাহিনীতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। শের খান দক্ষতার পরিচয় দিয়ে কাশী অধিকার করলেন। কিন্তু বিবন ও বেয়াজিদের সারণ পর্যন্ত পৌছোতেই অনেক দেরী হয়ে গেল। এদিকে বাবর-বিরোধী-গোষ্ঠীর নেতা মাহ্মূদের অপদার্থতায় সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। বাবর ঐ সময় ঢোলপুরে ছিলেন। তিনি আফগানদের অগ্রগতির খবর পেয়ে আগ্রায় ফিরে এলেন এবং বিহারের দিকে সসৈন্যে রওনা হলেন। বাবরের অগ্রগতির খবর শুনে মাহ্‌মূদ কোন যুদ্ধ না করেই মাহোবাতে পালিয়ে গেলেন। বাবরের অন্যান্য প্রতিপক্ষের মধ্যে শের খান বেগতিক দেখে এক মাসের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করলেন। বিবন ও বেয়াজিদ পালিয়ে এলেন। হাজীপুরে নসরৎ শাহের ভগ্নীপতি মখদূম-ই-আলম তাঁদের আটকে রাখলেন, মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে দিলেন না। বাবর ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্য-বাহিনী সমেত গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বক্সারে এসে পৌছেছিলেন। জলাল লোহানী তাঁর দলবল সমেত নসরতের কবল থেকে কৌশলে মুক্তিলাভ করে বক্সারে বাবরের কাছে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

উপরে বর্ণিত বাবর-বিরোধী অভিযানগুলিতে নসরৎ শাহ প্রত্যক্ষভাবে কোন অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লেখেন নি। কিন্তু 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে, নসরৎ মোগল বাহিনীকে পরাজিত করবার জন্য ভরাইচ অঞ্চলের দিকে কুৎব্ খাঁর অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। 'রিয়াজ'এ এই সংঘর্ষ সম্বন্ধে আরও এমন দুই একটি কথা আছে, যা বাবরের আত্মকাহিনীর সঙ্গে মেলে না। যা হোক্, নসরৎ যদি কোন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে থাকেন, তা মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে নি নিশ্চয়ই। ফলে তাঁর নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বাবর কোন প্রকাশ্য প্রমাণ পাননি। বাবর

তিনটি সর্তে নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন এবং নসরৎ শাহের দূত ইসমাইল মিতার কাছে এই প্রস্তাব দিলেন (১৯শে এপ্রিল, ১৫২৯ খ্রীঃ)। এইসব সর্তের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে এদের মধ্যে একটিতে বাবর ঘর্ঘরা নদী দিয়ে অবাধ সৈন্য চলাচলের অধিকার দাবী করেছিলেন, বাবরের আত্মকাহিনী থেকে এইটুকু জানা যায়। নসরৎকে তাড়াতাড়ি এই চুক্তি অনুমোদন করতে অনুরোধ জানিয়ে বাবর তাঁর কাছে একজন দূত পাঠালেন। নসরৎ কিন্তু তাড়াতাড়ি এর কোন উত্তর দিলেন না। এদিকে বাবর দুজন চরের মুখে খবর পেলেন যে গণ্ডক নদীর তীরে ২৪টি জায়গায় মখদুম-ই-আলমের নেতৃত্বে বাংলার সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তুলছে। শুধু তাই নয়, তারা আত্মসমর্পণেচ্ছু আফগানদের সপরিবারে নদী পার হয়ে বাবরের কাছে আসতে দিচ্ছে না এবং তাদের নিজেদের দলভুক্ত করছে। এপ্রিল মাসের শেষে বাংলার দূত ইসমাইল মিতা বাবরের দূত মুল্লা মজহবকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার দিকে রওনা হলেন। তার কদিন আগে বাবর তাঁকে নিজের কাছে ডাকিয়ে বলে দিলেন যে বাংলার সুলতান যেন ঘর্ঘরা নদীর ওপার থেকে সৈন্য সরিয়ে বাবরের আফগান নায়কদের বিরুদ্ধে যাত্রা করার পথ খুলে দেন, না দিলে তিনি যুদ্ধ করবেন এবং তাতে বাংলার সুলতানেরই ক্ষতি হবে। কিন্তু বাংলার দূত চলে যাওয়ার পরে কয়েকদিন অপেক্ষা করেও বাবর তাঁর সন্ধির প্রস্তাবের কোন উত্তর পেলেন না, নসরৎ শাহও ঘর্ঘরা নদীর ওপার থেকে তাঁর সৈন্য সরালেন না। তখন বাবর জোর করে ঘর্ঘরা নদী পার হবেন স্থির করলেন।

বাবর বাংলার সৈন্যদের শক্তি এবং কামান চালনায় দক্ষতার কথা জানতেন, তাই তিনি নিজের বাহিনীকে অসাধারণ শক্তিশালী করে গঠন করেছিলেন। এরপর যখন জৌনপুর থেকে আরও ২০,০০০ সৈন্য এসে তাঁর বাহিনীকে পুষ্টতর করে তুলল, তখন বাবর আক্রমণ সুরু করতে বিলম্ব করলেন না। উস্তাদ আলী কুলী খান ঘর্ঘরা নদীর পুর্ব তীরে অবস্থিত বাংলার বাহিনীর দিকে মুখ করে গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর মাঝে এক জায়গায় কামান বসালেন। ঘর্ঘরা ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থল থেকে কিছু দূরে মুস্তাফা প্রস্তুত রইলেন ওধারের এক দ্বীপের নিকটে অবস্থিত বাংলার নৌবাহিনীর উপর গোলা বর্ষণের জন্য। একদল মিস্ত্রী ও কারিগরকেও এইসব জায়গায় পাঠান হল। বাবরের বাহিনী ছটি দলে বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে চারটি ছিল তাঁর পুত্র আস্কারির পরিচালনাধীন,

এরা ইতিমধ্যেই গঙ্গার উত্তর দিকে পৌঁছেছিল। কথা ছিল এরা হেঁটে বা নৌকায় চড়ে ঘর্ঘরা নদী পার হবে যাতে শত্রুদের দৃষ্টি কামান-বাহিনীর উপর না পড়ে তাদের উপর পড়ে এবং এইভাবে কামান-বাহিনী নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে যাবে। পঞ্চম বাহিনীটি ছিল স্বয়ং বাবরের অধীন, এরা উস্তাদ আলীর কামান-বাহিনীকে আড়াল করে রেখেছিল, কথা ছিল যে, যখন শত্রুদের উপর কামান দাগা হবে, তখন এই বাহিনী নদী পার হবে। ষষ্ঠ বাহিনী গঙ্গার ডান ধারে মুস্তাফার গোলন্দাজ সৈন্যদের সাহায্য করতে নিযুক্ত ছিল।

২রা মে তারিখে বাবরের পরিচালনাধীন সৈন্যবাহিনী গঙ্গা পার হল। ৪ঠা মে তারিখে বাবর তাঁর ঘাঁটি থেকে রওনা হয়ে দুই নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ২ মাইল দূরের একটি জায়গায় পৌঁছোলেন এবং আলী কুলীকে কামান চালাতে বললেন।

আলী কুলী বাংলার দুটি নৌকাকে ঐদিন ডুবিয়ে দিলেন। ঐদিন রাত্রেই একজন বাঙালী বাবরের বজরায় উঠে তাঁকে বধ করার চেষ্টা করে, কিন্তু নৈশ প্রহরীর সতর্কতায় বাবর অব্যাহতি পান।

৫ই মে তারিখে বাঙালীরা প্রতি-আক্রমণ করে। তাদের নৌবল উৎকৃষ্টতর হওয়ার দরুণ তারা সহজেই নদীর উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করল এবং ঘর্ঘরার অপর পারে আস্কারির নতুন ঘাঁটির কাছে তাদের একদল পদাতিক সৈন্য অবতরণ করতে সমর্থ হল। গঙ্গার অপর পারে নীচের দিকে মুহম্মদ জামান মির্জার তাঁবুর কাছেও তাদের একদল পদাতিক সৈন্য অবতরণ করল।

বাঙালীরা কীভাবে এই সাফল্য লাভ করেছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ বাবর দেননি। তবে তিনি বাঙালীদের কামান চালানোর পদ্ধতির প্রশংসা করে লিখেছেন, "বাঙালীরা কামান চালানোয় নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। আমরা এখন তার পরিচয় পেলাম।"

যাহোক্, বাঙালীদের এই সাফল্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। ঘর্ঘরার ওপারে যারা অবতরণ করেছিল, মোগল অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের হটিয়ে দেয় এবং গঙ্গার ওপারে যারা অবতরণ করেছিল, মুহম্মদ জামান মির্জা তাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

ঐদিনই আস্কারির অধীন সৈন্যবাহিনীর এক বৃহদংশ ঘর্ঘরা নদী পার হয়। আস্কারি বাবরকে জানান যে তিনি বাংলার সৈন্যবাহিনীকে পরদিন পরিপূর্ণভাবে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছেন।

এই খবর শুনে বাবর ৫ই মের বিকালে আদেশ দেন যে ঐসন তিমুর সুলতান, তুখতেহ বুঘা সুলতান, বাবা সুলতান, অয়েশ খান এবং অন্যান্য কয়েকজন যোদ্ধার পরিচালনায় কয়েকটি রণতরী ঘর্ঘরা নদীতে অগ্রসর হয়ে বাংলার সৈন্যদের ঘাঁটির ঠিক সামনে এক জায়গায় সমবেত হবে। তাঁর কথা অনুযায়ী কাজ হল। কিন্তু ৫ই মে মধ্যরাত্রের মত সময়ে বাংলার নৌবাহিনী ঘর্ঘরা নদীর একটি বাঁকে এই সমস্ত নৌকার অগ্রগতি রোধ করে বাবরের সৈন্যদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে বিতাড়িত করল।

কিন্তু বাবর এই পরাজয়ে দমে গেলেন না। তিনি মুহম্মদ সুলতান মির্জাকে আদেশ পাঠালেন অবিলম্বে নদী পার হয়ে আস্কারির সঙ্গে যোগ দিতে। সেই সঙ্গে ঐসন তিমুর সুলতান এবং তুখতেহ বুঘা খানকে অবিলম্বে নদী পার হতে আদেশ দিলেন।

বাবরের আদেশ অনুযায়ী তাঁর রণতরীগুলি যখন নদী পার হতে লাগল, তখন বাংলার অশ্বারোহী সৈন্যেরা পূর্ণোদ্যমে তাদের আক্রমণ করার জন্যে অগ্রসর হল। কিন্তু তাতেও মোগল নৌ-বাহিনী নিরস্ত না হয়ে নদী পার হতে লাগল। ঐসন তিমুর সুলতান ত্রিশ চল্লিশ জন অনুচর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হলেন। প্রথম দলটি নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পদাতিক সৈন্যেরা তাদের আক্রমণ করল। সাত আটজন মোগল সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। ইতিমধ্যে অন্যান্য মোগলরাও তৈরী হয়ে গেল এবং আর একখানা নৌকা নদী পার হল। ঐসন তিমুর সুলতানের অদম্য বিক্রম সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করে তুলল। ইতিমধ্যে বাবরের অন্য অনেক সৈন্য ও রণতরী বিনা বাধায় নদী পার হয়ে এপারে চলে এল।

বাংলার নৌবাহিনী দুই নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু বাবরের বাহিনী যখন নদী পার হয়ে বাংলার স্থলবাহিনীকে পরাজিত করল, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ল। এদিকে দরবেশ মুহম্মদ খান সরবন, দোস্ত ইশাক আগা, নুর বেগ এবং অন্যেরা গঙ্গার অন্যদিক দিয়ে এসে বাংলার কামানবাহিনীকে এড়িয়ে চলে গেল। গিয়ে বাংলার স্থলবাহিনীকে আক্রমণ করল। এইভাবে বাংলার স্থলবাহিনী দুদিক দিয়ে বাবরের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হল। বাংলার নৌ-বাহিনী তাদের সাহায্য করতে না পেরে পালাতে লাগল। ঐসন তিমুর সুলতান এবং তাঁর বাহিনী একদিকে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অপরদিকে আস্কারির একদল সৈন্য কূকী নামে একজন অধ্যক্ষের অধীনে যুদ্ধ করে বাংলার

বাহিনীকে রণক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করল। এরা বসন্ত রাও নামে জনৈক বিখ্যাত হিন্দু (বাবরের ভাষায় "একজন খ্যাতিমান্ পৌত্তলিক") বীরকে নিহত করে তার মাথা কেটে ফেলল। বসন্ত রাওয়ের দশ পনেরো জন অনুচর কুকীর সৈন্যদের আক্রমণ করতে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে কাটা পড়ল।

তখন বাবর নিজেও নদী পার হয়ে রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর যে সমস্ত সৈন্যেরা তখনও নদী পার হয়নি, তাদের তিনি পায়ে হেঁটে নদী পার হতে আদেশ দিলেন। ৬ই মে দুপুরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

মোগল সৈন্যেরা যুদ্ধে জয়লাভ করে ঘর্ঘরা নদী পার হয়ে সারণে উপনীত হল। সারণের নিরহুন পরগনার কূনড়ীহ্ গ্রামে যখন বাবর পৌঁছোলেন, তখন জলাল লোহানী এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। বাবর জলালকে বিহারে তাঁর সামন্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করলেন।

কিন্তু নসরতের দূরদর্শিতার জন্যে বাবরের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বেশীদূর গড়াল না। ইতিপূর্বে বাবর প্রথমে গোলাম আলী নামক একজন দূত এবং পরে মুল্লা মজহব নামে আর একজন দূত মারফৎ নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। উপরে বর্ণিত যুদ্ধের কয়েকদিন পরে গোলাম আলী বাবরের কাছে প্রত্যাবর্তন করে জানালেন যে অপরপক্ষ বাবরের তিনটি সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি করতে রাজী হয়েছেন। গোলাম আলীর সঙ্গে আবদুল ফতে নামে মুঙ্গেরের শাহজাদার একজন লোক এসেছিলেন। লস্কর উজীর হোসেন খান ও মুঙ্গেরের শাহজাদা এঁদের মারফৎ বাবরকে একটি চিঠি পাঠান। তাতে এঁরা নসরৎ শাহের পক্ষ থেকে জানালেন যে তাঁরা বাবরের সর্তে সম্মত এবং সন্ধি পালনের দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করছেন। বাবরের প্রতিপক্ষ আফগান নায়কদের কতক পর্যুদস্ত, কতক নিহত হয়েছিল, কয়েকজন বাবরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং কয়েকজন বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তার উপরে এই সময়ে বর্ষাও আসন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই বাবরও সন্ধি করতে রাজী হয়ে অপরপক্ষকে চিঠি দিলেন। এইভাবে বাবর ও নসরৎ শাহের সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটল। এই সংঘর্ষের পরে বর্তমান বিহার ও উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কিছু অঞ্চল নসরতের হস্তচ্যুত এবং বাবরের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে দেখা যাচ্ছে। বাবর তাঁর আফগান সমর্থকদের সারণ ও গোরক্ষপুরের শাসনভার দিয়েছিলেন এবং খরিদ ও আজমগড়ে পদার্পণ করেছিলেন বলে তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়। অথচ এই সমস্ত জায়গা

যে বাংলার সুলতানের রাজ্যভুক্ত ছিল, তা তাঁর শিলালিপি থেকে জানা যায়। খরিদে নসরৎ শাহের ৯৩৩ হিজরা বা ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গেছে। অথচ বাবর নিজেই লিখেছেন যে তিনি নসরৎ শাহের সঙ্গে বিজেতার মত আচরণ করেননি, পূর্বঘোষিত সম্মানজনক সর্তে সন্ধি করেছিলেন। সম্ভবত বাবর ও নসরৎ শাহের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছিল, তারই সর্ত অনুযায়ী এই সমস্ত অঞ্চল বাবরের অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পরে মাহমুদ লোদী—বিবন, বেয়াজিদ এবং শের খানের সহায়তায় মোগলদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযান করেন এবং বিহারের সীমা অতিক্রম করে ক্রমশ জৌনপুর অবধি অধিকার করেন ও লক্ষ্ণৌ ঘেরাও করেন। অবশেষে নিজের অযোগ্যতা ও শের খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দাদরার যুদ্ধক্ষেত্রে মোগলের হাতে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। এই অভিযানে নসরৎ শাহের পরোক্ষ সমর্থন ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' লেখা আছে হুমায়ুনের সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিন পরে নসরৎ শাহের কাছে খবর আসে হুমায়ুন বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন। এই খবর পেয়ে নসরৎ গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের কাছে অনেক উপঢৌকনসমেত মালিক মর্জান নামে একজন দূত পাঠান। মালিক মর্জান মাণ্ডুতে বাহাদুর শাহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর কাছে খিলাৎ পান। এই কথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের প্রবল শত্রু, তাঁর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলে হুমায়ুন যখন নসরতের রাজ্য আক্রমণ করবেন, তখন বাহাদুর অপরদিক থেকে হুমায়ুনের রাজ্য আক্রমণ করবেন। সম্ভবত নসরতের এই বিজ্ঞোচিত কূটনৈতিক কার্যের ফলেই হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ থেকে বিরত হন।

ত্রিপুরার সঙ্গে যে নসরৎ শাহের পিতা হোসেন শাহের দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলেছিল, তা আমরা আগেই দেখে এসেছি। কিন্তু নসরৎ শাহের সঙ্গেও যে ত্রিপুরার যুদ্ধ হয়েছিল, সে খবর অনেকেই রাখেন না। প্রাচীন রাজমালায় (সা. প. ২২৫৯ নং পুঁথি, ২৩ খ পত্র) ধন্যমাণিক্যের পরবর্তী রাজা দেবমাণিক্য সম্বন্ধে লেখা আছে,

চাটীগ্রাম থানা রাখি আসিলেক দেশ।
যত রাজ্য পিতৃসত্ত্ব আছিলেক পুনি।
সকল শাসিল সুখে সেই নৃপমণি॥

দেবমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫২২-১৫২৭ খ্রীঃ (রাজমালা, কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত সংস্করণ, ২য় লহর, পৃঃ ১৮৪ দ্রষ্টব্য)। 'রাজমালা'তে যখন দেবমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন বলে দাবী জানানো হয়েছে, তখন চট্টগ্রামের অধিকারী বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে যে তাঁর সংঘর্ষ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ সম্বন্ধে আর একটি প্রমাণ আছে। ১০৫৬ হিজরা বা ১৬৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি মোহাম্মদ খান তাঁর 'মক্তুল হোসেন' কাব্য রচনা সম্পূর্ণ করেন। এই কাব্যের উপক্রমে কবি তাঁর বিস্তৃত বংশপরিচয় দিয়েছেন। সংক্ষেপে তাঁর বংশলতিকা এই,

মাহি আসোয়ার—হাতিম—সিদ্দিক—রাস্তি খান—মিনা খান—গাভুর খান—হামজা খান—নসরৎ খান—জালাল খান—রহিম খান ও মুবারিজ খান—মোহাম্মদ খান।

নীচে আমরা 'মক্তুল হোসেন' থেকে রাস্তি খান হতে সুরু করে নসরৎ খান পর্যন্ত কবির পূর্বপুরুষদের বিবরণ উদ্ধৃত করলাম (সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০১-১০৩ দ্রষ্টব্য)।

> সর্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু সত্যবাদী সিদ্দিক সমান।
> তান পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু রাস্তি খান রূপে পঞ্চবাণ॥
> চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন শচীপতি তাহানে প্রণামি বারে বার।
> তাহান নন্দন বলি রসে 'দধি বলে শূলী দানে হরিচন্দ্র সমসর॥
> তেজে অগ্নি কোপে যম মানেত কৌরবসম রণে যেন ভৃগুপতি রাম।
> কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর মিনা খান রূপে অনুপাম॥
> তান পুত্র গুণবান ভীমসম বলবান কার্তবীর্য সম ধনু ধারী।
> জ্ঞানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু দানে বলি কল্পতরু যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি॥
> ভিক্ষুক জনের গতি ঐশ্বর্যে যে যযাতি ধৈর্যে বীর্যে গম্ভীর সাগর।
> গাভুর খান গুণনিধি থিরে ক্ষিতি রসে 'দধি তাহানে প্রণামি বহুতর॥
> করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
> শত্রু সব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয় বাপ হোন্তে কৈলা রাজধ্বনি॥
> লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র শুনে অনুক্ষণ রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।
> হামজা খান মহলন্দ হাস্তবাণী মকরন্দ তাহাকে প্রণামি বারে বার॥

তাহান নন্দনবর রূসে যেন রত্নাকর ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি।
সুমেরু সদৃশ থির পার্থসম মহাবীর ঐশ্বর্য্যাদি নৃপ যযাতি ॥
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজ কুল জয়কেতু জন্ম হৈল প্রচণ্ড প্রতাপ।
গান্ধারী-নন্দন মানে কর্ণবলি জিনি দানে ভিক্ষুক জনের যেন বাপ ॥
বিজয়ে বিজয় সম বিপক্ষ কুলের যম চন্দ্রমুখ সুধা মধু হাস।
রূপে কাম সমসর ধীর সুললিত বর পুরান্ত সকল নারী আশ ॥
প্রজার পালক রাম বাপ হোন্তে অনুপাম বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি।
বান্ধব জনের প্রাণ নসরৎ খান জান তান পদে করম মিনতি ॥

মোহাম্মদ খানের এই বংশ পরিচয়ে যে রাস্তি খানের নাম পাওয়া যাচ্ছে, তিনি মোহাম্মদ খানের উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ। মোহাম্মদ খান যখন সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন, তখন সময়ের হিসাবে রাস্তি খান পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন বলা যেতে পারে। মোহাম্মদ খান রাস্তি খানকে "চাটিগ্রাম দেশপতি" বলেছেন। সুতরাং এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে এই রাস্তি খান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সমসাময়িক "মজলিস আলা" রাস্তি খানের সঙ্গে অভিন্ন, যিনি ৮৭৮ হিজরা বা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার জোবরা গ্রামে একটি মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত থেকে জানা যায় যে এই রাস্তি খানেরই পুত্র পরাগল খান ও পৌত্র ছুটি খান।* এদিকে মোহাম্মদ খানের বংশপরিচয়ে

* কবীন্দ্র পরমেশ্বর রাস্তি খানের পুত্র পরাগল খানকে "রুদ্রবংশরত্নাকর" নামে অভিহিত করেছেন। এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন রাস্তি খান অথবা তাঁর পিতা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলেন এবং আগে তাঁদের "রুদ্র" পদবী ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ খান লিখেছেন যে রাস্তি খানের প্রপিতামহ মুসলমান ছিলেন, তাঁর নাম ছিল "মাহি আসোয়ার" এবং তিনি ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন। এর থেকে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, কবীন্দ্র-পরমেশ্বর উল্লিখিত রাস্তি খান ও মোহাম্মদ খানের পূর্বপুরুষ রাস্তি খান পৃথক লোক। কিন্তু এই অনুমান যুক্তিযুক্ত নয়। একই সময়ে একই জায়গায় দুই রাস্তি খানের অস্তিত্ব কল্পনা করা সঙ্গত নয়। এ সমস্যার সমাধান অন্যভাবেও করা যায় এবং তা-ই এর প্রকৃত সমাধান বলে মনে হয়। মোহাম্মদ খান লিখেছেন যে মাহি

রাস্তি খানের পুত্র মিনা খান, পৌত্র গাভুর খান, প্রপৌত্র হামজা খান, বৃদ্ধ-প্রপৌত্র নসরৎ খান প্রভৃতির নাম পাওয়া যাচ্ছে। পরাগল খান ও ছুটি খানকে কেউ কেউ যথাক্রমে মিনা খান ও গাভুর খানের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন, কিন্তু এ মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নেই।[খ] প্রকৃতপক্ষে পরাগল খান ও মিনা খান রাস্তি খানের দুজন পুত্রের নাম। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও মোহাম্মদ খানের সাক্ষ্য মিলিয়ে রাস্তি খানের নিম্নতম পঞ্চম পুরুষ অবধি এই বংশ-লতা দাঁড়ায়,

---

আসোয়ার বাংলাদেশে এসে এক ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। সম্ভবত এই ব্রাহ্মণকন্যাই রুদ্রবংশীয়া ছিলেন, তাই তাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র পরাগল "রুদ্রবংশরত্নাকর" বিশেষণে অভিহিত হয়েছেন।

[খ] যাঁরা মিনা খান-গাভুর খানকে পরাগল খান-ছুটি খানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, তাঁদের একমাত্র তথাকথিত যুক্তি এই যে ছুটি খান ও গাভুর খান উভয়েই রাস্তি খানের পৌত্র এবং উভয়ের কীর্তি একই, কারণ শ্রীকর নন্দী বলেছেন যে ছুটি খান ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন আর এঁদের মতে মোহাম্মদ খান গাভুর খান সম্বন্ধে "জিনিয়া ত্রিপুরাগণ" ইত্যাদি উক্তি করেছেন। কিন্তু পর পৃষ্ঠায় আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, মোহাম্মদ খান এই উক্তি গাভুর খান সম্বন্ধে করেননি, তাঁর পুত্র হাম্‌জা খান সম্বন্ধে করেছেন। অতএব এর থেকে ছুটি খান ও গাভুর খানের অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না। পরাগল খান ও ছুটি খান হোসেন শাহের লস্কর ও সেনাপতি ছিলেন। মিনা খান ও গাভুর খান তা ছিলেন বলে মোহাম্মদ খান লেখেন নি। অথচ পূর্বপুরুষদের সমস্ত গৌরবের কথা তিনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন। এর থেকেও বোঝা যায়, পরাগল খান-ছুটি খান মিনা খান-গাভুর খানের সঙ্গে অভিন্ন নন। মোহাম্মদ খান মিনা খানের কেবলমাত্র রূপগুণের প্রশংসা করেছেন এবং গাভুর খান সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলেছেন, "যার কীর্তি গৌড়-দেশ ভরি।" সম্ভবত গাভুর খানের পুত্র হাম্‌জা খান থেকেই রাস্তি খানের বংশের এই শাখাটি প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে।
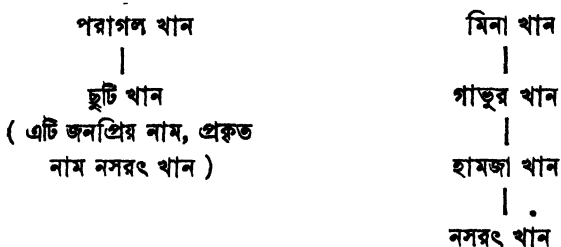
মোহাম্মদ খান তাঁর বংশপরিচয়ে তাঁর একজন পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে বলেছেন, "করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ" ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই উক্তি কার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে? অনেকে বলেন যে এই উক্তি গাভুর খান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ মোহাম্মদ খান তাঁর বংশপরিচয়ে প্রত্যেক পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম বা চরণবন্দনা জানাবার পরই তাঁর প্রসঙ্গ শেষ করে তাঁর পুত্রের প্রসঙ্গ সুরু করেছেন। বংশপরিচয়ের যে অংশ আমরা উদ্ধৃত করেছি এবং যে অংশ উদ্ধৃত করিনি দুইয়ের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০১-১০৩ দ্রঃ)। সুতরাং মোহাম্মদ খান গাভুর খানকে "তাহানে প্রণামি বহুতর" বলে পরে "করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরাগণ" বলে যে বর্ণনা সুরু করেছেন, তা গাভুর খান সম্বন্ধে নয়, তাঁর পুত্র হামজা খান সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়েছে সন্দেহ নেই। আর "করিয়া বিষম রণ" ইত্যাদি উক্তি গাভুর খান সম্বন্ধে প্রযুক্ত ধরলে বলতে হয়, হামজা খান সম্বন্ধে মোহাম্মদ খান মাত্র "লইয়া পণ্ডিতগণ···তাহাকে প্রণামি বারে বার" এইটুকুমাত্র বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং হামজা খান কার পুত্র তা বলেননি; এই দুই বিষয়ই বংশপরিচয়ের অন্যান্য অংশের সঙ্গে খাপ খায় না। সুতরাং মোহাম্মদ খান হাম্‌জা খানকেই ত্রিপুরা-বিজেতা বলেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পরাগল খান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমসাময়িক, ছুটি খানও হোসেন শাহের বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক; সুতরাং ছুটি খানের এক পুরুষ পরবর্তী হাম্‌জা খানকে নসরৎ শাহের সমসাময়িক ধরা যায়। এই হাম্‌জা খান ত্রিপুরা জয় করেছিলেন বলে দাবী জানানো হয়েছে। অতএব নসরৎ শাহের সঙ্গে যে ত্রিপুরার সংঘর্ষ হয়েছিল, তা এর থেকেও বোঝা যায়।

অহোম্ বুরঞ্জী থেকে জানা যায় যে নসরৎ শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে আসাম আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে অহোম্ বুরঞ্জীতে যে বিবরণ পাওয়া যায় (Mughal North-East Frontier Policy, Sudhindranath Bhattacharya, pp. 89-90 দ্রষ্টব্য), তার সংক্ষিপ্তসার নীচে দেওয়া হল।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তুরবক নামে বাংলার একজন মুসলমান সেনাপতি ৩০টি হাতী, ১০০০টি ঘোড়া এবং বহু কামান নিয়ে অহোম্ রাজ্য আক্রমণ করেন। তেমেনি দুর্গ বিনা বাধায় জয় করার পরে মুসলমানরা অহোম রাজ্যের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি সিঙ্গরির সামনে এসে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করতে থাকে। সিঙ্গরির ঘাঁটি রক্ষা করছিলেন বর পাত্র গোহাইন। অহোম রাজ তাঁর পুত্র সুক্লেনকে একদল শক্তিশালী সৈন্য দিয়ে সিঙ্‌রি রক্ষা করবার জন্য পাঠালেন। অল্পকালের মধ্যেই দুই পক্ষের খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয়ে গেল এবং কিছু দিন ধরে তা চলতে থাকল। সুক্লেন ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করলেন। তুমুল যুদ্ধের ফলে মুসলমানরা প্রথমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু অবশেষে তারা অসমীয়াদের পরাজিত করতে সমর্থ হল। আটজন অসমীয়া সেনাধ্যক্ষ নিহত হলেন, বহু লোক জলে ডুবে মরল, রাজপুত্র সুক্লেন আহত হলেন এবং অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন। অবশিষ্ট অসমীয়া সৈন্যবাহিনী সালা নামক জায়গায় পালিয়ে গেল। অহোম্-রাজ সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করে বর পাত্র গোহাইনের অধীনে রাখলেন।

প্রায় এই সময়েই নসরৎ শাহ পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও এই যুদ্ধ চলেছিল। যথাস্থানে এই যুদ্ধের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হবে।

তেরো বছর রাজত্ব করার পরে ৯৩৮ হিজরা বা ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে নসরৎ শাহ শেষ জীবনে ঘোরতর অত্যাচারী হয়ে ওঠেন এবং জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করতে সুরু করেন। এই সমস্ত কথা কতদূর সত্য তা বলা যায় না। 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে যে একদিন নসরৎ শাহ গৌড়ের একনাকা নামক স্থানে তাঁর পিতার সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। এর আগে তিনি একজন খোজাকে কোন দোষের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। এই খোজা অন্য খোজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং নসরৎ শাহ যখন একনাকা থেকে প্রাসাদে ফিরছিলেন, তখন নসরৎকে হত্যা করে। কিন্তু বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে, নসরৎ শাহ "was killed while asleep,

by his servant Khwajeh Soray." "Khwajeh Soray" বলতে বুকানন 'খওয়াজা সেরা' অর্থাৎ প্রাসাদের প্রধান খোজাকে বুঝিয়েছেন। কারণ জলালুদ্দীন ফতে শাহের হত্যাকারীকেও তিনি "Khwajeh Soray" বলেছেন। নসরৎ শাহ যে আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন, তাতে সংশয়ের অবকাশ অল্প। তবে কীভাবে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন তা সঠিক ভাবে বলা শক্ত। নসরৎ শাহ যে একজন অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাবর এবং আফগান নায়কবৃন্দ উভয় পক্ষের সঙ্গেই তিনি যেভাবে মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন, তা থেকে তাঁর কুশাগ্র কুটনীতিজ্ঞানের পরিচয় মেলে। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "Alau-d-din Husain Shah's son and seccessor, Nasrat Shah (1519-32 A. D.) appears to have been an indolent and tactless sovereign." কিন্তু এরকম অনুমানের কোন ভিত্তিই নেই, ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ থেকে এর বিপরীত সিদ্ধান্তে আসতে হয়। নসরৎ শাহ শুধুমাত্র কুটনীতির ক্ষেত্রে নয়, যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে ঘর্ঘরা ও গঙ্গানদীর সঙ্গমস্থলে নসরৎ শাহের সৈন্যবাহিনী তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু নসরৎ শাহের প্রতিপক্ষের উক্তির নির্ভর করে নসরতের শক্তি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন ধারণা করে বসলে ভুল করা হবে। ঘর্ঘরার যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র বাবরের বিবরণী ছাড়া আর কোন সূত্র যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। নসরতের নিজের পক্ষের বিবরণী অথবা নিরপেক্ষ বিবরণী পাওয়া গেলে প্রকৃত সত্য হয়তো খানিকটা ভিন্ন মূর্তি নিয়ে দেখা দেবে। হয়তো দেখা যাবে ঘর্ঘরার যুদ্ধে নসরতের সৈন্যবাহিনী বাবরের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় কম কৃতিত্বের পরিচয় দেয়নি। এরকম ধারণার কারণ, ঘর্ঘরার যুদ্ধের পর বাবর নসরৎ শাহের সঙ্গে তাঁর পূর্বের সর্ত অনুযায়ী সন্ধি করেছেন। অথচ এই যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে বাবরের পক্ষে বাংলাদেশ জয় করার জন্যে এগিয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কারণ নতুন নতুন রাজ্য জয় ছিল বাবরের চিরদিনের নেশা এবং ভারতবর্ষে আসার পর থেকে বাবরের প্রধান লক্ষ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজ্যবিস্তার। এই সময়ে তাঁর প্রতিপক্ষ আফগানেরাও পর্যুদস্ত হয়েছিল, সুতরাং বাবরের বাংলা জয়ের জন্যে অগ্রসর হওয়ার পথে এদিক দিয়ে কোন বাধা ছিল না। যদি ধরে নেওয়া যায়, বাবরের কথা সম্পূর্ণ সত্য, তাহলেও নসরৎ শাহের গৌরব খর্ব হয় না। কারণ বাবর নিজে লিখেছেন যে

বাংলার সৈন্যদের শক্তি এবং কামান চালানোর দক্ষতার কথা শুনে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীকে অসাধারণ রকম শক্তিশালী করে গঠন করেছিলেন। বাংলার সৈন্যবল যে কতখানি ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সম্ভবত ঘাঁটি রক্ষার জন্য সাধারণত যত সৈন্য থাকে, তা'ই ছিল। অতএব অধিকতর সৈন্য নিয়ে গঠিত অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তারা যদি পরাজিত হয়ে থাকে, তাহলেও তাদের দোষ দেওয়া যায় না। ঘর্ঘরার যুদ্ধের পরেই বাবর যে নসরৎ শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন, এর থেকেও মনে হয় যে বাবর বাংলার এই সৈন্য-বাহিনীর যোগ্যতার যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তার থেকে বুঝতে পেরেছিলেন তাদের নিজেদের দেশে বৃহত্তর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করলে তাঁর সুবিধা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বাবর সন্ধি করার স্বপক্ষে বর্ষা আসন্ন হওয়ার অছিলা দেখানোতে এই সন্দেহ দৃঢ় হয়। অতএব বাবরের সঙ্গে সংঘর্ষ ও তার পরিণতিকে কোন মতেই নসরৎ শাহের পক্ষে অগৌরবের বিষয় বলা যায় না।

আসাম-অভিযান নসরৎ শাহের আর একটি গৌরবময় কীর্তি। অসমীয়া বুরঞ্জীগুলির সাক্ষ্য থেকেই জানা যায় যে, নসরৎ শাহ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত ও কোণঠাসা করে রেখেছিল। নসরতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, আসাম রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর বিশ্রুতকীর্তি পিতা শোচনীয় ব্যর্থতা বরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

হোসেন শাহের মত নসরৎ শাহের রাজত্বকালেও পর্তুগীজরা বাংলাদেশে বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু এবারও তাদের চেষ্টা সার্থক হয়নি। বিভিন্ন সমসাময়িক বা প্রামাণিক পর্তুগীজ গ্রন্থে এসম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, নীচে আমরা তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করলাম।

যদিও সিলভেরার বাংলাদেশে আগমন ফলপ্রসূ হয়নি, তবু তার পর থেকেই পর্তুগীজদের মধ্যে প্রতি বছর বাংলাদেশে একখানি করে সওদাগরী জাহাজ পাঠাবার প্রথা চালু হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ গভর্নর লোপো-ভাজ-দে-সম্পায়ো রুই-ভাজ-পেরেরা নামে এক ব্যক্তির পরিচালনাধীন একটি বাণিজ্য-জাহাজ বাংলায় পাঠান। পেরেরা চট্টগ্রামে পৌঁছে দেখেন সেখানে খাজা শিহাবুদ্দীন নামে একজন ইরাণী বণিকের একটি জাহাজ রয়েছে; এটি পর্তুগীজ রীতিতে তৈরী। এর উদ্দেশ্য, অন্যান্য বাণিজ্য-জাহাজ এর দ্বারা লুঠ করে তার দোষ পর্তুগীজদের

ঘাড়ে চাপানো। পেরেরা এই জাহাজটি অধিকার করে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

এরপর ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্তিম-আফন্সো-দে-মেলো নামে একজন পর্তুগীজ কাপ্তেন তাঁর জাহাজ নিয়ে অন্য জায়গায় যেতে যেতে ঝড়ের দরুণ বাংলার উপকূলের কাছে এক জায়গায় এসে পড়েন। এখানকার কয়েক জন জেলে তাঁকে চট্টগ্রামে পৌঁছে দেবার নাম করে চকরিয়ায় নিয়ে যায়। এখানকার শাসনকর্তা খোদা বখ্শ্ খান এই সময় একজন প্রতিবেশী ভূস্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। পর্তুগীজদের পেয়ে তিনি তাদের বন্দী করে বলেন যে তাঁর হয়ে যুদ্ধ করলে তিনি তাদের মুক্তি দেবেন ও নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থলে চলে যেতে দেবেন। পর্তুগীজরা তাঁর হয়ে যুদ্ধ করে তাঁকে যুদ্ধে জেতাল। কিন্তু খোদা বখ্শ্ খান পর্তুগীজদের মুক্তি না দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সোরে শহরে বন্দী করে রাখলেন।

এদিকে দুয়ার্তে-মেনদেস-ভাসকনসেলস ও জোআঁ-কোএলহো নামে আফন্সো-দে-মেলোর দলের দুজন লোক তাঁদের জাহাজ নিয়ে চকরিয়ায় এসে উপস্থিত হন এবং তাদের জাহাজের সমস্ত জিনিস খোদা বখ্শ্ খানকে দিয়ে দে-মেলোকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু খোদা বখ্শ্ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও চান। কিন্তু তাঁদের কাছে আর কিছুই ছিল না। দে-মেলো তাঁর দলের সঙ্গে পালিয়ে এসে ভাসকনসেলস ও কোএলহোর সঙ্গে যোগ দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপরন্তু তাঁর রূপবান ও তরুণবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র গঞ্জলো-ভাস-দে-মেলোকে ব্রাহ্মণেরা ধরে দেবতার কাছে বলি দেয়।

এই সময়ে মুনো-দা-কুন্হা ছিলেন গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নর। তিনি বাংলায় বাণিজ্য সুরু করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পূর্বোক্ত ইরাণী বণিক খাজা শিহাবুদ্দীন তাঁর কাছে নিজের লুঠ হওয়া নৌকাটি জিনিসপত্র সমেত ফিরে চান এবং বলেন যে ফিরে পেলে ৩০০০ ক্রুজেডোর (পর্তুগীজ মুদ্রা) বিনিময়ে তিনি আফন্সো-দে-মেলোকে মুক্ত করিয়ে দেবেন। পর্তুগীজ গভর্নর তাঁর নৌকা জিনিস-পত্র সমেত ফিরিয়ে দিলেন। খাজা শিহাবুদ্দীন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে আফন্সো-দে-মেলোকে মুক্ত করিয়ে তাঁর ভাই খাজা শকর্-উল্লার সঙ্গে গোয়ায় পৌঁছে দিলেন। এরপর তিনি পর্তুগীজদের বিশেষ বন্ধু হয়ে পড়লেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে একটা গোলযোগপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তি করার জন্য এবং নিরাপদে ওরমুজ যাবার জন্য তিনি পর্তুগীজ জাহাজের সাহায্য চাইলেন এবং বললেন তাঁকে সাহায্য

করলে তিনি পর্তুগীজরা যাতে বাংলায় বাণিজ্য করার সুযোগ সুবিধা লাভ করে, এমনকি যাতে চট্টগ্রামে দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি লাভ করেন, তার জন্য বাংলার সুলতানের উপর তাঁর প্রভাব প্রয়োগ করবেন। পর্তুগীজ গভর্নর এই প্রস্তাবে রাজী হন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কিছু ঘটবার আগেই নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়। (Campos, Portugese in Bengal, pp. 30-33 দ্রষ্টব্য)

নসরৎ শাহ ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। গৌড়ে তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। গৌড়ে 'কদম রসুল' মসজিদ নামে যে বিখ্যাত মসজিদটি আছে, সেটি তিনিই নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে গোলাম হোসেন থেকে সুরু করে আবিদ আলী পর্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক লিখেছেন। এই মসজিদেরই প্রকোষ্ঠে একটি কালো কারুকার্যখচিত মর্মর-বেদীর উপরে হজরৎ মুহম্মদের 'পদচিহ্ন'-উৎকীর্ণ একটি পাথর ছিল। এই প্রকোষ্ঠের দরজার মাথায় একটি শিলালিপিতে লেখা আছে যে সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ ৯৩৭ হিজরায় "এই পবিত্র মঞ্চ এবং এর পাথর, যার উপরে নবীর পদচিহ্ন আছে, তা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন।" সম্ভবত এর থেকেই ঐতিহাসিকেরা মনে করেছেন যে নসরৎ শাহই মসজিদটির নির্মাতা। কিন্তু এই মসজিদটির ফটকের উপরে একটি শিলালিপি ছিল, তাতে লেখা ছিল যে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯০৯ হিজরার ২২শে মহরম তারিখে "এই ফটক নির্মিত হয়েছিল"। এখনও মসজিদের প্রবেশপথের বাঁ পাশের ভিতরের দিকে একটি শিলালিপি রয়েছে, তাতে লেখা আছে যে সুলতান শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে ১৮ই রমজান তারিখে মির্শাদ খান "এই মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন"। অনেকে মনে করেন, শেষোক্ত দুটি শিলালিপি মূলে এই মসজিদে ছিল না, কিন্তু এই মতের অনুকূলে কোন প্রমাণ নেই। আমাদের মনে হয়, মসজিদটি শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের রাজত্বকালে মির্শাদ খানই প্রথম নির্মাণ করান, তখন এটি একটি সাধারণ মসজিদ ছিল। পরে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে এর ফটকটি নির্মিত হয়। নসরৎ শাহ কেবলমাত্র হজরৎ মুহম্মদের পদচিহ্ন-সংবলিত পাথরটি ও যে মঞ্চের উপরে সেটি রক্ষিত ছিল, সেইটি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর সময় থেকেই এই মসজিদটি 'কদম রসুল' নামে পরিচিত হয়; মসজিদটির আদি নির্মাতা তিনি নন।

যাহোক্, নসরৎ শাহ গৌড়ের জন্ত অনেক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করান। তার মধ্যে বিখ্যাত বার দুয়ারী মসজিদ বা বড় সোনা মসজিদ অন্যতম। এটি ৯৩৭ হিজরা বা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের অনেক জায়গায় নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে এইভাবে নসরৎ শাহের নাম পাই,

নসরৎ সাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্র সম রক্ষা করে সকল পরজা ॥
নৃপতি হুসন সাহ তনয় সুমতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী ॥

এর পাঠান্তর :—

নসরৎ সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্য পালে সব প্রজা ॥
নৃপতি হুসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি।
সামদানদণ্ডভেদে পালে বসুমতী ॥

প্রথম পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে নসরৎ শাহের রাজত্বকালে শ্রীকর নন্দী মহাভারত রচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে শ্রীকর নন্দীর মহাভারত হোসেন শাহের রাজত্ব কালেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু যুবরাজ নসরৎ শাহ সে সময় এত জনপ্রিয় ছিলেন যে শ্রীকর নন্দী তাঁর নাম করে তাঁর পিতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনেকের ধারণা, নসরৎ শাহ নিজেও একখানি মহাভারত লিখিয়েছিলেন কোন কবিকে দিয়ে। এরকম ধারণার কারণ, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ারটি পাওয়া যায়,

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরৎ খান।
রচাইল পঞ্চালী যে গুণের নিদান ॥

কিন্তু এই নসরৎ খান নসরৎ শাহ নন, ইনি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খানের পুত্র, যিনি ছুটি খান নামে বিশেষভাবে পরিচিত। এই নসরৎ খান বা ছুটি খান শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে যে মহাভারত লিখিয়েছিলেন, তারই কথা এই পয়ারটিতে বলা হয়েছে এবং কালক্রমে এই পয়ারটি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের অর্বাচীন পুঁথিতে প্রবেশ করেছে।

নসরৎ শাহের সময়ে একজন বড় পদকর্তা ছিলেন। ইনি কবিশেখর, কবিরঞ্জন এবং বিদ্যাপতি এই তিন নামেই পদ লিখতেন। এঁর কয়েকটি পদের ভণিতায় নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। সেগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি,

(১) কবিশেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুললি কমলমুখী॥

(২) বিদ্যাপতি ভাণি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমলা-বাণী॥

(৩) নসীরা শাহ সে জানে
যারে হানল মদনবাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

সম্ভবত এই কবি নসরৎ শাহের দরবারে চাকরী করতেন। আগেই এঁর সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, নসরৎ শাহের প্রশস্তি সংবলিত একটি পদের ভণিতায় কবির নাম "কবিরশেখ" লেখা রয়েছে। এর থেকে ডঃ এনামুল হক মনে করেন যে শেখ কবীর নামে নসরৎ শাহের একজন সমসাময়িক কবি ছিলেন এবং তিনি নসরৎ শাহের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেন এখানে "কবিরশেখ" "কবিশেখর"এর বিকৃতি। এই অনুমানই যথার্থ বলে মনে হয়। ডঃ এনামুল হক ডঃ শহীদুল্লাহের মতের প্রতিবাদ করে লিখেছেন, "Had Kavi Shekhar mentioned Sultan Nusrat Shah in any of the songs we could have accepted Dr. Shahidullah's theory as probable." (Muslim Bengali Literature, p. 62 দ্রষ্টব্য) কিন্তু কবিশেখর বা বাঙালী বিদ্যাপতি রচিত এবং নসরৎ শাহের নাম সংবলিত একাধিক পদের নমুনা আমরা উপরে দিয়েছি।

নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন তাঁর পিতার রাজ্যের তুলনায় কম ছিল না, বরং কোন কোন নতুন জায়গা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। হোসেন শাহের রাজ্যের পশ্চিম সীমারেখা বর্তমান বিহার রাজ্যের পশ্চিম সীমারেখাকে কোথাও অতিক্রম করেনি বলে মনে হয়। কিন্তু নসরৎ শাহের রাজ্যের মধ্যে বর্তমান উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কোন কোন স্থানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তর প্রদেশের খরিদ বা সিকন্দরপুরে নসরৎ শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে এবং 'রিয়াজ'এর মতে নসরৎ শাহ উত্তর প্রদেশের ভরাইচ বা বহুরাইচে কুৎব্ খাঁর অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন।

সমসাময়িক পর্তুগীজ বিবরণ থেকে জানা যায় যে, চকরিয়া অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম বন্দর নসরৎ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নসরৎ শাহের যে সব মুদ্রা এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি এই সমস্ত জায়গার টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ হয়েছিল,

(১) নসরতাবাদ, (২) ফতেহাবাদ (ফরিদপুর), (৩) হোসেনাবাদ, (৪) খলিফতাবাদ (দক্ষিণ যশোহর), (৫) মুহম্মদাবাদ (উত্তর যশোহর)।

এই সমস্ত জায়গায় নসরৎ শাহের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে:—

(১) গৌড়, (২) সোনারগাঁও (ঢাকা), (৩) মঙ্গলকোট (বর্ধমান), (৪) মৌলানাতলী, (মালদহ), (৫) বাঘা (রাজশাহী), (৬) আশরফপুর (ঢাকা), (৭) নবগ্রাম (পাটনা), (৮) সিকন্দরপুর (খরিদ, উত্তর প্রদেশ), (৯) দেওতলা (মালদহ), (১০) মালদহ, (১১) মুর্শিদাবাদ, (১২) সাতগাঁও (হুগলী), (১৩) সন্তোষপুর (হুগলী), (১৪) বেগুসরাই (ত্রিহুত)।

এর থেকে নসরৎ শাহের রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

এই সব শিলালিপিতে নসরৎ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়:—

(১) তকীউদ্দীন
(২) মিঞা মুআজ্জম
(৩) মুবারক খান
(৪) ফতে খান
(৫) মজলিস সাঈদ
(৬) খলিফ খান
(৭) মজলিস সিরাজ
(৮) শের-এ-মালিক
(৯) সৈয়দ জমালুদ্দীন
(১০) মুখতিয়ার খান
(১১) মজলিস খানওয়ার
(১২) হাসান খান
(১৩) আনওয়ার খান

এছাড়া বাবরের আত্মকাহিনী থেকে নসরৎ শাহের এই সমস্ত দূত, কর্মচারী, আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও সৈন্যাধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায়।

(১) **ইসমাইল মিতা**

(২) **আবদুল ফতে**

(৩) **হোসেন খান লস্কর উজীর**

(৪) **মখদুম-ই-আলম**

(৫) **মুঙ্গেরের শাহজাদা** (ইনি সম্ভবত নসরৎ শাহের পুত্র, কিন্তু এঁর নাম জানা যায় না)।

(৬) **বসন্ত রাও**

পর্তুগীজ বিবরণগুলি থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী চকরিয়ায় খোদা বখ্‌শ্‌ খান নামে নসরৎ শাহের অধীনস্থ একজন শাসনকর্তা থাকতেন এবং তিনি এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করতেন। 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে কুৎব্‌ খাঁ নামে নসরৎ শাহের একজন সেনাপতি ছিলেন। আব্বাস খানের 'তারিখ-ই-শের-শাহী' তে গিয়াসুদ্দীন মাহমূদ শাহের কুৎব্‌ খান নামে একজন সেনাপতির উল্লেখ পাওয়া যায়; তিনি ও ইনি সম্ভবত অভিন্ন। অসমীয়া বুরঞ্জীতে "তুরবক" নামে নসরৎ শাহের আর একজন সেনাপতির নাম উল্লিখিত হয়েছে। এঁর নাম অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলির পরিচয় দেওয়া হল। এই সমস্ত তথ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে নসরৎ শাহ তাঁর পিতারই মত নানা যোগ্যতার অধিকারী একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। বাবরও তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন যে তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাজাদের মধ্যে নসরৎ শাহ অন্যতম। অকালে আকস্মিকভাবে নসরৎ শাহের মৃত্যু না ঘটলে হয়তো তিনি তাঁর পিতার সমান যশই অর্জন করতেন।

আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ

নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এঁর আগে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সুলতান হয়েছিলেন। সুতরাং এঁকে দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ বলা উচিত। কিন্তু এঁর রাজত্বও প্রথম আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহেরই মত স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল।

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের কতকগুলি মুদ্রা ইতিপূর্বে পাওয়া গিয়েছিল, এদের মধ্যে সবগুলিরই তারিখ ৯৩৯ হিজরা। এদের একটি হোসেনাবাদের টাকশাল থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। বর্ধমান জেলার কালনায় এঁর একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, এটি ৯৩৯ হিজরার ১লা রমজান বা ২৭শে মার্চ, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এটি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের উজীর ও সেনাপতি মালিক উলুঘ মসনদ খান স্থাপন করেছিলেন। ফিরোজ শাহের পিতা নসরৎ শাহের ৯৩৮ হিঃ পর্যন্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে এবং ৯৩৯ হিঃ থেকেই আবার ফিরোজের পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের মুদ্রা সুরু হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় থেকে সকলেই মনে করেছিলেন যে ফিরোজ শাহ মাত্র ৯৩৯ হিজরার কিছু সময় রাজত্ব করেছিলেন।

কিন্তু সম্প্রতি আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের ৯৩৮ হিজরায় উৎকীর্ণ দুটি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে (JASP, Vol, IV, 1959, pp, 173-180 দ্রষ্টব্য)। অতএব এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে ৯৩৮ হিজরাতেই নসরৎ শাহের মৃত্যু ও ফিরোজ শাহের সিংহাসনে আরোহণ ঘটেছিল এবং অন্তত কালনা শিলালিপির তারিখ অর্থাৎ ৯৩৯ হিঃর নবম মাস পর্যন্ত ফিরোজ শাহ রাজত্ব করেছিলেন। রিয়াজ-এর মতে ফিরোজ শাহ মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন। বলা বাহুল্য একথা সত্য হতে পারে না। বুকানন-বিবরণীতে লেখা আছে, "Firuz Shah governed nine months". এই কথা সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বলতে হবে ফিরোজ শাহের ৯৩৮ হিজরার মুদ্রাগুলি তাঁর রাজত্বের প্রথম মাসে উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং কালনার শিলালিপিটি সম্পূর্ণ হবার অব্যবহিত পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ফিরোজ শাহের নাম সুপরিচিত। কারণ সর্বপ্রথম বাংলা কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য এই ফিরোজ শাহেরই আজ্ঞায় লেখা হয়েছিল। এর লেখক দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ। তিনি ফিরোজ শাহকে তাঁর কাব্যের মধ্যে "রাজা শ্রীপেরোজ সাহা" এবং "ছিরি পেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ" বলেছেন এবং ফিরোজ শাহের পিতা হিসাবে নসরৎ শাহের নাম করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন ফিরোজ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন শ্রীধর কাব্য রচনা সুরু করেন এবং তিনি রাজা হবার পরে কাব্য রচনা শেষ হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ শ্রীধর তাঁর "কালিকামঙ্গল কাব্যে" অনেক ক্ষেত্রে ফিরোজকে একবার "রাজা" বলে তার অব্যবহিত পরেই "যুবরাজ"

বলেছেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যখন নসরৎ শাহ বাংলার সুলতান (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) এবং ফিরোজ শাহ যুবরাজ, সেই সময়ে ফিরোজের নির্দেশে শ্রীধর কালিকামঙ্গল রচনা করেন; তিনি ফিরোজকে স্তুতিচ্ছলে "রাজা" বলেছেন। শ্রীধর সম্ভবত চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক, কারণ তাঁর কালিকামঙ্গলের সব পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে মনে হয়, পিতার রাজত্বকালে ফিরোজ চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি ফিরোজকে দিয়ে এই কাব্যখানি লেখান।

অসমীয়া বুরঞ্জীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামে যে অভিযান সুরু করেছিল, তা ফিরোজ শাহের রাজত্বকালেও অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল।

ইতিপূর্বে বাংলার সৈন্যবাহিনীর যে জয়লাভের কথা উল্লেখ করেছি, তার পরে তারা আসামের ভিতর দিকে অগ্রসর হয়। মুসলমানরা দখিনকোলে ব্রহ্মপুত্র পার হল এবং কালিয়াবারে পৌঁছোলো। এই সময় বর্ষা এসে যাওয়াতে তারা অগ্রগতি বন্ধ করতে বাধ্য হল। ১৫৩২ খ্রীঃর অক্টোবর মাসে তারা উত্তরকোলে ফিরে এল এবং কিছুদিনের মধ্যেই ঘীলাধরিতে (দরং জেলার বিশ্‌নাথের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত) গিয়ে হাজির হল। শত্রুর অগ্রগতি দেখে অহোম্‌রাজ বিচলিত হয়ে বুরাই নদীর মোহানা পাহারা দেবার জন্যে একদল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী পাঠালেন এবং পরিখা কাটালেন, কিন্তু মুসলমানরা তাদের মতলব পালটে ফেলল। তারা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে সরে গিয়ে সালা দুর্গ অবরোধ করল। দুর্গের চারপাশের ঘরবাড়ীগুলি তারা পুড়িয়ে ফেলল এবং ঝড়ের মত তীব্রবেগে আক্রমণ চালিয়ে দুর্গ দখল করে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্গের অধ্যক্ষ তাদের উপর গরম জল ঢেলে দিয়ে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। দুমাস ইতস্তত খণ্ডযুদ্ধ চলার পর একটি বৃহৎ স্থলযুদ্ধ হয়। অহোমরা ৪০০ হাতী নিয়ে মুসলমান অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করল। কিন্তু মুসলমানরা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে জয়ী হল। অহোম্‌রা পরাজিত হয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। (Mughal North-East Frontier Policy, Sudhindra Nath Bhattacharya, pp. 90-91 দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের আর কোন ঘটনার কথা এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন

মাহ্মূদ শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র এবং আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পিতৃব্য। রিয়াজ-উস্- সলাতীন এবং বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে যে পিতৃব্য মাহ্মূদ ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য, কারণ সমসাময়িক ও প্রামাণিক পর্তুগীজ বিবরণগুলিতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

ফিরোজ শাহের উজীর ও সেনাপতি এবং কালনা শিলালিপির নির্মাতা মসনদ খান ভিন্ন তাঁর অন্য কোন কর্মচারীর নাম এ পর্যন্ত জানা যায় নি।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে গিয়াসুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আঠারো জন পুত্রের মধ্যে একজন এবং নসরৎ শাহ তাঁকে আমীর পদবী দান করেছিলেন। সাদুল্লাপুরের (গৌড়) শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ইনি আবদ্ শাহ ও আবদুল বদর নামে সাধারণত অভিহিত হতেন। গিয়াসুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ ৯৩৯ হিজরার আগে বাংলার সুলতান হননি। কিন্তু তাঁর ৯৩৩ ও ৯৩৮ হিজরায় মুদ্রিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গেছে, এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন নসরৎ শাহ তাঁকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, আবার কারও কারও মতে তিনি নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রার টাঁকশালের নাম পড়া যায়নি। নসরৎ শাহ তাঁর পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত না করে ভাইকে করবেন, এটা খুব সম্ভবপর বলে মনে হয় না। বিশেষত নসরৎ শাহের রাজত্বকালে রচিত শ্রীধরের কালিকামঙ্গলে ফিরোজ শাহকে "যুবরাজ" বলা হয়েছে, একথাও মনে রাখতে হবে। সুতরাং নসরতের রাজত্বকালে গিয়াসুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, এইটিই বেশী সম্ভাব্য বলে মনে হয়। অবশ্য এইসব মুদ্রার তারিখ ঠিকমত পড়া হয়েছে কিনা, তাতেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' গিয়াসুদ্দীন মাহ্মূদ শাহ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এগুলি সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। গিয়াসুদ্দীন শের শাহ ও হুমায়ুনের সমসাময়িক এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য পরিণামে একসূত্রে জড়িত হয়ে পড়ে। এই কারণে শের শাহ ও হুমায়ুন সংক্রান্ত প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে তাঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই বইগুলির মধ্যে

আব্বাস খাঁ সরওয়ানী রচিত 'তারিখ-ই-শেরশাহী' প্রধান। পর্তুগীজবণিক-দের সঙ্গে মাহমুদ শাহের যোগাযোগ ছিল বলে পর্তুগীজ বিবরণগুলির মধ্যেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়।

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁর ভগ্নীপতি মখদুম-ই-আলম ত্রিহুতে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ফিরোজ শাহের হত্যার প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছিলেন। আব্বাস খাঁ সরওয়ানী 'তারিখ-ই-শেরশাহী'তে (Eng. Translation, 2nd Ed., p. 44) লিখেছেন শের খাঁ দিল্লী থেকে পালিয়ে যখন বিহারে এসেছিলেন, তখন বাংলার সুলতানের অধীনস্থ হাজীপুরের সরলস্কর মখদূম আলমের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল ; বাংলায় সুলতান এই সময় মখদুম আলমের উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, এদিকে বাংলার সুলতান আফগানদের হাত থেকে বিহার প্রদেশ জয় করার মৎলব আঁটছিলেন। মাহমূদ শাহ মুঙ্গেরের সরলস্কর কুৎব্ খাঁকে পাঠিয়েছিলেন বিহার জয় করবার জন্যে। শের খাঁ মাহমূদ শাহের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু কুৎব্ খাঁ তাতে কর্ণপাত করেননি।

'তারিখ-ই-শেরশাহী'তে লেখা আছে (Ibid, pp. 44-45) যে শেরশাহ যখন সন্ধিস্থাপনে অক্ষম হলেন, তখন তিনি আফগানদের সঙ্গে মিলে কুৎব্ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বধ করলেন। মখদুম আলম কুৎব্ খাঁকে সাহায্য করেননি বলে মাহমূদ শাহ তাঁর বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। এই সময় শের খাঁ বিহারের অধিপতি জলাল খাঁ লোহানীর অমাত্য ও অভিভাবক ছিলেন। 'তারিখ-ই-শেরশাহী'র মতে শের খাঁ লোহানীদের প্রতিকূলতার জন্যে নিজে গিয়ে মখদুম আলমকে সাহায্য করতে পারেননি। তার বদলে তিনি তাঁর ভগ্নীপতি হসনু খাঁকে পাঠিয়েছিলেন। মখদূম আলম মাহমূদের সৈন্যদের হাতে নিহত হলেন, কিন্তু হসনু খাঁ অক্ষত শরীরে ফিরে এলেন। এদিকে মখদুম আলম যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর ধনসম্পত্তি শের খাঁর জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ফলে শের খাঁ ঐ বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন।

'তারিখ-ই-শেরশাহী' ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে এর পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা নীচে বর্ণিত হল।

জলাল খাঁ লোহানী শের খাঁর অভিভাবকত্ব বেশীদিন সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মাহমূদের কাছে চলে গিয়ে তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন শের খাঁকে দমন করার জন্য। মাহমুদ জালাল খাঁ ও

কুৎব্‌ খাঁর পুত্র ইব্রাহিম খাঁকে শের খাঁর বিরুদ্ধে পাঠালেন বহু সৈন্য, হাতী ও কামান সঙ্গে দিয়ে। শের খাঁ এই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে আসতে দেখে সসৈন্যে বাংলার দিকে অগ্রসর হলেন। আবুল ফজলের 'আকবরনামা'তে লেখা আছে যে সুর্যগড়ে দুই পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়। শের শাহ চারিদিকে মাটির প্রাকার তৈরী করে ছাউনি ফেললেন। ইব্রাহিম খাঁ শের খাঁর ছাউনি ঘিরে ফেলে তোপ বসালেন এবং নতুন সৈন্য পাঠাবার জন্য মাহ্‌মূদকে অনুরোধ করে পাঠালেন। প্রাকারের মধ্যে থেকে খানিকক্ষণ যুদ্ধ করে শের খাঁ ইব্রাহিম খাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে জানালেন, তিনি পরদিন সকালে প্রাকার থেকে বেরিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবেন। এদিকে শের খাঁ রাত্রি শেষ হবার আগেই প্রাকারের মধ্যে বাছা বাছা অল্প সৈন্য রেখে অন্য সৈন্যদের নিয়ে উঁচু জমির আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইব্রাহিম খাঁর সৈন্যেরা যখন এল, তখন শের খাঁর ঘোড়-সওয়ার সৈন্যরা একবার তীর ছুঁড়েই পিছু হটল। আফগানরা পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে বাংলার ঘোড়সওয়ার সৈন্যেরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করল। তখন শের খাঁ তাঁর লুকোনো সৈন্যদের নিয়ে বাংলার সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। বাংলার সৈন্যরা পালিয়ে না গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। এই যুদ্ধে বাংলার বাহিনী পরাজিত হল এবং তাদের সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ নিহত হলেন। সমস্ত হাতী, তোপ এবং অর্থভাণ্ডার শের খাঁর দখলে এল। এরপর শের খাঁ বাংলা-দেশ আক্রমণ করে গড়ি (তেলিয়াগড়ি) পর্যন্ত সব অঞ্চল অধিকার করে নিলেন (Tarikh-i-Sher Shahi, Eng. Translation, 2nd Ed. pp. 45-55, 68-69 দ্রঃ)। অতঃপর শের শাহ তেলিয়াগড়ি ও সক্রীগলির গিরিপথ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মাহ্‌মূদের সেনাপতিরা, বিশেষত পর্তুগীজ সেনাপতি জোআঁ-দে-ভিল্লালোবোস ও জোআঁ-কোরীয়া অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শের শাহের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। তখন শের শাহ অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত এক পথ দিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলে গেলেন (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো রচিত Sher Shah, pp. 120-125 দ্রষ্টব্য—ডঃ কানুনগোর মতে এই পথ ঝাড়খণ্ডের পথ) এবং ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৬,০০০ হাতী, ২০,০০০ সৈন্য ও ৩০০ নৌকা নিয়ে গৌড়ে গিয়ে হাজির হলেন। নির্বোধ মাহ্‌মূদ শাহ ১৩ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শের শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন। শের শাহ তখনকার মত ফিরে গেলেন এবং মাহ্‌মূদের অর্থে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে মাহ্‌মূদেরই বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করলেন।

এক বছর বাদে তিনি মাহ্‌মুদকে জানালেন যে সার্বভৌম নৃপতি হিসাবে তাঁর মাহ্‌মুদের কাছে বার্ষিক নজরানা প্রাপ্য এবং এই উপলক্ষে তিনি এক বিরাট পরিমাণ অর্থ দাবী করলেন। মাহ্‌মুদ তা দিতে রাজী না হওয়ায় তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করলেন (Campos, Portugese in Bengal, pp. 38-39, 40-41)। পর্তুগীজ বিবরণীর মতে শের শাহ গৌড় আক্রমণ করে শহরটি জালিয়ে দিয়েছিলেন এবং লুঠ চালিয়ে বাট মণ সোনা হস্তগত করেছিলেন। কিন্তু 'তারিখ-ই-শেরশাহী' থেকে জানা যায় যে, গৌড় নগরী অধিকারের সময় শের শাহ নিজে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর পুত্র জলাল খাঁ ও সেনাপতি খওয়াস খাঁ এই সময় তাঁর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করেছিলেন। সুতরাং তাঁরাই গৌড় জালিয়ে দিয়েছিলেন ও লুঠ করেছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ তখন আর উপায়ান্তর না দেখে হুমায়ুনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হুমায়ুন খান-ই-খানান যুসুফখেলের অনুরোধে শের খাঁকে দমন করার জন্যে জৌনপুর থেকে বিহারের দিকে রওনা হয়েছিলেন। আমীরদের পরামর্শে হুমায়ুন প্রথমে চুণার দুর্গ অবরোধ করলেন। শের খাঁ গাজী খাঁ সুর এবং বুলাকী খাঁকে চুণার দুর্গ রক্ষার জন্য রেখে নিজে বহ্‌রকুণ্ডা দুর্গে পালিয়ে গেলেন এবং কৌশলে ও বিশ্বাস-ঘাতকতার দ্বারা রোটাস দুর্গ অধিকার করলেন। এদিকে হুমায়ুন প্রায় ছ'মাস অবরোধের পর চুণার দুর্গ জয় করতে সক্ষম হলেন। এ খবর পেয়ে শের শাহ বিচলিত হলেন। ওদিকে তাঁর পুত্র জলাল খা ও সেনাপতি খওয়াস খাঁ গৌড় নগর অবরোধ করেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ গৌড়নগরকে প্রাকার ও পরিখা দিয়ে ঘিরে আত্মরক্ষা করছিলেন। একদিন খওয়াস খাঁ পরিখায় পড়ে জলমগ্ন হয়ে মারা যান। শের খাঁ এঁর ছোট ভাই মোসাহেব খাঁকে খওয়াস খাঁ উপাধি দিয়ে গৌড়ে পাঠালেন। এই দ্বিতীয় খওয়াস খাঁ ৬ই জিল্কদ, ৯৪৪ হিঃ তারিখে (৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ) গৌড় নগরী জয় করেন। 'রিয়াজ'-এর মতে গৌড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার ফলে আফগানরা গৌড়ের দুর্গ জয় করতে পেরেছিলেন ; গৌড় দখলের পর শের খাঁর পুত্র জলাল খাঁ গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের পুত্রদের বন্দী করলেন ; মাহ্‌মুদ শাহ নিজে পালিয়ে গেলেন ; শের খাঁ তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করলেন ; মাহ্‌মুদ তখন উপায়ান্তর না দেখে শের খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং সেই যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হলেন। এদিকে হুমায়ুন ততদিনে চুণার দুর্গ অধিকার করে গৌড়ের দিকে রওনা হবার

উদ্যোগ করছেন। শের খাঁ তাঁর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে দূত পাঠালেন। মাহ্‌মুদ হুমায়ুনের কাছে দূত পাঠিয়ে শের খাঁর কথা না শুনতে অনুরোধ জানালেন এবং বলে পাঠালেন শের খাঁ গৌড় শহর দখল করলেও বাংলার অধিকাংশ তাঁরই দখলে আছে, হুমায়ুন গৌড় আক্রমণ করলে তিনি সাহায্য করবেন। হুমায়ুন তাঁর কথায় রাজী হয়ে গৌড়ের দিকে রওনা হলেন এবং খান-ই-খানান যুসুফখেল বহরকুণ্ডার দিকে যাত্রা করলেন। শের খাঁ এই খবর পেয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে রোটাস দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হুমায়ুনের সঙ্গে আহত মাহ্‌মুদ শাহের দেখা হল। (Tarikh-i-Sher Shahi, Eng. Translation, 2nd Ed, pp. 69-79 দ্রঃ)। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হুমায়ুন মাহ্‌মুদ শাহকে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলেন, আবার কেউ কেউ বলেন তিনি মাহ্‌মুদকে আদৌ খাতির করেননি। কিন্তু হুমায়ুনের সহচর জৌহর তাঁর 'তজকিরৎ উল ওয়াকৎ'এ লিখেছেন যে হুমায়ুন মাহ্‌মুদকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্ভাব্য সমস্ত রকম উপায়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যাহোক্‌ হুমায়ুন গৌড়ের দিকে রওনা হলেন। পথে তেলিয়াগড়ির গিরিপথে হুমায়ুন বাধা পেলেন। জলাল খাঁ এখানে তাঁর বাহিনীকে প্রায় এক মাস আটকে রেখে অবশেষে পথ ছেড়ে দিলেন। শের খাঁ এই এক মাসের মধ্যে ঝাড়খণ্ড হয়ে রোটাস দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তেলিয়াগড়ি দখলের পর হুমায়ুন গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন। (Tarikh-i-Sher Shahi, Eng. Translation, pp. 82-83)। ইতিমধ্যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের মৃত্যু হয়। 'রিয়াজ-উস-সলাতীন'-এর মতে কহলগাঁও-তে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ খবর পান যে তাঁর দুই ছেলে গৌড়েতে শের খাঁর ছেলে জলাল খাঁর আদেশে নিহত হয়েছেন; মাহ্‌মুদ শাহ এই খবর শুনে মর্মাহত হন এবং কিছু দিনের মধ্যেই পরলোক গমন করেন। বুকাননের বিবরণীতেও লেখা আছে যে মাহ্‌মুদ তাঁর দুর্গের পতন এবং দুটি পুত্রের নিহত হওয়ার খবর পেয়ে রোগে আক্রান্ত হন ও তাইতেই মারা যান। এইভাবে বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতানের জীবনাবসান ঘটল। আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মৃত্যুর মাত্র ১৯ বছর বাদে বাংলা দেশে তাঁর বংশের রাজত্ব শেষ হল। অতঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড় অধিকার করেন (জুলাই, ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

ইতিপূর্বে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে বাংলার সৈন্যবাহিনী আসামে যে অভিযান সুরু করেছিল, তা গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে চূড়ান্ত

ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় (Mughal North-East Frontier Policy, Sudhindra Nath Bhattacharya, pp. 91-92 দ্রষ্টব্য)। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার বাহিনী অসমীয়া বাহিনীকে সালার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করে এবং সালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করে। অসমীয়া বুরঞ্জী থেকে জানা যায় যে, ১৫৩৩ খ্রীঃর মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানরা জল এবং স্থলে যুগপৎ আক্রমণ চালিয়ে সালা দুর্গ জয় করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি তুমুল যুদ্ধের পরেও দুর্গের পতন হল না।

এরপর অসমীয়া বাহিনীর ভাগ্য ফিরে গেল। বুরাই নদীর মোহানায় অনুষ্ঠিত এক যুদ্ধে তারা মুসলমান নৌবাহিনীকে পরাজিত করল। মুসলমানরা আর একবার সালা দুর্গ জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এরপর মুসলমানরা দুইমুনিশিলার নৌ-যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। এই যুদ্ধে তাদের একজন সেনাপতি ও ২৫০০ সৈন্য নিহত হল এবং তাদের ২০টি জাহাজ অসমীয়ারা জয় করে নিল।

এরপর হোসেন খানের অধীনে একদল নতুন শক্তিশালী সৈন্য এসে যোগ দেওয়ায় মুসলমানরা আবার উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধ করতে সুরু করে। ১৫৩৩ খ্রীঃর মে মাসের মধ্যভাগে মুসলমানদের নৌবাহিনী তেজপুরও অতিক্রম করে চলে যায় এবং ডিকরাই নদীর মোহানায় ঘাঁটি গাড়ে। কিন্তু তাদের ঠিক মুখোমুখি অহোম্রা এক শক্তিশালী নৌ-বহর নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল। আড়াই মাস দুপক্ষ প্রায় বিনা যুদ্ধে এইভাবে থাকবার পর অহোম্রা আক্রমণ সুরু করে। তার ফলে ডিকরাই নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। মুসলমানরা এই যুদ্ধে পরাজিত হল। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই মারা পড়ল, অনেকে অদূরবর্তী জলাভূমিতে আশ্রয় নিতে গিয়ে শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে গেল।

অতঃপর ১৫৩৩ খ্রীঃর সেপ্টেম্বর মাসে হোসেন খান ভরালি নদীর কাছে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে অহোম্ বাহিনীকে বেপরোয়াভাবে আক্রমণ করতে গিয়ে নিহত হলেন, তাঁর বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। অসমীয়ারা ২৮টি হাতী, ৮৫০টি ঘোড়া, এক বাক্স সোনা, ৮০ থলে রূপা এবং অসংখ্য বন্দুক সমেত বহু জিনিস লুঠ করল।

এইখানেই বাংলার মুসলমানদের আসাম অভিযানের সমাপ্তি ঘটল। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন কামরূপে অবস্থিত বাংলার মুসলমান বীরেরা নিজেদের উদ্যমে এই অভিযান চালিয়েছিলেন, বিপদের মুখেও তাঁরা বাংলার

সুলতানের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাননি। এই মত যদি সত্য হয়, তাহলে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের অপদার্থতার আর একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। আসাম অভিযানে ব্যর্থতার কিছুদিন পরে মুসলমানরা পূর্বদিক থেকে অহোমদের এবং পশ্চিম দিক থেকে কোচদের চাপ সহ্য করতে না পেরে কামরূপও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। দুর্বল গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ এবারেও এদের কোন সাহায্য করতে পারেননি।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহের রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এদেশে পর্তুগীজদের বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন। ইতিপূর্বে হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে পর্তুগীজরা এই বিষয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। মাহ্মুদ শাহের রাজত্বকালে তারা যেভাবে সফল হল, বিভিন্ন প্রামাণিক পর্তুগীজ গ্রন্থে তার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের মধ্যে পর্তুগীজদের বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপনের কথা ছাড়া গিয়াসুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ ও শের শাহের সংঘর্ষ সম্বন্ধে নতুন ও মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়। নীচে এই সব বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ গভর্ণর নুনো-দা-কুন্‌হা খাজা শিহাবুদ্দীনকে সাহায্য করবার এবং বাংলায় বাণিজ্য আরম্ভের ব্যবস্থা করবার জন্য মার্‌তিম-আফন্সো-দে-মেলোকে পাঁচটি জাহাজ এবং দুশো লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠান। চট্টগ্রামে পৌঁছে দে-মেলো তাঁর দূত দুয়ার্তে-দে-আজেভেদোকে ১২ জন লোক সঙ্গে দিয়ে বাংলার রাজার জন্যে অনেক ঘোড়া ও অলঙ্কার নিয়ে প্রায় ১২০০ পাউণ্ড মূল্যের উপহার সমেত গৌড়ে পাঠালেন। তখন মাহ্মুদ শাহ সদ্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে রাজা হয়েছেন, তাঁর মন খুব খারাপ। তারপর পর্তুগীজদের পাঠানো উপঢৌকনের মধ্যে কয়েক বাক্স গোলাপ জল ছিল, এগুলি দমিঙ্গো-বার্বালদেস নামে একজন পর্তুগীজ জলদস্যু একটি মুসলমান জাহাজ থেকে লুঠ করেছিল, মাহ্মুদ এগুলিকে সেই লুঠের মাল বলে চিনতে পারলেন। রেগে গিয়ে তিনি মনস্থ করলেন শুধু পর্তুগীজ দূতদের নয়, বাংলায় আগত সমস্ত পর্তুগীজকেই তিনি বধ করবেন। কিন্তু আলকা খান নামে একজন মুসলমান এবং জনৈক শতাধিক বর্ষ বয়স্ক মুসলিম সন্ন্যাসী তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে এ কাজ করা থেকে বিরত করলেন। সুলতান তখন পর্তুগীজ দূতদের বন্দী করলেন এবং অন্যান্য পর্তুগীজদেরও বন্দী করবার জন্যে চট্টগ্রামে একজন লোককে পাঠালেন। আফন্সো-দে-মেলোর সঙ্গে শুল্কবিভাগের কর্মচারীর একদিন বচসা চলছিল, এমন সময় মাহ্মুদ শাহের পাঠানো লোকটি

মাঝখান থেকে কথা বলল এবং দে-মেলোকে নৈশ ভোজের জন্যে আমন্ত্রণ জানাল। দে-মেলো এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু ভোজের মাঝখানে লোকটি অসুস্থতার অছিলা করে উঠে গেল। তখন একদল মুসলমান বন্দুক ও তীরধনুক নিয়ে পর্তুগীজদের আক্রমণ করল। দে-মেলো ও ৪০ জন পর্তুগীজ নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, তাঁরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন, শেষে অনেকে নিহত হলেন, অন্যেরা আত্মসমর্পণ করলেন। তাঁদের সঙ্গীরা সমুদ্র-তীরে শূকর শিকার করছিলেন, মুসলমানরা তাঁদের অতর্কিতে আক্রমণ করে অনেককে মেরে ফেলল, অন্যান্য লোকেরা বন্দী হলেন। পর্তুগীজদের ১,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। মাত্র ত্রিশজন পর্তুগীজ হত্যাকাণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়ে বন্দী হয়েছিলেন। তাঁদের প্রথমে অন্ধকূপের মত একটা ঘরে বিনা চিকিৎসায় রাখা হল, তারপর একটা গোটা রাত্রি ধরে হাঁটিয়ে ছয় লীগ দূরে মাওয়া নামে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল, সেখান থেকে তাঁদের গৌড়ে চালান দেওয়া হল এবং গৌড়ে মাহ্‌মুদ শাহের লোকেরা পর্তুগীজ বন্দীদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করে নরকের মত একটা জায়গায় আটকে রাখল।

এই খবর শুনে নুনো-দা-কুন্‌হা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আন্তোনিও-দে-সিলভা-মেনেজেসকে নটি জাহাজ ও ৩৫০ জন পর্তুগীজ সঙ্গে দিয়ে চট্টগ্রামে পাঠালেন মাহ্‌মুদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব এবং দে-মেলো ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্ত করবার জন্যে। মেনেজেস চট্টগ্রামে এসে তাঁর দূত জর্জ-অলকোকোরাদোকে মাহ্‌মুদ শাহের কাছে পাঠিয়ে বন্দীদের মুক্তি দাবী করলেন। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন দূতের কোন ক্ষতি করা হলে অথবা এক মাসের মধ্যে তাকে ফিরতে না দিলে তিনি যুদ্ধ করবেন। দূত যখন মাহ্‌মুদের কাছে উপস্থিত হল, তখন মাহ্‌মুদ বন্দীদের মুক্তি না দিয়ে মেনেজেসকে একটি চিঠি পাঠালেন গোয়ার গবর্নরের কাছে ছুতার, মনিকার এবং অন্যান্য মিস্ত্রী পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে। এদিকে দূতের প্রত্যাবর্তন করতে এক মাসের বেশী দেরী হয়ে গেল। তখন মেনেজেস চট্টগ্রামের এক বৃহৎ অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং বহু লোককে বধ ও বন্দী করলেন। মাহ্‌মুদ এ খবর শুনে খুব উত্তেজিত হলেন। মেনেজেসের দূতকে বন্দী করার জন্য তিনি আদেশ দিলেন, কিন্তু দূত ইতিমধ্যে মেনেজেসের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

আফন্সো-দে-মেলো ও তাঁর দলবলকে হয়তো মাহ্‌মুদ বধ করতেন, কিন্তু এই সময়ে শের খান বাংলা আক্রমণ করাতে তাঁর মতিগতি পালটে গেল। তিনি

সে-মেলোকে বধ করার বদলে বরং তাঁর কাছে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ চাইলেন এবং গোয়ার পর্তুগীজ গভর্নরের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠাবেন স্থির করলেন।

এই সময়ে নুনো-দা-কুন্‌হার কাছ থেকে দিয়োগো-রেবেলো আর একজন পর্তুগীজ কাপ্তেন তিনখানি জাহাজ নিয়ে সপ্তগ্রামে এসে পৌঁছোলেন। রেবেলো সপ্তগ্রামে এসেই প্রথমে কাম্বে থেকে আগত দুখানি ভিন্ন দেশের বড় বাণিজ্য-জাহাজকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং নিজের ভাগ্নে দিওগো-দে-স্পিনদোলা ও দুআর্তে-দিআস নামে আর একজন লোককে মাহ্‌মুদ শাহের কাছে পাঠিয়ে বললেন যে আফন্সো-দে-মেলো ও তাঁর লোকদের মুক্তি না দিলে তিনি মেনেজেসের অনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করবেন। এতদিন চট্টগ্রাম থেকে মেঘনা নদী দিয়ে পর্তুগীজ দূতরা গৌড়ে গিয়েছিল, এই প্রথম ভাগীরথী নদী দিয়ে গেল। এদিকে মাহ্‌মুদ তখন অন্য মানুষ। তিনি পর্তুগীজ দূতকে খাতির করলেন এবং সপ্তগ্রামের শাসনকর্তার কাছে চিঠি লিখে রেবেলোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে বললেন। পর্তুগীজ গভর্নরের কাছে বন্ধুত্বের প্রমাণস্বরূপ দূত পাঠাচ্ছেন বলেও জানালেন। পর্তুগীজদের কাছে তিনি সাহায্য চাইলেন এবং তার বিনিময়ে কুঠি তৈরীর জমি এবং দুর্গ তৈরীর অনুমতি দেবেন বলে জানালেন। তিনি ২১ জন পর্তুগীজ বন্দীকে রেবেলোর কাছে ফেরৎ পাঠালেন এবং জানালেন যে আফন্সো-দে-মেলোর পরামর্শ দরকার বলে তাঁকে তিনি রেখে দিচ্ছেন। আফন্সো-দে-মেলোও পর্তুগীজ গবর্নরকে চিঠি লিখে আশ্বস্ত করলেন।

এদিকে শের খান তখন অগ্রসর হয়ে তেলিয়াগড়ি ও সক্রীগলি গিরিপথ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। এই দুই গিরিপথ রক্ষা করার জন্য জোআঁ-দে-ভিল্লালো-বোস ও জোআঁ-কোরীআর অধীনে দুই জাহাজ পর্তুগীজ সৈন্য প্রেরিত হল। তারা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে শের খানকে গরিজ (গড়ি) দুর্গ ও গৌড় থেকে ২০ লীগ দূরে অবস্থিত "ফারানডুজ" (?) শহর অধিকার করতে দিল না এবং মাহ্‌মুদ শাহের কাঙ্ক্ষিত একটি বিখ্যাত হাতীকে অধিকার করল। কিন্তু শের খান অন্য এক অরক্ষিত পথ দিয়ে ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১,৫০০ হাতী, ২,০০,০০০ সৈন্য এবং ৩০০ নৌকা নিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করলেন। নির্বোধ মাহ্‌মুদ তাঁকে বাধা দিতে না পেরে আফন্সো-দে-মেলোর নিষেধ সত্ত্বেও তের লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে শের শাহের সঙ্গে সন্ধি করলেন।

যদিও মাহমুদ শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেননি, তাহলেও তিনি পর্তুগীজদের বীরত্ব দেখে খুশী হয়েছিলেন। আফন্সো-দে-মেলোকে তিনি বিস্তর পুরস্কার দিলেন এবং কুঠি ও শুল্কগৃহ নির্মাণের অনুমতি দিলেন। চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে যথাক্রমে নুনো-ফার্নাণ্ডেজ-ফ্রীয়ার ও জোআঁ-কোরীআর অধীনে একটি বড় ও একটি ছোট শুল্কগৃহ স্থাপিত হল। পর্তুগীজরা অনেক জমি ও বাড়ীও পেলেন। তাঁদের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার এবং আরও নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হল। সুলতান পর্তুগীজদের এতখানি ক্ষমতা এবং পাকাপোক্ত অধিকার দান করেছেন দেখে লোকেরা অবাক হয়ে গেল। এটি নির্বোধ মাহমুদের নির্বুদ্ধিতার আর একটি দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য এর পরিণাম বাংলার পক্ষে শুভ হয়নি। কারণ এর পর থেকে বাংলার নদীপথে পর্তুগীজদের অত্যাচার চরমে ওঠে। মাহমুদ শাহ তাদের এমন শক্ত ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়ায় ও অত্যধিক ক্ষমতা দান করায় পর্তুগীজরা "ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে" পেরেছিলেন।

যাহোক্ অনুকূল সুযোগ দেখে অন্যান্য পর্তুগীজরাও বাংলায় আসতে লাগল। ইতিমধ্যে কাম্বের লোকদের সঙ্গে পর্তুগীজদের যুদ্ধ বেধেছিল। পর্তুগীজ গবর্নর মাহমুদের কাছে দুত পাঠিয়ে আফন্সো-দে-মেলোকে ফেরৎ চাইলেন, কারণ কাম্বের যুদ্ধের জন্য তাঁকে দরকার। মাহমুদকে তিনি জানালেন এই যুদ্ধের জন্য তিনি তাঁকে তক্ষণি কোন সাহায্য পাঠাতে পারছেন না, তবে পরের বছর পাঠাবেন। মাহমুদ পাঁচজন পর্তুগীজ বন্দীকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতির জামিনস্বরূপ রেখে আফন্সো-দে-মেলো ও অন্যান্য পর্তুগীজদের ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই শের শাহ আবার গৌড় আক্রমণ ও অধিকার করেন। নুনো-দা-কুন্‌হা আগেকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাহমুদকে সাহায্য করার জন্য ভাস্কো-পেরেস-দে-সম্পায়োর অধীনে নয় জাহাজ সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই সাহায্য এসে পৌছোবার আগেই মাহমুদ শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পরলোক গমন করেছিলেন। পর্তুগীজ জাহাজগুলি যখন চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছোলো, তখন বাংলাদেশ শের শাহের অধিকারে। (Campos : Portugese in Bengal : pp. 33-42 দ্রষ্টব্য)

যাহোক্, গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে এবং তাঁরই অনুমোদন অনুসারে বাংলাদেশে একটি ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপন করল। এককথায় বলতে গেলে ইউরোপের সঙ্গে বাংলার ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ সংযোগ

এই প্রথম সুরু হল। এর আগে নিকলো কন্তি, বারথেমা, বারবোসা প্রভৃতি কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছিলেন, কয়েকটি পর্তুগীজ জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে এসে পৌছেছিল, এর বেশী ইউরোপের সঙ্গে বাংলার আর কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি। এখন মাহমুদ শাহের কল্যাণে বাংলাদেশের সামনে পশ্চিমের দ্বার খুলে গেল। এর ফল অনেক দিক দিয়ে ভাল হলেও সব দিক দিয়ে যে ভাল হয়নি, সে কথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ যে একজন নির্বোধ ও অদূরদর্শী রাজা ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর পূর্ব-বর্ণিত ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাই তাঁর নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করছে। কিন্তু নির্বুদ্ধিতা ছাড়া অন্যান্য দোষও তাঁর কিছু কম ছিল না। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বধ করে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি যে অপরিসীম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তারই ফলে মখদুম-ই-আলম তাঁর বিরুদ্ধে যান এবং এরই পরিণামে মাহমুদ শাহ সর্বস্বান্ত হন। এর উপর তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ। সমসাময়িক পর্তুগীজ বণিকদের মতে তাঁর উপপত্নীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০। এই সমস্ত দোষের ফলে তিনি যে শেষ পর্যন্ত রাজ্য হারিয়েছিলেন, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহ অবশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভায় অতুলনীয় ছিলেন। কিন্তু মাহমুদ শাহের মত এরকম অপদার্থ নৃপতি বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকলে তিনি সহজে এদেশ জয় করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

আজ পর্যন্ত এই সমস্ত জায়গায় গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের শিলালিপি পাওয়া গেছে :—

ধোরাইল (দিনাজপুর), সাদুল্লাপুর (মালদহ), গৌড়, জোয়ার (ময়মনসিংহ)।

মাহমুদ শাহের ধোরাইল গ্রামের শিলালিপির ভাষা সংস্কৃত। বাংলার আর কোন সুলতানের সংস্কৃতে লেখা শিলালিপি পাওয়া যায় নি। মাহমুদ শাহের গৌড়ের একটি মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় এই মসজিদটি বিবি মালতী নামে জনৈক স্ত্রীলোক তৈরী করিয়েছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে কতকগুলি হোসেনাবাদ ও [illegible] (দক্ষিণ যশোহর) টাকশাল থেকে বেরিয়েছিল।

এছাড়া ফতেহাবাদ, নসরতাবাদ এবং মুহম্মদাবাদের টাকশালেও গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সোনা, রূপো ও তামা তিন ধাতুতেই তৈরী মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তাঁর বহু মুদ্রায় তাঁর রাজকীয় নামের সঙ্গে 'বদর শাহ' নামটিও উল্লিখিত হয়েছে। খলিফতাবাদ বা বাগেরহাটের টাকশালে উৎকীর্ণ তাঁর অনেকগুলি মুদ্রা থেকে দেখা যায়, তিনি খলিফতাবাদের নামের সঙ্গে 'বদরপুর' নামটি যোগ করে দিয়েছিলেন।

গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের আয়তন বেশ বৃহৎ ছিল। তাঁর শিলালিপিগুলি উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁর টাকশালগুলি উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কোন শিলালিপি বা টাকশালের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গের সাতগাঁও অঞ্চল যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা পর্তুগীজ বিবরণী থেকে জানা যায়। গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের পশ্চিম সীমা মুঙ্গের ও পাটনার মাঝখানে এবং মুঙ্গের থেকে প্রায় ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সুরজগড় অবধি বিস্তৃত ছিল, এ কথা আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' থেকে জানা যায়। আরও উত্তরে মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্যের পশ্চিম সীমা হাজীপুর অবধি বিস্তৃত ছিল, অবশ্য হাজীপুরের সরলস্কর মখদুম-ই-আলম মাহ্‌মূদ শাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তার পরিণামস্বরূপ তিনি নিহত হন। দক্ষিণ-পূর্বে মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্য যে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং খোদাবখ্‌শ্‌ খানের শাসনাধীন আরাকানের পর্বতমালা ও মাতামহুরি নদী পর্যন্ত প্রসারিত অঞ্চলটি যে মাহ্‌মুদ শাহের রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা পর্তুগীজ বিবরণী থেকে জানা যায়।

শিলালিপি, 'তারিখ-ই-শেরশাহী' প্রভৃতি ইতিহাসগ্রন্থ এবং পর্তুগীজ বিবরণীগুলি থেকে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের এই সব কর্মচারীর নাম পাওয়া যায় :—

(১) **ফরাস খান**

(২) **নুর খান**

(৩) **মখদুম-ই-আলম**

(৪) **কুৎব্‌ খান**

(৫) **ইব্রাহিম খান** (কুৎব খানের পুত্র)

(৬) **খোদাবখ্‌শ্‌ খান** (Codavascām)

(৭) **আমীরজা খান** (Amarzacão)

এঁদের মধ্যে শেষ চারজন মাহ্‌মূদ শাহের সেনাপতি ছিলেন। শেষ দুজনের নাম পর্তুগীজ বিবরণে পাওয়া যায়। এঁরা দুজনেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে থাকতেন। খোদাবখ্‌শ্‌ খান একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। মাহ্‌মূদ শাহের মৃত্যুর পর এঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে বিরোধ বেধেছিল।

পর্তুগীজ বিবরণীগুলিতে লেখা আছে যে মাহ্‌মূদ শাহ্ যখন আফন্সো-দে-মেলো কর্তৃক প্রেরিত পর্তুগীজ দূতদের বধ করার পরিকল্পনা করছিলেন, তখন আলফা খান নামে জনৈক ব্যক্তি মাহ্‌মূদকে বুঝিয়ে তাঁদের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এই আলফা খানও সম্ভবত মাহ্‌মূদ শাহের কর্মচারী ছিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা একাধিকবার লিখেছি যে বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত একটি পদের (বিদ্যাপতি, খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত, ২নং পদ) ভণিতা এই,

বেকতেও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম জুগপতি (যুগপতি) চিরেজীব জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥

এই "গ্যাসদীন সুরতান"কে কেউ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে, আবার কেউ গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। এঁকে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলার স্বপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি আছে, সেগুলি এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। এখন, এঁকে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলার পক্ষে যে সব যুক্তি আছে, সেগুলির উল্লেখ করছি।

(১) আলোচ্য পদটি কেবলমাত্র লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে পাওয়া যায়; লোচন যেহেতু নিজে মৈথিল, অতএব তিনি কেবলমাত্র মৈথিল কবিদেরই পদ সঙ্কলন করেছেন এবং যেহেতু তিনি বিখ্যাত মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ছাড়া অন্য কোন কবি বিদ্যাপতির নাম করেন নি, অতএব তিনি দ্বিতীয় কোন বিদ্যাপতির পদ সঙ্কলন করতে পারেন না বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত বিদ্যাপতির "আনন লোহুঅ বচনে বোলএ হঁসি" পদটিতে কবিশেখরের ভণিতা ("কবিশেখর ভণ অপরূপ রূপ দেখি") পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে যে একজন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি ছিলেন, তার প্রমাণ আছে; মৈথিল বিদ্যাপতির 'কবিশেখর' উপাধি ছিল বলে জানা যায় না, কিন্তু ঐ দ্বিতীয় বিদ্যাপতির এই উপাধি ছিল (এ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট 'ঘ' দ্রষ্টব্য)। অতএব "আনন লোহুঅ বচনে বোলএ হঁসি" পদটি যে এই বাঙালী কবি দ্বিতীয় বিদ্যাপতির রচনা, তাতে

কোন সন্দেহ নেই এবং এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে লোচন কর্তৃক 'রাগতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত বিদ্যাপতির সব পদই মৈথিল বিদ্যাপতির রচনা নয়। অতএব "গ্যাসদীন সুরতান"-এর নাম সংবলিত পদটিও এই বাঙালী বিদ্যাপতির রচনা হতে পারে। এই বাঙালী কবি কবিরঞ্জন, কবিশেখর ও বিদ্যাপতি এই তিন ভণিতাতেই পদ রচনা করতেন। গোপালদাস-রসিকদাস কৃত 'শাখানির্ণয়' থেকে জানা যায়, এই কবি "রাজসেবী" ছিলেন। এই "রাজসেবী" কবির লেখা কয়েকটি পদের ভণিতায় হোসেন শাহ, নসীরা শাহ, নসরৎ শাহ প্রভৃতি রাজার নাম পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট 'ঘ' দ্রষ্টব্য), "আনন লোমুঅ বচনে বোলএ হঁসি" পদটির ভণিতাতে নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়। এইসব ভণিতায় উল্লিখিত নসীরা শাহ ও নসরৎ শাহ যে বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) এবং হোসেন শাহ তাঁর পিতা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ), সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতএব "গ্যাসদীন সুরতান"-কেও এই বংশের আর একজন সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরা যায়।

(২) মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা 'পুরুষপরীক্ষা' ও 'শৈবসবস্বসারে'র সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহের সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের শত্রুতা ছিল (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য)। অতএব মৈথিল বিদ্যাপতির লেখা পদের ভণিতায় গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের নাম এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে উল্লিখিত হওয়া সম্ভব কিনা, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। পদটি যদি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি অর্থাৎ কবিশেখর-বিদ্যাপতির লেখা হয়, তাহলে তার ভণিতায় গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের উল্লেখ সম্বন্ধে অনুরূপ কোন প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য আলোচ্য পদটিতে কবি "গ্যাসদীন সুরতান"-কে "যুগপতি" বলেছেন, যা গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের মত অপদার্থ সুলতানকে বলা সম্ভব কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু কবিদের পক্ষে এই জাতীয় অত্যুক্তি করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

সুতরাং আলোচ্য পদটির ভণিতায় উল্লিখিত "গ্যাসদীন সুরতান" যে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ নন, তা জোর করে বলা যায় না। ইনি যদি গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহই হন, তাহলে বলতে হবে, পদটির রচয়িতা "রাজসেবী" কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মত গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের সরকারেও চাকরী করতেন।

পরিশিষ্ট 'ক'

চীনা বিবরণীতে উল্লিখিত ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার রাজা কে?

ফেই-সিন নামক চীনা গ্রন্থকারের ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা গ্রন্থ 'সি-চা-শেং-লান' ('সিং-ছা-শুং-লান') থেকে জানা যায় যে চীন-সম্রাট য়ং-লো (য়ুং-লো) তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৪১৫ খ্রীঃ) একদল প্রতিনিধিকে বাংলার রাজার সভায় পাঠিয়েছিলেন; এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন হৌ-হিয়েন (হৌ-শিয়েন)। ফেই-সিন স্বয়ং ঐ দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন; এরা বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় এসে রাজার সভায় যান। সেখানে (সিং-চা-শেং-লান'-এর ভাষায়) "প্রধান দরবারে দামী পাথরে খচিত উঁচু এক সিংহাসনে পায়ের উপর পা রেখে রাজা বসেছিলেন। তাঁর কোলের উপর ছিল দু-দিকে ধার-ওয়ালা একটি তলোয়ার।···তিনি আমাদের প্রত্যভিবাদন করে (চীন) সম্রাটের ফরমানটি একবার মাথায় ঠেকিয়ে তারপর খুলে পড়লেন। রাজা (চীন) সম্রাটের প্রতিনিধিদের এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন এবং আমাদের সৈন্যদের অনেক উপহার দিলেন।···তারপর রাজা একটি সোনার আধারে রক্ষিত সোনার পাতের উপরে লেখা এক বাণী (চীন) সম্রাটকে দেবার জন্যে দিলেন।"

ইতিপূর্বে (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭-১৯, পৃঃ ৫১) আমরা অনুমান করেছি যে বাংলার এই রাজা হচ্ছেন হিন্দু রাজা গণেশ। আমাদের অনুমান একেবারে কল্পনাপ্রসূত ছিল না; রকহিল ১৯১৫ খ্রীঃর T'oung Pao পত্রিকায় (pp. 440-444) 'সিং-চা-শেং-লানে'র যে ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন, তারই মধ্যে আছে, "(At the banquet to the envoys) eating beaf or mutton was forbidden, nor could they drink wine for fear of trouble and because it is breach of decorum." এর থেকেই আমরা পূর্বোক্ত অনুমান করেছিলাম (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭, ছঃ ২৫—পৃঃ ১৮, ছঃ ১ দ্রষ্টব্য)।

আমাদের ঐ অনুমান লিপিবদ্ধ, এমন কি মুদ্রিত হবার সময় পর্যন্ত বিশ্বভারতী চীনভবনে অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও মূল 'সিং-চা-শেং-লান' এক খণ্ডও

ছিল না। তাই রকহিলের অনুবাদের উপর নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি বিশ্বভারতী চীনভবনে এই চীনা বইটি এসেছে, তাই রকহিলের অনুবাদ কতটা নির্ভুল, তা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। বিশ্বভারতী চীনভবনের অধ্যাপক এবং চীনা ভাষার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র সেন আমার অনুরোধে মূল 'সিং-চা-শেং-লান' এবং রকহিলের অনুবাদ মিলিয়ে দেখে আমায় জানিয়েছেন যে ঐ বিশেষ অংশটির ক্ষেত্রে রকহিলের অনুবাদ নির্ভুল নয়। নারায়ণবাবু ঐ অংশটির এই অনুবাদ করেছেন, "(ভোজে) মেষ ও গোমাংসের কাবাব দেওয়া হয়, (কিন্তু) মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। কেন না আশঙ্কা এতে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হবে এবং শিষ্টাচারের বিধি লঙ্ঘিত হবে।"

নারায়ণবাবুর এই অনুবাদ যে ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কারণ 'সি-য়াং-চও-কুং-তিয়েন-লু' ('শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু'), 'শু-য়ু-চৌ-২সেউ-লু' ('শু-য়ু-চৌ-২জ-লু') 'মিং-শে' ('মিং-শ্‌র্') প্রভৃতি চীনা বইতেও ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজার সভায় চীনা রাজপ্রতিনিধিদের আগমন সম্বন্ধে 'সিং-চা-শেং-লান'-এর বিবরণের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, তাদের মধ্যেও বলা হয়েছে যে বাংলার রাজা কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় চীনা রাজপ্রতিনিধিদের গোমাংস খেতে দেওয়া হয়েছিল (এই প্রসঙ্গে Visva-Bharati Annals, Vol. I, p. 111 f. n,. p. 127 এবং p. 131 দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং আমাদের আগেকার অনুমান প্রত্যাহার করা ভিন্ন এখন আর কোন উপায় নেই। 'সিং-চা-শেং-লান'-এ উল্লিখিত বাংলার রাজা চীনা রাজপ্রতিনিধিদের ভোজ দেবার সময় গোমাংস নিষিদ্ধ করেন নি, গোমাংস পরিবেশন করেছিলেন বলে যখন পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে, তখন এই রাজাকে হিন্দু বলবার কোন কারণই নেই। এই রাজা নিঃসন্দেহে মুসলমান। প্রশ্ন উঠবে, ইনি কে? তার উত্তর, ইনি জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, যিনি ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতার শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য লাভ করেছিলেন এবং রাজ্যলাভের জন্য ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮-৩১ দ্রঃ), এবং বাংলার রাজাদের মধ্যে একমাত্র যাঁর ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে (৮১৮ হিজরা) উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়।

চীনা রাজপ্রতিনিধিরা ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের যে সময়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন সে দিকে লক্ষ্য রাখলেও বোঝা যাবে, এই রাজা জলালুদ্দীন ভিন্ন আর কেউ

নন। ইতিপূর্বে (২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭) আমরা লিখেছি, "চীন দেশের মিং রাজবংশের ইতিহাস 'মিং-শে' থেকে জানা যায় যে, চীন সম্রাট য়ং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাসে চীনসম্রাটের একদল প্রতিনিধি বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় এসে রাজার সঙ্গে দেখা করেছিলেন।" কিন্তু একথা সর্বাংশে ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে 'মিং-শে' তে লেখা আছে, "য়ং-লো'র রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাসে সম্রাট বাংলা এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়ে হৌ-হিয়েনকে এক নৌবহর সমেত (ঐসব দেশে) যেতে বললেন।" (Visva Bharati Annals, Vol. I, p. 104 দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ য়ং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাসে চীনা রাজপ্রতিনিধি-দল চীন থেকে যাত্রা করেন, বাংলাদেশে পৌছোন তার কিছুদিন পরে। 'সিং-চা-শেং-লান' থেকে জানা যায় যে, হৌ-হিয়েনের নেতৃত্বাধীন চীনা রাজ-প্রতিনিধিদল চীন থেকে প্রথমে সুমাত্রায় যান এবং সেখান থেকে বাংলার দিকে যাত্রা করে কুড়ি দিন বাদে চট্টগ্রামে পৌছোন এবং তারও কয়েকদিন পরে পাণ্ডুয়ায় পৌছোন। সুতরাং চীন থেকে রওনা হবার অন্তত দু'মাস পরে তাঁরা পাণ্ডুয়ায় পৌছেছিলেন। য়ং-লোর রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষের সপ্তম মাস ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে আরম্ভ হয় এবং ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে শেষ হয় (A sino-Western Calender for Two thousand years—1-2000 A. D. by Hsieh Chung-San, 1956, p. 283 দ্রষ্টব্য)। অতএব হৌ-হিয়েনের নেতৃত্বাধীন চীনা রাজপ্রতিনিধিদল ঐ সময়ে চীনদেশ থেকে রওনা হয়ে ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের অর্থাৎ ৮১৮ হিজরার শাবান-রমজান মাসের মত সময়ে পাণ্ডুয়ায় বাংলার রাজার সভায় পৌছেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ততদিনে যে বাংলা দেশে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর অভিযান ও তার ফলে রাজা গণেশের আধিপত্যের সাময়িক বিলোপ ঘটে গেছে এবং জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায়। জলালুদ্দীনের ৮১৮ হিজরার মুদ্রার সংখ্যাধিক্য থেকে বোঝা যায়, তিনি ৮১৮ হিঃর অন্তত অর্ধাংশ এবং ১৪১৫ খ্রীঃর অন্তত শেষ এক তৃতীয়াংশতে নিশ্চয়ই রাজত্ব করেছেন। জলালুদ্দীনের প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণের পরে কিছুদিন তাঁর উপরে তাঁর পিতার কোন প্রভাব ছিল না (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১ দ্রঃ), সুতরাং ভোজসভায় গোমাংস পরিবেশন করা জলালুদ্দীনের পক্ষে অসম্ভব হয়নি। জলালুদ্দীন প্রকৃত নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত ভোজসভায় মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছিলেন।

আলোচ্য বিষয়ে আমরা আমাদের পূর্ব-মতের পরিবর্তন করলেও রাজা গণেশের প্রথমবার সিংহাসনে আরোহণ সম্বন্ধে আমাদের মূল সিদ্ধান্ত (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৭ দ্রঃ) পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন আমরা বোধ করছি না। আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের মুদ্রা যে বছরে শেষ হয়েছে, জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা সেই বছরে সুরু হয়নি, তার পরের বছর থেকে সুরু হয়েছে। এই বিষয়টি থেকে এবং আশরফ সিমনানীর চিঠি থেকে পরিষ্কার-ভাবে বোঝা যায় যে, আলাউদ্দীন ও জলালুদ্দীনের মাঝখানে রাজা গণেশ কিছু দিনের জন্য (অন্তত ছ'মাসের জন্য) সিংহাসনে বসেছিলেন।

পরিশিষ্ট 'খ'

পাণ্ডুয়া-গৌড়ের বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তি ও রাজা গণেশ

পাণ্ডুয়া এবং গৌড়ে যে সমস্ত স্থাপত্যকীর্তি বর্তমান ছিল বা আছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি রাজা গণেশ কর্তৃক নির্মিত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রথমে পাণ্ডুয়ার একলাখী প্রাসাদের নাম উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এই প্রাসাদটি অতুলনীয়। এর স্থাপত্যরীতি থেকে অনুমান করা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই প্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল। এসম্বন্ধে আবিদ আলী লিখেছেন, "The architechture of this building is of the usual Indo-Saracenic style, and the period seems to be about that of Jalāluddīn's reign. Possilbly it was built by his father, Rājā Kāns." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 126 দ্রষ্টব্য)।

প্রায় সাড়ে চারশো বছরের পুরোনো এই প্রাসাদটি এখনও মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এটি প্রায় আগাগোড়াই ইঁট দিয়ে তৈরী। এই প্রাসাদটির মাথায় একটি মাত্র বিশাল গোলাকৃতি গম্বুজ আছে। একলাখী প্রাসাদ তৈরী করতে নাকি একলক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল (তখনকার দিনের তুলনায় যা অত্যধিক), তাই এর এরকম নাম। প্রাসাদটি বিরাট এবং অত্যন্ত সুন্দর, এটি মধ্যযুগের স্থাপত্যশিল্পের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আবিদ আলী এটিকে "handsomest building in the place" বলেছেন। আবিদ আলী মনে করেন স্বয়ং রাজা গণেশই এই প্রাসাদ তৈরী করিয়েছিলেন। স্থানীয় প্রবাদও এই মতের পোষকতা করে। প্রাসাদটির মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের বহু নিদর্শন আছে; এর প্রধান প্রবেশদ্বারের শীর্ষে দেবতা গণেশের মূর্তি ক্ষোদিত। এই কারণেই মনে হয় হিন্দু রাজা গণেশ এই প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। অবশ্য মুসলমানদের নির্মিত যে সব প্রাসাদ বা মসজিদ ভাঙা হিন্দু মন্দিরের উপকরণে তৈরী, সেগুলির দেওয়ালেও কোন কোন সময় হিন্দু দেবমূর্তি থেকে যেত। কিন্তু মুসলমানরা প্রাসাদ-মসজিদ নির্মাণের সময় হিন্দু দেব-মূর্তিগুলিকে হয় ঘসে তুলে দিতেন, না হয় বিকৃত করতেন, নয় তো উল্টো করে বসাতেন। একলাখী প্রাসাদে গণপতির মূর্তিকে যেরকম সসম্মানে প্রধান

প্রবেশদ্বারের উপরে বসানো হয়েছে, তার থেকে মনে হয় প্রাসাদটি হিন্দুরই নির্মিত। আবিদ আলী ঠিকই লিখেছেন, "Over the entrance door is a lintel with a Hindu idol carved on it, and round the doorway are other stones on which may be detected partial representations of the human figure : the original carvings must therefore have been of Hindu origin."

'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' রয়েছে, রাজা গণেশ একদিন এমন একটি ঘরে বসেছিলেন, যার দরজার উচ্চতা খুব কম ; মাথা হেঁট না করে সেই দরজা দিয়ে ঢোকবার উপায় নেই ; দরবেশ শেখ বদর্-উল্-ইসলাম কাফেরের কাছে মাথা হেঁট করতে রাজী না হওয়ায় ঐ দরজা দিয়ে প্রথমে পা ঢুকিয়ে তারপর ঘরে ঢুকেছিলেন। একলাখী প্রাসাদের প্রধান দরজাটি অবিকল এই ধরণের। এই সব থেকে মনে হয় রাজা গণেশই এই প্রাসাদটি তৈরী করিয়েছিলেন। তাই যদি হয়, তাহলে এর থেকে তাঁর আড়ম্বরপ্রিয়তা ও শিল্পানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রাসাদটির মধ্যে তিনটি সমাধি রয়েছে, 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে'র মতে এই সমাধি তিনটী সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের।

পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদকে রাজা গণেশ তাঁর কাছারী-বাড়ীতে পরিণত করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। ইতিপূর্বে আমরা সিকন্দর শাহ সংক্রান্ত অধ্যায়ে (১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।১-৭৭।১) এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে এই প্রবাদ সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।

গৌড়ে 'ফতে খানের সমাধি-ভবন' নামে পরিচিত যে ছোট বাড়ীটি আছে, সেটি সম্ভবত মূলে একটি হিন্দু মন্দির ছিল ; কোন হিন্দু রাজা এটি তৈরী করিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এসম্বন্ধে আবিদ আলী লিখেছেন, "It seems to the author that the building is of the time of the Hindu Kings (possibly Rājā Kāns) and that it was used for a temple. An arrangement for hanging a chain and bell by an iron hook in the central part of the ceiling is still visible and the building itself lies north to south. There are door openings on three sides only. From all these facts it may be concluded that a Hindu God was worshipped here." সুতরাং যতদূর মনে হয়, মধ্যযুগের হিন্দু গৌড়েশ্বর রাজা গণেশই এই ভবনটি তৈরী করিয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট 'গ'

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমি এই বইয়ে (২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২-১০৫) সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' (১৯৫৯) বইয়ে এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বই যেভাবে সুধীবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তা লেখকের পক্ষে বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক। এইসব সুধীবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই আমার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন। সকলে অবশ্য করেননি। অন্তত দু'জন লেখক মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখে আমার মতের বিচার করেছেন এবং তাঁদের স্বতন্ত্র মত লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সুপ্রবীণ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এঁর প্রবন্ধ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'তে (পৃঃ ৬২-৬৭) এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের পাকিস্তান দিবস সংখ্যা 'মাহে-নও'-তে (পৃঃ ৫৯-৬৩) প্রকাশিত হয়েছে; অবশ্য এই দুই জায়গায় একই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, প্রবন্ধটির নাম "কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে?" অপরজন অধ্যাপক প্রমোদ কুমার ভট্টাচার্য; এঁর প্রবন্ধ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতবর্ষে' (পৃঃ ৬৯৪-৬৯৮) প্রকাশিত হয়েছে। এঁর প্রবন্ধের নাম "কবি কৃত্তিবাসের কাল"। এছাড়া প্রথিতযশা পণ্ডিত ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র (১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) গ্রন্থপরিচয়ে (পৃঃ ৯৫-৯৯) 'কৃত্তিবাস-পরিচয়'-এর সমালোচনা করেছেন। এঁরা যা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে আমি এখানে আলোচনা করব।

প্রথমে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র মত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। যে সমস্ত বিষয়ে তিনি আমার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন, সেগুলি আমার মন্তব্যসমেত নীচে উল্লেখ করলাম।

(১) ডঃ শহীদুল্লাহ্ কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর "বেদানুজ মহারাজা" ও নারসিংহ ওঝার সম্পর্ক সম্বন্ধে ডঃ ভট্টশালী আবিষ্কৃত পুঁথির সাক্ষ্য ("তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা") বিশ্বাস করেন না। তিনি লিখেছেন, "কুলজীতে নারসিংহ ওঝার পিতা শিব বা শিয়ো। সুতরাং 'পুত্র' পাঠ ভ্রান্ত।" কিন্তু কুলজীগ্রন্থগুলি অনেক পরবর্তী কালের রচনা এবং এদের উক্তি অনেকক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং কুলজীগ্রন্থগুলির সাক্ষ্যের মূল্য কিংবদন্তীর সাক্ষ্যের চেয়ে বেশী নয়, অতএব নারসিংহ ওঝার পিতার নাম যে "শিব বা শিয়ো" ছিল, "বেদান্তজ্ঞ মহারাজা" ছিল না, সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না।

(২) ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, "আয়িতের জন্ম ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি রাজা লক্ষণসেন কর্তৃক কৌলীন্য পদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং নারসিংহ ত্রয়োদশ শতকের শেষের বা চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের লোক।" কিন্তু লক্ষণসেনের কাছে আয়িতের কৌলীন্যলাভের ব্যাপারটা কেবলমাত্র কুলজীগ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, সুতরাং তা প্রামাণিক ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না; আর আয়িতের যে জন্মসালের উল্লেখ ডঃ শহীদুল্লাহ্ করেছেন, তা তিনি কোথায় পেয়েছেন জানি না। বলা বাহুল্য, এই তারিখকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা চলে না।

(৩) ডঃ শহীদুল্লাহ্ "পরলোকগত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গণনানুযায়ী কৃত্তিবাসের জন্মকাল" বলে চারটি তারিখ উদ্ধৃত করেছেন এবং লিখেছেন "সা. প. প. ৪৮ ভাগ, ১০৫ পৃঃ" থেকে তিনি এই তারিখগুলি পেয়েছেন। কিন্তু আসলে সা. প. প. ৪৮ ভাগ, ১০৫-১২০ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির নয়, ঐ তারিখগুলি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যই গণনা করে পেয়েছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকেই এই তারিখগুলি নিয়ে ভুলবশত "যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির" নাম করেছেন।

(৪) ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, "ধ্রুবানন্দের মহাবংশে (১৪০৭ শকে = ১৪৮৫।৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) দেখা যায় যে ১৪০২ শকে (= ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ) মালাধরি মেল প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই মালাধরী কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।" এখানে একটু ভুল হয়েছে। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশে' (আসল নাম 'মহাবংশাবলী') কোথাও লেখা নেই যে ১৪০২ শকে "মালাধরি" বা অন্য কোন মেল প্রবর্তিত হয়েছিল, মেল-বন্ধনের কোন উল্লেখই ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে নেই। এছাড়া ধ্রুবানন্দের গ্রন্থের মধ্যে ডঃ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক উল্লিখিত ঐ বইয়ের "রচনাকাল"টিও (১৪০৭ শক) কোথাও পাওয়া যায় না। আসলে মেল-বন্ধন ও ধ্রুবানন্দের গ্রন্থরচনার এই দুই তারিখ (১৪০২ শক ও ১৪০৭ শক) পাওয়া যায় ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত এক অপ্রকাশিত 'কুলকারিকা'য়। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত ধ্রুবানন্দের "মহাবংশে"র ভূমিকায় সর্বপ্রথম এই দুই তারিখের উল্লেখ করেন।

এই দুই তারিখ যে ঠিক্, তার কোন প্রমাণ নেই। আর একটা কথা, কুলগ্রন্থের মতে কৃত্তিবাসের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম "মালাধর খান", "মালাধরী" নয়।

(৫) ডঃ শহীদুল্লাহ্ অন্যত্র লিখেছেন, "জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৯-১৪৩১ খ্রীঃ)। তিনি ভরত মল্লিককে নানা উপহারসহ বৃহস্পতি ও রায়মুকুট এই দুই উপাধি দিয়েছিলেন।" এখানে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালটি সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়নি। জলালুদ্দীন প্রথম দফায় ১৪১৫-১৪১৬ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয় দফায় ১৪১৮-১৪৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আর ভরত মল্লিককে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ কোন উপাধি দেন নি। ভরত মল্লিক জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমসাময়িকই ছিলেন না, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থ ১৫৯৭ শকে অর্থাৎ ১৬৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, তাঁর বিখ্যাত 'অমরকোষটীকা'র রচনাকাল ১৫৯৯ শক অর্থাৎ ১৬৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ (সা. প. প., ১৩৪৮, পৃঃ ১৯৬)। 'চন্দ্রপ্রভা'তে ভরত মল্লিক নিজেকে রাজা প্রতাপনারায়ণের সভাসদ ("ইতি প্রজাধীশ্বরধীরবীরপ্রতাপনারায়ণসংসদস্থঃ") বলেছেন। রামদাস আদক তাঁর ধর্মমঙ্গলে সমসাময়িক রাজা হিসাবে এই প্রতাপনারায়ণের নাম করেছেন; রামদাস আদক "বেদ বসু তিন বাণ শকে" (১৫৮৪ শক = ১৬৬২ খ্রীঃ) ধর্ম-মঙ্গল রচনা করেন। আর একটা কথা, ভরত মল্লিক অথবা অন্য কোন পণ্ডিত জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের কাছে "বৃহস্পতি ও রায়মুকুট এই দুই উপাধি" পাননি। জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সমসাময়িক একজন পণ্ডিতের নামই ("উপাধি" নয়) ছিল বৃহস্পতি এবং তিনি রাজার কাছে "রায়মুকুট" উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এই বইয়ের পরিশিষ্ট 'ঙ'-তে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, যে রাজা বৃহস্পতিকে "রায়মুকুট" উপাধি দেন, তিনি জলালুদ্দীন নন, রুকনুদ্দীন বারবক শাহ।

(৬) মুল্লা তকিয়ার 'বয়াজে' যে কেদার রায়ের উল্লেখ আছে এবং বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দণ্ডবিবেকে' যে কেদার রায়ের উল্লেখ আছে, তাঁরা যে অভিন্ন, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭-৯৯ এবং কৃত্তিবাস পরিচয়, পৃঃ ৪০-৪৭ দ্রষ্টব্য)। ডঃ শহীদুল্লাহ্ কিন্তু এঁদের ভিন্ন লোক বলে মনে করেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

"একজন রাজসভাসদ কেদার রায় সম্বন্ধে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, 'তাঁহার (ধীরসিংহের) রাজ্যকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবেন্দ্র

বা ভৈরবসিংহ গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ভৈরবেন্দ্রের পরামর্শে গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি কেদার রায় মিথিলা রাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।' ('বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় ভাগ, ২০২ পৃঃ)।

"ধীরসিংহের রাজত্বকালে দুইটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। একটি লং সং ৩২১ অব্দের কার্তিকী পূর্ণিমায় আর একটি লং সং ৩২৭ অব্দে লিখিত (J. B. O. R. S. Vol. X, p. 47)। প্রথমোক্ত তারিখ হইতে পরলোকগত মনোমোহন চক্রবর্তী ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখ স্থির করিয়াছেন। ইহাতে শেষোক্ত তারিখ হইতে ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে (J. A. S. B. 1915, XI, p. 425)। ধীরসিংহের পিতা নরসিংহদেবের একটি শিলালিপির তারিখ শরাশ্বমদন। ইহা হইতে কে. পি. জয়স্বল ১৩৫৭ শক (১৪৩৫ খ্রীঃ) নির্ণয় করেন (J. B. O. R. S., Vol. XX, pp. 18-19)। মনে করা যাইতে পারে যে, কেদার রায় ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতে গৌড়েশ্বরের সভাসদ্ ছিলেন। ······বারবক্ শাহের সময়ের কেদার রায় পূর্বোক্ত কেদার রায় হইতে ভিন্ন হওয়াই সম্ভব। এক মুসলমান বাদশাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিন্দুকে অন্য মুসলমান বাদশাহ নায়েব নিযুক্ত করিবেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।"

এখানে মাত্র দুটি কথা বলবার আছে। গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি কেদার রায় যে ভৈরবেন্দ্রের পরামর্শে মিথিলা-রাজের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, একথা ডঃ শহীদুল্লাহ্ পেয়েছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০২ থেকে। কিন্তু ডঃ শহীদুল্লাহ্ রাখালদাসের যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, তার কী প্রমাণ রাখালদাস দিয়েছেন, তা তিনি লক্ষ্য করেননি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ২০২ পৃষ্ঠারই ৬৫ নং পাদটীকায় তাঁর উক্তির প্রমাণে নিদর্শনী দিয়েছেন "দণ্ডবিবেক (এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি) পৃঃ ১ শ্লোক ৪।" 'দণ্ডবিবেকে'র এই ৪ নং শ্লোক হচ্ছে সেই শ্লোকটি, যা আমরা এই বইয়ের ২য় খণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছি। এখানে শ্লোকটি আবার উদ্ধৃত করছি,

যঃ শ্রীহুসেনমপনীতসমস্তসেন-
মাত্মীয়সৈনিকনিবাত্মমতে নিযুংক্তে।
গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমপ্রতিপ্রতাপঃ (?)
কেদাররায়মবগচ্ছতি দারতুল্যম্॥

(আগেই বলা হয়েছে, ছাপা বইয়ে 'শ্রীহুসেন'-এর জায়গায় 'শ্রীকুসেন' পাঠ মেলে।)

এখানে ভৈরবেন্দ্রের পরামর্শে কেদার রায়ের মিথিলা-রাজের পক্ষ অবলম্বন করার কোন কথা নেই, অতএব এ সমস্ত কথা যে রাখালদাসের কল্পনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং এর উপর নির্ভর করে ডঃ শহীদুল্লাহ্ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, তার কোন গুরুত্ব নেই। 'দণ্ডবিবেকে' উল্লিখিত কেদার রায়কেই যে বারবক শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিহুতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত, নরসিংহের শিলালিপির তারিখ "শরাশ্বমদনঃ" শকাব্দ। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" নিয়ম অনুসরণ করে এর থেকে ১৩৭৫ শকাব্দ (১৪৫৩-৫৪ খ্রীঃ) পাওয়া যায়। কে. পি. জয়সোয়াল "শরাশ্বমদনঃ" র একাংশে অঙ্কের দক্ষিণা গতি এবং অপরাংশে বামা গতি অনুসরণ করে এর থেকে ১৩৫৭ শক (১৪৩৫-৩৬ খ্রীঃ) পেয়েছিলেন; কিন্তু জয়সোয়ালের এই উদ্ভট গণনা কখনও প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়নি। অথচ ডঃ শহীদুল্লাহ্ এরই উপর নির্ভর করেছেন!

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ধীরসিংহের রাজত্বকালের "লিপি" সম্বন্ধে মনোমোহন চক্রবর্তীর যে "তারিখ স্থির" করার কথা ডঃ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন, তারও এখন আর কোন মূল্য নেই। "লং সং" অর্থাৎ "লক্ষণসেন সংবৎ" সম্বন্ধে বর্তমানে অজস্র নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়াতে এসম্বন্ধে পূর্ববর্তী গবেষকদের সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমি 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছি, "মিথিলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের ল. সং প্রচলিত ছিল এবং খৃষ্টাব্দের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ১০৮০ বছর থেকে সুরু করে ১১২৯ বছর পর্যন্ত হত।"

(৭) ডঃ শহীদুল্লাহ্ "নারায়ণের সময় বিচার" করতে গিয়ে লিখেছেন, "ভরত মল্লিক তাঁহার পুস্তকে নারায়ণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।...ভরত মল্লিক যে জালালুদ্দীনের সভাসদ্ ছিলেন, তাহা সর্ববাদীসম্মত। সুতরাং নারায়ণেরও জালালুদ্দীনের সভাসদ্ হওয়া সম্ভব।"

কিন্তু ভরত মল্লিক যে জলালুদ্দীনের সভাসদ ছিলেন, একথা মোটেই সর্ববাদিসম্মত নয়, ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র আগে একথা কেউই বলেন নি। উপরে দেখানো হয়েছে, ভরত মল্লিক জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের প্রায় আড়াইশো বছর পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং নারায়ণের জলালুদ্দীনের সভাসদ হবার কথাই ওঠে না।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ তাঁর প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমার মত গ্রহণ না করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে কৃত্তিবাস জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন, সেগুলি আমরা খণ্ডন করলাম। সুতরাং ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত যে সমর্থন করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য।

ঐ প্রবন্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ্ অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, এখানে সেগুলিরও সংক্ষেপে বিচার করা যেতে পারে। যেমন, তিনি লিখেছেন যে মালাধর বসু ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা শেষ করেছিলেন এবং তিনি নিশ্চয়ই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনার জন্য "গুণরাজ খান" উপাধি লাভ করেছিলেন, অতএব ঐ উপাধি শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের দেওয়া, যিনি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতান ছিলেন। কিন্তু মালাধর বসু রাজসরকারে চাকরী করার জন্য অথবা অন্য বিষয়ে কবিত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্য "গুণরাজ খান" উপাধি পেতে পারেন, কিংবা বিদ্যোৎসাহী সুলতান বারবক শাহ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর প্রথম অংশ শুনেই তাঁকে ঐ উপাধি দিতে পারেন। মালাধর ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচনা সুরু করেছিলেন, কাব্যের প্রথম থেকেই তিনি 'গুণরাজ খান' নামে ভণিতা দিয়েছিলেন এবং বারবক শাহ ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯ দ্রষ্টব্য), তার পরেও থাকতে পারেন। সুতরাং বারবক শাহই যে মালাধরকে "গুণরাজ খান" উপাধি দিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তারপর, 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' বইয়ে (পৃঃ ২৬-২৭) আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি যে কৃত্তিবাস গুরুর আদেশে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রদত্ত পাঠের উপর নির্ভর করে স্থির করেছেন যে কৃত্তিবাস রাজার আদেশে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে আত্মকাহিনীর এই পাঠ পাঠিয়েছিলেন হারাধন দত্ত, তিনি যে পুঁথিতে এই পাঠ পেয়েছিলেন সেটি তিনি ছাড়া আর কেউ দর্শন করেন নি। পক্ষান্তরে ডঃ ভট্টশালী আবিষ্কৃত কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর পুঁথি অনেকেই দেখেছেন, তার ফটোও ছাপা হয়েছে; ঐ পুঁথিতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনা-প্রসঙ্গে গুরুর কথা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু তাতে রাজাজ্ঞার কোন কথা নেই। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজার আজ্ঞায় রামায়ণ লেখেন নি, গুরুর আজ্ঞায় লিখেছিলেন বলে আমরা এখনও মনে করি।

কৃত্তিবাসকে যে গুরু রামায়ণ-রচনায় আদেশ দিতে পারেন না, তা দেখাবার জন্য ডঃ শহীদুল্লাহ্ প্রমাণস্বরূপ

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

এই সংস্কৃত শ্লোকটি এবং

"কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁসে
এই তিন সর্ব্বনেশে"

এই বাংলা প্রবাদটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকটি কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়নি এবং বাংলা প্রবাদটির ভাষা নিতান্তই আধুনিক। অতএব এগুলিকে কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বলে মনে করার কোন কারণ নেই। সুতরাং এই শ্লোক ও প্রবাদ কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনা-প্রসঙ্গের উপর কোন আলোক পাত করে না।

এখন, ভারতবর্ষের ৪৮শ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্যের "কবি কৃত্তিবাসের কাল" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে কুলজীগ্রন্থের উপরে খুব বেশী নির্ভর করেছেন। কুলজীগ্রন্থগুলির সাক্ষ্যের মূল্য কতখানি, সে সম্বন্ধে আমরা ডঃ শহীদুল্লাহ্-র মতের বিচার করার সময় মন্তব্য করেছি। যাহোক, অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের মধ্যে এমন কতকগুলি উক্তি আমাদের চোখে পড়েছে, যেগুলি নির্ভুল নয়। নীচে সেগুলির উল্লেখ করে তাদের সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করলাম।

(১) প্রমোদবাবু লিখেছেন, "আমরা যতদূর জানি তাহাতে দেবীবর ঘটক ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে মেলবন্ধন করিয়াছিলেন।"

কিন্তু বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত 'কুলকারিকা'য় লেখা আছে দেবীবর ঘটক ১৪০২ শকে বা ১৪৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে মেলবন্ধন করেছিলেন। এই তারিখই বহুল-প্রচারিত এবং নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কুলজী-শাস্ত্রবিশারদরা এই তারিখকেই যথার্থ বলে স্বীকার করেছিলেন। আমাদের অবশ্য এই তারিখের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রবল সংশয় আছে। যাহোক্, ১৪০৭ শকাব্দে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেছিলেন, একথা কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না।

(২) প্রমোদবাবু লিখেছেন, "আমরা মনে করি 'পূর্ণ' পাঠই (অর্থাৎ

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস") অবিকৃত এবং অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের গণনানুসারে ১৪৩২ খৃঃর ২৯শে মাঘ (ফেব্রুয়ারী) মাসে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন।"

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য, ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীপঞ্চমী ও রবিবারের যোগাযোগ হয়নি। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গণনায ভুল কবেছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর এই ভুল স্বীকার করে লিখেছিলেন, "এই শকে (১৩৫৪ শক অর্থাৎ ১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ) মাঘ শুক্ল চতুর্থী রবিবার ২৮ দং। অতএব সে দিন সরস্বতী-পূজা হয় নাই, প্রকৃত শ্রীপঞ্চমীও হয় নাই।" (সা. প. প., ১৩৪০, পৃঃ ১৩)

দ্বিতীয় বক্তব্য, "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী"র পরে "পুণ্য মাঘ মাস" হবে কি "পূর্ণ মাঘ মাস" হবে, তা নিয়ে এখন আর বিতর্কের কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কাবণ প্রাচীন পুঁথিতে লিপিকররা যে যত্রতত্র বিভিন্ন অক্ষরের মাথায় "রেফ্" চিহ্নের অনুরূপ টান দিত, তার বহু নিদর্শন পাওয়া যায় আর ডঃ ভট্টশালী আবিষ্কৃত পুঁথিতে স্পষ্টভাবে "পুণ্য মাঘ মাস"ই লেখা আছে।

তৃতীয় বক্তব্য, কৃত্তিবাসের জন্মসাল নির্ণয়প্রসঙ্গে "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য (বা পূর্ণ) মাঘ মাস" চরণটির উপর একেবারেই নির্ভর করা যায় না। তার কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমি যা লিখেছি তা উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে।

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে বাল্মীকির জন্মতিথি, দশরথের জন্মতিথি, রামচন্দ্রের জন্মতিথি তিনটিই 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস' বলে লেখা আছে। আত্মকাহিনী অনুসারে এটি কৃত্তিবাসের জন্মতিথি। কিন্তু উড়িষ্যার রামায়ণ-রচয়িতা সারলা দাসও নিজের, বাল্মীকির, দশরথের ও রামচন্দ্রের জন্মতিথি হিসাবে একটিমাত্র তিথির উল্লেখ করেছেন। পূর্ব-ভারতের প্রাচীন রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে সম্ভবতঃ এরকম একটি সাধারণ প্রথার প্রচলন ছিল।"

(৩) প্রমোদবাবু লিখেছেন, "কৃত্তিবাস-লিখিত গৌড়েশ্বর এমন একব্যক্তি যিনি হিন্দুধর্মকে অটুট রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং তাহা ব্রহ্মণ্য ধর্মের মধ্য দিয়াই করিতে সমুৎসুক।"

কিসের থেকে প্রমোদবাবু এই সিদ্ধান্ত করেছেন জানিনা। যদি ধরে নেওয়া যায়, গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিয়েছিলেন, তাতেও

এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় না। কারণ রামায়ণ যেমন হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ, মহাভারতও তেমনি। অথচ প্রথম যিনি একজন হিন্দু কবিকে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি হিন্দু নন, মুসলমান রাজপুরুষ পরাগল খান।

(৪) প্রমোদবাবু লিখেছেন, "বলাবাহুল্য যে সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় এবং উৎকল লইয়াই পঞ্চগৌড়।"

প্রমোদবাবু স্কন্দপুরাণের উপর নির্ভর করে এই উক্তি করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা যে 'পঞ্চগৌড়' অর্থে কেবলমাত্র বাংলাদেশ বোঝাতেন, তার প্রমাণ তাঁদের লেখা থেকে দিচ্ছি।

(ক) শ্রীযুক্ত হুসন জগতভূষণ সোই ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশরাজ খান॥

(খ) সাহ হুসেন অনুমানে পঞ্চগৌড়েশ্বর জানে
চিরজীবী হউ পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

(গ) সে যে নশিরা সাহ সে জানে যারে হানল মদনবাণে
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চগৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

হোসেন শাহ ও "নশিরা" শাহ (নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ) কখনও সারস্বত, কান্যকুব্জ এবং উৎকলের স্থায়ী অধিপতি হন নি। তেমনি কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বরও হন নি। অধ্যাপক ভট্টাচার্য "পঞ্চগৌড়" শব্দকে সমাজবাচক বলে ধরেছেন এবং তদনুসারে কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর "সমাজের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজের ধারক ছিলেন" বলে স্থির করেছেন। কিন্তু "পঞ্চগৌড়েশ্বর" হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহ যখন "ব্রাহ্মণ সমাজের ধারক" ছিলেন না, তখন কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বরকে "ব্রাহ্মণ সমাজের ধারক" বলে কল্পনা করব কোন্ যুক্তিতে?

(৫) "উড়িষ্যার গজপতি সম্রাট কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-৬৭ খৃঃ) গৌড়পতি উপাধি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বকালের উনবিংশ অঙ্কে অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে তিনি গৌড় আক্রমণ করেন এবং গৌড়ের 'মালিকা পারিসা' বা সুলতানকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সিংহাসন কিছুদিনের জন্য দখল করেন।"

এই উক্তির প্রথম বাক্যটি বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশ প্রমোদবাবুর নিছক কল্পনা। কপিলেন্দ্রদেব কোন দিনই বাংলার সুলতানের সিংহাসন দখল করেন নি।

বাংলার দক্ষিণ প্রান্তের কিছু অঞ্চল হয়ত তিনি সাময়িকভাবে অধিকার করেছিলেন, এর বেশী কিছুই করতে পারেন নি। কপিলেন্দ্রদেব "গৌড়েশ্বর" উপাধি নিয়েছিলেন, কিন্তু এই উপাধি রাজাদের "সসাগরা বিশ্বের নাথ" উপাধির মতই শূন্যগর্ভ।

(৬) প্রমোদবাবু লিখেছেন, "এই কপিলেন্দ্রদেবেরই পুত্রের নাম প্রতাপরুদ্র, যিনি চৈতন্য দেবের পদাশ্রিত হইয়াছিলেন।"

কিন্তু প্রতাপরুদ্র কপিলেন্দ্রদেবের পুত্র নন, পৌত্র।

(৭) প্রমোদবাবু লিখেছেন, "সুলতান নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহের সহিত কপিলেন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল ১৪৫০-৫১ খৃঃ তে।"

ঐ সুলতানের নাম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ—"মহম্মদ শাহ" নয়। যাহোক্, কপিলেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়তো হয়েছিল, যদিও এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কপিলেন্দ্রদেবের শিলালিপিতে উল্লিখিত "মালিকা পারিসা" বিজয়নগরের রাজা মল্লিকার্জুন। কপিলেন্দ্র ও নাসিরুদ্দীনের যুদ্ধের যে তারিখ প্রমোদবাবু দিয়েছেন, তা কাল্পনিক। কপিলেন্দ্রদেবের উনবিংশ অঙ্কের শিলালিপিতে "মালিকা পারিসা"-র সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর বিজয় লাভের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ সংঘর্ষ যে ঐ বছরেই ঘটেছিল, তা বলবার কোন কারণ নেই।

(১১) প্রমোদবাবু লিখেছেন, "রামায়ণ রচয়িতার যে যৌবন অতিক্রম হয় নাই তাহা বোধহয় তাঁহার রচনা বিশ্লেষণে পাওয়া যাইবে।"

কিন্তু কৃত্তিবাসের রচনার মূল রূপ পাওয়া যাচ্ছে না, যে প্রক্ষিপ্ত সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে, তার থেকে রচয়িতার বয়স সম্বন্ধে কোন কিছু অনুমান করবার কোন উপায়ই নেই।

অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য আমার সম্বন্ধে তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, সে তিনটি অভিযোগ উদ্ধৃত করে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি,

(১) "তিনি কবির আত্ম-পরিচয়ের 'পুণ্যমাঘ মাস' পাঠের 'পূর্ণ মাঘ মাস' পাঠ লইয়াছেন। অথচ এ বিষয়ে কোনও আলোচনাই করেন নাই।"

এখানে বোধহয় ছাপার ভুল হয়েছে। আসলে আমি "পুণ্য মাঘ মাস" পাঠ নিয়েছি। এ সম্বন্ধে কোন আলোচনার প্রয়োজন আগে বোধ করিনি। যাহোক্, উপরে এ নিয়ে আমি আলোচনা করেছি।

(২) অতঃপর প্রমোদবাবু আমার সম্বন্ধে লিখেছেন, " 'পঞ্চগৌড়' শব্দটি লইয়াও তিনি কোনও আলোচনা করেন নাই।"

নিষ্প্রয়োজনবোধেই করিনি। যাহোক্, উপরে আমি এই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করেছি।

(৩) এরপর তিনি আমার সম্বন্ধে লিখেছেন, "কবির আত্মপরিচয়ের :—

'গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥'

এই শ্লোকটির কি অর্থ হইবে ইহা লইয়াও কোনও আলোচনা করেন নাই।"

এই শ্লোকটির অর্থ—'(অন্যতম রাজসভাসদ) গন্ধর্ব রায় বসে আছেন; তিনি গন্ধর্বের মত রূপবান (অথবা সঙ্গীতজ্ঞ); তাঁর অপার গৌরব রাজসভায় পূজিত।' কিন্তু এর সঙ্গে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকালের কী সম্পর্ক, তা ঠিক বুঝলাম না।

সবশেষে অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য আমার সম্বন্ধে লিখেছেন,

"ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে তাঁহার দৃষ্টি সব সময় উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তেই নিবদ্ধ। দক্ষিণে ফিরিয়াও চাহেন নাই।

"অথচ তিনি গৌড়েশ্বর বলিতে বারবক শাহকে বুঝাইবে ইহাই স্থির করিয়াছেন।

"আমাদের মনে হয় কৃত্তিবাসের 'আত্ম-পরিচয়' যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন এবং তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মণের আচার এবং গৌড়পতির সহিত কবির ভাব বিনিময়ের বৃত্তান্তটি অনুধাবন করিবেন তাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন না।"

এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় "দক্ষিণে ফিরিয়া" চাওয়া অর্থাৎ উড়িষ্যার রাজাদের প্রসঙ্গ অবতারণ করার কোন সার্থকতা আমি আগে দেখি নি, এখনও দেখি না। কপিলেন্দ্রদেব কেবলমাত্র "গৌড়েশ্বর" উপাধি নিয়েছিলেন, সত্যিকার গৌড়েশ্বর কখনও হননি। বাংলাদেশে কেউ তাঁকে "গৌড়েশ্বর" বলে স্বীকার করেছিল, এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই তাঁর সভাতে কৃত্তিবাস গিয়েছিলেন, একথা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখতে পাই না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রন্থে আমি উড়িষ্যার রাজাদের সম্বন্ধে অনেক কথা এবং বাংলার সুলতানদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্যের সর্বশেষ মন্তব্য সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে, সে যুগের বাঙালী ব্রাহ্মণদের আচার সম্বন্ধে আমরা

যেটুকু তথ্য পেয়েছি, তাতে মুসলমান সুলতানদের কাছে সংবর্ধনা নিতে তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। বৃহস্পতি মিশ্র তাঁর 'পদচন্দ্রিকা'য় নিজেকে "কুলীনাগ্রণী" বলেছেন, কিন্তু তিনি মুসলমান গৌড়েশ্বরের কাছে 'রায়মুকুট' ও 'পণ্ডিতসার্বভৌম' উপাধি নিতে এবং সে কথা সগর্বে লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। রূপ-সনাতনও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন অথচ হোসেন শাহের সরকারে চাকরী করতেন। কিন্তু তাঁরাই আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে ভাগবতের বিচার করতেন। অতএব কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন আপত্তি অন্তত এদিক দিয়ে করা চলে না।

ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় (১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৯৫-৯৯) 'কৃত্তিবাস-পরিচয়'-এর যে সমালোচনা করেছেন, তাতে তিনি কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সংক্রান্ত আমার মূল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নি, বরং "কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন তিনি যদি রুকনুদ্দিন বারবক শাহই হন তাহা হইলেও ক্ষতি নাই" লিখেছেন। কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, মাত্র সেইটুকু জানাই বিজনবাবুর পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয়নি, তিনি কৃত্তিবাসের জন্ম ও মৃত্যুর সময় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় তিনি কৃতকার্য হয়েছেন বলে আমরা মনে করতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে কারও পক্ষেই এই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ কৃত্তিবাসের জন্মের সময় নির্ধারণ করার কোন উপকরণই মেলে না। "আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস" থেকে যে কোন সুবিধা হয় না, তা একটু আগেই দেখিয়েছি। কৃত্তিবাসের মৃত্যুর সময় কোন প্রামাণিক সূত্রেই উল্লিখিত হয়নি।

ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "আচার্য যোগেশচন্দ্র (রায় বিদ্যানিধি) 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস' ধরিয়া যে গণনা করিয়াছেন তাহাতে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দকে কৃত্তিবাসের জন্ম বৎসর ধরা হইয়াছে। এই জন্ম-বৎসরকে খণ্ডিত করার মত কোনো প্রমাণ তো আপাতত দেখা যাইতেছে না। সুখময়-বাবুও সেরকম কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত করেন নাই।" কিন্তু আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কিসের ভিত্তিতে গণনা করে "১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ"কে ("১৩৯৮" নয়) কৃত্তিবাসের জন্ম-বৎসর বলে ধরেছিলেন, তা ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ভেবে দেখেন নি। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পরামর্শ অনুযায়ী আচার্য যোগেশচন্দ্র এই গণনা করেছিলেন, এই গণনা করার সময় ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কৃত্তিবাস রাজা গণেশের

সভায় গিয়েছিলেন এবং সেই সময়ে তাঁর বয়স ১১।১২ বছরের বেশী ছিল না, কারণ আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের পাঠসমাপনের প্রসঙ্গের ঠিক পরেই রাজদর্শনের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। রাজা গণেশ ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন, তার ১১।১২ বছর আগে কোন্ বছরে "আদিত্যবার" ও "শ্রীপঞ্চমী"র যোগাযোগ হয়েছিল, তা'ই আচার্য যোগেশচন্দ্র গণনা করলেন এবং গণনা করে তিনি জানতে পারলেন যে ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমী তিথি রবিবারে পড়েছিল। এরই থেকে আচার্য যোগেশচন্দ্র ধরেছিলেন যে কৃত্তিবাস ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর গণনা নিছক অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সভায় যান নি বলে প্রমাণিত হলে এই গণনা একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' বইয়ে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সভায় যান নি এবং রাজা গণেশের মৃত্যুর প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে যিনি রাজত্ব করেছিলেন, সেই রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় তিনি গিয়েছিলেন। আমার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্ত স্বতই খণ্ডিত হয়ে যায়। সেজন্য তাকে পৃথকভাবে খণ্ডন করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনি। প্রসঙ্গত বলা চলে, "আদিত্যবার" ও "শ্রীপঞ্চমী"র যোগাযোগ কয়েক বছর অন্তর অন্তর ঘটে সুতরাং জ্যোতিষ-গণনা করে যে কোন সময়েই এমন এক বা একাধিক বছর খুঁজে বার করা সম্ভব, যার মধ্যে এই দুইয়ের যোগাযোগ ঘটেছিল। এই জাতীয় গণনার কোন মূল্যই নেই।

ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কৃত্তিবাসের জন্মসময়কে মোটামুটি ১৪৬০ হইতে ১৪৯০ খ্রীঃ অঃ এই কাল পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি"—এই উক্তির অনেক সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস যে ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রীঃর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, একথা বলা ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয় না। আসলে ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে প্রকাশিত আমার সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছেন। ঐ গ্রন্থে আমি লিখেছিলাম, "কৃত্তিবাস ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় জীবিত ছিলেন"। সুতরাং ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় "কৃত্তিবাসের জন্মসময়" বলতে "কৃত্তিবাসের জীবৎকাল" বুঝিয়েছেন বলে মনে হয়।

ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য লিখেছেন, "১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ প্রকাশিত

হয়।" তারও আগে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র প্রথম সংস্করণে (পৃঃ ৭১-৭৫) যে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, এ খবর ডক্টর ভট্টাচার্য রাখেন নি। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণের প্রথম প্রকাশের সময় নিয়ে এই ভুল ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী করেছেন, তাঁর দেখাদেখি ডক্টর সুকুমার সেন করেছেন এবং তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকে করেছেন। এখন ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্যও এই ভুল করলেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র যে কোন সংস্করণ দেখলেই কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর ঐ বইয়ের প্রথম সংস্করণে প্রকাশের কথা তাঁরা জানতে পারতেন। কষ্ট করে একবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়ে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র প্রথম সংস্করণটি স্বচক্ষে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন, তার মধ্যে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী রয়েছে। আমি আমার বিভিন্ন বইয়ে ইতিপূর্বেই এ সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি।

ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' (পৃঃ ৩২) থেকে "কৃত্তিবাস ১৪০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলতে হবে" উক্তিটি উদ্ধৃত করে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে এখানে "খ্রীষ্টাব্দের" ছাপার ভুল—আসলে "শকাব্দের" হবে। 'কৃত্তিবাস-পরিচয়'-এর শেষে এক "সংশোধন ও সংযোজন" যোগ করে তার মধ্যে (পৃঃ ৭১) আমি ঐ ভুলটি শুধরে নিয়েছিলাম।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম প্রকাশের সময় (১৮৯৬ খ্রীঃ) থেকে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যে বিতর্ক চলে আসছিল, বর্তমানে তা অবসানের পথে। এসম্বন্ধে একমাত্র ডক্টর সুকুমার সেনের মনোভাব খানিকটা রহস্যময় থেকে গিয়েছে। তাঁর বিভিন্ন বই ও তাদের বিভিন্ন সংস্করণ পড়ার পরে আমি বুঝতে পারি নি, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃত অভিমত কী। বিভিন্ন স্থানে তিনি এসম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, সেগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি।

(১) "পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আমরা একজন বড় কবিকে পাইতেছি। ইনি কৃত্তিবাস ওঝা।...

"...কৃত্তিবাস রাজা গণেশের দ্বারাই আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

"পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন...।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ১ম সংস্করণ, ১৯৩৯, পৃঃ ৮-১০)

(২) "পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা কংস…কৃত্তিবাস রাজা কংস বা গণেশের সভায় বিশেষ সংবর্দ্ধনা লাভ করেন এবং তাঁহারই আজ্ঞায় রামায়ণ কাব্য রচনা করেন, এই অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

"…কৃত্তিবাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

"কৃত্তিবাসের কাব্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আজ অবধি ইহা সমগ্র বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতাকে তাহাদের সুখে দুঃখে, উত্থানে পতনে, ভোগে ত্যাগে, কর্ম্মে অবসরে—সর্ব্ববিধ অবস্থায় সমান আনন্দ যোগাইয়া আসিতেছে।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ১৯৪০, পৃঃ ৭১-৮৮)

এখানে একই বইয়ে ডঃ সেন কৃত্তিবাসের তিন রকম সময় নির্দেশ করেছেন।

(৩) "পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৪৫, পৃঃ ৭)

(৪) "কৃত্তিবাসকে পাই পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে।

"…কৃত্তিবাস যে ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন তাহা প্রতিপন্ন হয়।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৪৮, পৃঃ ৯৮)

(৫) "পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ··।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৫ম সংস্করণ, ১৯৫৬, পৃঃ ৮)

(৬) "(কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত) রাজসভার বর্ণনার ও সদস্যদের নামের যদি কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে তবে ইহা কোন হিন্দু রাজা-জমিদারের, এবং হোসেন শাহার রাজ্যলাভের [১৪৯৩-৯৪ খ্রীঃ] অনতিদূর কালের।…আরও বেশী সম্ভব, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের সন্ধিকালে [১৫০০ খ্রীঃ] কোন সময়ে উত্তরবঙ্গের কোন রাজা-জমিদারের সংবর্ধনা পাইয়াছিলেন।

"…এখানে অনুমান করিতে ইচ্ছা যায় যে সনাতন-রূপ বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে পর [১৫১৪-১৫ খ্রীঃ] হোসেন শাহার সভার কোন কোন সদস্য গৌড় পরিত্যাগ করিয়া উত্তরে চলিয়া যান। সেখানে কোন রাজা-জমিদারের (কংসনারায়ণের?) সভায় হয়ত কৃত্তিবাস ইহাদের দেখিয়াছিলেন।"

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ১১২-১১৪)

উদ্ধৃত অংশে ডঃ সেন যে ঘটনাগুলির উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সঠিক সময় আমি [ ] বন্ধনীর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে একই জায়গায় ডঃ সেন কৃত্তিবাসের রাজদর্শনের তিন রকম সময় নির্দেশ করেছেন।

(৭) "Krttivāsa belonged to the second half of the fifteenth century, and that he had come to the court of a Pathan Sultan who may well have been Ruknuddin Bārbak Shāh or Yūsūf Shāh or even Husain Shāh."

(History of Bengali Literature, Sahitya Akademi, 1960, p. 68)

একই লোক একই বিষয় সম্বন্ধে এত জায়গায় এতগুলি পরস্পরবিরোধী মত লিপিবদ্ধ করেছেন, এর থেকে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে তাঁর কোন সুনির্দিষ্ট অভিমত আছে কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় জাগে। তাছাড়া এসম্বন্ধে ডঃ সেনের গবেষণার প্রায় সবটাই বিশুদ্ধ অনুমান। যাহোক্, এসম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের সর্বশেষ মত পাওয়া যায় সাহিত্য আকাদেমী থেকে প্রকাশিত History of Bengali Literature বইয়ে। ঐ বই আমার 'কৃত্তিবাস পরিচয়'-এর পরে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে ডঃ সেন কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভাতে যেতে পারেন, এই সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়ে আংশিকভাবে কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করেছেন।

পরিশিষ্ট 'ঘ'

কবিরঞ্জন

এই বইয়ের ২য় খণ্ডের ২৭৮ পৃষ্ঠায় আমরা লিখেছি যে 'কবিরঞ্জন'-এর "প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন সিংহ। এঁর তিনটি উপাধি—কবিরঞ্জন, কবিশেখর ও বিদ্যাপতি। এই তিন ভণিতাতেই তিনি পদরচনা করতেন।" কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত গবেষক একমত নন। কারও কারও মতে 'গোপালবিজয়' কাব্যের রচয়িতা 'কবিশেখর' উপাধিধারী দৈবকীনন্দন সিংহ এবং পদকর্তা কবিশেখর পৃথক লোক। সেই রকম, অনেক গবেষকের মতে কবিশেখর ও কবিরঞ্জন ভিন্ন লোক, সুতরাং এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা দরকার বলে মনে করছি।

প্রথমে, দৈবকীনন্দন সিংহ যে পদকর্তা কবিশেখরের সঙ্গে অভিন্ন, তার প্রমাণ উল্লেখ করছি (এসম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম', পৃঃ ১৭০-১৭২ দ্রষ্টব্য)।

(১) পদকর্তা কবিশেখর—'শেখর' ও 'রায়শেখর' ভণিতাতেও পদ লিখতেন; 'গোপালবিজয়ে'ও 'কবিশেখর' ভণিতার সঙ্গে দু'এক জায়গায় 'শেখর' ও 'রায়শেখর' ভণিতা পাওয়া যায়।

(২) 'গোপালবিজয়ে'র ভণিতার সঙ্গে পদকর্তা কবিশেখরের রচনা 'দণ্ডাত্মিকা পদাবলী'র ভণিতার হুবহু মিল দেখা যায়। কবিশেখরের কোন কোন পদের অংশবিশেষের সঙ্গে 'গোপালবিজয়ে'র কোন কোন অংশের ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে।

(৩) রামগোপালদাস ও রসিকদাসের শাখানির্ণয়ে মাত্র একজন কবিশেখরেরই নাম আছে, তিনি রঘুনন্দনের শিষ্য পদকর্তা কবিশেখর। কিন্তু রামগোপালদাসের 'রসকল্পবল্লী'তে কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' কাব্য থেকে কতকাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। রামগোপালদাস পদকর্তা কবিশেখর ও 'গোপালবিজয়'-রচয়িতা কবিশেখরকে পৃথক লোক বলে জানলে 'শাখানির্ণয়ে' 'গোপালবিজয়'-রচয়িতার নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হত বলে বোধ হয়। তা না হওয়াতে মনে হয়, উভয় কবিশেখর অভিন্ন।

(৪) দুই কবিশেখরের সময়ও এক।

কবিশেখর ও কবিরঞ্জন যে অভিন্ন লোক, তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থেকে প্রমাণিত হয়।

(১) কবিশেখর ও কবিরঞ্জন উভয়েই রঘুনন্দনের শিষ্য এবং উভয়ের পদের রচনারীতি এক।

(২) রামগোপাল দাস কবিরঞ্জন সম্বন্ধে লিখেছেন, "ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি"। এর থেকে মনে হয়, কবিরঞ্জনের 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মিলন বর্ণনামূলক কয়েকটি পদ থেকেও বোঝা যায়, এই কবিরঞ্জন 'বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত হতেন (সা. প. প., ১৩৩৭, পৃঃ ৪০-৪৭ দ্রষ্টব্য)। কবিশেখরেরও 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল। কারণ লোচন তাঁর 'রাগতরঙ্গিণী'তে কবিশেখর-ভণিতাযুক্ত একটি পদ উদ্ধৃত করে তার নীচে লিখেছেন, "ইতি বিদ্যাপতেঃ"। ডঃ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন একই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত পরস্পরের পরিপূরক দুটি পদের একটিতে 'কবিশেখর' ভণিতা এবং অপরটিতে 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যায়" ('বিদ্যাপতি-শতক'-এর ভূমিকা,) পৃঃ ।৶০ দ্রষ্টব্য)।

(৩) রামগোপালদাস লিখেছেন যে কবিরঞ্জন 'রাজসেবী' ছিলেন। কবিশেখরও 'রাজসেবী' ছিলেন, কারণ তাঁর ভণিতা-সংবলিত পদে নসরৎ শাহের নাম আছে। 'বিদ্যাপতি' ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদেও হোসেন শাহ ও 'নসীরা শাহ' অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের নাম আছে।

(৪) উপরে 'রাগতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত 'কবিশেখর' ভণিতাযুক্ত যে পদটির আমরা উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন গ্রন্থে ও পুঁথিতে তার বিভিন্ন পাঠ পাওয়া যায়। কোন পাঠে 'কবিশেখর', কোন পাঠে 'কবিরঞ্জন', আবার কোন পাঠে 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যায়। নীচে পদটির কয়েকটি পাঠ উদ্ধৃত করলাম।

(ক) 'রাগতরঙ্গিণী'তে (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪-৪৫) এই পাঠ পাওয়া যায় (খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি'র ৯৩২ সংখ্যক পদেও এই পাঠ গৃহীত হয়েছে),

আনন লোহুঅ বচনে বোলএ হঁসি।
অমিঅ বরিস জনি সরদ পুনিমা সসি॥
অপরুব রূপ রমনিআঁ।
জাইতে দেখলি গজরাজ গমনিআঁ॥

কাজলে রঞ্জিত ধবল নয়ন বর।
ভ্রমর মিলল জনি অরুন কমল দল॥
ভান ভেল মেহি মাঁঝ খীনি ধনি।
কুচ সিরিফল ভরে ভাঁগি জাতি জনি॥
কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি।
রাএ নসরদ শাহ ভজলি কমলমুখি॥

(খ) সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবী সম্পাদিত 'কীর্তন-পদাবলী'তে (পৃঃ ১৫৯) এই পাঠ পাওয়া যায়,

নহুয়া-বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূনিম শশী॥
অপরূপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজগমনি ধনি॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥
কবিরঞ্জন ভণে অশেষ অনুমানি।
রাএ নসরৎ শাহ ভুলল কমলা বাণী॥

(গ) 'পদকল্পতরু'তে (পদসংখ্যা ১৯৭) পদটির এই পাঠ পাওয়া যায়,

নহুঙা বদনি ধনি বচন কহসি হসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিম শশী॥
অপরূপ রূপ রমণি-মণি।
যাইতে পেখলুঁ গজরাজগমনি ধনি॥
সিংহ জিনি মাঝা খিনি তনু অতি কমলিনি।
কুচ-ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জানি॥
কাজরে রঞ্জিত বনি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর-নাগর।
রাই-রূপ হেরি গর-গর অন্তর॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ নং পুথিতে পদটির আর একটি পাঠ

পাওয়া গিয়েছিল। এই পাঠ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি, তবে ডঃ শহীদুল্লাহ্ এর ভণিতাটি প্রকাশ করেছেন (সা. প. প. ১৩৬০, পৃঃ ৫০, পাদটীকা দ্রঃ)। সেটি এই,

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসীর মধুপ ভুলে কমল বাণী॥

একই পদের বিভিন্ন পাঠে 'কবিশেখর', 'কবিরঞ্জন' ও 'বিদ্যাপতি' ভণিতা পাওয়া যাওয়াতে প্রমাণ হচ্ছে যে এই তিনটি নাম একই লোকের। এই "'বিদ্যাপতি' মৈথিল হতে পারেন না, কারণ শেষ তিনটি পাঠে বাংলা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অনেক গবেষক একটি পদের বিভিন্ন পাঠ পেলে সব সময়েই মনে করেন যে গায়েন ও লিপিকরদের হস্তক্ষেপের ফলে এই পাঠের বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে ; কিন্তু কবি নিজেও যে বিভিন্ন সময়ে একই পদকে বিভিন্ন রূপ দিতে পারেন, তা এঁদের মাথায় ঢোকে না। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তিনি তাঁর অনেক গানের বারবার পরিবর্তন সাধন করে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছেন ; মধ্যযুগে লেখা ছাপা হত না বলে কবিদের একটা পদের মূল রূপকে সারাজীবন একভাবে রাখবার সুযোগ ও অনুপ্রেরণা এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কবিশেখর বা কবিরঞ্জন বা বাঙালী বিদ্যাপতি একটি পদকেই নানা সময় নানা রূপ দিয়েছেন এবং এক একবার তাঁর এক একটি উপাধিকে ভণিতায় বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি যে সুলতানের পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন, তাঁকে তিনি দুটি পাঠে "রাএ নসরৎ (নসরদ) শাহ" বলেছেন এবং একটি পাঠে "সুলতান শাহ নসীর" বলেছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, এই সুলতান দিল্লী বা আর কোন জায়গার সুলতান নন, ইনি বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ)।

এই বইয়ের ২য় খণ্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় আমরা 'শেখ কবীর' ভণিতা-সংবলিত (ঐ পৃষ্ঠায় দু'জায়গায় ভুলক্রমে "শেখ কবীর"-এর জায়গায় "কবির শেখ" ছাপা হয়েছে) যে পদটির উল্লেখ করেছি, সেটি আসলে উপরে উক্ত পদটিরই আর একটি পাঠ। অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য' (পদসংখ্যা ২৪) থেকে ঐ পাঠটি আমরা উদ্ধৃত করলাম,

অকি অপরূপ রূপের রমণী ধনি ধনি
চলিতে পেখল গজ-রাজ-গমনি ধনি ধনি।

কাজলে রঞ্জিত ধনি ধবল নয়ন ভালে
ভোমরা ভুলল বিমল কমল দলে ॥
গুমান না কর ধনি ক্ষীণ অতি মাঝাখানি
কুচগিরি ফলের ভরে ভাঙ্গি পড়িব যৌবনি ॥
সুন্দরী চান্দ মুখে বচন বোলসি হাসি
অমিয়া বরিখে যৈসে শারদ পূর্ণিমা শশী ॥
শেখ কবীরে ভণে অহি গুণ পামরে জানে
সুলতান নাসির সাহা ভুলিছে কমলবনে ॥

পূর্বোদ্ধৃত পাঠগুলির সঙ্গে এই পাঠের প্রায় সর্বত্রই মিল আছে, এবং চতুর্থ পাঠের ভণিতার সঙ্গে এই পাঠের ভণিতার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে এই পাঠটি স্বতন্ত্র পদ নয় অথবা 'শেখ কবীর' নামে স্বতন্ত্র একজন কবির লেখা নয়। যতদূর মনে হয়, এই পাঠের ভণিতায় প্রথমে 'কবিশেখর' নামই ছিল, পরে 'কবিশেখর' 'কবিরশেখ'-এ পরিবর্তিত হয়েছে এবং তা আবার পরে 'শেখ কবির (কবীর)'-এ পরিণত হয়েছে।

যাহোক, আমরা যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ ইতিপূর্বে দেখিয়েছি, তার থেকে অনায়াসেই বলা যায় যে দৈবকীনন্দন সিংহ, পদকর্তা কবিশেখর এবং কবিরঞ্জন একই লোক। ইনি 'শেখর', 'রায়শেখর' ও 'শেখর রায়' ভণিতাতেও পদ রচনা করতেন, শেষোক্ত দুই ভণিতা থেকে কেউ কেউ মনে করেছেন যে এঁর বংশ-পদবী ছিল 'রায়'। কিন্তু 'রায়' শব্দটি তখন পদবী হিসাবে ব্যবহৃত হত না; বংশমর্যাদার পরিচায়ক হিসাবে বা নিছক সম্মানবাচক বিশেষণ হিসাবে এটি তখনকার দিনে নামের সঙ্গে যুক্ত হত। বৃন্দাবনদাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দকে 'নিত্যানন্দ রায়' বলেছেন।

আর একটি কথা। এই 'কবিশেখর'-বিদ্যাপতির একটি পদের ভণিতায় 'সাহ হুসেন অনুমানে পঞ্চগৌড়েশ্বর জানে' এবং ঐ একই পদের পাঠান্তরের ভণিতায় 'সে যে নশিরা সাহ সে জানে যারে হানল মদনবাণে' লেখা আছে দেখতে পাওয়া যায় (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮ ও পৃঃ ৩৩১ দ্রষ্টব্য)।

'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র একটি প্রাচীন পুঁথিতে (লিপিকাল ১৬৮৬ শকাব্দ ও ১১৭১ সন অর্থাৎ ১৭৬৪-৬৫ খ্রীঃ) এই পদটির দুটি পাঠই পর পর উদ্ধৃত হয়েছে, প্রথম পাঠে 'সাহ হুসেন'-এর এবং দ্বিতীয় পাঠে 'নশিরা

সাহ'-র নাম-সংবলিত ভণিতা দেখা যায়। প্রথম পাঠটির আরম্ভ হয়েছে 'ধনি গো আজহু দেখলি বালা' দিয়ে এবং দ্বিতীয় পাঠটির আরম্ভ হয়েছে 'গোধূলি পেখলু বালা' দিয়ে। উভয় পাঠে চরণগুলির ভাষার দিক দিয়ে খুব সামান্য পার্থক্য আছে, কিন্তু দুই পাঠে চরণগুলির বিন্যাসের ক্রম ভিন্ন ধরণের (সাধনা, ১৩০০, পৃঃ ২৬৯-২৭৫ দ্রষ্টব্য)। এর থেকে মনে হয় আসল ব্যাপারটি এই। কবি পদটি হোসেন শাহের রাজত্বকালেই লিখেছিলেন এবং তখন তার ভণিতায় 'সাহ হুসেন অনুমানে' লিখেছিলেন; অতঃপর হোসেন শাহের পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি পদটির ভাষার ও চরণগুলির বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটান এবং ভণিতা থেকে হোসেন শাহের নাম তুলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন রাজার নাম বসিয়ে 'সে যে নশিরা সাহ সে জানে' লেখেন। শ্রীকর নন্দীও তাঁর মহাভারতে ঠিক এই ভাবেই যেখানে রাজা হিসাবে হোসেন শাহের নাম ছিল, সেখানে সুকৌশলে নসরৎ শাহের নাম বসিয়ে দিয়েছিলেন (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০-২৩১ দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট 'ঙ'

অতিরিক্ত টীকা ও সংশোধনী

প্রথম খণ্ড

পৃঃ ২৯/১ ছঃ ২০-২৪—ইব্‌ন্ বত্তুতা কর্তৃক উল্লিখিত "সোদকাওয়াঙ" যে 'সাতগাঁও'-এর সঙ্গে অভিন্ন একথা ইতিপূর্বে এইচ আর গিব, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদভূষণ রায় প্রভৃতি গবেষকেরা যুক্তিসহযোগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কর্নেল য়ুল, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, মেহ্‌দী হোসেন প্রভৃতি গবেষকেরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে 'সোদকাওয়াঙ' বলতে ইব্‌ন্ বত্তুতা 'চাটগাঁও'কে বুঝিয়েছেন। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি থেকে বলা যায় যে "সোদকাওয়াঙ" 'সাতগাঁও'-এর সঙ্গে অভিন্ন।

(১) সাতগাঁও যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারনির লেখা 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' থেকে জানা যায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬/১ দ্রঃ)। পক্ষান্তরে চাটগাঁও যে ফখরুদ্দীনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, একথা সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিহাবুদ্দীন তালিশের লেখা বিবরণেই প্রথম পাওয়া যায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯/১-৩০/১ দ্রঃ); ফখরুদ্দীনের মৃত্যুর তিনশো বছরেরও বেশী পরে শিহাবুদ্দীন তালিশ এ সম্বন্ধে কতখানি সঠিক সংবাদ দিতে পেরেছেন, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে; অবশ্য শিহাবুদ্দীনের উক্তি যে সত্য হওয়া সম্ভব, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখাবার চেষ্টা করেছি (১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০/১)। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন যখন সুলতান, সেই সময়েই তিনি চট্টগ্রাম প্রথম জয় করেন এবং শিহাবুদ্দীনের উক্তি সত্য হলে বলতে হবে, এর আগে চট্টগ্রামে কোনদিন মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ইব্‌ন্ বত্তুতা স্পষ্টই লিখেছেন যে ফখরুদ্দীন "raised a rebellion at Sudkāwān and in the rest of Bengal." (The Rehla of Ibn Baṭṭūṭa, Translated by Mahdi Husain, p. 237)। শিহাবুদ্দীন তালিশের উক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে ফখরুদ্দীন সুলতান হবার আগে চাটগাঁওয়ে বিদ্রোহ করতে পারেন না, আর শিহাবুদ্দীনের উক্তি অবিশ্বাস করলে চাটগাঁওয়ে ফখরুদ্দীনের অধিকার

সম্বন্ধেই কোন প্রমাণ থাকে না। সাতগাঁও মুহম্মদ তুঘলকের অধীন বাংলা রাজ্যের তিনটি বিভাগের অন্যতম ছিল বলে এখানে ফখরুদ্দীনের বিদ্রোহ করা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সাতগাঁওয়ে যে ফখরুদ্দীন সত্যই বিদ্রোহ করেছিলেন, তা জিয়াউদ্দীন বারনির লেখা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়।

(২) ইব্‌ন্ বত্তুতা 'সোদকাওয়াঙ' সম্বন্ধে লিখেছেন, "……in the vicinity of which the river Ganges where the Hindus make pilgrimage and the river Jūn (Jamuna) join together and whence they flow into the sea." (The Rehla of Ibn Battūta, Translated by Mahdi Husain, pp. 235-236)। তখন গঙ্গা (ভাগীরথী) নদী সাতগাঁওয়ের কাছ দিয়েই প্রবাহিত হত, এখনও হয়। চাটগাঁওয়ের ধারে-কাছে কোথাও গঙ্গানদী নেই। এই প্রমাণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাতগাঁওয়ের কাছে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সম্মিলিত হয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করা সম্বন্ধে ইব্‌ন্ বত্তুতা যা লিখেছেন, তার সম্পূর্ণ সমর্থন আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' (রচনাসমাপ্তিকাল ১৫৯৮ খ্রীঃ) থেকে পাওয়া যায়। আবুল ফজল গঙ্গা নদী সম্বন্ধে লিখেছেন,

"It is divided into three streams; one, the Sarsuti; the second the Jamna (Jamuna) and the third the Ganges, called collectively in the Hindi Language Tribeni, and held in high veneration. The third stream after spreading into a thousand channels, joins the sea an Sātgāon. The Sarsuti and the Jamna unite with it." (Ain-i-Akbari, Vol. II, Jarrett's translation, pp. 120-121)

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ইব্‌ন্ বত্তুতা কর্তৃক উল্লিখিত 'সোদকাওয়াঙ' চাটগাঁওয়ের সঙ্গে অভিন্ন (Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, pp. 145-149)। ডঃ ভট্টশালী ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণের ফরাসী অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহার করেছিলেন। ঐ অনুবাদে লেখা আছে, 'সোদকাওয়াঙে'র কাছে গঙ্গা ও যমুনা নদী "have united before falling into the sea." এই উক্তিটির উপর ডঃ ভট্টশালী নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু মেহ্‌দী হোসেন মূল আরবী থেকে ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণের যে ইংরেজী

অনুবাদ করেছেন, তাতে পাওয়া যায় 'সোদকাওয়াঙে'র কাছে গঙ্গা-যমুনা "join together and whence they flow into the sea." তারপর, ডঃ ভট্টশালী এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে সাতগাঁওয়ের কাছে গঙ্গা ও বর্তমানে ক্ষীণকায়া যমুনা মিলিত হয়নি, পৃথক হয়েছে এবং সাতগাঁওয়ের অদূরবর্তী ত্রিবেণী "যুক্তবেণী" নয় "মুক্তবেণী"; সুতরাং 'সোদকাওয়াঙ' সাতগাঁওয়ের সঙ্গে অভিন্ন নয়। কিন্তু 'আইন-ই-আকবরী' থেকে আমরা উপরে যে অংশ উদ্ধৃত করেছি, তার থেকে এই আপত্তি খণ্ডিত হয়। সাতগাঁওয়ের নিকটবর্তী যমুনা নদীর আয়তন ও অবস্থান এবং "যুক্তবেণী," "মুক্তবেণী" প্রভৃতি সম্বন্ধে ডঃ ভট্টশালী যা লিখেছেন, তা উনবিংশ ও বিংশ শতকের ব্যাপার; ইব্‌ন্ বত্তুতার আমলে, এমন কি আবুল ফজলের আমলেও অবস্থা অন্যরকম ছিল। ইব্‌ন্ বত্তুতা ও আবুল ফজলের উক্তি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, অন্ততপক্ষে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত গঙ্গা (ভাগীরথী) নদী এবং "যমুনা" নামে একটি নদী সাতগাঁওয়ের কাছেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হত। ডঃ ভট্টশালী দেখিয়েছেন যে রেনেলের মানচিত্র অনুসারে "Ganges" নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদ দক্ষিণে শাহাবাজপুরের ঠিক উপরে এবং চাটগাঁও থেকে ষাট মাইল উপরে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হত; ডঃ ভট্টশালীর মতে ইব্‌ন্ বত্তুতা গঙ্গা-যমুনার সম্মিলন বলতে গঙ্গা (Ganges) ও ব্রহ্মপুত্রের এই সম্মিলন বুঝিয়েছেন। কিন্তু রেনেল যাকে "Ganges" বলেছেন, তা আসলে পদ্মা নদী; চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গার মূল ধারা পদ্মা দিয়ে যেত না, ভাগীরথী দিয়ে যেত; পদ্মাকে ইংরেজরাই প্রথম "The Ganges" নামে অভিহিত করে। গঙ্গার মূল ধারা পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হবার পরেও সকলে ভাগীরথীকেই "গঙ্গা" বলে আসছে; এখনও সাধারণ লোকে তা'ই বলে। বাঙালী জনসাধারণ পদ্মাকে এখনও "গঙ্গা" বলে না; পদ্মা নদীতে কোনদিনই হিন্দুরা তীর্থ করতে যেত না বা যায় না। সুতরাং ইব্‌ন্ বত্তুতা কর্তৃক উল্লিখিত "গঙ্গা" নদী পদ্মা হতে পারে না। ইব্‌ন্ বত্তুতা যে 'ব্রহ্মপুত্র'কে 'যমুনা' বলেছেন, এই ধারণার স্বপক্ষে ডঃ ভট্টশালী ও অধ্যাপক মেহ্‌দী হোসেন প্রমুখ গবেষকদের অনুমান ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। আর পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থানও চট্টগ্রাম থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল; অথচ ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে 'সোদকাওয়াঙে'র কাছেই গঙ্গা-যমুনা মিলিত হত। যমুনা নামে আর একটি নদী (যেখান দিয়ে ১৭৮৭ খ্রীঃ থেকে মুক্ত

করে বর্তমান কাল অবধি ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা প্রবাহিত হচ্ছে) গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, কিন্তু এই মিলনের স্থান চাটগাঁও থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, তাই ইব্‌ন্ বত্তুতা এর কথা লিখেছেন বলে মনে করা যায় না। মেহ্‌দী হোসেন লিখেছেন যে 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত যমুনা নদী "is but a local stream, still existing as a canal," সুতরাং তা ইব্‌ন্ বত্তুতা কর্তৃক উল্লিখিত যমুনার সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। কিন্তু আবুল ফজল যদি "local stream" যমুনা নদীর উল্লেখ করতে পারেন, ইব্‌ন্ বত্তুতাও তা করতে পারেন। তাছাড়া ইব্‌ন্ বত্তুতা ও আবুল ফজল এই যমুনা নদীর উল্লেখ করায় মনে হয়, চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এই নদী এখনকার তুলনায় অনেক বড় ছিল।

(৩) ইব্‌ন্ বত্তুতা লিখেছেন যে 'সোদকাওয়াঙ' থেকে কামরু (কামরূপ) পর্বতমালায় যেতে তাঁর একমাস সময় লেগেছিল। সাতগাঁও থেকে কামরূপ যেতে একমাস লাগা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু চাটগাঁও থেকে কামরূপে যেতে অত দিন লাগার কথা নয়।

(৪) ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'সোদকাওয়াঙ' ফখরুদ্দীনের অন্যতম রাজধানী ছিল ; সাতগাঁওয়ের পক্ষে ফখরুদ্দীনের অন্যতম রাজধানী হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু নববিজিত চাটগাঁওতে ফখরুদ্দীন রাজধানী স্থাপন করতে পারেন বলে মনে হয় না।

এই সমস্ত বিষয় থেকে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে 'সোদকাওয়াঙ' বলতে ইব্‌ন্ বত্তুতা সাতগাঁওকেই বুঝিয়েছেন, চাটগাঁওকে বোঝান নি।

কেউ কেউ বলেন যে ইব্‌ন্ বত্তুতা 'সোদকাওয়াঙে'র নিকটবর্তী 'গঙ্গা' বলতে মেঘনা নদীকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। ইব্‌ন্ বত্তুতা তাঁর বাংলাদেশ সম্বন্ধীয় বিবরণীর শেষ দিকে মেঘনা নদীর উল্লেখ করেছেন এবং তাকে 'নহ্‌র্-উল্-অজ্‌রক্' (নীল নদী) বলেছেন। সুতরাং ইব্‌ন্ বত্তুতা মেঘনা নদীকে ভুল করে গঙ্গা বলতে পারেন না।

যাঁরা 'সোদকাওয়াঙ'-কে 'চাটগাঁও'-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন, তাঁদের প্রধান যুক্তি এই যে ইব্‌ন্ বত্তুতা 'সোদকাওয়াঙ'কে "মহাসমুদ্রের তীরে অবস্থিত" বলেছেন, যা সাতগাঁও সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, চাটগাঁও সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু আগে আমরা যে সমস্ত প্রমাণের উল্লেখ করেছি, সেগুলিকে উপেক্ষা করে মাত্র এই একটি বিষয়ের উপর জোর দিলে ভুল করা হবে।

বাংলাদেশে ভ্রমণের কুড়ি বছর পরে ভ্রমণ-বিবরণী রচনা করবার সময় সমুদ্র থেকে সাতগাঁওয়ের দূরত্ব সম্বন্ধে ইব্‌ন্ বতুতার ধারণা বিকৃত হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু তিনি 'সোদকাওয়াঙ' সম্বন্ধে আর যত কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়েছেন, সমস্তই সাতগাঁও সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অতএব 'সোদকাওয়াঙ' এবং 'সাতগাঁও'য়ের অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

পৃঃ ৩৪/১ ছঃ ৩০-পৃঃ ৩৫/১ ছঃ ২—ডঃ আবদুল করিমের মতে ইব্‌ন্ বতুতা যে শেখ জলালুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী নন, শেখ জলালুদ্দীন কুন্যাঈ (Social History of the Muslims in Bengal, pp. 97-98, f. n. দ্রষ্টব্য)। ডঃ আহমদ হসান দানীও এই মতের সমর্থক বলে মনে হয় (Bibliography of the Muslims Inscriptions of Bengal, pp. 103-104 দ্রঃ)। কিন্তু ইব্‌ন্ বতুতা যে লোককে নিজের চোখে দেখেছিলেন, তাঁর নাম ভুলভাবে লেখা তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী একজন অতিবিখ্যাত ব্যক্তি; অন্য কারও সঙ্গে দেখা করে "শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর সঙ্গে দেখা করেছি" বলা কোন প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষেই সম্ভব বলে মনে হয় না। ডঃ সুকুমার সেন একবার ঠিক এইরকমভাবে অনুমান করেছিলেন যে জয়ানন্দ শৈশবে গদাধর দাস বা গদাধর পণ্ডিতের দেখা পান, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁর সঙ্গে চৈতন্যদেবের গোলমাল করে ফেলে তিনি চৈতন্যমঙ্গলে লেখেন যে শৈশবে তিনি চৈতন্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন (বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ২৬৯); আমরা ডঃ সেনের এই উক্তির তীব্র সমালোচনা করি (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ৩১৯-৩২০); তার পরে ডঃ সেন ঐ উক্তি প্রত্যাহার করেন (বা. সা. ই. ১।৩, পূর্বার্ধ, পৃঃ ৩৬৪)।

ডঃ আবদুল করিম লিখেছেন, "Ibn Baṭṭūṭah's reference to Shaykh Jalāl Tabrizī in Kamrup is a mistake for Shaykh Jalāl Kunyāyī, as he committed in many other cases in connection with Bengal." কিন্তু ইব্‌ন্ বতুতার বাংলাদেশ সম্বন্ধীয় বিবরণে যেটুকু ভুল আছে, তা প্রধানত বাংলার অতীত ইতিহাস সংক্রান্ত; অতীত ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করার সময় এবং দীর্ঘকাল পরে তা লিপিবদ্ধ করার সময় ভুল করা কারও পক্ষেই বিচিত্র নয়, কিন্তু কেউ যখন বলে যে সে

নিজে একজন লোককে দেখেছে, তখন তাতে তার ভুল হবার কথা কল্পনা করা যায় না। দীনেশচন্দ্র সেনের বইগুলিতে ইতিহাসঘটিত ভুলের বহু নিদর্শন মেলে, কিন্তু তাই বলে দীনেশচন্দ্র সেন যেখানে লিখেছেন যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছিলেন, সেখানে তাঁর উক্তিকে কেউ অবিশ্বাস করবে না। অতএব ইব্‌ন্ বতুতা যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীকে দেখেছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন কারণই নেই।

ইব্‌ন্ বতুতা যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীকে দর্শন করেছিলেন, তা মনে করার আর একটি কারণ, তিনি এই শেখ সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি করেছেন. তাদের সমর্থন অন্য বহু সূত্র থেকে পাওয়া যায়।

ইব্‌ন্ বতুতা ৭৪৭ হিজরা বা ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন যে তার একবছর পরে অর্থাৎ ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী ১৫০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন ; তাহলে ইব্‌ন্ বতুতার উক্তি অনুসারে শেখ জলালের জন্মসাল হচ্ছে ১১৯৭ খ্রীঃ (চান্দ্র বৎসর ধরলে ৫৯৮ হিজরা বা ১২০২ খ্রীষ্টাব্দ হয়)। শেখ কুৎবুদ্দীন বখ্‌তিয়ার কাকীর (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লোক এবং শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর বন্ধু) বাণীর সংগ্রহ-গ্রন্থ 'ফওয়াইদ অল-সালকীন' ও সূফীদের অন্য জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে প্রামাণিকভাবে জানা যায় যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী তব্রিজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুজন গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করার পরে দিল্লীতে আসেন ; তখন শামসুদ্দীন ইলতুৎমিস (১২১০-১২৩৬ খ্রীঃ) দিল্লীর সুলতান।

ডঃ আবদুল করিম মনে করেছেন যে ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে যদি শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে দিল্লীতে আসেন, তা "...means that he was a mere boy when he came to Dehlī, though the sources at our disposal assert thet he already served two of his teachers." কিন্তু ইলতুৎমিস ১২৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করলে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বয়স হয় ৩৯ বছর। ঐ বছরে কেন, তার ১৫ বছর আগেও জলালুদ্দীন দুই গুরুর কাছে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করে দিল্লীতে আসতে পারেন।

অতএব দ্বাদশ শতকের শেষ দিকেই যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর জন্ম হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে ইব্‌ন্ বতুতার উক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। অপরদিকে বুকাননের বিবরণীতে লেখা আছে যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী

আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্বকালেও অর্থাৎ ৭৪২-৭৪৩ হিজরায় (১৩৪১-১৩৪২ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন এবং আলাউদ্দীন আলী শাহ তাঁকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; সুতরাং এখানেও ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তির সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলিতে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর প্রথম জীবনের এবং ইব্‌ন্ বত্তুতা ও বুকাননের বিবরণে তাঁর শেষ জীবনের কিছু কিছু প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর সঙ্গে ইব্‌ন্ বত্তুতার বিবরণীতে উল্লিখিত ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শেখ জলালুদ্দীনের বাগদাদে খলিফা অল-মুতাশিম বিল্লাহ্ অল-আব্বাসীর হত্যাকাণ্ডের সময়ে উপস্থিত থাকার প্রসঙ্গ এবং কিংবদন্তীতে বর্ণিত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর শ্রীহট্ট জয় করার প্রসঙ্গ যোগ করলে ১১৯৭ খ্রীঃ থেকে ১৩৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর একটা মোটামুটি জীবন-ইতিহাসও পাওয়া যায়।

মোটের উপর, ইব্‌ন্ বত্তুতা যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তা শুধু তাঁর নিজের উক্তি থেকে নয়, পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন সূত্রের সাক্ষ্য থেকেও প্রমাণিত হয়।

ডঃ আবদুল করিম ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ আবুল ফজল ও ফিরিশ্‌তার উক্তির উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "According to Khazīnat al-Asfiyā he died in 642/A. D. 1244, while according to Tadhkirat i-Awliyā'-i-Hind, an Urdu biography of the saints, he died in 622/A. D. 1225". কিন্তু ইব্‌ন্ বত্তুতার প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তির বিরুদ্ধে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত 'আইন-ই-আকবরী', সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত 'তারিখ ই-ফিরিশ্‌তা', অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'খজীনৎ অল-আশফিয়া' এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত 'তজকিরৎ-ই-আউলিয়া-ই-হিন্দ'-এর উক্তির কোনই মূল্য নেই। ডঃ করিম দেখিয়েছেন যে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের রাজত্বকালে—৯৩৪ হিজরা বা ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দেওতলার শিলালিপিতে দেওতলাকে "শেখ জলাল মুহম্মদ তব্রিজীর শহর" বলা হয়েছে এবং আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজত্বকালে—৯১১ হিজরা বা ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শ্রীহট্টের "শাহ জলালের দরগার" শিলালিপিতে ঐ শেখ জলালকে "কুন্যাঈ" বলা হয়েছে ; কিন্তু এই দুটি শিলালিপি ইব্‌ন্ বত্তুতার বাংলাদেশে আগমনের দেড়শো বছরেরও বেশী পরে উৎকীর্ণ। অতএব আলোচ্য বিষয়ে ইব্‌ন্ বত্তুতার উক্তির তুলনায় তাদের উক্তি বেশী গুরুত্ব লাভ করতে পারে না।

ডঃ আহমদ হাসান দানী দেখিয়েছেন যে আশরফ সিম্‌নানীর একটি চিঠিতে "জলালিয়া দরবেশ"দের দেওতলাতে সমাধিস্থ হওয়ার কথা লেখা আছে। কিন্তু এই চিঠিও শেখ জলালুদ্দীনের সমসাময়িক নয়। অবশ্য এরকম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী অনেকদিন দেওতলাতে বাস করেছিলেন এবং তাঁর বহু শিষ্য-প্রশিষ্য সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন; তা যদি হয়, তাহলে পূর্বোক্ত দেওতলা শিলালিপি এবং আশরফ সিমনানীর এই চিঠির উক্তির মধ্যে যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ইব্‌ন্ বতুতা লিখেছেন যে শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজী কামরূপ পর্বতেই পরলোকগমন করেছিলেন ও সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু বহু জায়গাতেই শেখ জলালুদ্দীন তব্রিজীর সমাধি দেখতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক মেহ্‌দী হোসেন এ সম্বন্ধে যথার্থই লিখেছেন, "...great saints and martyrs about whom contemporary history is silent have given rise to popular stories, and monuments have been raised in their honour sometimes in the shape of replica tombs bearing identical names".

পৃঃ ৫৫/১ ছঃ ৫-৭—কয়েকটি খুঁটিনাটি বিষয়ের ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়। জিয়াউদ্দীন বারনি লিখেছেন যে ফিরোজ শাহের সৈন্যদের ঘাঁটি পরিবর্তনের সময় ইলিয়াস শাহ নিজের থেকেই ভেবেছিলেন যে ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ করছেন; কিন্তু শাম্‌স্-ই-সিরাজ আফিফের মতে ফিরোজ শাহই চর পাঠিয়ে ইলিয়াস শাহের মনে ঐ ধারণা সৃষ্টি করিয়েছিলেন। বারনির মতে ফিরোজ শাহ একডালার যুদ্ধক্ষেত্রে ইলিয়াস শাহের ৪৪টি হাতী জয় করেন, কিন্তু আফিফের মতে ৪৮টি হাতী বিজিত হয়; আফিফের কথা সত্য হতে পারে না, কারণ আফিফ নিজেই লিখেছেন যে ইলিয়াস ৫০টি হাতী নিয়ে যুদ্ধে এসেছিলেন এবং তার মধ্যে ৩টি হাতী যুদ্ধে মারা পড়েছিল, সুতরাং ৪৮টি হাতী জীবন্ত অবস্থায় ধরা পড়তে পারে না। 'সিরাৎ-ই-ফিরোজ শাহী'র মতে ইলিয়াসের পক্ষের প্রায় ৬০,০০০ জন লোক মারা পড়েছিল, কিন্তু আফিফের মতে অন্তত ১,৮০,০০০ জন বাঙালী নিহত হয়েছিল। আফিফ ও 'সিরাৎ' উভয়েরই মতে ফিরোজ শাহ 'একডালা'র নাম 'আজাদপুর' রাখেন,

এ কথা সত্য হতে পারে; কিন্তু আফিফের মতে পাণ্ডুয়ার 'ফিরোজাবাদ' নামও ফিরোজ শাহ তুঘলকই দেন, এ কথা সত্য নয় (পৃঃ ৩৯/১ দ্রঃ)।

পৃঃ ৬৩/১ ছঃ ১৮—ইলিয়াস শাহ কোনদিনই মুহম্মদ তুঘলকের "বশ্য ও অনুগত" ছিলেন না; তিনি ৭৪৩ হিঃ বা ১৩৪২ খ্রীঃ থেকে বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন ও নিজের নামে মুদ্রা প্রকাশ করছিলেন। যদি কোনদিন তিনি মুহম্মদ তুঘলকের আনুগত্য স্বীকার করে থাকেন, তা নিছক একটা মৌখিক স্বীকৃতি মাত্র। অবশ্য তা'ও তিনি করেছিলেন বলে মনে হয় না।

পৃঃ ৬৮/১ ছঃ ৫-১৫—এই বিবরণে উল্লিখিত মালিক সৈফুদ্দীনের পদবী "শাহ্‌নাফীল", যার অর্থ 'হস্তিসমূহের (হস্তিশালার) অধ্যক্ষ'। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য বিবরণটি 'তবকাৎ-ই-আকবরী' ও 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' ঠিক একইরকম ভাবে পাওয়া যায়। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ থেকে সিকন্দর শাহ পর্যন্ত সুলতানদের সম্বন্ধে 'তবকাৎ'-এর বিবরণের সঙ্গে 'রিয়াজ'-এর বিবরণের ঘনিষ্ঠ মিল আছে। যতদূর মনে হয়, এক্ষেত্রে 'রিয়াজ'-রচয়িতা 'তবকাৎ'-কেই অনুসরণ করেছেন। 'তবকাৎ'-এ লেখা আছে যে ৭৪১ হিজরায় আলাউদ্দীন আলী শাহ ফখরুদ্দীনকে আক্রমণ করে বন্দী ও নিহত করেন। 'রিয়াজ'-এও তা'ই লেখা আছে। এ কথা যে ভুল, তা আগেই দেখানো হয়েছে (পৃঃ ৩৪/১)।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও সিকন্দর শাহ সম্বন্ধে 'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে যা লেখা আছে, তার কতকাংশ নীচে উদ্ধৃত হল।

"মালিক হাজী ইলিয়াস আলাই লখ্‌নৌতির সৈন্যবাহিনীতে মনোনীত (নিযুক্ত) হয়েছিলেন। তিনি সেই সৈন্যবাহিনীকে (তাঁর প্রতি) বন্ধুভাবাপন্ন করলেন, তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং সুলতান আলাউদ্দীনকে বধ করলেন।...

"তিনি (ইলিয়াস) জনসাধারণের শুভেচ্ছা অর্জনের এবং সৈন্যবাহিনীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রবল চেষ্টা করলেন।

"কিছুদিন বাদে তিনি এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে জাজনগরে অভিযান করলেন এবং ঐ দেশ থেকে অনেকগুলি বড় বড় হাতী লাভ করে নিজের রাজধানীতে ফিরে এলেন।

"তেরো বছর কয়েক মাস দিল্লীর সুলতানেরা তাঁর (ইলিয়াসের) ব্যাপারে

কোন ভাবে হস্তক্ষেপ করেন নি এবং তিনি সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নিয়ে সুলতানের কর্তব্য পালন করেছিলেন।...

"যখন সুলতান শামসুদ্দীন চলে গেলেন (মারা গেলেন), আমীররা এবং বিভিন্ন দলের প্রধানরা তাঁর মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিনে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিকন্দর শাহ উপাধি দিয়ে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসালেন। তিনি (সিকন্দর শাহ) দয়া ও ন্যায়বিচারের বাণী ঘোষণা করে সুলতানের কর্তব্য গ্রহণ করলেন।"

এর সঙ্গে 'রিয়াজ'-এর বিবরণের আগাগোড়াই মিল আছে। ইলিয়াস শাহের জাজনগর বা উড়িষ্যায় অভিযান করা এবং সেখান থেকে হাতী লুঠ করে আনার কথা 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'তেও পাওয়া যায় (পৃঃ ৪৫/১-৪৬/১ দ্রঃ)।

দ্বিতীয় খণ্ড

পৃঃ ৪ ছঃ ১৬-২৬—তবকাৎ-ই-আকবরী, আইন-ই-আকবরী, মাসির-ই-রহিমী, তারিখ-ই-ফিরিশতা প্রভৃতি বইতে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। 'রিয়াজ-উস্-সলাতীন' ও বুকাননের বিবরণী এদের তুলনায় পরবর্তী কালে রচিত হলেও এই দুটি সূত্রের সাক্ষ্য এদের তুলনায় বেশী নির্ভরযোগ্য। 'রিয়াজ'-রচয়িতা কতকগুলি অধুনালুপ্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যবহার করে বহু অকৃত্রিম তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে এইরকম একটি তথ্যের উল্লেখ করছি। 'রিয়াজ'-এ লেখা আছে যে মুসলমান দরবেশদের উপর রাজা গণেশের অত্যাচারের ফলে নূর কুৎব্ আলম ক্ষুব্ধ হয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে চিঠি লিখলেন, "যিনি ঐ সময়ে বিহারের সীমা পর্যন্ত শাসন করতেন।" ইব্রাহিম শর্কী যে রাজা গণেশের সমসাময়িক নৃপতি ছিলেন এবং বিহার পর্যন্ত তাঁর অধিকার ছিল, একথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু 'তবকাৎ', 'আইন', 'ফিরিশ্‌তা' ও 'মাসির'-এর বিবরণ অনুসারে ইব্রাহিম শর্কীর সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বছর আগেই রাজা গণেশ বা কান্‌স্ পরলোকগমন করেছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ঐ সব বইতে যেখানে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে 'রিয়াজ'-এ সঠিক সংবাদ লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'রিয়াজ'-রচয়িতা তাঁর ব্যবহৃত নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলির নাম প্রায় করেনই নি,

অবশ্য কোথাও কোথাও তিনি "দ্বিতীয় একটি বিবরণ", "কোন এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা" বলে অস্পষ্টভাবে তাদের উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখ করে তাদের যেটুকু সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছেন, তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খাঁটি। 'রিয়াজ'-রচয়িতার ঐতিহাসিক বোধও বেশ প্রখর ছিল; 'সুলতান আলাউদ্দীন'-এর যে 'হোসেন শাহ' নাম ছিল, 'নসাব শাহ' নামে উল্লিখিত সুলতানের প্রকৃত নাম যে 'নসরৎ শাহ', তা তিনি শিলালিপির সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন। তিনি যে সব গল্প ও প্রবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের সূচনায় "কথিত আছে" লিখে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এগুলি কোন প্রামাণিক সূত্র থেকে সংগৃহীত নয়।

বুকাননের বিবরণী যে পুঁথির উপর নির্ভর করে লিখিত, সেটি খুবই মূল্যবান সূত্র ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই বিবরণীতে সুলতানদের নাম সবক্ষেত্রেই নির্ভুলভাবে উল্লিখিত হয়েছে; তাঁদের রাজত্বকালও যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই সত্যের কাছাকাছি। পক্ষান্তরে 'তবকাৎ', 'আইন', 'ফিরিশ্‌তা', 'মাসির' প্রভৃতি বইতে সুলতানদের রাজত্বকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবং নামও অনেক ক্ষেত্রে ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে'র উক্তির সঙ্গে বুকাননের বিবরণীর উক্তির অনেক জায়গায় ঐক্য দেখা যায়, আবার অনৈক্যও কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। আচার্য যদুনাথ সরকার বুকানন-বিবরণীর রাজা গণেশ ও তাঁর বংশ সংক্রান্ত অংশটি সম্বন্ধে লিখেছেন, "...it looks like a careless and incorrect summary of Riyaz-us-salatin'. কিন্তু এই মত সমর্থন করা যায় না; কারণ বুকানন-বিবরণীর এই অংশে সৈফুদ্দীন, শিহাবুদ্দীন প্রভৃতি সুলতানদের নাম সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে ও রাজত্বকাল প্রায় সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যা 'রিয়াজ-উস-সলাতীনে' হয়নি। অন্যান্য বিষয়েও দুই বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। কেউ কেউ মনে করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদ ফার্সী ভাষায় বাংলার মুসলমান রাজাদের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেছেন, সেটি এবং বুকানন-বিবরণীর আধার ফার্সী পুঁথিটি অভিন্ন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদ বুকাননের সমসাময়িক লোক; তাঁর লেখা ফার্সী বিবরণের পাণ্ডুলিপি India Office Libraryতে আছে, তা বুকানন-বিবরণী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (J. A. S. B., 1902, Pt. 1, No. 1, p. 44-এ মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদের বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

ইতিহাস-রচনার প্রতি হিন্দুদের অনাসক্তি সর্বজনবিদিত। কিন্তু মুসলমানরা

ইতিহাস লিখতে ভালবাসতেন। অথচ বাংলাদেশে এসে মুসলমানরাও ইতিহাস লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন! যাহোক, 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' উল্লিখিত "ক্ষুদ্র পুস্তিকা" ও "দ্বিতীয় বিবরণ" প্রভৃতি এবং বুকানন বিবরণীর-আধার পুঁথিটি থেকে প্রমাণ হয় যে মধ্যযুগে বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

পৃঃ ৫ ছঃ ২১ পাদটীকা—"দেববংশের ইতিবৃত্তি" নামটি ডঃ দানীরই দেওয়া। ডঃ দানী যে বইয়ে এই সূত্রটির উল্লেখ ও বিবরণ পেয়েছেন, তা হল সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' (প্রথম খণ্ড)। ঐ বইয়ে (পৃঃ ২৭৯-২৮০) শুধুমাত্র "কায়স্থ দেব-বংশের ইতিবৃত্তসম্বলিত যে একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে" বলে এই সূত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃঃ ৭ ছঃ ১১-১২—এখানে আলোচ্য শিলালিপিটির যে পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে, তা ডঃ আহমদ হাসান দানীর Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal (p. 14) থেকে গৃহীত। ডঃ দানী নিজেই "ভীহ্ ভাতোরিয়া" পাঠের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নন। মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ Inscriptions of Bengal, Vol. IV-এ (p. 48) এই শিলালিপির যে পাঠ দিয়েছেন, তা ঠিক হলে বলতে হবে, শিলালিপিটিতে "আমীর-এ-ভীহ্ ভাতোরিয়া"র উল্লেখ নেই, তার বদলে "সুকিয়ার (সুতিয়ার?) পুত্র আমীর ভুডা"র নাম আছে।

পৃঃ ৭ ছঃ ১৫—বর্তমান পশ্চিম দিনাজপুর জেলার মহকুমা-শহর রায়গঞ্জের কাছে 'রাজা গণেশ' নামে একটি গ্রাম আছে বলে শুনেছি। তবে গ্রামটির এই নাম কে কোন্ সময়ে দিয়েছে এবং রাজা গণেশের সঙ্গে এ গ্রামের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তা জানি না।

পৃঃ ৮ ছঃ ১৪—রাজা গণেশের অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আমরা গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃঃ ১০৬/১-১০৭/১ দ্রষ্টব্য)। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে ধর্মান্ধ হয়ে উঠে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিলেন এবং তারই ফলে গণেশের অভ্যুত্থান ঘটেছিল বলে আমরা মনে করি।

পৃঃ ২২ ছঃ ৬—এখানে যে "শেখ হুসেন"-এর নাম করা হয়েছে, তাঁর উপাধি ছিল "ধোক্করপোশ" (ধূলায় আবৃত)। ইনি নূর কুৎব আলমের

পিতা আলা অল-হকের শিষ্য ছিলেন, পূর্ণিয়াতে এঁর খানকা ছিল। ফ্রান্সিস বুকানন দিনাজপুর জেলার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে তিনি 'হুসেন ধোক্করপোশ' (Makdum Ghuribal Hoseyn Dokorposh) নামে আর একজন দরবেশের উল্লেখ করেছেন; ইনি হোসেন শাহের সমসাময়িক; এঁর আচরণের ফলে হেমতাবাদের হিন্দু রাজা মহেশ (Mohes) ঢাকায় চলে যেতে বাধ্য হন, এবং হোসেন শাহ এঁর ভাইয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন বলে বুকানন লিখেছেন। হেমতাবাদে এই হুসেন ধোক্করপোশের সমাধি আছে।

পৃঃ ২৩ ছঃ ৬-৭—"বয়াজ" শব্দের আসল অর্থ 'পাঁচমিশেলী সংগ্রহ'। তবে এই "বয়াজ"টিতে মুল্লা তকিয়া তাঁর ভ্রমণের বিবরণ এবং ভ্রমণের সময়ে দেখা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।

পৃঃ ২৩ ছঃ ২৫—মুল্লা তকিয়ার বয়াজের ত্রিহুতের ইতিহাস সম্পর্কিত অংশটুকু পাটনা থেকে প্রকাশিত 'মাসির' নামক উর্দু পত্রিকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন ও জুলাই-আগষ্ট মাসের সংখ্যা দুটিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে মৌলভী মুহম্মদ ইলিয়াস রহমান মুল্লা তকিয়ার মূল ফার্সী রচনাটি উর্দু টীকা সমেত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন।

পৃঃ ২৭ ছঃ ১৩—শিবসিংহ সম্বন্ধে মুল্লা তকিয়ার উক্তির অধিকাংশই যে প্রামাণিক, তাতে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

পৃঃ ৩২ ছঃ ১—নূর কুৎব্ আলমের পত্রসঙ্কলনগ্রন্থে লেখা আছে যে নূর কুৎব্ আলমের কোন প্রিয়জন তাঁকে ছেড়ে পাণ্ডুয়ার বাইরে চলে গেলে কুৎব্ আলম তাঁকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

পৃঃ ৩৭ ছঃ ১১-১৭—Memoirs of Gaur and Pandua, p. 143 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৭ ছঃ ১৭—"পাণ্ডব রাজার দালান"-কে অশিক্ষিত লোকেরা "পাণ্ডপ রাজা দালান" বলে। বর্তমানে এর ধ্বংসাবশেষ মাত্র রয়েছে।

পৃঃ ৩৯ ছঃ ২০—'প্রবাসী'তে "একটি 'w' অক্ষর"-এর বদলে "একটি 'ঘ' অক্ষর" ছাপা হয়ে গিয়েছে। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর নিজের কপিটিতে এই ভুল সংশোধন করে যা লিখেছিলেন, তা'ই আমি উদ্ধৃত করেছি।

পৃঃ ৪১ ছঃ ১৫-১৭—বর্তমান ফরিদপুর জেলার কিয়দংশও প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়।

পৃঃ ৪৬ ছঃ ১১-১২ (পাদটীকা)—আর একটি তারিখ ৮৩৩ হিজরা। এই সব তারিখ যে সমস্ত সূত্রে পাওয়া যায়, তাদের বিবরণের জন্য J. A. S. B., 1892, Pt. I; pp. 122-124, J. A. S. B, 1895, Pt. I, p. 207 এবং J. A. S. B., 1902, Pt. I, p. 46 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৪৬ ছঃ ১৬-২১ (পাদটীকা)—বেভারিজের উক্তি ও অভিমতের জন্য J. A. S. B., 1895, Pt. I, pp. 207-208 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৪৬ ছঃ ২৪-২৫ (পাদটীকা)—মনোমোহন চক্রবর্তীর জ্যোতিষগণনার জন্য J. A. S. B., 1909, p. 228 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৪৯ ছঃ ১৭—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের বাল্যলীলাসূত্র, নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস প্রভৃতি অপ্রামাণিক গ্রন্থে এবং দুর্গাচরণ সান্যালের 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' নামে গালগল্পে-ভরা বইটিতে রাজা গণেশ সম্বন্ধে কতকগুলি অতিরিক্ত "সংবাদ" পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করছি,

(১) গণেশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন,

(২) তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল নরসিংহ নাড়িয়াল,

(৩) তাঁর সঙ্গে সাঁতোড়ের রাজার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল,

(৪) তাঁর পুত্র যদু ইলিয়াস শাহী বংশের রাজকন্যা আশমানতারার প্রেমে পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন।

এদের মধ্যে প্রথম তিনটি বিষয়ের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। চতুর্থ বিষয়টি ষোল আনাই মিথ্যা। গণেশের পুত্র কোন নারীর প্রেমে পড়ে মুসলমান হননি, তিনি যে কারণের জন্য মুসলমান হয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন; এই বইয়ের ২য় খণ্ডের ২৮-৩১ পৃষ্ঠায় তা আলোচিত হয়েছে। 'আশমানতারা' নামটি নিতান্ত আধুনিক, এই নামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে কোন মুসলমান রাজকন্যা থাকতেই পারেন না। 'আশমানতারা' প্রকৃতপক্ষে দুর্গাচরণ সান্যালের কল্পনার আশমানের তারা। রাজা গণেশ ও যদু সম্বন্ধে দুর্গাচরণ সান্যাল যা লিখেছেন, সমস্তই তাঁর বানানো, তার কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

পৃঃ ৪৯ ছঃ ১৮-১৯—এই পুনর্গঠিত ইতিহাসের সঙ্গে এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত রাজা গণেশ সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি যোগ করে নিলে রাজা গণেশের একটি মোটামুটি সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যাবে।

পৃঃ ৫০ ছঃ ১১—"অনেকে মনে করেন"-এর পরে "কিন্তু এই ধারণার কোন ভিত্তি নেই।" পঠনীয়। এসম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২, ছঃ ১-১২ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৫৫ ছঃ ২৭-৩০ (পাদটীকা)—অবশ্য 'তারিখ-ই-হামিদী'র উক্তির মূল্য খুব বেশী নয়, কারণ এই বই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত। কিন্তু চট্টগ্রামের নিকটবর্তী ফতেহাবাদের নামকরণ সম্বন্ধে এতে যে কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ হয়েছে, তার বিরোধী কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ঐ নামের ইতিহাস ষোড়শ শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীনতর বলে মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

পৃঃ ৬২ ছঃ ২৬-২৭—মুয়াজ্জমাবাদ ও রোটাসপুরের (?) টাকশাল থেকেও জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের মুদ্রা বেরিয়েছিল।

পৃঃ ৬৪ ছঃ ১৬—স্টুয়ার্ট তাঁর History of Bengal-এ লিখেছেন যে তিনি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে লেখা শাহ্‌রুখের চিঠিটি পেয়েছেন। তিনি ঐ চিঠির একটি ইংরেজী অনুবাদ দিয়েছেন (Stuart, History of Bengal, 2nd Edn., pp. 111-112 দ্রষ্টব্য)। স্টুয়ার্ট লিখেছেন, "...the Letter is a curious specimen of the pompous style of the East" এবং "The Letter is taken from Ferishtah." কিন্তু 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র মুদ্রিত সংস্করণে এই চিঠিটি পাওয়া যায় না। স্টুয়ার্ট হয়তো 'তারিখ-ই-ফিরিশ্‌তা'র কোন পুঁথিতে এটি পেয়েছিলেন। আমরা নীচে এই চিঠির বাংলা অনুবাদ দিলাম।

"এই আদেশ (সমস্ত পৃথিবী যার অধীন এবং বিশ্ব যার বাধ্য) একদিনের দূরত্ব অতিক্রম করে পৌছোবামাত্র সেই দেশের সমস্ত মুসলমান বন্দীদের সমবেত করবে ও তাদের যার যার প্রভুর হাতে সমর্পণ করে ঐ ব্যাপারের কাজীদের স্বাক্ষরিত ও মোহরযুক্ত একটি নিদর্শনপত্র (certificate) নেবে এবং অবিলম্বে তা সম্রাটের সিংহাসনের পাদমূলে প্রেরণ করবে। নিশ্চিত জেনো, যদি তুমি একটুও দেরী কর অথবা সামান্যতম পরিমাণেও এই আদেশ উপেক্ষা কর, তাহলে আমরা আমাদের প্রসিদ্ধতম পুত্র, কাবুলের অধিপতি সুলতান মাহ্‌মুদকে এবং খোটেলান, গজনী, কান্দাহার ও গর্‌ম্‌সীরের শাসনকর্তাদের রাজকীয় আদেশ পাঠাব অগ্রসর হতে এবং তোমাকে এমন ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে, যা অন্যদের কাছে উদাহরণ-স্বরূপ হয়ে থাকবে। তা যদি যথেষ্ট না হয়, তাহলে আমরা সেনাপতি ফিরোজ শাহকে খোরাসানের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে

তোমার উপর প্রতিশোধ নিতে আদেশ দেব। তাতেও যদি কাজ না হয়, আমরা আমাদের মহত্তম পুত্র সুলতান শামসুদ্দীনকে আদেশ পাঠাব অবুহং, পিরাই, কুন্দ্‌দিজ এবং বাকেলানের সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য। তাতেও যদি কোন ফল না হয়, আমরা আমাদের সাহসী এবং বিজয়ী পুত্র বয়েস্তেগুর বাহাদুরকে বাবুল, সারী, মাজিনদেরান, তবারিস্তান, গরিক এবং জিলানের সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে তোমাকে তোমার অপরাধ আর অযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে নির্দেশ দেব। তা সত্ত্বেও তুমি যদি তোমার অসৎ আচরণ চালিয়ে যেতে সমর্থ হও, তাহলে আমরা আমাদের মহান্ পুত্র সুলতান ইব্রাহিমকে ইরাক, আজারবাইজান, বাগদাদ এবং আরবের নানা অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করে তোমার দেহ থেকে আত্মা পৃথক করে ফেলতে আদেশ দেব। তারা যদি আমাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে আমাদের প্রিয়তম এবং বিজয়ী পুত্র উলুগ বেগ গুরগনকে আমাদের রাজকীয় ইচ্ছা জানিয়ে দেব যাতে সে তুর্কিস্তানের অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয় এবং তোমাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলে অথবা তোমার দেহকে ঝুলিয়ে রাখে কাকেদের খাবার জন্য।"

তিনটি জিনিস এখানে সাবধানে লক্ষ্য করতে হবে। প্রথমত, চিঠিটিতে বাংলা-দেশের নাম কোথাও উল্লিখিত হয়নি। এই চিঠিতে যে দেশের বন্দীদের মুক্তি দেবার কথা লেখা আছে, স্টুয়ার্ট ( ) বন্ধনীর মধ্যে তাকে "Bengal" বলেছেন, কোন্ প্রমাণে বলেছেন, তা আমরা জানি না। দ্বিতীয়ত, চিঠিটিতে ইব্রাহিম শর্কীরও নাম উল্লিখিত হয়নি। তৃতীয়ত, চিঠিটিতে ইব্রাহিম যে ঐ দেশ আক্রমণ করেছিলেন, সে কথাও লেখা হয়নি। এই চিঠি যদি ইব্রাহিম শর্কীকেই লেখা হয়, তাহলে এর থেকে শুধু এইমাত্র জানা যায় যে ইব্রাহিম ঐ দেশের অনেক বন্দীকে মুক্তি না দিয়ে আটক করে রেখেছিলেন। সুতরাং 'মতলা-ই-সদাইনে' শাহ্‌রুখের ইব্রাহিমকে প্রেরিত যে ফরমানের উল্লেখ আছে, তা এই চিঠির সঙ্গে অভিন্ন নয়। আলোচ্য চিঠিটি যদি অকৃত্রিম হয়, এটি যদি ইব্রাহিম শর্কীকেই লেখা হয় এবং এতে উল্লিখিত ঐ বিশেষ দেশটি যদি বাংলাদেশই হয়, তাহলে বলতে হবে ইব্রাহিম শর্কী বাংলাদেশের উপর আক্রমণ বন্ধ করার পরেও এদেশের বন্দীদের মুক্তি দেননি, তাই শাহ্‌রুখ দ্বিতীয়বার তাঁর উপর আদেশ জারী করে মুসলমান বন্দীদের মুক্তি দিতে বলেছিলেন এবং সেই আদেশই এই চিঠির মধ্য দিয়ে জানানো হয়েছে।

পৃঃ ৬৮ ছঃ ৪—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুন্সী শ্যামপ্রসাদ মেজর উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিনের জন্য গৌড়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমেত একটি বিবরণ রচনা করেছিলেন ; এই বিবরণটি ছাপা হয়নি, এর পুঁথি India Office Library-তে আছে। এতে লেখা আছে, জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের পূর্ব-নাম "কদীর (!) সেন" (Qadir Sen) এবং তাঁর পিতার নাম "কাশী রায়" (J. A. S. B, 1902, Pt. I, No. 1, p. 44 দ্রঃ)। এইসব উক্তির বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না।

পৃঃ ৬৮ ছঃ ১০—ডঃ দানীর অনুবাদের জন্য J. A. S. B., 1952, p. 138 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৬৯ ছঃ ১২-২৩—অল-সখাওয়ীর বইয়ের নাম 'অল্ জও অল্-লামে লে-অহ্ল্ অল্-করন্ অল্-তাসে'। এটি আরবী ভাষায় লেখা। এই বইয়ে (Vol. VIII, p. 280) অল-সখাওয়ী জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বাংলা অনুবাদ নীচে দিলাম। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্রের ইংরেজী অনুবাদ থেকে এই অনুবাদ করা হয়েছে।

"মুহম্মদ বিন্ হিন্দু অল জলাল আবুল মুজঃফর,
মুজঃফর আহমদের পিতা, বাংলার শাসক।

এঁর পিতা ছিলেন কাফের, কান্স নামে পরিচিত। শামসুদ্দীনের পুত্র সিকন্দর শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পুত্র সৈফুদ্দীন হমজার ক্রীত-দাসদের অন্যতম শহাব তাঁকে আক্রমণ করে; সে বাংলাদেশে রাজা হয় এবং তাঁকে বন্দী করে। এই লোকটির (কান্সের) পুত্র মুসলমান হয়ে মুহম্মদ নাম নিলেন এবং তিনি শহাবকে আক্রমণ করে তার কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিলেন। তিনি ইসলামের উন্নতিবিধান করলেন, ইসলামের বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন এবং তাঁর পিতা মসজিদ ও অন্যান্য জিনিস যা কিছু ধ্বংস করেছিলেন, সেগুলির সংস্কারসাধন করলেন। তিনি আবু হানিফার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তিনি মক্কায় অনেকগুলি প্রাসাদ, বিশেষভাবে একটি অপূর্বসুন্দর মাদ্রাসা তৈরী করালেন এবং মিশরের শাসক আশরফকে উপহার সহযোগে চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন তাঁকে খলিফার স্বীকৃতি (investiture) পাঠাবার জন্য। তিনি (আশরফ) তাঁকে (জলালকে) মক্কার শেরিফের মারফৎ একটি সম্মান-পরিচ্ছদ পাঠালেন। তিনি (জলাল) সেই পোষাক অঙ্গে ধারণ করে খলিফাকে উপহার পাঠালেন। এইসব উপহার

আলা উল-বুখারির মারফৎ প্রেরিত হয়। এই ভাবে মিশর ও দামাস্কাসে ক্রমাগত উপহার পাঠানো হয়েছিল। তিনি ৮৩৭ সালের রবী উল-আখির মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।"

অল-সখাওয়ীর এই বিবরণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এর মধ্যে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহকে স্পষ্টভাবে 'বিন্ হিন্দু' অর্থাৎ হিন্দুর পুত্র বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সৈফুদ্দীন হম্‌জা শাহের ক্রীতদাস শহাবের কথাও বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই শহাব শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ্ ভিন্ন আর কেউ নন। এসম্বন্ধে আগেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৭/১-১১৮/১ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৭১ ছঃ ৫-৯—'স্মৃতিরত্নহার' গ্রন্থের উপক্রমের তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্লোকে রায় রাজ্যধরের প্রশস্তি আছে। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 'স্মৃতিরত্নহার'-এর পুঁথি থেকে আমরা শ্লোকগুলি নীচে উদ্ধৃত করছি। পুঁথিটি কীটদষ্ট হওয়ার দরুণ শ্লোকগুলির কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায় নি।

জীয়াদয়ং স জগদত্ত-সুতোঽতিবেল-
স্থৈর্য্যৈর্গুণৈ......................
......পা নিজভুজদ্রবিণার্জিতশ্রীঃ
শ্রীরায়রাজ্যধরনাম পদং প্রপন্নঃ ॥ ৩
সৈনাধিপত্যমিভসৈন্ধবতূর্যশঙ্খ
চ্ছত্রাবলীললিতকাঞ্চনরূপ্য···
···দান্ বহুভূষণঞ্চ
জল্লালদীননৃপতির্মুদিতো গুণৌঘৈঃ ॥ ৪
যো ব্রহ্মাণ্ডং কনকতুরগস্যন্দনং বিশ্বচক্রং
পৃথ্বীং কৃষ্ণাজি [ন] সুরতরূন্ ধেনুশৈলোদধীংশ্চ।
···ধিবদবনীদেবতানামমন্দং
ভিন্দন্ দৈন্যং সপদি দধতে ধর্মসূনোরভিখ্যাম্ ॥ ৫
জন্মাপ্তং জগদত্ততো গুণনিধের্ধীভি [বিদ্যা] ন্বয়ে
দারাঃ সংতুলিতা···তিঃ শ্রীভাস্করাঃ সূনবঃ।
লক্ষ্মীরদ্ভুতদানভোগসুভগা মন্ত্রিত্বমুর্বীভুজা-
মিত্থং যস্য মনোরথায় কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন কাম্যং স্থিতম্ ॥ ৬

আচার্য ইত্যভিমতং কবিচক্র [বর্তী]
.........দ্বিতয়মধ্যগমত্ততো যঃ।
স শ্রীবৃহস্পতিরিমং বহুসংগ্রহার্থৈ-
নির্মাতি নির্মলমতিঃ স্মৃতিরত্নহারম্ ॥ ৭

এর মধ্যে চতুর্থ শ্লোকে নৃপতি জলালুদ্দীন ('জল্লালদীন') কর্তৃক রায় রাজ্যধরকে সেনাপতি-পদে নিয়োগের কথা আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মতের উল্লেখ করছি। এই মত প্রথমে প্রচার করেন ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁর পরে ডঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা। কিন্তু এঁদের মত প্রচারিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ডিত হয়। এঁরাও নীরব হন। বর্তমানে একমাত্র ডঃ আহমদ হাসান দানী ছাড়া এই মতের সমর্থক আর কেউ আছেন বলে জানি না। মতটি হচ্ছে এই যে, রায় রাজ্যধর এবং সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ অভিন্ন। কিন্তু এই মত কোনক্রমেই সমর্থন করা যায় না। কারণ উপরে উদ্ধৃত 'স্মৃতিরত্নহার'-এর পঞ্চম শ্লোকে বৃহস্পতি মিশ্র বলেছেন যে রাজ্যধর ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্ণাশ্বযুক্ত রথ, বিশ্বচক্র, পৃথ্বী, কৃষ্ণাজিন, কল্পতরু প্রভৃতি দান অনুষ্ঠান করে ভূমিদেব ব্রাহ্মণদের দৈন্য দূর করে দিয়ে ধর্মপুত্র আখ্যা লাভ করেছিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান জলালুদ্দীন এই জাতীয় দান অনুষ্ঠান করতে পারেন না। তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্লোকে বৃহস্পতি বলেছেন যে রাজ্যধরের পিতার নাম ছিল জগদত্ত এবং ষষ্ঠ শ্লোকে তিনি বলেছেন যে রাজ্যধরের শ্রীভাস্কর প্রভৃতি পুত্রেরা ('শ্রীভাস্করাঃ সূনবঃ') জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষষ্ঠ শ্লোকেই বৃহস্পতি বলেছেন যে রাজ্যধর রাজাদের মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য,—গণেশের পুত্র, শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের পিতা এবং সার্বভৌম নৃপতি জলালুদ্দীন সম্বন্ধে এসব কথা প্রযোজ্য হতে পারে না। সব চেয়ে বড় কথা, চতুর্থ শ্লোকে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে জলালুদ্দীন রাজ্যধরকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, জলালুদ্দীন নিজেই নিজেকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করতে পারেন না।

কিন্তু অপর পক্ষও হাল ছাড়েন নি। তাঁরা বলেন—(১) পুঁথিতে যাকে 'জগদত্ত' পড়া হয়েছে, তা আসলে 'জগদন্ত' হবে (কিন্তু পুঁথিতে পরিষ্কারভাবে 'জগদত্ত'ই লেখা আছে; আমরা পুঁথি দেখেছি); 'জগদন্ত' আবার 'গজদন্ত'র ভ্রান্ত পাঠ, আর 'গজদন্ত' অর্থে 'গণেশ' বুঝতে হবে। (২) 'শ্রীভাস্করাঃ' রাজ্যধরের পুত্রদের নাম নয়, বিশেষণ। (৩) ষষ্ঠ শ্লোকের "মন্ত্রিত্বমুর্বীভুজাম্"

ভ্রান্ত পাঠ, তার জায়গায় "মন্ত্রিত্বমুর্বীভুজাম্" হবে। (৪) জলালুদ্দীন রাজ্যধরকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেননি, বৃহস্পতিকেই সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেছিলেন, সেই কথাই চতুর্থ শ্লোকে বলা হয়েছে। কিন্তু পুঁথির যে পাঠ পাওয়া যাচ্ছে, তার স্পষ্ট ও সঙ্গত অর্থ যখন করা যায়, তখন ঐ পাঠের পরিবর্তন করা (জগদত্ত<জগদন্ত<গজদন্ত ধরলে দু'বার পরিবর্তন করা হয়) জবরদস্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। বৃহস্পতি জলালুদ্দীনের পিতার নাম সোজাসুজি 'গণেশ' না লিখে 'গজদন্ত'ই বা লিখতে যাবেন কেন? চতুর্থ শ্লোকের শূন্যস্থানগুলি ব্যাকরণসম্মতভাবে যেমন করেই পূরণ করা হোক্ না কেন, তার থেকে কিছুতেই এমন অর্থ দাঁড় করানো যায় না যে জলালুদ্দীন বৃহস্পতিকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করেছিলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সেনাপতি-পদে নিয়োগ করার কল্পনার অবাস্তবতা সংক্রান্ত প্রশ্ন ছেড়েই দিলাম। অপর পক্ষ চতুর্থ শ্লোকের শূন্যস্থানগুলি যেভাবে পূরণ করেন, তাতে শ্লোকটি মারাত্মক-ভাবে ব্যাকরণদুষ্ট হয়ে পড়ে। এ সব ব্যাপারকে গবেষণার নামে স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। রায় রাজ্যধর যে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের সঙ্গে অভিন্ন নন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সপ্তম শ্লোক থেকে জানা যায়, রায় রাজ্যধর বৃহস্পতি মিশ্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৃহস্পতির অন্য কতকগুলি গ্রন্থের পুষ্পিকায় উল্লিখিত তাঁর "রাজ্যধরাচার্য" উপাধি থেকে বোঝা যায়, রাজ্যধর বৃহস্পতির শিষ্যও ছিলেন। "মন্ত্রিত্বমুর্বীভুজাম্" উক্তি থেকে বোঝা যায়, রাজ্যধর অন্তত তিনজন রাজার মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন; ঐ সময়ে এ ব্যাপার মোটেই অসম্ভব ছিল না, কারণ ১৪১০ খ্রীঃ থেকে ১৪৩৭ খ্রীঃর মধ্যে ১০।১১ জন রাজা বাংলার সিংহাসনে বসেছিলেন।

পৃঃ ৭২ ছঃ ১২-১৩—এই মুদ্রাগুলির মাথায় অস্পষ্টভাবে কিছু লেখা আছে। তাকে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী পড়েছেন "বিন্ কান্স্ শাহ্" (কান্স্ শাহের পুত্র)। জলালুদ্দীনের অন্য কোন মুদ্রায় তাঁর বিধর্মী পিতার নাম পাওয়া যায় না।

পৃঃ ৭৪ ছঃ ১৭-১৮—বৃহস্পতি মিশ্রের লেখা প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি আমরা নীচে উদ্ধৃত করছি,

বিভাসু তাসু বিনয়ী প্রণয়ী গুণেষু
গৌড়াধিপাদুপচিতপ্রচুরপ্রতিষ্ঠঃ।

সোঽহং যথামতি বৃহস্পতিরাতনোমি
ব্যাখ্যাবৃহস্পতিমলংকৃতিকাব্যলিঙ্গম্ ॥

বৃহস্পতির লেখা কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা ও শিশুপালবধটীকার সূচনাতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়। কুমারসম্ভবটীকাতে রাজ্যধরের নাম নেই। সুতরাং এমনও হতে পারে যে বৃহস্পতিই প্রথমে গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। তাঁর শিষ্য রাজ্যধর হয়তো গুরুর সাহায্যেই গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী ও সেনাপতির পদ লাভ করেছিলেন এবং লাভ করার জন্যই গুরুকে বিশেষভাবে সমাদর করেছিলেন।

পৃঃ ৭৪ ছঃ ২৬—এখানে যে "দুটি শিলালিপি"র উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের বিবরণের জন্য ডঃ আহমদ হাসান দানী সঙ্কলিত Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal (p. 14) এবং মৌলভী শামসুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত Inscriptions of Bengal, Vol. IV (pp. 44-48) দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৭৫ ছঃ ২১-২২—মান্দরা শিলালিপি ৮৩৬ হিজরার ১০ই জমাদী অল-আউয়ল অর্থাৎ ২রা জানুয়ারী, ১৪৩৩ খ্রীঃ তারিখে উৎকীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ যে অন্তত ঐ তারিখ অবধি জীবিত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃঃ ৭৫ ছঃ ২৪-২৫—অল-সখাওয়ীর নিজের উক্তি এই, "তিনি (জলালুদ্দীন) ৮৩৭ সালের (হিজরার) রবী উল-আখির মাসে পরলোকগমন করেন। তাঁর পুত্র তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যখন তাঁর (পুত্রের) বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।"

পৃঃ ৮০ ছঃ ১৩-১৮—'তবকাৎ-ই-আকবরী'তে শাদী খানের নাম নেই। তাতে লেখা আছে, "জলালুদ্দীনের পুত্র সুলতান আহমদের মৃত্যুর পরে যখন রাজসিংহাসন অনধিকৃত ছিল, তখন নাসির নামে তাঁর একজন ক্রীতদাস মহা ধৃষ্টতার সঙ্গে সাম্রাজ্যের সিংহাসনে পদার্পণ করল এবং সমস্ত আদেশ জারী করতে সুরু করল। সুলতান আহমদের আমীর ও মালিকেরা তাকে বধ করে সুলতান শামসুদ্দীন ভাঙ্গরার একজন পৌত্রকে রাজা করলেন।"

পৃঃ ৮১ ছঃ ৯-১১—পূর্ববর্তী গবেষকদের মধ্যে একমাত্র মনোমোহন চক্রবর্তী এই রাজবংশকে "Later Illyas Shahi Dynasty" না বলে "Mahmūdi Dynasty" বলেছেন (J. A. S. B., 1909, p. 205 দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৮১ ছঃ ২৮-৩০—রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে গৌড়ের বিখ্যাত "সেলামী দরওয়াজা" বা "কোৎওয়ালী দরওয়াজা"র নির্মাতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৮২ ছঃ ১৩—অনেকের মতে এই শিলালিপিতে উল্লিখিত "মল্লিকা পারিসা" বিজয়নগরের রাজা মল্লিকার্জুন (১৪৪৬-৬৫ খ্রীঃ)।

পৃঃ ৮৫ ছঃ ৩—"ওয়াই-কুও-চুয়ান (চোয়ান)"-এর আসল অর্থ বিদেশ সংক্রান্ত নথীপত্র।

পৃঃ ৮৮ ছঃ ১-৩—অবশ্য মিং-শে'তে লেখা আছে, ১৪০৯ খ্রীঃর পরে "তারা (বাংলার রাজদূতেরা) প্রতি বছরই চীনে আসত।" (২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একথাকে আক্ষরিক অর্থে সত্য বলে গ্রহণ না করে "প্রতি বছর"-কে "প্রায় প্রতি বছর" অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। অবশ্য এসম্বন্ধে মতভেদেরও যে অবকাশ আছে, তা আমরা স্বীকার করি। আমরা যে বছরগুলির উল্লেখ করেছি, অন্তত সেইসব বছরে যে বাংলার রাজদূতেরা চীনে গিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃঃ ৮৯ ছঃ ১—এই বইয়ে আমরা চীনা বিবরণগুলির ও তাদের গ্রন্থকারদের নাম এবং অন্যান্য চীনা শব্দ যেভাবে উল্লেখ করেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। এই সব চীনা শব্দ আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী রোমান অক্ষরে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়, আমরা তারই বাংলা রূপ দিয়েছি। কিন্তু শব্দগুলির মূল চীনা উচ্চারণ কতকটা আলাদা। নীচে শব্দগুলির রোমান অক্ষরে লেখা রূপ, আমাদের দেওয়া রূপ এবং মূল চীনা উচ্চারণ পাশাপাশি দেখানো হল।

রোমান অক্ষরে লেখা রূপ	আমাদের দেওয়া রূপ	মূল চীনা উচ্চারণ
Si yang ch'ao kung tien lu	সি-য়ং-চও-কুং-তিয়েন-লু	শি-য়াং-ছাও-কুং-তিয়েন-লু
Shu yu chou tseu lu	শু-য়ু-চৌ-ৎসেউ-লু	শু-য়ু-চৌ-ৎজ্‌-লু
Ming-she	মিং-শে	মিং-শ্‌র্‌
Huang Sing-ts'eng	হুয়াং-সিং-ৎ-সেং	হোয়াং-শিং-ৎসাং
Yong-lo	য়ং-লো	য়ুং-লো
Ngai-ya-sse-ting	ঙ্গাই-য়া-স্‌সে-তিং	ঙ্গায়-য়া-স্‌জ্‌-তিং
T'ai-ts'ang	তাই-ৎ-সাং	থাই-ৎসাং

রোমান অক্ষরে লেখা রূপ	আমাদের দেওয়া রূপ	মূল চীনা উচ্চারণ
Pa-yi-tsi	পা-য়ি-ৎ-সি	পা-য়ি-চি
K'i-lin	কি-লিন	ছি-লিন (দক্ষিণ চীনে কি-লিন)
Cheng-t'ong	চেং-ত	চেন্-থু
Yen Ts'ong-kien	য়েন-ৎস -কিয়েন	য়েন ৎস্থ -চিয়েন
Hou-hien	হৌ-হিয়েন	হৌ-শিয়েন
Wai Kuo Chuan	ওয়াই-কও-চুয়ান	ওয়াই-কুও- চুয়ান
Sai-wu-ting	সৈ-উ-তি	সাই-উ-তি
Chen-kiang	চেন-কিয়া	চেন-চিয়া (দক্ষিণ চীনে চেন-কিয়া)
Chao-na-fu-eul	চও-ন-ফু-উল	চাও-না-ফু-আর
Sai-fo-ting	সৈ-ফো-তি	সাই-ফু-তি
Ying yai sheng lan	য়িং-য়ই-শে -লান	য়িং-য়া-শু -লান
Ma-Huan	মা-হুয়ান	মা-হোয়ান
Sing ch'a sheng lan	সিং-চা-শে -লান	শিং-ছা শু লান
Fei-sin	ফেই-সিন	ফেই-শিন

পৃঃ ৮৯ ছঃ ৭—য়ুং-লো চেং-তং-এর পূর্ববর্তী সম্রাট, কিন্তু অব্যবহিত পূর্ববর্তী সম্রাট নন। এঁদের মাঝখানে আরও দু'জন সম্রাট চীনদেশের সিংহাসনে বসেছিলেন। এখানে আর একটা কথা আছে। চীনসম্রাটদের যে সমস্ত নাম আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, সেগুলি আসলে তাঁদের রাজত্বের (reign) নাম। রাজাদের ব্যক্তিগত নাম এগুলি নয়। তবে ঐতিহাসিকদের কাছে চীনসম্রাটরা এইসব নামেই বিশেষভাবে পরিচিত।

পৃঃ ৮৯ ছঃ ১৯—জঙ্গীপুর ও ত্রিবেণীর শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গেরও এক বৃহদংশ নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিহারে অন্তত মুঙ্গের পর্যন্ত নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ শাহের রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল, কারণ মুঙ্গেরে তাঁর শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে।

পৃঃ ৯০ ছঃ ১১-১২—রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সমসাময়িক যে "একটি ফার্সী গ্রন্থে"র কথা এখানে বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী রচিত 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী' বা 'শরফনামা'।

পৃঃ ৯৭ ছঃ ৪-৬—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মৈত্র মুল্লা তকিয়ার 'বয়াজে'র সংশ্লিষ্ট অংশটির মূল ফার্সী থেকে যে ইংরেজী অনুবাদ করেছেন, তা নীচে উদ্ধৃত হল। আমার 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' বইয়ে এই অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়।

"Previously, Sultan Firoz Shah Tughlaq had brought Sultan Shamsuddin Haji Illyas under his domination and had annexed the territory of Tirhut in his possesion, which later on became the part of the Sharqi Kingdom. But after 121 years, i. e. in the year 875, Rukn-ud-din Barbak Shah, the Sultan of Bengal, having collected Afghans in his army, which were more than locusts in number, invaded the territory of Tirhut, which was in the possesion of Sultan Husain Shah Sharqi. And after a lot of warfare, he became perfectly victorious and directly came into possesion of the fort of Hajipur and its suburbs, as much as formed part of the dominion of Haji Ilyas. With this, he extended to the north as far as the river Budi Gandak, which was in the hands of the zeminder of Tirhut, where he appointed Kedar Rai as his Naib (Deputy) for the realisation of royal revenues and protection of frontiers. The son of the zeminder, Bharat Singh by name, ejected the above-mentioned Rai, through his extreme folly and force, and became supreme there. As soon as Sultan Barbak Shah heard this news, he hastened to give punishment to the zeminder. But the Raja showed his submission and gave assurance of his loyalty to the king."

পৃঃ ৯৮ ছঃ ৩-৪—'তারিখ-ই-মুবারক শাহী' থেকে জানা যায় যে স্বাধীন জৌনপুর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মালিক সারওয়ারই চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দশকে ত্রিহুত জয় করে তাকে জৌনপুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু প্রথমদিকে ত্রিহুতের উপর জৌনপুরের অধিকার খুব সুদৃঢ় ছিল না। ইব্রাহিম শর্কী জৌনপুরের সুলতান হয়ে দু'বার ত্রিহুতে অভিযান করে বিদ্রোহী রাজাদের পর্যুদস্ত করেন। তার ফলে তাঁরই রাজত্বকালে ত্রিহুতে জৌনপুরের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃঃ ৯৮ ছঃ ২৫—J. A. S. B., 1915, p. 427 দ্রষ্টব্য। 'প্রতিশরীর'-এর অর্থ যে প্রতিনিধি, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

পৃঃ ১০০ ছঃ ১৫-২০—'পদচন্দ্রিকা'র যে শ্লোক দুটিতে বৃহস্পতি মিশ্র তাঁর 'রায়মুকুট' ও 'পণ্ডিতসার্বভৌম' উপাধি লাভের উল্লেখ করেছেন, সে দুটি শ্লোক আমরা নীচে উদ্ধৃত করলাম,

জ্যোতির্মন্মণিপুঞ্জমঞ্জুলরুচং হারং জ্বলৎকুণ্ডলে।
রত্নৌঘস্ফুরিতা দশাঙ্গুলিজুষঃ শোচিষ্মতীরূর্মিকাঃ॥
যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্টকনকস্নানৈরবিন্দন্নৃপা-
চ্ছত্রৈস্তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্॥

পুণ্যাং পণ্ডিতসার্বভৌমপদবীং গৌড়াবনীবাসবাদ্।
যঃ প্রাপ্তঃ প্রথিতো বৃহস্পতিরিতি শ্লোকবাচস্পতিঃ॥
কোষস্যামরনির্মিতস্য বিবিধব্যাখ্যানদীক্ষাগুরুঃ
সানন্দং পদচন্দ্রিকাং স কুরুতে টীকামিমাং কীর্তয়ে॥

পৃঃ ১০১ ছঃ ৯-১২—এই শ্লোকটি I. H. Q., 1941, p. 467-468 থেকে উদ্ধৃত। এই শ্লোকটি থেকে জানা যাচ্ছে যে, 'পদচন্দ্রিকা' ১৩৯৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি বা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছিল। এই শ্লোকটি এবং এর পরবর্তী দুটি শ্লোক—তিনটিতেই 'পদচন্দ্রিকা'র রচনাসমাপ্তির কথা আছে। দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ চরণ 'তাবন্মে কৃতিরাতনোতু কৃতিনামানন্দবৃন্দো(দ)য়ং' থেকে বোঝা যায়, শ্লোকগুলি বৃহস্পতি মিশ্রের নিজেরই রচনা। 'পদচন্দ্রিকা'র আর একটি পুঁথিতে সংক্ষেপে এর রচনাসমাপ্তিকাল '১৩৯৬' (শকাব্দ) উল্লিখিত হয়েছে (I. H. Q., 1941, p. 467 দ্রষ্টব্য)।

'পদচন্দ্রিকা' যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে রচনাসমাপ্তিকালবাচক শ্লোকটির সাক্ষ্য ছাড়া অন্য প্রমাণও আছে। 'পদচন্দ্রিকা'য় বৃহস্পতি মিশ্র বলেছেন যে তাঁর বিশ্বাস রায় প্রভৃতি পুত্রেরা রাজার মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন। অর্জুন রায় তাঁর 'মোক্ষধর্মার্থ-দীপিকা'র টীকায় লিখেছেন যে তিনি গৌড়েশ্বরের মহামন্ত্রী বিশ্বাস রায়ের অনুজ্ঞা পেয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন (I. H. Q., 1941, p. 466; f. n. দ্রষ্টব্য)। অর্জুন মিশ্রের আর একজন পৃষ্ঠপোষকের নাম সত্য খান

(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত A Descriptive Catalogue of Sanskrit Maunscripts in the Collections of the Asiatic Society of Bengal, Vol V., Preface, pp. lxix-lxx দ্রষ্টব্য)। এবং এক সত্য খান বারবক শাহের সমসাময়িক (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১১০ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং 'পদচন্দ্রিকা' বারবক শাহের রাজত্বকালে সম্পূর্ণ হয়েছিল বলেই স্থির করা যায়।

যাঁরা মনে করেন বৃহস্পতির সব বইই জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল, তাঁদের মতের বিপক্ষে একটি যুক্তি দেখানো যায়। 'স্মৃতিরত্নহার' বইয়ে বৃহস্পতি জলালুদ্দীন কর্তৃক রায় রাজ্যধরের সেনাপতিপদে নিয়োগের উল্লেখ করেছেন। এই বই এবং রঘুবংশটীকা, মেঘদূতটীকা এবং শিশুপালবধটীকার মধ্যে বৃহস্পতির গুরুপ্রদত্ত 'মিশ্র' উপাধি ছাড়া 'আচার্য' এবং 'কবিচক্রবর্তী' এই দুটি মাত্র উপাধির উল্লেখ দেখা যায় এবং শেষ তিনটি বইয়েও রাজ্যধরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। অতএব এই চারটি বইয়ের রচনাকালের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান ছিল না এবং এই বইগুলি জলালুদ্দীনের রাজত্বকালে অথবা তার অল্প পরেই রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু 'পদচন্দ্রিকা'র মধ্যে বৃহস্পতির অতিরিক্ত পাঁচটি উপাধির উল্লেখ দেখা যায়। এই পাঁচটি উপাধি হচ্ছে—পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম ও রায়মুকুট। এতগুলি উপাধি অর্জন করতে সময় লাগে। সুতরাং 'পদচন্দ্রিকা' যে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালের অনেক পরে রচিত হয়েছিল, তা এর থেকেও বোঝা যায়।

পৃঃ ১০৩ পাদটীকা—এখানে যে বংশলতিকাটি ছাপা হয়েছে, তাতে ছাপার গোলমালে কৃত্তিবাসের নামটি বাদ পড়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস।

পৃঃ ১০৫ ছঃ ২০-২৫—ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী তাঁর 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী' বা 'শরফনামা' গ্রন্থে যে বারবক শাহের নাম করেছেন, তিনি বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ কিনা, সে সম্বন্ধে সম্প্রতি ডঃ এ. বি. এম. হবিবুল্লাহ্ সংশয় সৃষ্টি করেছেন। ডঃ হবিবুল্লাহ্ লিখেছেন, "Fārūqī claims Jaunpur as his native town. Bārbak Shāh mentioned in some of the eulogistic verses, therefore, need not necessarily be the Sultan of Bengal, for Jaunpur also at this time

had a Bārbak Shāh, the younger Son of Bahlol Lodī appointed as vassal ruler after Husain Sharqī was driven out and whom Sikandar Lodī finally removed a few year after his accession." (J. A. S. P., Vol. V, p. 215)।

কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী যে বারবক শাহের নাম করেছেন, তিনি বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ভিন্ন আর কেউ নন।

(১) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহকে "আবুল-মুজঃফর বারবক শাহ" বলেছেন। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের অসংখ্য মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে দেখা যায় তাঁর পূর্ণ নাম 'রুকন্-উদ্-দুনিয়া ওয়াদ্-দীন আবুল-মুজঃফর বারবক শাহ।' অতএব বাংলার বারবক শাহের 'আবুল-মুজঃফর' বিরুদ ছিল। কিন্তু জৌনপুরের বারবক শাহের 'আবুল-মুজঃফর' বিরুদ ছিল বলে জানা যায় না। স্ট্যানলী লেনপুল সম্পাদিত 'Coins of the Muhammadan States of India in the British Museum'-এ (p. 112) জৌনপুরের বারবক শাহের মুদ্রার যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে দেখা যায়, মুদ্রায় তাঁকে 'আবুল-মুজঃফর বারবক শাহ' বলা হয়নি, শুধু 'বারবক শাহ' মাত্র বলা হয়েছে।

(২) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী বারবক শাহ সম্বন্ধে লিখেছেন, "বারবক শাহ শাহ-ই-আলম (পৃথিবীপতি) হোন্ এবং তিনি তা'ই। জমশিদের রাজ্য তাঁর অধীনে থাকুক এবং তা আছে।" রুকনুদ্দীন বারবক শাহের প্রশস্তি করে এই সমস্ত কথা কোন কবি লিখতে পারেন। কিন্তু অতি বড় স্তাবকও জৌনপুরের বারবক শাহ সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা লিখতে পারেন না। কারণ জৌনপুরের বারবক শাহ স্বাধীন নৃপতি ছিলেন না, তিনি তাঁর পিতা বহ্‌লোল লোদীর অধীনে সামন্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর পিতা জীবিত ও সিংহাসনে আরূঢ় থাকতে কেউ তাঁকে 'পৃথিবীপতি' ও 'জমশিদের রাজ্যের মালিক' বলে প্রশস্তি করবে বলে কল্পনা করা যায় না। পিতার মৃত্যুর পরে এই বারবক শাহ অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ভ্রাতা সিকন্দর লোদীর কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন এবং কয়েকবছর সিকন্দরের অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে জৌনপুরে থাকেন। কিন্তু জৌনপুরের জমিদারদের বিদ্রোহ দমনে তিনি বারবার ব্যর্থ হওয়ার দরুণ সিকন্দর তাঁকে শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত ও ব[illegible]করেন। অতএব পিতার মৃত্যুর

পরেও জৌনপুরের বারবক এই জাতীয় প্রশস্তি লাভ করতে পারেন বলে মনে করা যায় না।

(৩) বারবক শাহের দান সম্বন্ধে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী লিখেছেন, "যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়েছেন। যারা পায়ে হেঁটে যায়, তারা হাজার হাজার ঘোড়া উপহার পেয়েছে। এই মহান আবুল-মুজঃফর, যাঁর সবচেয়ে সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।"

এই ঘোড়া দান করা বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহেরই বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পিতৃব্য নিশাপতি তাঁর কাছ থেকে ঘোড়া পেয়েছিলেন; এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখেছেন,

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥

বৃহস্পতি মিশ্রকে 'রায়মুকুট' উপাধি দান করবার সময় রুকনুদ্দীন বারবক শাহ তাঁকে ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বৃহস্পতি তাঁর 'পদচন্দ্রিকা'য় লিখেছেন,

যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্টকনকস্নানৈরববিন্দন্নৃপা-
চ্ছত্রৈস্তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্॥

(৪) 'ফরঙ্গ-ই-ইব্রাহিমী'তে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী শুধু বারবক শাহের প্রশস্তি করেননি, "জলালুদ্দীন" নামে আর একজন নৃপতির প্রশস্তি করেছেন (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫-১২৬ দ্রষ্টব্য)। ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী যদি জৌনপুরে বসে বই লিখে তাতে জৌনপুরের শাসনকর্তা বারবক শাহের প্রশস্তি করে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন উঠবে এই জলালুদ্দীন কে? কিন্তু তিনি বাংলায় বসে বই লিখেছেন ও বাংলার বারবক শাহের প্রশস্তি করেছেন ধরলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজেই পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে অনায়াসেই বলা চলে যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী যে "জলালুদ্দীন"-এর প্রশস্তি করেছেন তিনি বারবক শাহের ভাই এবং তাঁর পরের পরের সুলতান জলালুদ্দীন ফতে শাহ।

(৫) বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ছিলেন বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু জৌনপুরের বারবক শাহ তা ছিলেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শব্দকোষ-রচয়িতা পণ্ডিতপ্রবর ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকীর পক্ষে বাংলার বারবক শাহের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করাই স্বাভাবিক।

এই সমস্ত প্রমাণ থেকে অনায়াসেই বলা চলে যে ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী

"বারবক শাহ" বলতে বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহকেই বুঝিয়েছেন।

পৃঃ ১১২ ছঃ ১৯—মহীসন্তোষ বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এখানে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের কয়েকটি শিলালিপি পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গে বারবকাবাদ নামে একটি জায়গা ছিল। এখানকার টাকশালে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ও তাঁর পরবর্তী অনেক সুলতানের মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়েছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে "সরকার বারবকাবাদ"-এর উল্লেখ আছে। বারবক শাহের নাম অনুসারেই যে 'বারবকাবাদ'-এর নামকরণ হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কেউ মনে করেন, বারবকাবাদ ও মহীসন্তোষ অভিন্ন স্থান।

পৃঃ ১১৫ ছঃ ৯-১০—সাম্প্রতিককালে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের অনেক নতুন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলিতে টাকশালের স্থানের নাম লেখা আছে; এই স্থানগুলি হচ্ছে বারবকাবাদ, মুজঃফরাবাদ, ফিরোজাবাদ, জন্নতাবাদ (?) ও সাতগাঁও (?)। এদের মধ্যে বারবকাবাদের অবস্থান সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। মুজঃফরাবাদ পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদের কাছেই অবস্থিত ছিল। জন্নতাবাদকে কেউ কেউ গৌড়ের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু গৌড়ের জন্নতাবাদ নাম ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন রাখেন, এই কথা বিভিন্ন প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থ থেকে জানা যায়। অতএব এই জন্নতাবাদ (?) কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

পৃঃ ১২৩ ছঃ ৪—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগে (পৃঃ ২১৫) লিখেছেন যে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের "রাজ্যকালে শ্রীহট্ট মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে মুসলমানরা প্রথম শ্রীহট্ট জয় করেন (History of Bengal, D. U., Vol. II, pp. 79-80 দ্রঃ)।

পৃঃ ১২৪ ছঃ ৩০—তবে একটি পরোক্ষ প্রমাণ থেকে মনে হয়, য়ুসুফ শাহ ও ফতে শাহের মাঝখানে সিকন্দর শাহের কিছুদিন রাজত্ব করার কথা সত্য। য়ুসুফ শাহের কোন মুদ্রা ৮৮৫ হিঃর পরবর্তী নয় এবং ফতে শাহের কোন মুদ্রা ৮৮৬ হিঃর পূর্ববর্তী নয়। সুতরাং এঁদের মাঝখানে—৮৮৫ হিঃর

শেষ দিকে ও ৮৮৬ হিঃর প্রথম দিকে আর একজন রাজা স্বচ্ছন্দেই রাজত্ব করতে পারেন।

পৃঃ ১৩৫ ছঃ ৪-৯—"মুলুক" শব্দকে 'দেশের ছোট একটি অঞ্চল' অর্থে ব্যবহারের নিদর্শন বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্যেই এক জায়গায় পাওয়া যায়, 'চৈতন্যভাগবত' অন্ত্যখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন,

এইমতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে॥

পৃঃ ১৪৪ ছঃ ১৬-২৪—এইসব বড় বড় রাজা-জমিদাররা সকলেই যে হিন্দু ছিলেন, তার প্রমাণ হরিদাসের উক্তির মধ্যেই আছে—এঁরা সকলেই বন্দী অবস্থায় কৃষ্ণের নাম করছিলেন।

পৃঃ ১৪৬ ছঃ ৭—"খওয়াজা সেরা"র অর্থ 'প্রাসাদের খোজা'।

পৃঃ ১৬১ ছঃ ১২-১৪—মুন্‌শী শ্যামপ্রসাদের উক্তির জন্য J. A. S. B., 1902, Pt. I, No. 1, p. 44 দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ১৬৩ ছঃ ২৬-২৮—মুহম্মদাবাদের টাকশালে উৎকীর্ণ সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহের কতকগুলি মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে।

পৃঃ ১৬৫ ছঃ ২২—ডঃ আবদুল করিম সম্প্রতি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের কোন মুদ্রা এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি, যে সমস্ত মুদ্রা এযাবৎ তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে, সেগুলি প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের (Corpus of the Muslim Coins of Bengal, pp. 173-176 দ্রঃ)।

পৃঃ ১৬৭ ছঃ ২২-২৬—ব্লকম্যান লিখেছিলেন যে প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের মুদ্রা ও শিলালিপিতে তাঁর নামের সঙ্গে "আবুল-মুজঃফর" বিরুদ (kunyah) যুক্ত দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের মুদ্রা ও শিলালিপিতে "আবুল-মুজঃফর"-এর বদলে "আবুল-মুজাহিদ" পাওয়া যায়; সুতরাং এঁদের নাম সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়, অতএব এঁদের মধ্যে পিতামহ-পৌত্র সম্পর্ক থাকতে কোন বাধা নেই (J. A. S. B., 1873. Pt. I, No. 3, p. 288 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ব্লকম্যান একথা লেখার পরে প্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের এমন অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের মধ্যে "আবুল-মুজঃফর" বিরুদের বদলে "আবুল-মুজাহিদ" বিরুদ লেখা আছে; যে সমস্ত মুদ্রা দ্বিতীয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের উপর আরোপ করা হয়েছে, তাদের

মধ্যেও কিছু মুদ্রাতে "আবুল-মুজাহিদ"-এর বদলে "আবুল-মুজঃফর" লেখা আছে বলে দেখা গেছে। সুতরাং ব্লকম্যানের যুক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হচ্ছে। উভয় নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের নাম অবিকল অভিন্ন, সুতরাং এঁদের পিতামহ-পৌত্র হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

পৃঃ ১৭০ ছঃ ১৬-২৩—সম্প্রতি শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহের ফতেহাবাদের টাকশালে উৎকীর্ণ কতকগুলি মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে সুদূর দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত শামসুদ্দীন মুজঃফর শাহের অধিকার ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

পৃঃ ১৭৫ ছঃ ১৫-১৭—ফার্সী ভাষায় লেখা আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত সূত্রগুলির মধ্যে 'মাসির-ই-রহিমী'ও অন্যতম।

পৃঃ ১৭৬ ছঃ ৩-৬—যে সমস্ত প্রামাণিক পর্তুগীজ গ্রন্থে হোসেন শাহ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালে বাংলায় পর্তুগীজদের আগমন এবং ঐ সময়ের আরও কোন কোন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হল।

(১) জোআঁ দে বারোসের লেখা 'Asia : dos Feitos que os Portuguesas fizeram no Descobrimento e Conquista dos Mares e Terras do Oriente'। এই বই 'Da Asia' বা 'Asia' নামে সাধারণত পরিচিত। লেখক লিসবনের "India House"-এর কার্যাধ্যক্ষ এবং গোমস্তা ছিলেন। এই বইয়ের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

(২) গাসপার কোরীআর লেখা 'Lendas da India'। লেখক প্রাচ্যের পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলগুলির শাসনকর্তা আলবুকার্কের সেক্রেটারী ছিলেন এবং ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতে আসেন। তাই আলোচ্য সময়ের ঘটনা সম্পর্কে এই বইয়ের সাক্ষ্য খুবই মূল্যবান। এই বই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই রচিত হয়।

(৩) মনোএল-দে ফরিআ-ই-সুজার লেখা 'Asia Portuguesa'। লেখকের জীবৎকাল ১৫৮১-১৬৪৯ খ্রীঃ। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বইয়ের প্রথম খণ্ড এবং ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এর সর্বশেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

এই তিনটি বইয়ের মধ্যে প্রথম দুটি বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তৃতীয়টির যে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ। জে. জে. এ. ক্যাম্পোস তাঁর 'History of the Portugese

in Bengal'-এ এই বইগুলির বিবরণের যে সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন, তা'ই আমরা ব্যবহার করেছি।

পৃঃ ১৭৬ ছঃ ১৮-২৫—এই "চাঁদপুর" বর্তমানে "চাঁদপাড়া" বা "একানী চাঁদপাড়া" নামেও পরিচিত।

পৃঃ ১৭৮ ছঃ ১০—সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে রূপ-সনাতনের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কথা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২৫শ পরিচ্ছেদ, ১৫৯-১৬৫ সংখ্যক শ্লোক থেকে জানা যায়।

পৃঃ ১৮০ ছঃ ১-২—ফ্রান্সিস বুকানন এসম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার জন্য Martins Eastern India, Vol. III, p. 448 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৮২ ছঃ ২২-২৬—ফ্রান্সিস বুকাননের উক্তি Martin's Eastern India, Vol. III, p. 448-এ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ১৮৩ ছঃ ১-২—"তৃতীয়ত"র পরে "চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিক বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে" কথাটি সংযোজনীয়।

পৃঃ ১৮৪ ছঃ ৩০—"লেখা আছে যে"র পরে "হাজী মুহম্মদ কন্দাহারীর মতে" কথাটি সংযোজনীয়।

পৃঃ ১৮৮ ছঃ ১৩-১৪—এখানে "জনৈক গবেষক" বলে যাঁর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর নাম মমতাজুর রহমান তরফদার। হোসেন শাহ ও তাঁর বংশের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি মূল্যবান গবেষণা করেছেন। তাঁর দুটি প্রবন্ধ থেকে আমি অনেক সাহায্য পেয়েছি। প্রবন্ধ দুটির নাম,

(১) Husain Shah in Bengali Literature (I. H. Q., Vol. XXXII, pp. 56-80-তে প্রকাশিত)।

(২) The Frontiers of Bengal under the Husain Shahi Rulers (Bengal : Past and Present, Vol. LXXVII, pp. 42-49-এ প্রকাশিত)।

পৃঃ ১৯৪ ছঃ ৫—আমাদের মনে হয়, 'রিয়াজ-উস্-সলাতীনে' হোসেন শাহ কর্তৃক বিজিত অঞ্চলগুলির রাজাদের যে সব নাম দেওয়া হয়েছে, সেইগুলিই বুকাননের বিবরণীতে বিকৃত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে; 'রিয়াজ'-এ উল্লিখিত 'মল কুনওয়ার' (মল কুঁআর) ও 'রূপনারায়ণ' বুকাননের বিবরণীতে যথাক্রমে 'Malkongyar' ও 'Harup Narayan'-এ পরিণত হয়েছে।

পৃঃ ১৯৪ ছঃ ১০-১১—মিথিলা বা ত্রিহুতের রাজা ভৈরবসিংহের পুত্রঃ

'রূপনারায়ণ' বিরুদধারী রামভদ্রসিংহ এবং তাঁর পুত্র 'কংসনারায়ণ' বিরুদধারী লক্ষ্মীনাথ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সমসাময়িক ছিলেন। ঠিক 'লক্ষ্মীনারায়ণ' নামে কোন রাজা অবশ্য ঐ সময় ত্রিহুতে ছিলেন না। তবে লক্ষ্মীনাথের নাম ও বিরুদের একাকার করে ফেলে তাঁকে 'লছমীনারায়ণ' বানানো 'রিয়াজ'-রচয়িতা বা তাঁর সংবাদদাতার পক্ষে অসম্ভব নয়।

পৃঃ ১৯৪ ছঃ ১৪—হাজীপুর পাটনার অপর পারে হরিহরক্ষেত্র বা শোনপুর-এর পাশে অবস্থিত।

পৃঃ ১৯৭ ছঃ ২৫-২৬—হোসেন শাহের আসাম অভিযানের সময় সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা অনুমান করা যেতে পারে। হোসেন শাহের রাজ্য ও আসাম রাজ্যের মাঝখানে কামতাপুর রাজ্য অবস্থিত ছিল। আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ কামতাপুর রাজ্য জয় করেন। আসাম রাজ্য আক্রমণ করতে হলে কামতাপুর দিয়ে যেতে হয়। সুতরাং ১৫০০ খ্রীঃর পরে হোসেন শাহ আসাম রাজ্য আক্রমণ করেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। অবশ্য শ্রীহট্টের দিক থেকেও আসামে অভিযান করা যেতে পারে, কিন্তু তখনকার দিনে ঐদিকের পথ খুবই দুর্গম ছিল বলে এই সম্ভাবনা কম। ত্রিপুরার 'রাজমালা'র মতে ১৪৩৬ শকাব্দ বা ১৫১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ বলেছিলেন, "উড়িয়া আসাম কোচ জিনিয়া লইল।" এর থেকে মনে হয়, শিহাবুদ্দীন তালিশ ও গোলাম হোসেন আসাম অভিযানে হোসেন শাহের যে প্রাথমিক সাফল্যের কথা বলেছিলেন, তা ১৫০০ খ্রীঃ থেকে ১৫১৪-১৫ খ্রীঃর মধ্যেই ঘটেছিল এবং এর পরে কোন এক সময়ে আসামে হোসেন শাহের বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে।

পৃঃ ১৯৭ ছঃ ২৯-৩০—হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কনের যে মতের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করেছি, তা তাঁর লেখা 'আসাম বুরঞ্জি'-তে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ বই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। একজন অসমীয়া পণ্ডিত কর্তৃক বাংলা ভাষায় লেখা আসামের ইতিহাস-গ্রন্থ হিসাবে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু এই বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য খুবই অকিঞ্চিৎকর। এর মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার সুলতানদের আসাম-অভিযান সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তা নীচে উদ্ধৃত হল (অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের সৌজন্যে আমি এই বইটি দেখতে ও এই অংশটি উদ্ধৃত করতে সমর্থ হয়েছি)।

"গৌড়দেশের বাদশাহ হুসেন শাহার জামাতা নওয়াব দুলালগাজী নামক একজন কোন কারণ নিমিত্ত মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে, তিনি মক্কা না

গিয়া কামরূপে আসিয়া কামরূপ অধিকার করিয়া এইখানেই ওয়াক্কা হন। তাঁহার কবর গুয়াহাটিতে লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর পারে আছে।

"পরে তৎপুত্র মসন্দর গাজী এই দেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী অশ্বক্রান্তের উত্তরে ছিল।

"পরে তাঁহার মরণান্তে স্থলতান গয়াস্থদ্দিন গৌড় হইতে আসিয়া এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া শাসন করিয়াছিলেন। আরো তিনি হিন্দুর অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া লৌহিত্যের উত্তর গরুড়াচল পর্ব্বতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন। তাঁহার যে কবর আছে তাহাকে পাওমক্কা কহে।"

উদ্ধৃত অংশটিতে ডুলাল গাজী "মক্কা যাওয়া আবশ্যক হওয়াতে" মক্কায় না গিয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে কামরূপে কেন গেলেন, তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এই অংশটিতে যে "স্থলতান গয়াস্থদ্দিন"-এর কথা বলা হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই হোসেন শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ্‌। কিন্তু ঐ স্থলতান সম্বন্ধে এতে যা লেখা হয়েছে,তা সম্পূর্ণ অলীক। কারণ শের শাহ্‌ গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহের রাজ্য কেড়ে নেবার পর গিয়াসুদ্দীন বাংলার পূর্বদিকে অবস্থিত কামরূপে যান নি, পশ্চিমদিকে বিহার অঞ্চলে গিয়েছিলেন, সেখানে শোন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তার অল্প বাদেই তিনি পরলোকগমন করেন; একথা প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। অতএব তাঁর "গৌড় হইতে আসিয়া" কামরূপ শাসন করে সেখানে মৃত্যু বরণ করার কথা সম্পূর্ণ অমূলক। 'রিয়াজ-উস্‌-সলাতীনে'র মতে গিয়াসুদ্দীন মাহ্‌মূদ শাহ ভাগলপুরের নিকটবর্তী কহলগাঁওতে পরলোকগমন করেছিলেন।

পৃঃ ২০০ ছঃ ২৬-পৃঃ ২০১ ছঃ ৪—এখানে 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক থেকে উদ্ধৃত অংশের যে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, তা আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ।

পৃঃ ২০৩ ছঃ ২৪—সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লেখা প্রায় সমস্ত চৈতন্যচরিতগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। এসম্বন্ধে ডঃ এন. কে. সাহু একটি অভূতপূর্ব মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, "It may be pointed out that nowhere in any of his inscriptions, which are so numerous and in any of his literary works Prataprudra speaks of Sri Chaitanya as his

Guru, and that contemporary literature, either Sanskrit, Oriya, or Bengali, has not declared Sri Chaitanya a royal preceptor. On the other hand we know definitely that Kavidindima Jivadevacharya the court poet, was the royal Guru." (A History of Orissa, ed. by N. K. Sahu, Vol II, p. 387)

এই উক্তি সত্যিই বিস্ময়কর। কেউ কোনদিনই বলেনি যে চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন; সুতরাং তা খণ্ডন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের মতে চৈতন্যদেব কখনও কারও দীক্ষাদাতা গুরু হননি। চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলির মতে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন, তাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণই নেই; জীবদেবাচার্য কবিডিণ্ডিম যে প্রতাপরুদ্রের গুরু ছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বয়ং জীবদেবাচার্য কবিডিণ্ডিমের লেখা "ভক্তিভাগবতম্"-এর ২৮ নং শ্লোক থেকেই জানা যায় যে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। ঐ শ্লোকের ইংরেজী অনুবাদ এই,

"'The King (Prataparudra) with long arms weakened his enemies and increased his dominions, purified his inner souls by the theory of non-duality, but spread the dual doctrine at the incarnation of Krishna (Chaitanya)."

পৃঃ ২১০ ছঃ ১-২—এই শিলালিপির তারিখ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য Epigraphica Indica, 1950, p. 206 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ২১০ ছঃ ২৩-২৪—India Office Liberaryর 5469 নং পুঁথিতে 'সরস্বতীবিলাসমে'র পুষ্পিকার পাঠ এই,

"ইতি গজপতিগৌড়েশ্বরন(ব)কোটি-কর্ণাটকলুবরিরেশ্বর-জয়মুনাপুরাধীশ্বর-হুশনসাহসুরত্রাণশরণরক্ষণ-শ্রীদুর্গাবরপুত্র-পরমপবিত্রচরিত্র-রাজাধিরাজরাজপরমেশ্বর-বীরপ্রতাপরুদ্রদেব-মহারাজ বরচিতে স্মৃতিসংগ্রহে সরস্বতীবিলাসে ব্য(ব)হারকাণ্ডে প্রকীর্ণকাখ্যস্ত পদস্ত বিলাসঃ।"

(Catalogue of the Sans. & Prakrit Mss., Ind. Off. Lib., Vol. II, Pt. I, p. 424)

"শরণাগত-জবুনাপুরাধীশ্বর-হুসনশাহসুরত্রাণ-শরণরক্ষণ" পাঠটি ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' (পৃঃ ২২) থেকে নেওয়া।

পৃঃ ২১১ ছঃ ২৭—এখানে বলা হয়েছে যে সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রতাপরুদ্রের বয়স ১৭ বছর ছিল। প্রতাপরুদ্র ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব তিনি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

পৃঃ ২১৬ ছঃ ২৬-পৃঃ ২১৭ ছঃ ২—বিভিন্ন লেখক ত্রিপুরার রাজাদের রাজত্বকাল বিভিন্নভাবে নির্দেশ করেছেন। ধর্মমাণিক্য সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে তিনি ১৩৮০ শকের মধ্যেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, কারণ তাঁর ১৩৮০ শকের ("শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বর্ষে") এক তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। 'রাজমালা'য় লেখা আছে যে তিনি ৩২ বছর রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং তিনি অন্তত ১৪৫৮-১৪৯০ খ্রীঃ অবধি নিশ্চয়ই রাজত্ব করেছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধেও প্রচণ্ড মতভেদ আছে। কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা' দ্বিতীয় লহরের ১৮৪ পৃষ্ঠায় "ত্রিপুরেশ্বরগণের কালনির্ণায়ক প্রাচীন লিপি"র যে ফটো প্রকাশিত হয়েছে, তাতে গোবিন্দ-মাণিক্যের সিংহাসনে আরোহণের সময় ১৫৫৯ শকাব্দ এবং রাজত্বকাল ৩৮ বছর লেখা আছে। এই সময়নির্দেশ সমীচীন বলে মনে হওয়ায় এখানে আমরা তা'ই গ্রহণ করেছি। অমরমাণিক্য ও কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে মতপার্থক্য বিশেষ নেই। হোসেন শাহের সমসাময়িক ত্রিপুরা-রাজ ধন্যমাণিক্যের সিংহাসনে আরোহণের ও পরলোকগমনের সময় সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে তিনি যে অন্তত ১৪৯০-১৫১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নেই।

পৃঃ ২১৭ ছঃ ৩-৪—সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত 'রাজমালা'র এই পুরোনো পুঁথিটিতে লিপিকাল দেওয়া নেই, তবে এর লিপিকাল অন্য উপায়ে জানা যায়। 'রাজমালা'র এই পুঁথির মধ্যে (৪৯ খ ও ৫৫ খ পৃষ্ঠায়) লিপিকরের নাম দেওয়া আছে "শ্রীরামনারায়ণ দেব"। এই রামনারায়ণ দেবেরই নকল করা 'চম্পকবিজয়' নামে একটি ঐতিহাসিক কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে—তার পুষ্পিকায় লেখা আছে—"পুস্তক শ্রীরামজয়ঠাকুর স্বাক্ষর শ্রীরামনারায়ণ দেব সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ।" (ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৯ দ্রষ্টব্য) 'চম্পকবিজয়'-এর পুঁথি যখন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ('সন' অর্থে বঙ্গাব্দ না ধরে ত্রিপুরাব্দ ধরলে ১৮০২ খ্রীঃ হয়) লিপিকৃত হয়েছিল, তখন একই লিপিকরের নকল করা 'রাজমালা'র পুঁথি তার কয়েক বছরের মধ্যেই নকল করা হয়েছিল সন্দেহ নেই। দুর্গামণি উজীর মহারাজ

কাশীচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৬-৩০ খ্রীঃ) 'রাজমালা' সংশোধন করেন। সুতরাং সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত 'রাজমালা'র পুঁথি তার আগেই লিপিকৃত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সর্বপ্রথম এই পুঁথিটির পরিচয় দেন (সা. প. প., ১৩৫৮, পৃঃ ১-৯ দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ২২৮ ছঃ ৬-৭—"গৌরাই মল্লিক মেহেরকুলের পথে অগ্রসর হয়ে গোমতী নদীর উপর দিক দখল করেছিলেন," এই উক্তির অর্থ এই নয় যে মেহেরকুল গোমতী নদীর উপরের দিকে অবস্থিত। ত্রিপুরার মানচিত্র (কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা' ২য় লহর, পৃঃ ২৮০ দ্রষ্টব্য) থেকে দেখা যায় যে, মেহেরকুল গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত নয়, ঐ নদীর খানিকটা দক্ষিণে অবস্থিত। 'রাজমালা'য় গৌরাই মল্লিকের বাহিনীর যাত্রাপথের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়নি, কেবলমাত্র এইটুকু বলা হয়েছে যে গৌরাই মল্লিক মেহেরকুলের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং চণ্ডীগড় দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। চণ্ডীগড় গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। সুতরাং সহজেই অনুমান করা চলে যে গৌরাই মল্লিক যখন চণ্ডীগড় দুর্গ জয় করতে পারলেন না, তখন তিনি চণ্ডীগড় দুর্গের পাশ কাটিয়ে সামান্য অগ্রসর হয়ে গোমতী নদীর উপরের দিক দখল করলেন এবং তাতে প্রথমে বাঁধ দিয়ে ও পরে বাঁধ খুলে চণ্ডীগড় দুর্গে অবস্থিত ত্রিপুরারাজের বাহিনীর বিপর্যয় ঘটালেন। গৌরাই মল্লিক যে এইভাবে চণ্ডীগড় দুর্গের পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত 'রাজমালা'র পুরোনো পুঁথিতে পাই; তাতে লেখা আছে যে চণ্ডীগড় দুর্গের "পাছে পাছে কাছে কাছে গেল গৌড় সেনা" (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০ দ্রঃ)।

পৃঃ ২৩০ ছঃ ৫-৬—কোন কোন পুঁথিতে এই দুই ছত্রের এই পাঠ পাওয়া যায়,

যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥

এই পাঠ ঠিক হলে বলতে হবে, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত রচনার সময়ে বাংলার সুলতান ও ত্রিপুরার রাজার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল।

পৃঃ ২৩০ ছঃ ৭—কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে কোন কোন গবেষক এক ব্যক্তি বলেই মনে করেন। আমরাও 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ে (পৃঃ ১২৫-১২৬) সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে এঁরা এক লোক। কিন্তু

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যেমন যুক্তি আছে, বিপক্ষেও তেমনি আছে। আপাতত আমাদের এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। আলোচনার সুবিধার জন্য বর্তমান গ্রন্থে আমরা এঁদের "দুই কবি" হিসাবেই উল্লেখ করেছি। এর দ্বারা ঠিক আমাদের পূর্বমতের পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না।

পৃঃ ২৩০ ছঃ ১২-১৩—পরাগল খানের আদেশে লেখা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত ১৫০০ খ্রীঃর পরে রচিত হয় (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১২৬ দ্রষ্টব্য)। এই বই রচনার কয়েক বছর পরে শ্রীকর নন্দীর মহাভারত রচিত হয়।

পৃঃ ২৩১ ছঃ ৭-৮—শ্রীকর নন্দী যদি হোসেন শাহের রাজত্বকালে মহাভারত লিখে থাকেন, তাহলে তার মধ্যে উল্লিখিত ছুটি খানের ত্রিপুরা-অভিযান নিশ্চয়ই হোসেন শাহের রাজত্বকালে ঘটেছিল; আর যদি তিনি নসরৎ শাহের রাজত্বকালেই মহাভারত লিখে থাকেন, তাহলে ছুটি খানের ত্রিপুরা-অভিযান নসরৎ শাহের রাজত্বকালেও ঘটতে পারে আবার হোসেন শাহের রাজত্বকালেও ঘটতে পারে। অতএব যে দিক দিয়েই দেখা যাক্ না কেন, শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে উল্লিখিত ছুটি খানের ত্রিপুরা-অভিযান হোসেন শাহের রাজত্বকালে ঘটারই সম্ভাবনা বেশী।

পৃঃ ২৩২ ছঃ ৮—"তিনি" বলতে এখানে "বাংলার সুলতান"কে বোঝানো হয়েছে।

পৃঃ ২৩২ ছঃ ১৩-১৬—গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে লেখা মুজঃফর শাম্‌স বলখির আলোচ্য চিঠির জন্য Proceedings of the 19th session of Indian History Congress, 1956, pp. 217-220 দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ২৩৫ ছঃ ২২-২৩—"বিহার" বলতে এখানে 'বিহার শরীফ'কেই বোঝানো হয়েছে, বর্তমান বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অঞ্চল তখনও 'বিহার' নামে পরিচিত হয়নি। সুতরাং এই শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে সিকন্দর শাহের সমগ্র "বিহার রাজ্য" জয়ের কথা অনুমান করা যায় না।

পৃঃ ২৩৬ ছঃ ১-২—সারণ জেলার ইসমাইলপুরেও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। তার তারিখ, শাবান ৯০৬ হিঃ (মার্চ, ১৫০১ খ্রীঃ)। সারণ জেলার সন্নিহিত হাজীপুর যে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়।

পৃঃ ২৪৩ ছঃ ২৩-২৭—হোসেন শাহের সমাধি-ভবনটি ছিল এক অপূর্ব সুন্দর শিল্পকর্মের নিদর্শন। মেজর উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন এই ভবনটি স্বচক্ষে দেখে এর এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন,

"You enter by a handsome arched gateway built of stone, the sides and front of this doorway are incrusted with a peculiar kind of composition, blue and white China tiling, which has a singular appearance ; at the four corners are large roses cut in the stone···The minarets which flank the building are ornamented with curious carved work of trees, flowers, etc. Within the doorway is a large enclosoure containing the bodies of Shah Sultan Hosein and other branches of the royal family. The sides of the enclosure are incrusted with the same kind of blue and white composition." (Memoirs of Gaur and Pandua, p. 59 দ্রষ্টব্য)

ক্রেটন এই সমাধি-ভবনটিকে দেখে এর একটি ছবি এঁকেছিলেন। সেটি দেখলে এই অধুনালুপ্ত সমাধি-ভবনের অতুলনীয় সৌন্দর্যের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। মধ্যযুগের মুসলমান নৃপতিরা অনেক সময় নিজেরাই নিজেদের সমাধি-ভবন নির্মাণ করে তাতে সমাধির স্থান নির্বাচন করে রাখতেন। হোসেন শাহও সম্ভবত তা'ই করেছিলেন। এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে এর থেকে হোসেন শাহের শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যরসিকতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

পৃঃ ২৫৪ ছঃ ৯-১১—কোন কোন গবেষক মনে করেন, কবি কঙ্ক ও শেখ ফয়জুল্লাহ ষোড়শ শতাব্দীতে যথাক্রমে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেছিলেন। কিন্তু আমরা এই মত সমর্থন করি না। এ সম্বন্ধে আমরা 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বিশদভাবে আলোচনা করব।

পৃঃ ২৫৮ ছঃ ১৫—অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে দৌলত-উজীর বাহ্‌রাম খান ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খ্রীঃর মধ্যে 'লায়লী-মজনু' কাব্য রচনা করেন (ঢাকার বাঙলা-একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'লায়লী-মজনু'র ভূমিকা, পৃঃ ১২-২৭ দ্রষ্টব্য)। বাহ্‌রাম খান 'লায়লী-মজনু'তে লিখেছেন "চাটিগ্রাম-অধিপতি" "নৃপতি নেজাম শাহা সুর" তাঁর পিতাকে ও তাঁকে "দৌলত-উজীর" খেতাব

দেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মতে এই "নেজাম শাহা স্থর" শের শাহ স্থরের ভ্রাতা নিজাম খান।

কিন্তু শের শাহের ভাই নিজাম খান যে কোনদিন "চাটিগ্রাম-অধিপতি" হয়েছিলেন, এ কথা কোন সূত্র থেকে জানা যায় না। আরও একটি কারণে অধ্যাপক আহমদ শরীফের মত সমর্থন করা চলে না। 'লায়লী-মজনু'তে বাহ্‌রাম খান লিখেছেন যে তাঁর পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের নরপতি হোসেন শাহের "প্রধান উজীর" ছিলেন ; এরপর কবি লিখেছেন

অনুক্রমে বংশ কথ গঞিলেন্ত এই মত গৌড়ের অধীন (পাঠান্তর—অদিন)
হইল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি নৃপতি নেজাম শাহা স্থর ॥

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ পরলোক গমন করেন। তার ২৬ থেকে ৩৪ বছর পরে কাব্য রচনা করলে বাহ্‌রাম খান এই উক্তি করতেন না। তাঁর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, হোসেন শাহের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামে বহু রাজবংশ রাজত্ব করে যাওয়ার পরে নিজাম শাহ সেখানে রাজা হন। সুতরাং ১৫১৯ খ্রীঃর অন্তত ১০০ বছর পরে বাহ্‌রাম খান কাব্য রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাহ্‌রাম খান যে ঔরংজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ 'লায়লী-মজনু'র উপক্রমে "আওরঙ্গ শাহা দিল্লীশ্বর"-এর প্রশস্তি আছে এবং এই প্রশস্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলবার কোন কারণ নেই। বাহ্‌রাম খান যে ঔরংজেবের সমসাময়িক, তার অন্য প্রমাণও আছে। চট্টগ্রাম-নিবাসী কবি মোহাম্মদ খানের লেখা 'মক্তুল হোসেন' (রচনাকাল ১০৫৬ হিজরা বা ১৬৪৫-৪৬ খ্রীঃ) কাব্যে এক পীর সদর জাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁকে বারো ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ সংবর্ধনা করেছিলেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃঃ ১০০ দ্রঃ)। ঈশা খাঁ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে স্বাধীন রাজা হন এবং ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন (History of Bengal, D. U., Vol. II, p. 238 দ্রঃ)। [ঐ সদর জাঁহার প্রকৃত নাম শাহ আবদুল ওহাব (সা. প. প., ১৩৫৪, পৃঃ ২৭-২৮ দ্রঃ)।] এদিকে চট্টগ্রামবাসী বাহ্‌রাম খানও 'লায়লী-মজনু'তে লিখেছেন যে তাঁর পীর আছাউদ্দীনের প্রপিতামহের নাম সদর জাঁহা (ছদরজাহান)। সদর জাঁহা

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জীবিত থাকলে তাঁর প্রপৌত্রের শিষ্য বাহ্‌রাম খান খুব স্বাভাবিকভাবেই ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রীঃর মধ্যে জীবিত থাকবেন।

'লায়লী-মজনু' ঔরংজেবের রাজত্বকালের প্রথমার্ধে রচিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ এই কাব্যে বাহ্‌রাম খান চট্টগ্রামের "নগর ফতেয়াবাদ" নামের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করে ঔরংজেবের আদেশ অনুসারে তার নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'। অবশ্য কোন স্থানের নাম একবার পরিবর্তিত হওয়ার পরেও লোকে কিছুদিন তার পুরোনো নাম বর্জন করে না। যেমন কলকাতার হ্যারিসন রোডের নাম কয়েক বছর আগে 'মহাত্মা গান্ধী রোড'-এ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও লোকে তাকে এখনও হ্যারিসন রোড বলে। তাই, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০।১৫ বছর পর পর্যন্ত বাহ্‌রাম খানের পক্ষে চট্টগ্রামকে "ফতেয়াবাদ" বলা সম্ভব, তার পরে আর নয়। তাই, ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাহ্‌রাম খান 'লায়লী-মজনু' রচনা করেছিলেন বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

বাহ্‌রাম খানের পৃষ্ঠপোষক "নেজাম শাহা" বা নিজাম শাহ কোন মুসলমান নৃপতি নন, তিনি আসলে আরাকানের রাজা। তার প্রমাণ, বাহ্‌রাম খান নিজাম শাহকে "ধবল অরুণ গজেশ্বর" বলেছেন। আলোচ্য সময়ের আরাকানের রাজাদের যে এই জাতীয় উপাধি ছিল (উপাধিগুলিকে বিভিন্ন কবি ও অনুবাদক বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় "ধবল অরুণ গজেশ্বর"; "ধবল গজেশ্বর"; "শ্বেত রক্ত মাতঙ্গ ঈশ্বর"; "Lord of the Red Elephant, Lord of the White Elephant"; "Elder brother of the sun, Lord of the golden House and White Elephant" প্রভৃতি রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন),—তা আরাকানের রাজাদের মুদ্রা থেকে, দৌলৎ কাজীর 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী', আলাওলের 'পদ্মাবতী', মোহাম্মদ খানের 'মক্‌তুল হোসেন' প্রভৃতি কাব্য থেকে এবং শিহাবুদ্দীন তালিশের লেখা মোগল বাহিনীর চট্টগ্রাম-বিজয় সংক্রান্ত বিবরণ থেকে জানা যায় (J. A. S. B., Vol XV, 1846, p. 234-235; প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৬৮, পৃঃ ৬০৬-৬০৮; বা. সা. ই. ১।২, পৃঃ ৫৯৮ এবং Studies in Mughal India by Jadunath Sarkar, p. 119 দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং "নেজাম শাহা" আরাকানেরই রাজা। আরাকানের রাজার মুসলমানী নাম থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুলতানের

সাহায্যে মেং-সোআ-মৃউন রাজ্য ফিরে পাবার (বর্তমান গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬-৬৭ দ্রঃ) পর থেকে আরাকানের রাজারা নিজেদের আসল নামের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে মুসলমানী নামও নিতেন; এঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের মুদ্রায় মুসলমানী নাম উল্লেখ করেছেন, সকলে অবশ্য করেন নি। বাহ্‌রাম খান যখন 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন, তখন ঔরংজেব জীবিত ছিলেন, সম্ভবত 'নেজাম শাহা'ও জীবিত ছিলেন; দুজনেই যদি এই সময়ে জীবিত থাকেন, তাহলে বলতে হবে এই 'নেজাম শাহা' আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্রসুধর্মা (রাজত্ব-কাল ১৬৫২-১৬৮২ খ্রীঃ), কারণ তিনিই ঔরংজেবের সমসাময়িক একমাত্র আরাকানরাজ, যিনি "চাটিগ্রাম-অধিপতি" ছিলেন।

পৃঃ ২৬০ ছঃ ২৫—আগে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১-২০২) দেখানো হয়েছে যে ঠিক এই সময়ে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যে কার্যত কোন যুদ্ধ হচ্ছিল না। সুতরাং এখানে "যুদ্ধ চলছিল"র জায়গায় "শত্রুতা বর্তমান ছিল" পঠনীয়।

পৃঃ ২৭১ ছঃ ১২—শ্রীযুক্ত গোবর্ধন দাস বাবাজী তাঁর 'শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ' বইয়ে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯) রূপ-সনাতনের সমসাময়িক বলে কথিত এবং সনাতনের নাম সংবলিত দুটি দলিলের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'পিরোজপুরের নিষ্কর মালিকদার মিঞা সাহেবের আরবি ভাষায় লিখিত দলিলের শিরোদেশে পাতশাহের স্বর্ণমসীদ্বারা দেবাক্ষরে এইরূপ লিখিত আছে—'শ্রীল শ্রীযুক্ত গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক সনাতন দবিরখাস।' কিন্তু কদমরোশুল নামক দরগার নিষ্কর ভূমির দলিলে কেবল—'শ্রীসনাতন দবিরখাস' লিখিত আছে।" শ্রীযুক্ত গোবর্ধন দাস বাবাজী আরও লিখেছেন যে উল্লিখিত দুটি দলিলের মধ্যে প্রথমটি রূপের এবং দ্বিতীয়টি সনাতনের স্বহস্তে লেখা বলে তিনি শুনেছেন। কিন্তু তিনি এই দুটি দলিলের বিস্তৃত বিবরণ দেন নি অথবা এদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নি। এতদিন বাদে রূপ-সনাতনের আমলের দলিল আবিষ্কৃত হওয়া যেমন সন্দেহজনক, তেমনি মুসলমানের কাছে প্রাপ্ত আরবী ভাষায় লেখা দলিলে সনাতনের "গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক" উপাধির উল্লেখ থাকা অত্যন্ত বিস্ময়কর। সেইজন্যে এই দুটি দলিল জাল বলে আমাদের সন্দেহ হয়। যদি দলিল দুটি অকৃত্রিম হয়, তাহলে এদের মধ্যে সনাতনের "দবির খাস" উপাধির উল্লেখ এইটুকু প্রমাণ করবে যে সনাতন হোসেন শাহের 'দবীর খাস' ছিলেন; কিন্তু এই তথ্য আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নয়।

পৃঃ ২৭২. ছঃ ২৫—ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭, পৃঃ ৯২০ দ্রষ্টব্য। অর্বাচীন কিংবদন্তীর মতে সনাতন ও রূপের পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ। এই কিংবদন্তীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

পৃঃ ২৭৪ ছঃ ১৮-১৯—চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২৫শ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁকে অনেক যত্ন করেছিলেন,

রূপগোস্বামী আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈল।
আপনসঙ্গে লঞা দ্বাদশবন করাইল ॥

ঐ পরিচ্ছেদেই লেখা আছে যে সনাতন মথুরাতে এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে রূপ ও অনুপমের সংবাদ বলেছিলেন এবং

সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।

পৃঃ ২৭৬ ছঃ ৬-৭—"অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করান" স্থলে "তাঁর ঘরে অভক্ষ্য মাংস রন্ধন করান" পঠনীয়।

পৃঃ ২৭৬ ছঃ ১১—এই ছত্রের প্রথম সালাঙ্কটি অস্পষ্টভাবে ছাপা হয়েছে। এটি "১৪৫৪" হবে।

পৃঃ ২৭৭ ছঃ ১১—কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'তেও (রচনাকাল ১৪৯৮ শক বা ১৫৭৬-৭৭ খ্রীঃ) শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীবের নাম আছে, তাতে বলা হয়েছে চিরঞ্জীব গৌরাঙ্গের একান্তশরণ এবং নরহরির সহচর,

খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্যান্মহত্তরৌ
গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ ॥

পৃঃ ২৮১ ছঃ ২১-২৩—জগাই-মাধাই নবদ্বীপের "রাজা" বা "নায়ক" বা "অধিকারী" ছিল না। তাদের "পূজ্য" বলেও যে মনে করা হত না, তা চৈতন্যচরিতগ্রন্থগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায়। "ব্রাহ্মণ" অবশ্য তারা ছিল, কিন্তু নবদ্বীপে তো আরও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, সুতরাং জগাই-মাধাইকে বিশেষভাবে "নবদ্বীপের ঠাকুর" বলা হবে কেন? অতএব লোচন-দাস যে তাদের "রাজা" বা "নায়ক" বা "অধিকারী" বা "পূজ্য" বা "ব্রাহ্মণ" অর্থে "ঠাকুর" বলেন নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পৃঃ ২৮৪ ছঃ ২০-২১—এই স্থানগুলির মধ্যে মুয়াজ্জমাবাদ সোনারগাঁওয়ের অদূরে অবস্থিত। খলিফতাবাদ বাগেরহাটের নামান্তর। হোসেনাবাদ নামে ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় তিনটি স্থান আছে, তাদের মধ্যে কোন্‌টি থেকে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মুদ্রা বেরিয়েছিল, বলা শক্ত।

মুহম্মদাবাদেরও অবস্থান নির্ণয় করা যায়নি। এই স্থানগুলি ছাড়া চন্দ্রাবাদ নামে আর একটি জায়গার টাকশালে উৎকীর্ণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়। ডঃ আবদুল করিমের মতে এই চন্দ্রাবাদ চাঁদপুর বা চাঁদপাড়ার ("একানী চাঁদপুর" বা "একানী চাঁদপাড়া" নামে পরিচিত) সঙ্গে অভিন্ন।

পৃঃ ২৮৪ ছঃ ২২—ইংরেজবাজার প্রভৃতি আধুনিক শহরগুলিতে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও অন্যান্য সুলতানদের যে সমস্ত শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি সাধারণত অন্য জায়গা থেকে উঠিয়ে-আনা, ঐ সব জায়গায় মূলে এগুলি ছিল না।

পৃঃ ২৮৬ ছঃ ২৬—ছত্রভোগ কলকাতার প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এর পাশ দিয়ে শীর্ণকায়া আদিগঙ্গা প্রবাহিত। চৈতন্যভাগবত থেকে জানা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গার প্রধান স্রোত এখান দিয়েই প্রবাহিত হত। 'আদিগঙ্গা' যে সত্যই আদিগঙ্গা, তার প্রমাণ এর থেকে পাওয়া যায়।

পৃঃ ২৯০ ছঃ ৮—উত্তরবঙ্গে হোসেন শাহ একটি সুন্দর ও প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এসম্বন্ধে ফ্রান্সিস বুকানন লিখেছেন, "Hoseyn Shah formed a fine road through the country between the Tanggon and Punabhoba, and it is said to have extended to Ghoraghat; but I have not been able to trace it. The width is said to have been 348 cubits, with a large ditch and many fine trees on each side, and bridges constructed of bricks. The whole is overgrown, and gone to ruin. From these dimensions it must rather have been a work of ostentation than utility, and probably was rather an appendage to the country residence of the kings at Secundura, than a military way to Ghoraghat." (Martin's Eastern India, Vol. II, p. 643)।

পৃঃ ২৯০ ছঃ ১৮—'বারথেমা' নামের আদ্যক্ষর 'ব' বর্গীয় 'ব' নয়, অন্তঃস্থ "ব'। এই নামটি রোমান অক্ষরে Varthema রূপে লেখা হয়। অনেকে তাই বাংলায় 'ভার্থেমা' লেখেন।

পৃঃ ২৯৩ ছঃ ২-৪—ভারতে ইংরেজদের শাসনের সময় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নবগোপাল দাশ, দেবেশচন্দ্র দাশ প্রভৃতি বাঙালী সাহিত্যিকেরা সরকারী চাকরী করতেন। কিন্তু তার থেকে এ বিষয় প্রমাণিত হয় না যে ইংরেজ সরকার বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পৃঃ ২৯৮ ছঃ ২৬-২৭—চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলা ১৯শ পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে সনাতন সভাতে বসে বিশ ত্রিশ জন ভট্টাচার্য পণ্ডিতকে নিয়ে ভাগবত বিচার করতেন,

ভট্টাচার্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবতবিচার করে সভাতে বসিয়া॥

পৃঃ ৩০০ ছঃ ২৩-২৬—সব সময় সমস্ত পদের জন্য যোগ্য মুসলমান কর্মচারী পাওয়া যেত না; অযোগ্যদের নিযুক্ত করলে শাসনকার্যেরই ক্ষতি হবে, তাই অন্য মুসলমান সুলতানদের মত হোসেন শাহও যোগ্য হিন্দুদের ঐ সমস্ত পদে নিয়োগ করতেন।

পৃঃ ৩০৬ ছঃ ১৩-১৯—রামচন্দ্র খানের এই নির্যাতনের ঘটনা কোন্ রাজার রাজত্বকালে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে অবশ্য কিঞ্চিৎ সংশয়ের অবকাশ আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে নিত্যানন্দ যখন ভক্তদের নিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেম প্রচার করছিলেন, সেই সময়েই তিনি রামচন্দ্র খানের গ্রামে যান এবং সদলবলে রামচন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে ওঠেন। রামচন্দ্র তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দুর্গামণ্ডপ ছেড়ে দিয়ে গোয়ালঘরে থাকতে বলেন। নিত্যানন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্গামণ্ডপ ছেড়ে দিলে রামচন্দ্র যেখানে তিনি বসেছিলেন, তার মাটি খুঁড়িয়ে এবং দুর্গামণ্ডপের মন্দির-অঙ্গনে গোময়-লোপন করে সমস্ত "পবিত্র" করেন। এর কিছুদিন পরেই "ম্লেচ্ছ উজীর" এসে রামচন্দ্রকে নির্যাতিত করেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার সামান্য পরে নিত্যানন্দ নীলাচল থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন (প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম, পৃঃ ১৪৮ দ্রষ্টব্য)। তারপরে নিত্যানন্দ বাংলাদেশে প্রেম প্রচার সুরু করেন। এদিকে হোসেন শাহ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সুতরাং 'ম্লেচ্ছ উজীরের' হাতে রামচন্দ্র খানের নির্যাতন হোসেন শাহের রাজত্বকালের ঘটনা হতে পারে, আবার তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের রাজত্বকালের ঘটনাও হতে পারে।

পৃঃ ৩১০ ছঃ ৩—ধর্ম সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ স্বাধীন সুলতানই গোঁড়ামি দেখান নি। স্টেপলটন লিখেছেন, "...from Manrique's statement...that, in 1641, he saw figures of idols standing in niches surrounded by carved grotesques and leaves in some stone reservoirs in Gaur, it is quite possible that—except during periods of persecution—the Muhammadan Kings of Gaur allowed idols and Hindu temples to remain unmolested in their capital." (Momoirs of Gaur and Pandua, p. 82, f. n.)

অবশ্য হিন্দু রাজার রাজ্যে যুদ্ধাভিযান করার সময় এঁদের মধ্যে অনেকে মন্দির ও বিগ্রহ প্রভৃতি ধ্বংস করতেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষই তার একমাত্র কারণ নয়; মন্দির ও মূর্তিগুলির ভিতরে অনেক ধনরত্ন থাকত, সেগুলি হস্তগত করার জন্যও এঁরা ঐগুলি ভাঙতেন। নিজের রাজ্যে মন্দির ও মূর্তি প্রভৃতি ধ্বংস করার ব্যাপারে দু' একজন ভিন্ন আর কোন সুলতানই আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। হিন্দু প্রজা ও হিন্দু অমাত্য-কর্মচারীদের মনে অযথা আঘাত দিলে তার ফল ভাল হবে না মনে করেই সম্ভবত এঁরা এই ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার যে সমস্ত স্থানের নাম পৌত্তলিকতাগন্ধী, সেগুলির অধিকাংশই এই সুলতানদের আমলে অপরিবর্তিত ছিল, তাদের মুসলমানী নাম দেওয়া হয়নি। এ ব্যাপারও এঁদের সহিষ্ণু মনোভাবেরই পরিচয় দেয়।

পৃঃ ৩১৩ ছঃ ১৩-১৫—কংসনারায়ণ সম্ভবত নসরৎ শাহের সামন্ত ছিলেন, কারণ 'রাগতরঙ্গিণী'তে (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৭) সঙ্কলিত কংসনারায়ণের ভণিতাযুক্ত একটি পদে "নসিরা শাহ" অর্থাৎ নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের এই প্রশস্তি পাই,

সুমুখি সমাদ সমাদরে সমদল নসিরাসাহ সুরতানে।
নসিরা ভূপতি সোরম দেই পতি কংসনরাএণ ভাণে॥

সম্ভবত কংসনারায়ণ স্বাধীন হবার চেষ্টা করাতেই নসরৎ শাহ তাঁকে আক্রমণ করে বন্দী করেন এবং বধ করেন।

মিথিলায় প্রচলিত একটি শ্লোক এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতে বলা

হয়েছে, কংসনারায়ণ ১৪৪৯ শকাব্দের (১৫২৭ খ্রীঃ) ভাদ্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে মঙ্গলবারে নিহত হয়েছিলেন,

অঙ্কাব্ধিবেদরাসি সম্মিতশাকবর্ষে।
ভাদ্রেসিতে প্রতিপদি ক্ষিতিসূনুবারে॥
হা হা নিহত্য কংসনারায়ণোঽসৌ।
তত্যাজ দেবসরসী নিকটে শরীরম্॥

(Proceedings of the Indian History Congress, 16th Session, 1953, p. 206 দ্রষ্টব্য)

এই শ্লোকটি প্রামাণিক বলে মনে হয়, কারণ ১৪৪৯ শকাব্দের ভাদ্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি মঙ্গলবারেই পড়েছিল। ঐদিন তারিখ ছিল ২৭শে আগস্ট, ১৫২৭ খ্রীঃ (Indian Ephemeries, Swami Kanupillay, Vol. V, p. 257 দ্রষ্টব্য)। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে নসরৎ শাহ্ বাংলার সুলতান ছিলেন। সুতরাং নসরৎ শাহ্ ত্রিহুতের রাজাকে নিহত করেছিলেন—'রিয়াজ'-এর এই উক্তির সঙ্গে শ্লোকটির উক্তির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

পৃঃ ৩১৭ ছঃ ২৩—বাবর তাঁর আত্মকাহিনীতে বাঙালীদের কামান-চালানো সম্বন্ধে এই প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গেই লিখেছেন, "তারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে কামান চালায় না, যথেচ্ছভাবে চালায়।" এর অর্থ, কামান-চালানোতে বাঙালীদের হাত এত পাকা যে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করার দরকার হয় না, যথেচ্ছভাবে কামান চালিয়ে তারা শত্রুদের ঘায়েল করতে পারে। অনেকের ধারণা আছে যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল; চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধে কামান ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় (The Delhi Sultanate, Bharatiya Vidya Bhavan, pp. 460-461 দ্রষ্টব্য)। বাংলা দেশেও পাণিপথের প্রথম যুদ্ধের অন্তত নয় বছর আগে থেকে কামান ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পর্তুগীজ বিবরণগুলিতে লেখা আছে যে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ শাসনকর্তার প্রতিনিধি জোআঁ-দে-সিলভেরা যখন চট্টগ্রামের উপকূলের কাছে একটা চালে-বোঝাই নৌকা জোর করে দখল করে নিয়েছিলেন, তখন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ডাঙা থেকে সিলভেরার জাহাজকে উদ্দেশ করে কামান দেগেছিলেন (Campos, Portugese in Bengal, p. 29 দ্রঃ)। বাবরের সমসাময়িক বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের তোপখানা

ছিল ; শের খাঁ পরে ঐ তোপখানা দখল করেছিলেন (J. A. S. P., Vol. III, 1958, p. 98 দ্রঃ)

পৃঃ ৩১৮ ছঃ ৭—বাবর বাংলার নৌবাহিনীর কাছে তাঁর বাহিনীর এই পরাজয় সম্বন্ধে তাঁর আত্মজীবনীতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা নীচে উদ্ধৃত করছি,

"নদীর আরও উপরের দিকে যে সমস্ত জাহাজ সমবেত ছিল, তাদের কাছ থেকে মধ্যরাত্রে খবর এল যে যুদ্ধের জন্য আদেশপ্রাপ্ত নৌবহর নির্দেশ অনুযায়ী এগিয়ে গিয়েছে ; যে সমস্ত জাহাজ সমবেত হয়েছে, তারা আদেশ অনুসারে চলছে ; বাঙালীরা নদীর একটি সঙ্কীর্ণ বাঁক দখল করে তাদের আটকে রেখেছে, একজন নাবিকের পা গুলী লেগে ভেঙে গেছে ; তারা (বাবরের সৈন্যেরা) এগিয়ে যেতে অসমর্থ হয়ে পড়েছে।'

পৃঃ ৩২০ ছঃ ২-৩—খরিদে প্রাপ্ত নসরৎ শাহের শিলালিপিতে নসরৎ শাহকে 'সুলতান' না বলে শুধুমাত্র 'মালিক' বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ডঃ আহমদ হাসান দানী লিখেছেন, 'It is strange that Nuṣrat Shāh boes not bear the title of Sulṭān at all. He is simply called Malik." (Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, p. 70) ডঃ দানী আরও দেখিয়েছেন যে এতে নসরৎ শাহের সম্বন্ধে "ভগবান তাঁকে তাঁর ভৃত্যশ্রেণীর মধ্যে রাখুন"—এইটুকু ভিন্ন আর কিছু লেখা হয়নি ; এ থেকেও ঐ অঞ্চলে নসরৎ শাহের রাজত্ব করা বোঝায় না। এই বিষয় দুটি থেকে ডঃ দানী নসরৎ শাহ সার্বভৌম রাজা হিসাবে খরিদ অঞ্চল শাসন করতেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ডঃ দানীর সন্দেহের কারণগুলি অযৌক্তিক না হলেও শুধুমাত্র এইটুকুর উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে না। আর নসরৎ শাহ ভারত-বর্ষের একটি অঞ্চলের সার্বভৌম নৃপতি হয়ে বাবর বা আর কোন নৃপতির অধীনস্থ শাসনকর্তা হিসাবে খরিদ অঞ্চল শাসন করবেন, এ কথা কল্পনা করা কঠিন। সুতরাং খরিদে যে নসরৎ শাহের সার্বভৌম অধিকার ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প।

পৃঃ ৩২০ ছঃ ১৬—'রিয়াজ'-এর মতে এই মালিক মর্জান নপুংসক ছিল।

পৃঃ ৩২০ ছঃ ২৬—'রাজমালা'র মতে দেবমাণিক্য ধন্যমাণিক্যের পুত্র এবং পরবর্তী রাজা। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ধন্যমাণিক্য ও দেব-মাণিক্যের মাঝখানে "ধন্যমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য" অল্প সময়ের জন্য রাজা হয়েছিলেন।

পৃঃ ৩২৫ ছঃ ১-৫—অহোম্ বুরঞ্জীগুলিতে বাংলার স্থলতানদের আসাম অভিযানের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হলেও মূলত সত্য। এসম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ না পাওয়ার দরুণ কেবলমাত্র অহোম্ বুরঞ্জীর বিবরণের সার সঙ্কলন করা ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নেই।

পৃঃ ৩২৯ ছঃ ৭—আবিদ আলী Memoirs of Gaur and Pandua-তে (pp. 61 ff.) "কদম রসুল"কে মসজিদ না বলে শুধুমাত্র "The Qadam Rasūl" নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কানিংহাম তাঁর Archæological Report-এ (Vol. XV, p. 54) "কদম রসুল"কে "mosque" বলেছেন।

পৃঃ ৩৩০ ছঃ ১২-১৬—অবশ্য দুটি পাঠই ঠিক হতে পারে। এই প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩১, ছঃ ১-৪ দ্রষ্টব্য।

পৃঃ ৩৩২ ছঃ ৩-৬—এই সমস্ত স্থান ছাড়া নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহের মাহ্মূদাবাদ ও বারবকাবাদের টাকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। তাঁর মুদ্রার অন্যতম নির্মাণস্থান নসরতাবাদ 'আইন-ই আকবরী'তে ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্গত একটি মহল বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-কে অনুসরণ করে আমরা এখানে খলিফতাবাদ ও মুহম্মদাবাদকে যথাক্রমে দক্ষিণ যশোহর ও উত্তর যশোহর বলে নির্দিষ্ট করেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খলিফতাবাদ বাগেরহাটের নামান্তর; মুহম্মদাবাদের অবস্থান এখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি।

পৃঃ ৩৩৪ ছঃ ২-৩—আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের ফতেহাবাদ, নসরতাবাদ ও মুহম্মদাবাদের টাকশালে উৎকীর্ণ মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

পৃঃ ৩৩৪ ছঃ ১১-১২—এস. শরফুদ্দীন আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের ৯৩৮ হিজরায় উৎকীর্ণ পাঁচটি মুদ্রা পরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে দুটি মুহম্মদাবাদের টাকশালে তৈরী (Varendra Research Society's Monographs, No. 6, pp. 16-18 দ্রষ্টব্য)।

পৃঃ ৩৩৮ ছঃ ৩-৪—"সুর্যগড়" বা "সুরজগড়" মুঙ্গের ও পাটনার মাঝখানে—মুঙ্গের থেকে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আবুল ফজল অবশ্য 'আকবরনামা'তে পরিষ্কারভাবে লেখেননি যে সুরজগড়েই ইব্রাহিম খাঁর বাহিনীর সঙ্গে শের খাঁর বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র লিখেছেন, "সে (শের খাঁ) বাংলার রাজার রাজ্যের যা সীমান্ত, সেই সুরজগড়ে একটি যুদ্ধ করে এবং তাতে জয়লাভ করে।" ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো দেখিয়েছেন যে সুরজগড়েই শের খাঁ এবং ইব্রাহিম খাঁর বাহিনী যুদ্ধ করেছিল (Sher Shah, pp 99-101 দ্রষ্টব্য)।

পরিশিষ্ট 'চ'

কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে মন্তব্য

অমাত্য :—

এই বইয়ের সর্বত্র "অমাত্য" শব্দ ফার্সী "আমীর" শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তা স্বীকার্য। কিন্তু অন্য উপযুক্ত শব্দ না পাওয়ায় "অমাত্য" শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে।

কংথর (দ্রঃ পৃঃ ৪৯/১) :—

"কংথর" শব্দের বিশিষ্ট অর্থ ছাউনি ফেলবার উপযোগী বিশেষভাবে প্রস্তুত স্থান ("The place dressed with concrete for camping"—Bhattasali)।

খলীফৎ আল্লাহ্ (দ্রঃ পৃঃ ৬৯, ১২১) ;—

"খলীফৎ আল্লাহ্"র অর্থ ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী। বাংলার সুলতানদের মধ্যে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ সর্বপ্রথম এই উপাধি ব্যবহার করেন। তাঁর পরবর্তী অনেক সুলতান তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই উপাধি ব্যবহার করতেন—যেমনভাবে ইংলণ্ডের রাজারা "Defender of the Faith" উপাধি ব্যবহার করে আসছেন। নতুন মুসলমান জলালুদ্দীনের পক্ষে এই উপাধি গ্রহণ ইসলামধর্মের প্রতি তাঁর অত্যধিক নিষ্ঠার পরিচয় দেয়, কিন্তু তাঁর পরবর্তী সুলতানবর্গ কর্তৃক এই পুরোনো উপাধি ব্যবহার থেকে তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন হদিস্ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই বইয়ের ১২১ পৃষ্ঠায় (২য় খণ্ড) ১২-১৭ ছত্রে কিছু ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের প্রায় সমস্ত মুদ্রাতেই তাঁর "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কোন শিলালিপিতে ঐ উপাধির উল্লেখ মেলে না। পক্ষান্তরে, শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের কয়েকটি শিলালিপিতে "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধির উল্লেখ থাকলেও তাঁর কোন মুদ্রায় ঐ উপাধির উল্লেখ নেই।

ডঃ আবদুল করিমের মতে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পরে বাংলার কোন সুলতান "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধি গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁদের কারও মুদ্রাতেই ঐ উপাধি উল্লিখিত হয়নি (Corpus of the Muslim Coins of Bengal, pp. 174-176 দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ, জলালুদ্দীন ফতেহ শাহ ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কয়েকটি শিলালিপিতে সুলতানের

"খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ডঃ আবদুল করিম বলেন যে ঐ শিলালিপিগুলি সুলতানরা খোদাই করাননি, তাঁদের কর্মচারী ও প্রজারা খোদাই করিয়েছিলেন, তাঁরা চাটুকারিতা করে সুলতানদের "খলীফৎ আল্লাহ্" বলেছেন। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এতগুলি লোক এইসব সুলতানকে তোষামোদ করে "খলীফৎ আল্লাহ্" বলেছেন ভাবা কঠিন। আর আলাউদ্দীন হোসেন শাহের যে চারটি শিলালিপিতে তাঁর "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধির উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে একটি তাঁরই আদেশে ক্ষোদিত হয়েছিল (Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, pp. 49-50 দ্রষ্টব্য)। অতএব ঐসব সুলতানের যে "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধি ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুদ্রার অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে রাজাদের সবগুলি উপাধি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ইংলণ্ডের রাজাদের অধিকাংশ উপাধিই তাঁদের মুদ্রায় উল্লিখিত হত না বা হয় না। রুকনুদ্দীন বারবক শাহের পরবর্তী বাংলার সুলতানরা তাঁদের প্রিয় অন্যান্য উপাধির স্থান সঙ্কুলান করার জন্য মুদ্রা থেকে "খলীফৎ আল্লাহ্" উপাধিটিকে বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু উপাধিটিকে যে তাঁরা ত্যাগ করেন নি, তার প্রমাণ তাঁদের পূর্বোক্ত শিলালিপিগুলি থেকে পাওয়া যায়।

'পরিশিষ্ট ছ'

হিজরা ও খ্রীষ্টাব্দ

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন তারিখে আরম্ভ
৭৩৯	২০।৭।১৩৩৮	৭৬৫	১০।১০।১৩৬৩
৭৪০	৯।৭।১৩৩৯	৭৬৬	২৮।৯।১৩৬৪
৭৪১	২৭।৬।১৩৪০	৭৬৭	১৮।৯।১৩৬৫
৭৪২	১৭।৬।১৩৪১	৭৬৮	৭।৯।১৩৬৬
৭৪৩	৬।৬।১৩৪২	৭৬৯	২৮।৮।১৩৬৭
৭৪৪	২৬।৫।১৩৪৩	৭৭০	১৬।৮।১৩৬৮
৭৪৫	১৫।৫।১৩৪৪	৭৭১	৫।৮।১৩৬৯
৭৪৬	৪।৫।১৩৪৫	৭৭২	২৬।৭।১৩৭০
৭৪৭	২৪।৪।১৩৪৬	৭৭৩	১৫।৭।১৩৭১
৭৪৮	১৩।৪।১৩৪৭	৭৭৪	৩।৭।১৩৭২
৭৪৯	১।৪।১৩৪৮	৭৭৫	২৩।৬।১৩৭৩
৭৫০	২২।৩।১৩৪৯	৭৭৬	১২।৬।১৩৭৪
৭৫১	১১।৩।১৩৫০	৭৭৭	২।৬।১৩৭৫
৭৫২	২৮।২।১৩৫১	৭৭৮	২১।৫।১৩৭৬
৭৫৩	১৮।২।১৩৫২	৭৭৯	১০।৫।১৩৭৭
৭৫৪	৬।২।১৩৫৩	৭৮০	৩০।৪।১৩৭৮
৭৫৫	২৬।১।১৩৫৪	৭৮১	১৯।৪।১৩৭৯
৭৫৬	১৬।১।১৩৫৫	৭৮২	৭।৪।১৩৮০
৭৫৭	৫।১।১৩৫৬	৭৮৩	২৮।৩।১৩৮১
৭৫৮	২৫।১২।১৩৫৬	৭৮৪	১৭।৩।১৩৮২
৭৫৯	১৪।১২।১৩৫৭	৭৮৫	৬।৩।১৩৮৩
৭৬০	৩।১২।১৩৫৮	৭৮৬	২৪।২।১৩৮৪
৭৬১	২৩।১১।১৩৫৯	৭৮৭	১২।২।১৩৮৫
৭৬২	১১।১১।১৩৬০	৭৮৮	২।২।১৩৮৬
৭৬৩	৩১।১০।১৩৬১	৭৮৯	২২।১।১৩৮৭
৭৬৪	২১।১০।১৩৬২	৭৯০	১১।১।১৩৮৮

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৭৯১	৩১।১২।১৩৮৮	৮১৯	১।৩।১৪১৬
৭৯২	২০।১২।১৩৮৯	৮২০	১৮।২।১৪১৭
৭৯৩	৯।১২।১৩৯০	৮২১	৮।২।১৪১৮
৭৯৪	২৯।১১।১৩৯১	৮২২	২৮।১।১৪১৯
৭৯৫	১৭।১১।১৩৯২	৮২৩	১৭।১।১৪২০
৭৯৬	৬।১১।১৩৯৩	৮২৪	৬।১।১৪২১
৭৯৭	২৭।১০।১৩৯৪	৮২৫	২৬।১২।১৪২১
৭৯৮	১৬।১০।১৩৯৫	৮২৬	১৫।১২।১৪২২
৭৯৯	৫।১০।১৩৯৬	৮২৭	৫।১২।১৪২৩
৮০০	২৪।৯।১৩৯৭	৮২৮	২৩।১১।১৪২৪
৮০১	১৩।৯।১৩৯৮	৮২৯	১৩,১১।১৪২৫
৮০২	৩।৯।১৩৯৯	৮৩০	২।১১।১৪২৬
৮০৩	২২।৮।১৪০০	৮৩১	২২।১০।১৪২৭
৮০৪	১১।৮।১৪০১	৮৩২	১১।১০।১৪২৮
৮০৫	১।৮।১৪০২	৮৩৩	৩০।৯।১৪২৯
৮০৬	২১।৭।১৪০৩	৮৩৪	১৯।৯।১৪৩০
৮০৭	১০।৭ ১৪০৪	৮৩৫	৯।৯;১৪৩১
৮০৮	২৯।৬।১৪০৫	৮৩৬	২৮।৮।১৪৩২
৮০৯	১৮।৬।১৪০৬	৮৩৭	১৮।৮।১৪৩৩
৮১০	৮।৬।১৪০৭	৮৩৮	৭।৮।১৪৩৪
৮১১	২৭।৫।১৪০৮	৮৩৯	২৭।৭।১৪৩৫
৮১২	১৬।৫।১৪০৯	৮৪০	১৬।৭।১৪৩৬
৮১৩	৬।৫।১৪১০	৮৪১	৫।৭।১৪৩৭
৮১৪	২৫।৪।১৪১১	৮৪২	২৪।৬।১৪৩৮
৮১৫	১৩।৪।১৪১২	৮৪৩	১৪।৬।১৪৩৯
৮১৬	৩।৪।১৪১৩	৮৪৪	২।৬।১৪৪০
৮১৭	২৩।৩।১৪১৪	৮৪৫	২২।৫।১৪৪১
৮১৮	১৩।৩।১৪১৫	৮৪৬	১২।৫।১৪৪২

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৮৪৭	১।৫।১৪৪৩	৮৭৫	৩০।৬।১৪৭০
৮৪৮	২০।৪।১৪৪৪	৮৭৬	২০।৬।১৪৭১
৮৪৯	৯।৪।১৪৪৫	৮৭৭	৮।৬।১৪৭২
৮৫০	২৯।৩।১৪৪৬	৮৭৮	২৯।৫।১৪৭৩
৮৫১	১৯।৩।১৪৪৭	৮৭৯	১৮।৫।১৪৭৪
৮৫২	৭।৩।১৪৪৮	৮৮০	৭।৫।১৪৭৫
৮৫৩	২৪।২।১৪৪৯	৮৮১	২৬।৪।১৪৭৬
৮৫৪	১৪।২।১৪৫০	৮৮২	১৫।৪।১৪৭৭
৮৫৫	৩।২।১৪৫১	৮৮৩	৪।৪।১৪৭৮
৮৫৬	২৩।১।১৪৫২	৮৮৪	২৫।৩।১৪৭৯
৮৫৭	১২।১।১৪৫৩	৮৮৫	১৩।৩।১৪৮০
৮৫৮	১।১।১৪৫৪	৮৮৬	২।৩।১৪৮১
৮৫৯	২২।১২।১৪৫৪	৮৮৭	২০।২।১৪৮২
৮৬০	১১।১২।১৪৫৫	৮৮৮	৯।২।১৪৮৩
৮৬১	২৯।১১।১৪৫৬	৮৮৯	৩০।১।১৪৮৪
৮৬২	১৯।১১।১৪৫৭	৮৯০	১৮।১।১৪৮৫
৮৬৩	৮।১১।১৪৫৮	৮৯১	৭।১।১৪৮৬
৮৬৪	২৮।১০।১৪৫৯	৮৯২	২৮।১২।১৪৮৬
৮৬৫	১৭।১০।১৪৬০	৮৯৩	১৭।১২।১৪৮৭
৮৬৬	৬।১০।১৪৬১	৮৯৪	৫।১২।১৪৮৮
৮৬৭	২৬।৯।১৪৬২	৮৯৫	২৫।১১।১৪৮৯
৮৬৮	১৫।৯।১৪৬৩	৮৯৬	১৪।১১।১৪৯০
৮৬৯	৩।৯।১৪৬৪	৮৯৭	৪।১১।১৪৯১
৮৭০	২৪।৮।১৪৬৫	৮৯৮	২৩।১০।১৪৯২
৮৭১	১৩।৮।১৪৬৬	৮৯৯	১২।১০।১৪৯৩
৮৭২	২।৮।১৪৬৭	৯০০	২।১০।১৪৯৪
৮৭৩	২২।৭।১৪৬৮	৯০১	২১।৯।১৪৯৫
৮৭৪	১১।৭।১৪৬৯	৯০২	৯.৯।১৪৯৬

হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ	হিজরা	খ্রীষ্টাব্দের কোন্ তারিখে আরম্ভ
৯০৩	৩০	৮	১৪৯৭	৯২৫	৩	১	১৫১৯
৯০৪	১৯	৮	১৪৯৮	৯২৬	২৩	১২	১৫১৯
৯০৫	৮	৮	১৪৯৯	৯২৭	১২	১২	১৫২০
৯০৬	২৮	৭	১৫০০	৯২৮	১	১২	১৫২১
৯০৭	১৭	৭	১৫০১	৯২৯	২০	১১	১৫২২
৯০৮	৭	৭	১৫০২	৯৩০	১০	১১	১৫২৩
৯০৯	২৬	৬	১৫০৩	৯৩১	২৯	১০	১৫২৪
৯১০	১৪	৬	১৫০৪	৯৩২	১৮	১০	১৫২৫
৯১১	৪	৬	১৫০৫	৯৩৩	৮	১০	১৫২৬
৯১২	২৪	৫	১৫০৬	৯৩৪	২৭	৯	১৫২৭
৯১৩	১৩	৫	১৫০৭	৯৩৫	১৫	৯	১৫২৮
৯১৪	২	৫	১৫০৮	৯৩৬	৫	৯	১৫২৯
৯১৫	২১	৪	১৫০৯	৯৩৭	২৫	৮	১৫৩০
৯১৬	১০	৪	১৫১০	৯৩৮	১৫	৮	১৫৩১
৯১৭	৩১	৩	১৫১১	৯৩৯	৩	৮	১৫৩২
৯১৮	১৯	৩	১৫১২	৯৪০	২৩	৭	১৫৩৩
৯১৯	৯	৩	১৫১৩	৯৪১	১৩	৭	১৫৩৪
৯২০	২৬	২	১৫১৪	৯৪২	২	৭	১৫৩৫
৯২১	১৫	২	১৫১৫	৯৪৩	২০	৬	১৫৩৬
৯২২	৫	২	১৫১৬	৯৪৪	১০	৬	১৫৩৭
৯২৩	২৪ ১	১৫১৭	৯৪৫	৩০	৫	১৫৩৮
৯২৪	১৩	১	১৫১৮		

সঙ্কেতপঞ্জী

বা. সা. ই. ১৷২—ডঃ সুকুমার সেন রচিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ।

বা. সা ই. ১৷৩—ঐ, তৃতীয় সংস্করণ।

সা. প. প.—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

I. H. Q.—Indian Historical Quarterly.

J. A. S.—Journal of the Asiatic Society.

J. A S. B.—Journal of the Asiatic Society of Bengal.

J. A S. P.—Journal of the Asiatic Society of Pakistan.

J. B. O. R. S.—Journal of the Bihar and Orissa Research Society.

J. B. R. S.—Journal of the Bihar Research Society.

P. A. S B.—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

নির্ঘণ্ট

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
৩৯/১	২০	অভিাজত	অভিজাত অমাত্য
৪৪/১	১৫	Sultans	Inscriptions
৮৫/১ – ৮৭/১	৯ – ৬	গুলন্ধম	গুল-অন্দাম
৮৭/১	২৪	1641	1941
৩	৩০	হত	হয়
৪	১৯	নাম করেন নি	নাম দু' এক জায়গা ভিন্ন কোথাও উল্লেখ করেন নি
১৯	২১	ইনি	'রিয়াজ'-এর মতে ইনি
২৬	১৩	নবী	রসুল
৪০	২৩	মুদ্রাগুলি	মুদ্রাগুলির তারিখ
৪১	৯	ওয়াইস	ওয়াইজ
৬৭	২০	Appendix V	Book III, Appendix N
৬৭	২১	Judoosein	Juddoo Sein
৬৮	২৬	'খলিকার সেবক'	'খলিফার সহায়ক'
৬৯ – ৭১	১৮ – ২	বার্ত্তায়	বার্‌স্‌বায়
৮৩ – ৮৪	২৮ – ৩	'সি-য়ং-চও-কুং-তিয়েন'	'সিং-য়ং-চও-কুং-তিয়েন-লু'
৮৯	৭	৩৫	২৫
৯২ – ৯৩	৫ – ৭	ইব্রাহিম	ইসমাইল
১০৩	৮	দুর্গাদাস	দুর্গাবর
১০৫	২১	তাই	তা'ই
১০৫	২১	রাজত্ব	রাজ্য
১০৬	১০	শহাবুদ্দীম	শহাবুদ্দীন
১১৫	২৫	ভাগলপুর	ভাগলপুর ও মুঙ্গের
১২৪	৩-৪	তবকাৎ-ই-আকবরী	আইন-ই-আকবরী
১৬৩	৯	সিংহাসনেরও	সিংহাসনে আরোহণেরও
১৬৭	৩০	মুনাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ	নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ

পৃষ্ঠা	ছত্র	আছে	হবে
১৭২	১০	প্রথম শাসনব্যবস্থায়	শাসনব্যবস্থায় প্রথম
১৭২	২২	পাইকদের সর্দার	পাইকদের সর্দার ও বাঙালী
১৭৪	১২	frontier	frontiers
১৮৮	৭	জোনপুর	জৌনপুর
১৯৪	১৪	ত্রিহুতের	ত্রিহুতের সন্নিহিত
২০২	৯	বাংলা থেকে	চৈতন্যদেব বাংলা থেকে
২০৭	৩	দুর্গে	দুর্গের কাছে থেকে
২০৭	৪	জয়লাভের জন্য	ঘোড়ায় বসে
২০৭	৪	যুদ্ধ	সম্মুখযুদ্ধ
২০৭	৫	গোবিন্দ বিদ্যাধর	গোবিন্দ ভোই বিদ্যাধর
২০৯	৩০	"প্রমোদ্ভূত"	"প্রমোদাঢ্য"
২১০	১০	পঞ্চগৌড়-অধিনায়কঃ	পঞ্চগৌড়াধিনায়কঃ
২১২	২৪	হয়।	হয়)
২২৬	১৯	দেবদ্বার	দেবদ্বার
২৪২	২৮	গ্রামের	রামকেলি গ্রামের
২৮২	১১	ডাকলেও	ডাকালেও
২৮৫	২৩	জামী মসজিদ আছে, এতে তাঁর	জামী মসজিদের
২৯৪	৩	মুসমান	মুসলমান
৩০৩	১৫	হীদেন	পৌত্তলিক
৩২৬	২	প্রাসাদের প্রধান খোজাকে	প্রাসাদের খোজাকে
৩২৯	১৩	নবীর	রসূলের
৩৩৭	৩০	জালাল খাঁ	জলাল খাঁ
৩৩৮	৩০	মাহ্‌দের	মাহ্‌মুদের
৩৪৫	২৩	সম্পায়ো	সম্পয়ো
৩৪৬	২৪-২৫	মাহ্‌মুদ শাহের	মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ
৩৫১	২১	beaf	beef
৩৫৩	১৬	sino-	Sino-
৪০৩	২৭	অর্জুন রায়	অর্জুন মিশ্র

ছাপার সময় অক্ষর ভেঙে যাওয়ায় নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিকৃত আকারে মুদ্রিত হয়েছে :—

পৃঃ ৩৮ ছঃ ৩ "এবং", পৃঃ ২২০ ছঃ ১০ "ছিলে", পৃঃ ৩৮৭ ছঃ ৯ "পদবী", পৃঃ ৩৮৯ ছঃ ৫ "নসীব শাহ", [illegible] "[illegible]খ্যাত"।